বঙ্গীয়

লোক-সঙ্গীত রত্নাকর

বাংলার লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ

(An Encyclopaedia of Bengali Folk-song)

দ্বিতীয় খণ্ড

G13761

জ—ন
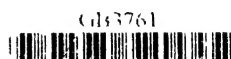
ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ. ; পি. এইচ. ডি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অধ্যাপক ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
নয়াদিল্লী কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমির
রত্নসদস্য কর্তৃক সঙ্কলিত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষ-গ্রন্থ (encyclopaedia) 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডে 'অ' হইতে 'ছ' আদ্য অক্ষরবিশিষ্ট লোক-সঙ্গীতগুলি স্থান পাইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডে 'জ' হইতে 'ন' পর্যন্ত আদ্য অক্ষরবিশিষ্ট লোক-সঙ্গীতগুলি প্রকাশিত হইল। পরবর্তী দুই খণ্ডে অবশিষ্ট সঙ্গীতগুলি যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশিত হইবে।

এই খণ্ডে ঝুমুরের সংগ্রহই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আদিবাসীর সঙ্গীত এবং লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঝুমুর শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এখানেও তাহা তেমনই ব্যাপকভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে; তবে যথাসম্ভব তাহা বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিষয়ের যেমন বৈচিত্র্য, সুরেরও তেমনই বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। লোক-সঙ্গীতের সংগ্রহের মধ্যে সুরের বৈচিত্র্য নির্দেশ করা সম্ভব নহে, তাহা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার মধ্যে কেবল সঙ্গীতের পাঠ্য (text) অংশই প্রকাশিত হইল।

বাংলার সঙ্গীত-সাধনায় ঝুমুরের একটি বিশেষ স্থান আছে, সে সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্যক্ অবহিত হইতে পারি নাই। মধ্যযুগে যে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার উৎস এবং পরিণতি সন্ধান করিতে গেলে ঝুমুরের মধ্যেই তাহা সম্ভব। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর যে একটি লৌকিক ধারা প্রচলিত ছিল, তাহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচলিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক গ্রন্থ হইতেও জানিতে পারা যায়। একটি ধারা অনুসরণ করিয়াই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহা অনুসরণ করিয়াই পদাবলী সাহিত্য রচনার যুগেও যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ঐতিহ্য অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহা ঝুমুর গানগুলি হইতেই জানিতে পারা যাইবে। এ কথা সত্য, কালক্রমে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র লৌকিক ধারাটি বৈষ্ণবপদাবলী দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৈষ্ণবপদাবলীর ধারার মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে মৌখিক সাহিত্যের ধারা কোনদিন কোনও লিখিত রূপের মধ্যে একেবারে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদগুলি অভিজাত বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহে স্থান লাভ না করিলেও তাহা যে জন-মানস হইতে কোনদিনই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া

যাইতে পারে নাই, ঝুমুর গানগুলি তাহার প্রমাণ। অথচ ঝুমুর গানের এ যাবৎ বিস্তৃত কোন সংগ্রহের অভাবে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কিংবা বৈষ্ণবপদাবলীর আলোচনায় এই কথাটি কাহারও মনে কোনও গুরুত্ববোধ জন্মাইতে পারে নাই।

বাংলা দেশের নিরক্ষর সমাজের উপর রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, ঝুমুর গানগুলি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই দেশের নিরক্ষর লোক যখন পুরাণ পাঠকের নিকট হইতে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের কথকতা শুনিত, তখন তাহারা ইহাদের সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিত না। ইহাদের বিষয়ে তাহাদের মধ্যেও একটি মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইত। তাহারই ফল স্বরূপ তাহারা এদেশে যাহা আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার একটি প্রধান অংশ ঝুমুর গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এ’দেশের সাধারণ জন-সমাজে হিন্দুর শাস্ত্র কিংবা পুরাণ সম্পর্কে কোনদিনই কোন গোঁড়ামি-বোধের জন্ম হয় নাই; সেইজন্য প্রতি মুহূর্তেই ইহাদিগকে তাহারা নিজেদের মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। কৃত্তিবাস হইতেই যাহার সূচনা, জন-মানসে তাহারই পূর্ণতর বিকাশ হইয়াছে মাত্র। ঝুমুর গানে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঝুমুর গানের সুরলোকে আর্য এবং অনার্যের একটি অপূর্ব মিলন সাধিত হইয়াছে, তাহার ফলেই ইহা একটি অভাবনীয় প্রাণশক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি অনার্য লোকে, বিকাশ আর্য লোকে। আদিবাসীর সমাজ হইতে ইহার মূল গীতিসুরের উৎপত্তি হইয়া ক্রমে তাহা উচ্চতর সমাজের গীতি-সাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের একটি ধারা যেমন বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যে এবং আর একটি ধারা অনার্য ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে উভয়ে একাকার হইয়া গিয়াছে, ঝুমুরের মধ্যেও বাঙ্গালী এবং তাহার প্রতিবেশী উপজাতির সঙ্গীত-সাধনা সেই পরিচয় লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সঙ্গীতের বৈদিক ঐতিহ্য কিংবা অনার্য ঐতিহ্য যেমন নিজেদের স্বাধীন ধারাও বিলুপ্ত করিয়া দেয় নাই, তেমনই ঝুমুর বাঙ্গালীর সঙ্গীত-সাধনার ক্রমবিকাশের ধারায় নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব বিসর্জন দেয় নাই।

এই খণ্ডে ঝুমুরের পরই যে গানের সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য, তাহা টুসু। টুসু পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কেবলমাত্র আঞ্চলিক সঙ্গীত নহে, বিশেষ একটি মাসের মধ্যে সীমায়িত সাময়িক সঙ্গীত মাত্র। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে seasonal song বলা যায়। কারণ, ইহার সঙ্গে একটি মাসেরই বিশিষ্ট আচার (ritual) সংযুক্ত

হইয়া রহিয়াছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহার ক্ষেত্র ঝুমুরের মত এত বিস্তৃত নহে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে বিশেষ অঞ্চলে ইহা সীমাবদ্ধ, তাহাতে ইহার যে অজস্রতা এবং প্রভাবের ব্যাপকতা দেখা যায়, তাহার সঙ্গে আর কোনও এই শ্রেণীর সঙ্গীতের তুলনা হয় না।

সাধারণত আমাদের দেশের লোক-সঙ্গীত-প্রেমিকদিগের মধ্যে একটি ধারণা আছে যে, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের তুলনায় লোক-সঙ্গীতের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য অনেক কম। এই খণ্ডে সংগৃহীত সঙ্গীতগুলি লক্ষ্য করিলে তাহাদের সেই ধারণা দূর হইবে। লোক-সঙ্গীতের দিক দিয়া বাংলার মাটি কোথাও অনুর্বর নহে, কেবল বিষয়ের বিভিন্নতা আছে এই মাত্র।

আমার তত্ত্বাবধানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লোক-সাহিত্য শাখার ছাত্রছাত্রীগণ যে বিপুল সংখ্যক লোক-সঙ্গীত বিভিন্ন সংগ্রহ-শিবির হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই এই খণ্ডের সংগ্রহে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই কোষগ্রন্থকে নানাদিক দিয়া পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য অন্যের সংগ্রহের উপরও আমাকে স্বভাবতই নির্ভর করিতে হইয়াছে। উত্তর বঙ্গের সংগ্রহের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁহার *The Rajbansi of North Bengal* নামক গ্রন্থে যে সকল গান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের সংগ্রহ হইতেও কয়েকটি সঙ্গীত গ্রহণ করিয়াছি। বিগত প্রায় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে নানা পত্র-পত্রিকায় যে সব সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগেরও কিছু কিছু এই সংগ্রহে প্রকাশ করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নহে। প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডেরও মুদ্রণ ব্যয় দিল্লীর জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমিই গ্রহণ করিয়াছেন ; সেইজন্য এই খণ্ডটিরও মূল্য সুলভ করা সম্ভব হইয়াছে।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের সৌখীন সংগ্রাহকদিগের কাহারও কাহারও মনে এমন একটি ধারণা আছে যে, তাঁহার সংগৃহীত সকল গানই তাঁহার 'নিজস্ব' সম্পত্তি। কিন্তু নিজস্ব রচনা একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলেও পরের রচনার সংগ্রহের মধ্যে 'নিজস্ব' বলিয়া কিছু নাই, তাহাতে ব্যক্তিগত কোনও অধিকার স্থাপন করা যায় না। সংগৃহীত গান যদি অকৃত্রিম হয়, তবে অন্যেও তাহা সংগ্রহ করিতে পারে ; এমন কি, সংগ্রহ না করিলেও সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া দাবী করিলেও তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে না। সুতরাং এই কোষগ্রন্থের মধ্যে

আমার নিজের যত্ন ও চেষ্টার ফলে যাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি, তাহার মধ্যে আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত কোনও অধিকার নাই। ইহা সামগ্রিক ভাবে জাতির সৃষ্টি এবং ইহাতে সামগ্রিক ভাবে জাতিরই অধিকার। সুতরাং ইহাদের স্বাধীন মৌখিক প্রচারে যেমন কোনও বাধা নাই, লিখিত হইয়া প্রচারিত হইলেও কোনও বাধা থাকিতে পারে না।

বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রন্থ রচনার এই প্রথম প্রয়াস সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হইবে, এমন দাবী স্বভাবতই আমি করি না। ইহার ভুলত্রুটি কিংবা অন্য কোনও প্রকার অসম্পূর্ণতা বিষয়ে যদি সহৃদয় পাঠক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তবে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি
গবেষণা পরিষদ
পৌষ-উৎসব, ১৩৬৭ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

State Central Library, West Bengal
56A, B. T. Road, Calcutta-700 050

জন্মকালীন সঙ্গীত

পরিবারে শিশুর জন্ম হইলে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে যে মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে জন্মকালীন সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইংরেজীতে এই শ্রেণীর সঙ্গীত birth song বলিয়া পরিচিত। সম্রান্ত হিন্দু পরিবারে সাধারণত এই উপলক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্তই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হয়; তবে অনেক ক্ষেত্রেই রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্তের পরিবর্তে লক্ষীন্দরের জন্মকাহিনীও শুনিতে পাওয়া যায়।

১

পরে সাধ খাইয়া সোনাইর প্রসব বেদনা হইল।
রতি রতি বলে সোনাই ডাকিতে লাগিল॥
কোথা গেল ছয় বধূ দেখ গো আসিয়া।
বুড়াকালে প্রসব ব্যথা উপজিল বলিয়া॥
এক খাটের থেকে রাণী অন্য খাটে যায়।
মাঝের খাটে রাণী গড়াগড়ি যায়॥
রাম-লক্ষ্মণ দুই শূল আসিয়া উপজিল।
হস্তে যোড় লখিন্দর ভূমিষ্ঠ হইল॥
মাটিতে পড়িয়া ছেলে ওয়া ওয়া বলে।
হেনকালে দাই মা তুলে নিল কোলে॥
সোনার কাটারি দিয়া নাড়ী ছেদন করিল।
সোনার সুপুরি কড়ি দাইরে দিল॥
ছয় দিনে লখিন্দরের ষষ্ঠ হইল।
সাত দিনে লখিন্দরের অশৌচ তুলিল॥
ছয় মাসের লখিন্দর হইল তখন।
শুভক্ষণে সোনাই করিলেক অন্নপ্রাশন॥
সোনাইর সঙ্গে যুক্তি করিয়া তখন।
রাখিল লখিন্দর নাম ওঝা বিচক্ষণ॥

দিনে দিনে বাড়ে লখাই মনসার বর।
সাত বৎসরের হইল কুমার লখিন্দর॥
শুভদিন পাইয়া করাইল কর্ণভেদ।
রাজনীতি শিখাইল জানাইল বেদ॥ —মৈমনসিং

পুত্র সন্তানের জন্ম হইলে সেই উপলক্ষে যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার আরও একটির নিদর্শন এই প্রকার—

২

ভগবান পুত্র পেইয়ে, আনন্দে কোলে নিয়ে রাণী নিদ্রা যায়।
গোপাল কান্দিছ না রে—ঐ আমার কোলে আয় রে॥
কে তোরে বলে কালো—গোপাল রে,
যে তোরে বলে কালো, তার কিরে, বাপ, নয়ন কালো।
ঐ তোর ঐ রূপে অন্ধকার করে আলো॥
(গোপাল কান্দিছ না রে)
একদিন দেইখাছি তোরে মৃত্তিকা বোধনের কালে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড দেইখাছি তোর বদনে॥
(গোপাল কান্দিছ না রে)
ছিল তোর নয়ন-তারা দুঃখিনীর দুখপাসরা
তিলে তিলে হইলাম হারা।
গোপাল, যাইও না যাইও না কারো গৃহে খেলাইতে;
গৃহে বইসে খেল, মা বলিয়ে ডাক,
শুনুক গোকুলেরই লোকে॥
বাছা, যাইও না যাইনা না কারো গৃহে খেলাইতে॥ —ত্রিপুরা

পুত্রের পরিবর্তে কন্যা-সন্তানের জন্ম হইলে নিম্ন প্রকার গীত শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৩

ওগো, গিরিরাজ, দেখ গো আসিয়া
তোমার ঘরে আজি কোটী চাঁদ মিলিয়া
এক চান্দ হইয়াছে উদয়।
আইস, গিরিরাজ, আর না কৈর ব্যাজ
এমন ভাগ্য নাকি আর কারো হয়। —মৈমনসিং

৪

কৈ কৈ কৈ মাগো তোর সোনার খোকা কই,
দুই হাত পেতেছি আজ ফুল বাতাসা কৈ।
তোমার খোকার রূপের বাহার, তুলনা নাই তাহার
দূর হতে এসেছি মোরা মুড়কি মোয়া কৈ। —২৪ পরগণা

জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতীর পালাগান

পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনীমূলক যে এক গীতিকা প্রচলিত আছে, তাহা চন্দ্রাবতীর পালা বা জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতীর পালা নামে পরিচিত। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই: পিতার শিবপূজার জন্য চন্দ্রাবতী প্রত্যহ ফুল তুলিতে নির্জন পুকুরের ধারে যায়। একদিন জয়ানন্দের সঙ্গে তাহার সেখানেই সাক্ষাৎ হইল। অপরিচয়ের ব্যবধান দূর হইয়া গিয়া ক্রমে পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিল; উভয়ে উভয়কে লাভ করিবার জন্য অন্তরে ব্যাকুল হইল। উভয়ের মধ্যে মিলনে কোন বাধা ছিল না, বিবাহের প্রস্তাবও হইল, চন্দ্রাবতীর পিতা সে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এমন সময় শুনিতে পাওয়া গেল, জয়ানন্দ এক পরনারীতে আসক্ত। বিবাহে বাধা পড়িল। চন্দ্রাবতী হৃদয়কে পাষাণ করিয়া ফেলিল; অবশিষ্ট জীবন অনূঢ়া থাকিয়া শিবপূজায় যাপন করিতে সঙ্কল্প করিল। পিতা তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিয়া কুমারী জীবন-যাপন করিতে উপদেশ দিলেন। জয়ানন্দ নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, অনুতপ্তচিত্তে একদিন চন্দ্রাবতীর নিকট আসিয়া শেষ দর্শন প্রার্থনা করিল। শিবমন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাবতী দ্বাররুদ্ধ করিয়া রহিল, জয়ানন্দের প্রার্থনা ব্যর্থ হইল। জয়ানন্দ মালতীর ফুল দিয়া তাহার অন্তরের শেষ কথা মন্দিরের দ্বারে লিখিয়া গেল। সেইদিনই চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে গিয়া দেখিতে পাইল, জয়ানন্দের প্রাণহীন দেহ জলের উপর ভাসিতেছে।

ইহার প্রথমাংশের রচনা এইরূপ:

চাইর কোনা পুষ্কুণির পাড়ে চাম্পা নাগেশ্বর।
ডাল ভাঙ্গ, ফুল তোল, কে তুমি নাগর॥
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী ঐ না নদীর পার।

কি কারণে তুল, কন্যা, মালতীর হার ॥
প্রভাত কালে আইলাম আমি পুষ্প তুলিবারে।
বাপেও করিব পূজা শিবের মন্দিরে ॥
বাছ্যা বাছ্যা ফুল তুলে রক্তজবা সারি।
জয়ানন্দ তুলে ফুল ঐ না সাজি ভরি ॥
জবা তুলে চম্পা তুলে গেন্দা নানা জাতি।
বাছিয়া বাছিয়া তুলে মল্লিকা-মালতী ॥
তুলিল অপরাজিতা অতসী সুন্দর।
ফুল তুলা শেষ হইল আনন্দ অন্তর ॥
এক দুই তিন করি ক্রমে দিন যায়।
সকাল সন্ধ্যা ফুল তুলে কেউ না দেখ্‌তে পায় ॥
ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী।
তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী ॥ —মৈমনসিং

জরিনার গান

মুর্শিদাবাদ জিলার পল্লীঅঞ্চলে একটি আখ্যায়িকা-গীতি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা জরিনার গান, বা জরিনার কথা নামে পরিচিত। ইহা একটি প্রেমমূলক কাহিনী; নায়িকার নাম জরিনা, সেইজন্য গানের নামও জরিনার গান। পারস্য কথাসাহিত্যের প্রভাব ইহার মধ্যে অনুভব করা যায়।

১

জরিনা— শোন, ওকি সোনার কুমার গো,
কুমার শোন দিয়া মন,
হায় গো, আমার কথা তোমার আছে কি স্মরণ।
কুমার— এই তো ফুলের বাগান, কন্যা, গো কাগজ কলম নাই,
বল, কন্যা, আমি কালি কোথায় পাই।
আঙ্গুল কাটিয়া, কন্যা, কলম বানাইলাম,
সাড়ীরও অঞ্চল, কন্যা, কাগজও করিলাম।
পারস্যের রাজা আমি গো, কন্যা, তোমার লাগিয়া,
পারস্য শহর দিব যে লিখিয়া।

সূচীপত্র

পারস্য শহর লিখিয়া দিয়া গো, কন্যা, তোমায় করিব বিয়া।
পারস্য শহর দিব যে লিখিয়া ॥

জরিনা— কাগজ হইল, কলম হইল, কালি কর কিসের,
নয়নের জলে, কুমার, কালি বানাও গো।
ফুলবাগানে তুমি আমি গো—
কুমার আর তো কেহ নাই—হায় গো,
পারস্য শহর লিখে দিয়ে আমায় কর বিয়া ॥

কুমার— চন্দ্র সাক্ষ, সূর্য সাক্ষ, কন্যা, সাক্ষ তরুলতা,
পারস্য শহর দিয়া লিখিয়া তোমায় করলাম বিয়া।

—মুর্শিদাবাদ

২

কোথায় পাব কাগজ কলম, কোথায় পাব কালি—
আঙ্গুল কাটিয়া করিব গো কলম ঐ না চোখের জল কালি।
কি মন আমার ॥
কি হেরিলাম, কি দেখিলাম ঐ না ফুলের বাগানে—
ফুলের বাগান হইল গো আলো কন্যার রূপের সৌরভে ॥ —ঐ

জলভরার গীত

পূর্ববাংলার হিন্দুসমাজে বিবাহের নির্দিষ্ট দিনে যে বিবিধ আচার পালন করা হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই সঙ্গীত যুক্ত হইয়া থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে নদী বা পুকুরঘাট হইতে জল ভরিয়া আনিবার সময় যে গীত গাওয়া হয়, তাহা জলভরার গীত নামে পরিচিত। প্রথমেই এই প্রকার জলভরার গীত শুনিতে পাওয়া যাইবে—

১

ধুয়া—কুক্ষণে জল ভরতে আইলাম বিরহিণীর দেশে ॥
কেউর কান্ধে লুটা গো ঘটি, কেউর কান্ধে কলসী
রাধিকা সুন্দরীর কান্ধে হীরার মাঞ্জা কলসী।
কেউর পিন্ধনে লালো গো নীলে, কেউর পিন্ধন শাড়ি
রাধিকা সুন্দরীর পিন্ধনে গো কিষ্ট নীলাম্বরী। —মৈমনসিং

২

রাধা যায় যমুনার জলে গোয়াল পাড়ায় সাড়া পড়ে
আইজ রাধার পড়ছে বাধা।
ঘর থনে বাহির হইতে, মাথা ঠেকে উপর চালে
আইজ রাধার পড়ছে বাধা।
জলে কলসী ভইরে লয়ে রাধা দাঁড়ায় কদম তলায়।
ননদিনী বলে, বধূ, কদমতলায় কিসের মধু।
বধূর কথা কইমু মায়ের আগে।
আইস, মাতা, মোর হেথা, শুন তোমার বধূর কথা
কালার সঙ্গে করেন পীরিতি।
বধূ আমার শিশুমতি, কালার আমার প্রাণের পতি
তার সঙ্গে কিসের পীরিতি ॥ —ঐ

৩

এ গো, সাঁজের বেলা কে তোরে জল আনতে বলেছে।
দাদা এলে বলে দিব বলে দিয়ে মাইর খাওয়াব
শয়তানি তোর ঘুচাইব আয়ানের কাছে।
কে, জল আনতে বইলাছে।
ঘরের জল বাইরে ফেলে যমুনার জল আনতে গেলে,
না জানি কোন কালার সনে প্রেমে মইজাছে।
কে, জল আনতে বইলাছে। —ঐ

৪

ঘরের থেকে বাহির হইতে চালে ঠেকল মাথা গো,
চল, সখি, জলে যাই।
রাজকুমারী উইঠ্যা বলে কিসের জয়ধ্বনি লো,
চল, সখি, জলে যাই।
আগে সখী পাছে সখী, মধ্যের সখী রাধা গো,
চল, সখী, জলে যাই ॥ —ঐ

৫

কেমন রসিকের বাঁশী রাধা বলে বাজিছে।
কেমন বাঁশীর সুরে মন উদাসী করিছে।

রাধিকা জল ভরিতে যায়, নীল বসন পরিয়া গায়,
যে ঘাটে দাঁড়ায়ে কালা, সেই ঘাটে জল আনতে যায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান, চমকিয়া উঠে প্রাণ,
বসন দিয়ে বাতাস করে দূরে থাক্যা কালা চান্দ।
বাঁশীর সুরে মন উদাসী রাধিকার মন মজিছে।
এমন রসিকের বাঁশী জগতে মন ভুলিছে॥ —ঐ

৬

অতি রঙ্গে রঙ্গিণী রাই, সঙ্গে ব্রজের বড়াই
যমুনায় গিয়ে কিশোরী,
কদম তরুর তলে, কৃষ্ণে দেখে বলে
মেঘের মত ওকি নেহারি?
সখি গো, মেঘেতে বিহারে চপলা, সে যে বিদ্যুতের খেলা,
অঙ্গ শীতল মেঘের জলে, সে মেঘে কি অঙ্গ জ্বলে?
কে দিয়াছে মেঘের জলে. মালতী পুষ্পের মালা?
অঙ্গ অধৈর্য হল মেঘের হিল্লোলেতে।
ললিতার কাছে প্যারী কেঁদে বলে॥ —ঐ

জাওলু ভাদর গীত

নদীয়া জিলা হইতে এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা জাওলু ভাদর গীত নামে পরিচিত। জাওলু ভাদর ভাদ্র মাসের কৃষিলক্ষ্মী। ভাদ্র মাসে তাহার আবির্ভাব হয়, ভাদ্র সংক্রান্তি দিনেই তিনি বিদায় লইয়া যান। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাদু ঠাকুরাণীরই ইনি একটি স্বতন্ত্র রূপ মাত্র বলিয়া মনে হয়।

১

জাওলু মা, জাওলু কিয়া কিয়া জাওলু,
জাও হলো ভাইয়ে করম গোঁসাই রে॥
দেহ করম গোঁসাই দেহোয়া সিমরে
আমার ভ্যেইয়া দেহো তো রাখবো তোইমরে॥

ইস আছে কিয়া পনি কিয়া ফুল পাইরে
পাও তো ভাইরে করম গোঁসাই রে ॥ —নদীয়া

২

শিরি ছিপি ছাকনা পাটি কাণে গুঁজে লে লো ॥
যা গাই তোর বড়দাদার বো লো।
বো লো দেখে যা জাওলু মাসে রাম লো,
ভাদর শেষে রং-এর ছটা দেখে যা লো ॥
আর কি পাবি এমন দিনে, জাওলু মায়ের মেলা ॥
কপালে তোর আর কি আছে।
এমনই কি সাধের বো লো ॥ —ঐ

৩

ওমা জাওলু ভাদর, যেও না যেও না।
অষ্টম ধানের দুধে চিঁড়ে দিব খেয়ে লে না ॥
বছর পরে আসবি ঘরে এমনি দিনে
কালা ধেনুর মিঠে দুধে পায়স ক্ষীরে
ভাল করে পানের খিলে মুখে ফেলে দে না ॥
তোর ছাওয়াল সব দুপাটি ফুলে
বেণী বেঁধেছে আর মালা গেঁথেছে
মা গঙ্গার লাল জলে সব খেলে বেড়াছে।
ও মা জাওলু ভাদর, দয়া করে দেখে যা না ॥
সারা বছর মোদের যেন মঙ্গল করে,
এই মিনতি আমরা করি যেন ভুলো না ॥ —ঐ

জাওয়া গান

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল প্রধানত পুরুলিয়া জিলার পশ্চিমাংশে যেখানে কুর্মালি উপভাষা প্রচলিত, সেখানে বর্ষাকালীন একটি শস্যোৎসবের নাম জাওয়া পরব। ইহা শস্যের জন্মোৎসব। ইহা ভাদু উৎসবের সমসাময়িক উৎসব; কিন্তু ভাদু উৎসবের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ভাদু শস্যোৎসব নহে, কেবলমাত্র বর্ষাকালীন কুমারীদিগের আনন্দোৎসব; কিন্তু জাওয়া সকল

শ্রেণীর স্ত্রীলোকই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ইহার প্রধান লক্ষ্য শস্যের নব অঙ্কুরোদ্গম, অথবা ceremony of germination। টুসু উৎসব যেমন পুরুলিয়ার শস্যোৎসব, অর্থাৎ ফসল কাটিয়া ঘরে লইয়া আসিবার পর (post-harvest) অনুষ্ঠিত হয়, জাওয়া তাহার পরিবর্তে শস্যরোপণের সময় ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ভাদু ও টুসু পুরুলিয়া ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত ; কিন্তু জাওয়া একান্ত ভাবে পুরুলিয়া জিলার পশ্চিমাংশেই সীমাবদ্ধ, ইহা পুরুলিয়া জিলার প্রকৃতিগত। জাওয়া ভাদ্রমাসের একাদশীর পনর দিন আগে আরম্ভ হইয়া একাদশীর দিন সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং ইহা পনর-ষোল দিনের অনুষ্ঠান, কিন্তু ভাদু ও টুসু এক মাস ব্যাপী অনুষ্ঠান। জাওয়ায় নৃত্য একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু ভাদু ও টুসুতে নৃত্য গৌণ স্থান অধিকার করে মাত্র, নৃত্যের অনুষ্ঠান না হইলেও ভাদু-টুসুর অঙ্গহানি হয় না ; কিন্তু নৃত্য জাওয়ার অপরিহার্য অঙ্গ। জাওয়া শস্যের জন্মোৎসব বলিয়া ইহাকে জাতানুষ্ঠান বা জাওয়া পরব বলা হয়। ইহার পদ্ধতি এই প্রকার :

পল্লীর মেয়েরা প্রত্যেকে এক একটি ডালায় বালি রাখিয়া তাহাতে নানা প্রকার শস্যের বীজ রোপণ করে, প্রতিদিন জল সিঞ্চন করিয়া বীজগুলি তাহাতেই মুকুলিত করে। তারপর গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ডালাগুলি মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া গৃহের আঙ্গিনায় নামাইয়া রাখে। তাহাই ঘিরিয়া তাহাদের নৃত্যগীত চলিতে থাকে। এই ভাবে গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই তাহারা উপস্থিত হইয়া নৃত্যসহকারে সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। তাহাই জাওয়া বা শস্যের বাৎসরিক জন্মোৎসব বলিয়া পরিচিত। জাওয়া গানের মধ্য দিয়া কোন শস্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, বরং তাহার পরিবর্তে নারীজীবনের নানা ব্যবহারিক সুখদুঃখের কথাই ব্যক্ত হয়। তবে প্রধানতঃ ইহাদের মধ্যে শ্বশুর গৃহের নিন্দা, পিতৃগৃহের প্রশংসা এবং মাতাপিতা ও ভাইভগিনীদের গুণ-কীর্তন করা হইয়া থাকে। শ্বশুরগৃহের নিন্দা অর্থে শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর, ননদ প্রত্যেকের উপরই কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। এমন কি, টুসু ও ভাদু গান অপেক্ষাও জাওয়া গান জীবনের কথায় সরস ; সেইজন্য ইহার কাব্যগুণ অধিক।

পুরুলিয়া জিলার পশ্চিম অংশে যেখানে কুর্মি মাহাতোদিগের ঘন বসতি, সেই অঞ্চলেই এই গানের প্রচলন সর্বাধিক দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমে পূর্ব

অংশে ইহার প্রভাব ক্ষীণতর হইয়া বাঁকুড়া জিলার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া ইহা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাদ্র মাসের প্রথম হইতেই এই উৎসব আরম্ভ হয়। একাদশীর পনের দিন আগে প্রধানত মাহাতো পরিবারের বিবাহিতা, অবিবাহিতা এবং বয়স্কা মেয়েরা একটি ডালায় বালি লইয়া তাহাতে বীজ রোপণ করে, প্রত্যহ জল সিঞ্চন করিয়া তাহাতে অঙ্কুর উদ্গম করে। বীজের মধ্যে ধান এবং নানা প্রকার কলাই বীজই প্রধানত ব্যবহৃত হয়, কোন প্রকার শাকসব্জীর বীজ রোপণ করিতে দেখা যায় না। বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে প্রত্যেকেই এক একটি ডালা মাথায় করিয়া লইয়া সমবেত ভাবে পল্লীর এক একজন গৃহস্থের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে। সেখানে মাথা হইতে ডালিগুলি নামাইয়া রাখিয়া তাহা ঘিরিয়া বৃত্তাকারে নৃত্য আরম্ভ করে। নাচের তালে তালে একত্রিত ভাবে দশ বারোজন মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া—বাম হাতে অপরের বাম হাত এবং ডান হাতে অপরের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া ডান পা একবার করিয়া সাম্‌নে ও পিছনে এবং বাম পা তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া একবার সম্মুখে ও একবার পিছনে অগ্রসর হয় এবং পিছাইয়া যায়। তাহার তালে তালে গান গাহিয়া থাকে, যেমন—

ছুটু মুটু গড়্যাটি কমলপাতের খেরারে,
ডুবিলে না ডুবে, ভাই, কাঁখেরি গরয়া।

'কাঁখেরি গরয়া' কথাটি বার বার গাওয়া হইয়া নৃত্য ক্রমশ দ্রুততালে পরিবর্তিত হয়। যে কথাগুলি বার বার আবৃত্তি করা হয়, তাহাকে বলা হয় গানের রঙ, প্রচলিত অর্থে ইহাকেই ধুয়া বলে। এই নৃত্য আবার পার্শ্বের দিকে, আবার কখনও সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া চলে। তাহার সহিত ধুয়াটি বার বার গাওয়া হয়। কখনও একটি মেয়ে সমগ্র গানটি গায়, অন্যেরা ধুয়াটি গাহিতে থাকে। যেমন—

তুমি যাবে পরদেশে আমি যাব সঙ্গে,
রাঁধিব বেগুন ভাত পরশিব রঙ্গে।

'রাঁধিব বেগুন ভাত, পরশিব রঙ্গে'—কথাটি বার বার গাওয়া হইতে থাকে। এইটি গানের রং বা ধুয়া।

জাওয়া গানের সুর মিষ্ট। তাল দ্রুত। সুর ক্রমশঃ চড়ার দিকে চলিতে থাকে। আরম্ভের সময় সুর ততটা চড়া থাকে না। গান শেষ হইবার সময় তাহার তাল এত দ্রুত হয় যে, কথা প্রায় বোঝা যায় না। নৃত্যের পদক্ষেপও খুব দ্রুত তালে চলিতে থাকে। একমাত্র যাহাদের অভ্যাস আছে, তাহারাই এইভাবে নাচিতে পারে।

সামাজিক কারণে এই নৃত্য বিলোপের পথে চলিয়াছে; কেবল গানই অনেকক্ষেত্রে গাওয়া হইয়া থাকে। ক্রমশঃ পূর্বাঞ্চলের দিকে সরিয়া গেলে গানে বাংলা শব্দ বেশি ও পশ্চিমাঞ্চলের দিকে হিন্দী শব্দ বেশি দেখা যায়। হাজারীবাগের সীমায় হিন্দী শব্দের আধিক্য দেখা যায়। ঝালদা অঞ্চলে কুর্মালী ভাষায় গান বাঁধা হয়। অন্য দিকে যত পূর্বে যাওয়া যায়, ততই বাংলা ভাষা অবিমিশ্র শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় একই গান দুই জায়গায় দুই প্রকার ভাষায় গাওয়া হয়।

প্রথমেই জাওয়া পাতানোর গান শুনিতে পাওয়া যাইবে।

১

নাম' কুলির ছানারা জাওয়া পাতাল,
বড় পাতের ডাল পায়ে ছাতাই গেল;
আমাদের কুলির ছানারা জাওয়া পাতাল,
আমলা মেথির বাস পেয়ে লহকে বাড়িল ॥

—পুরুলিয়া

কুলি শব্দের অর্থ গ্রাম্য পথ, অর্থাৎ পথের নীচের দিককার মেয়েরা যে জাওয়া পাতাইল, তাহা বড় ডালির সুযোগ পাইয়া নূতন পাতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল, আমাদের পথের মেয়েরা যে জাওয়া পাতিল, তাহা আমলকি ও মেথির গন্ধ পাইয়া লকলক্ করিয়া বাড়িয়া গেল।

প্রকৃত জাওয়া পাতানোর বিষয় লইয়া এই প্রকার গান খুব বেশি শুনিতে পাওয়া যায় না; দুই একটি মাত্র গানে দেখা যায় গাছ ও পাতার কথা আছে—

২

সাইরের আইড়ে নীলকণ্ঠের গাছ,
তাই পাত করে লহু লহু। —ঐ

৩

শাল তলার বালি আলো জাওয়া পাতব লো
এমনি জাওয়া লগ্ন হবে, বাঁশ পাতাটার পারা লো। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে জাওয়া নাচের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

৪

কারো কারো নীলশাড়ী আঁচলেতে জরি,
মুখে বলে হরি হরি বদন ভরি।
হাতেতে ময়ুর পাখা, দয়া কর হরি,
মুখে বলে হরি হরি বদন ভরি।
নাচে জাওয়া ঘুরি ফিরি—বদন ভরি
মুখে বলে হরি হরি বদন ভরি। —ঐ

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শস্যরোপণ কিংবা জাওয়া উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কহীন গানই ইহার বিষয়। জীবনের নানা বিষয় লইয়াই ইহাতে গান শুনিতে পাওয়া যায়; যেমন, নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে গামছার চটক দেখিয়া ভানুমতীর ভুলিবার কথা আছে—

৫

বিরি[১] বাড়ী জতহিতে[২] রাঙ্গামাটি উঠি গেল,
বাবু ভায়া গামছা গাবায়,
গামছারি চটক দেইখে[৩] গেল ভানুমতী
কুলির[৪] মাঝে লহর শালে[৫] যায়। —ঐ

৬

লুকুই লুকুই মান খোড়কা গেল ভিজে
বীজই তো বড় বৌ এর সব
বড় বৌ এর ঘর কন্না বড় বৌ এর সব।
বড় বৌ এর দেখাশোনা কাম।
বড় বৌ এর বাবুয়ানা কাম গো
বড় বৌ এর বাবুয়ানা কাম। —ঐ

১ বিরি—কলাই, ২ জতহিতে—কর্ষণে, ৩ মইজে—মজে, ৪ কুলি—গাঁয়ের রাস্তা, ৫ লহর শালে—যেখানে হাসিঠাট্টা চলে।

৭

আকালে পুষিলাম পায়রা দুধুভাতু দিয়ে গো,
সময়ে পালালেন পায়রা আমায় ফাঁকি দিয়ে গো।
যাও যাও যাও, পায়রা, কতই না দূর যাবি গো,
লাগ লিব বাঁকুড়া শহরে।
বাঁকুড়ার শহরে কি কি দোকান বসে গো,
লাগ লিব বাঁকুড়া শহরে। —ঐ

৮

চেলকায় বসিল পায়রা চেলকার সমান রে
সোনায় রূপায় বাঁধায় দিব রাজার দেওয়ান,
রাজার বিটি নিল আমাদের জাওয়া গো,
ডোগ ডোগ পঞ্চমেঘে উঠছে রাজার ইন্দ গো। —ঐ

৯

বেগুন বাড়ী রুঁধ দেওয়া রুঁধ চারি পাশ
রুখি দিও খিরুখি দুয়ার,
খিরুখি দুয়ারে দেওয়া মিরিগি পালায় গো,
উঠ, দেওরা, ঝাঁক তলোয়ার।
তরালের ঝিকিমিকি বন্ধুকেরই চটক গো
উপরে তো উড়ে রাজার হাঁস।
হাঁস মরালি, দেওরা, মাস খাওয়া গো,
ফিরায় অ্যানে মার খাওয়ালি॥

১০

আসন তলে বাসন কুশন তরুতলে ঝারি,
যার ঘরে যার সুন্দর কন্যা তার ঘরে যায় চুরি॥ —ঐ

১১

নদীয়াকা ধারে ধারে পগারেরি গাছ গো,
সেই গাছে খেলা করে মোর বন্ধুয়া।
ডাল ভ্যাঙ্গ না, বন্ধু, ফুল তুলনা হে,
চুহে চুহে খাবে ফুলের মধু। —ঐ

১২

নদীয়াকা ধারে ধারে চাকল চাকল পাত গো,
শ্বাশুই বাঁটে তুটি তুটি পাত—
বাঁট শ্বাশু বাঁট শ্বাশু আপনিকা ভাত গো,
নহর গেলে খাব তুধভাত। —ঐ

১৩

কাঁধে কোদাল বাবা হাতে সিঁয়াড় গো,
লাগাঁই অ্যাল বকুল ফুলের গাছ।
ডাল মেলিল গাছে ফুল ফুটিল রে,
কাল ভ্রমর আসিয়া জুটিল।
আন রে চামের দড়ি ভমরাকে বাঁধ রে
ভমরাকে বাঁধিয়া মারিব রে॥
কাঁধে কোদাল, দাদা, হাতে সিঁয়াড্ রে
দিহো দাদা ছোট বড় আইড়।
বুয়াল ধানের গাছ দাদা আগুন লাগালি রে
এমন দাদা নিঠুর হলি আন্‌তে না পাঠালি॥ —ঐ

১৪

বাড়ী নাময় ধান গিলা বানিয়ে তুপায় গো।
বিনা পান অ্যাল বেটার বৌ॥
খইড়কা খুঁচি পাটের শাড়ী রইস পেড়ি ভরা গো,
আমরা কে কই লেগতে অ্যাল গো।
আমাদের যদি মা থ্যাকত অভিসারে পাঠ্যাত,
ভাই ভাজ তো হইল তুষমন॥ —ঐ

১৫

তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ, ননদ, খাও, ননদ, যাও শশুর বাড়ী।
শশুরের সঙ্গে হাম নাহি যাই গো
লাটি বহিতে বেলা যায়॥

তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ, ননদ, খাও, ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ী।
শাশুড়ীর সঙ্গে হাম নাহি যায় গো
মট বহি বহিতে বেলা যায়॥
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ, ননদ, খাও, ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ী।
ভাসুরের সঙ্গে হাম নাহি যাই গো
ঘোমটা টানিতে বেলা যায়॥
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ, ননদ, খাও, ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ী।
জাএর সঙ্গে হাম নাই যাই গো
ঝগড়া লাগিতে বেলা যায়॥
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ, ননদ, খাও, ননদ, যাও শ্বশুর বাড়ী।
দেওরের সঙ্গে হাম নাহি যাই গো
হাসিতে খেলিতে বেলা যায়॥
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী ঘুমায় গো
উঠ ননদ খাও ননদ যাও শ্বশুর বাড়ী।
কুঁওয়ের সঙ্গে হাম নাহি যাই গো
পায়না সনকাতে বেলা যায়॥ —ঐ

১৬

চারকুন্যা পুকুরটি সান বাঁধা ঘাট গো,
চারি কুনে চার উঠে বুয়াল মাছ।
জাল ফেলিবে, ভাইরে, মাছ ধরিবে গো,
ঝাল বাটনা দিয়ে মাছকে লহকে রাঁধিব।
লহকে রাঁধিব মাছকে, মহকে খাইব গো
মাচিলাই বসিয়া ভাইয়ে হাত ধুয়াব। —ঐ

১৭

কে কে যাবি ইন্দ দেখতে আমরা দিব কড়ি গো,
ভোগ ভোগ পঞ্চমেঘে উঠছে রাজার ইন্দ গো।

রাজার ইন্দ বিটি আমাদের যাওয়া গো,
ডেগে ডেগে পঞ্চমেঘে উঠছে রাজার ইন্দ।
ইন্দ দেখালি, ভাইরে, শাঁখা পরালি রে,
ফির‍ায় অ্যানে মার খাওয়ালি।
কাপড় দিব থান থান বিটি দিব দান গো,
তবু জামাই কিসের এত মান।
কুলু ঘরের তেল, বাবা, ধানের ভিতর চাল গো,
করি দিব পিটারী সন্দেশ॥
নাহি যে খুঁজি, মাগো, পিটারী সন্দেশ গো,
আমি খুঁজি তুমার বিটির বিদায়॥ —ঐ

১৮

বনিচরে চেরেবেরে ডাহাচাল খাতা লো,
কবে পড়িল ভাদর মাস।
ভাদর মাসের গাদর জুনহার লাল টুপায় খাব লো,
তা বলে কি ভাজের অধীন হয়। —ঐ

১৯

আম পাতা চিরি চিরি নৌকা বানাব গো।
সেই নৌকায় নদী পার হব।
যত পার করাব নিব আনা আনা গো।
রাধিকাকে পার করাবো লিব কানের সোনা গো। —ঐ

২০

ঠাকুর থানে দুব্ ঘাসটি করে লহ বসহ গো।
মাথায় তো মুড়ির ঠেকা কাঁখে তো গৈরা গো।
কামিন মুনিস মুলে বালি গুড় গো। —ঐ

২১

যাওহা যে দিলি তোরা হলুদ কোথা পালি গো।
দোকানীকে নাম দিব হলুদ ব্যাপারি গো। —ঐ

২২

বউয়ের ভাই পুতি পরে তপোবনের ধারে রে।
শুনব শুনব মরে কবে নদীতে ঢেউ পড়ে রে॥ —ঐ

২৩

বাড়ীর দিকের জোড় গাছটায় ককুগুলা ডাকিছে গো,
ভায় আমার নিয়ে যাতে আসবে গো ॥
শাশুড়ীর ননদীর ঘরে না পাঠায়ে দিলে গো,
ভায় আমার কাঁদিয়ে ফিরিল গো ॥

২৪

শাক তুলতে গেলে বৌ।
ডুমুর তলে বাড়ি গো।
কি সাপে কামড়ালো গো
না জানি মন্তর গো।

২৫

আসন তলে বাসন কোসন।
তারি তলে শাড়ি গো ॥
বাড়ির ঘরের সুন্দর কন্যা।
তারি ঘরে চুরি গো ॥

২৬

গোয়ালে কোন গরু নাই, ঘাগর কেনো বাজে রে।
রাজার ঘরের রাণী নাই রাজা কেন কাঁদে রে ॥

২৭

খড় থাকতে গরু মরে, কোটালদের বা খুলে রে।
ঘর থাকতে বউ মরে শিকড় বা খুলে রে ॥

২৮

আদাড়ে বাদাড়ে চাকর গাই চরালি কোথায় রে।
খুরিআ ন লাগে কাদা, জল খাওয়ালি কোথায় রে ॥
বনে বনে চওরালি বিজু বনে ফিরালি
মালদহে পানী ফিরালি ॥

২৯

নদীয়াক ধারে ধারে কদমেরি গাছ গো,
সেই ডালে খেলা করে মোর বন্ধু ওগো,

ডাল ভাঙ্গো না, বন্ধু, ফুল তুল না গো,
চুসে চুসে খাও ফুলের মধু ॥

৩০

যেখানে জন্মিলে, নিমাই, নিমতরু তলে রে,
জন্ম হোয়ে না মরিলে না করিতাম কোলে রে।
বার বৎসরে নিমাই তের নাই পুরে রে,
কেমনে ভিক্ষা মাগিবে লোকের দুয়ারে রে ॥ —ঐ

৩১

শুনগো, দূতি, করি গো মিনতি,
কোথা রহিল মনোচোরা।
কেন এলো না গিরিগোবর্ধন ধরা।
অনাথা কামিনী ভাবে দিন রজনী,
ভেবে সোনার অঙ্গ হলো জরা
কেন এলো না গিরিগোবর্ধন ধরা।
কুসুম কলি হলো, ভ্রমরা এলো গেলো,
বিকলে বিহনে ভ্রমরা।
কেন এলো না গিরিগোবর্ধন ধরা।
হেন শ্রীনাথ মিছে ভণে, আশা রইল চিরদিনে
কবে হেরিব মুখ হরা।
কেন এলোনা গিরিগোবর্ধন ধরা। —ঐ

জাওয়া গানে অনেক সময় এক এক পক্ষের সঙ্গে অপর পক্ষের বাদ প্রতিবাদও হইয়া থাকে।

৩২

জাও আজ দিলি তোরা হলুদ নাই গো,
তোদের জাওয়ার ফুল না ফুটিল গো।
বড় দাদার শালার পিঠ ভর্তি চুল
মচরায়ে বেঁধেছে খোঁপা
দেলেন গ্যান্দা ফুল।

৩৩

এ ঘর কাদা সে ঘর কাদা তাই বুনেছি আদা,
আদার বাসে ভাত খায় নাই বড় বউএর দাদা।

৩৪

একদিনকার হলুদ বাঁটা তিন দিনকার বাসি,
মা-বাপকে বলে দিবে বড় সুখে আছি।

৩৫

তাল তল দিয়ে বাঁশতল দিয়ে কে করিল পথ,
আমরা বলি ইন্দ দেখা ল,
ইন্দ দেখতে এলি তোরা,
ইন্দে কত জাঁক (লোক),
ডেগে ডেগে (ধীরে-ধীরে) পথক বেগে
উঠছে রাজার ইন্দ।

৩৬

দশ হাতের কাপড়খানি কাণের গোড়ায় দশী
পিছলে পিছলে পড়ে কাঁখের কলসী।

৩৭

অকালে পুষিলাম পায়রা দুধ ভাত দিয়া,
এমন সময়ে পায়রা আমায় ফাঁকি দিলে।
চল পায়রা, চল পায়রা, কত না দূর যাবি,
যাব নিয়া বাঁকুড়া শহরে।

৩৮

চার কন্ডা পকুটি শান বাঁধা ঘাট,
চার কোণায় উঠে মাগুর মাছ,
জালে ধরিব থালে পুরিব
ঝাল বাটনা দিয়ে মাছ রাঁধিব।

৩৯

কত বাড়ীর কত থাকড়া কত হেলকান যায়,
মদন মোহন ছেলে ভলি তিন ঘন্টায় খায়।

৪০

এক পাড়ি লীল সুতা গহনা বনাব,
বিটি ছিলার ধুয়ে বিয়া, কাঁদে ঢর ঢর।
মায়ো কাঁদে বাপো কাঁদে, কাঁদেরে পিঠের ভাই গো,
খেলিবার সঙ্গতি কাঁদে ধূলাতে লুটাই গো॥
একি আমো পিয়রা তুই আমো পিয়রা
তিনি আমো সিঁদুর বরণ,
সেও আম বিছো গেল কন্যাকুঁয়র।
ওগো রাজার বেটায় ধরিল আঁচল।
ছাড়্যে দিও, ছাড়্যে দিও আমারি আঁচল।
আমি আছি কন্যা কুঁয়র।
আমি আছি বর কুঁয়র।
তুমি যদি বর কুঁওর, চলি যাও আজাকো রাখাল।
কেইসে চিনিব আমি আজা রাখাল।
কেইসে চিনব আমি জ্যাঠাকা রাখাল।
কেইসে চিনব আমি বাবাকা রাখাল
(ওগো) কেইসে চিনব আমি মাকে রাখাল।　　—ঐ

৪১

বড় ঘরের দুয়ারে জড়া ময়ুর ঘুরে গো।
কাল দেখেছি বেল ফুলটি আজও মনে পড়ে লো॥　—পুরুলিয়া

৪২

ঝিঙ্গা তুলি ডালি ডালি আর কত ডাকি লো।
শিশু ছেইলার বিহা দিয়ে অন্তর হৈল কালী॥
'গুঁদলি'[১] কুটি হুকুড় হুকুড় ছলকে উঠে চাল লো।
ঘরে আছে ননদিনী, সেই তো বটে কাল॥　—ঐ

৪৩

বনে ফুটে বন কিয়ারী বন বলে আলারে,
বিটি ছিল্যার মিছাই জনম, পরের ধর আলা রে।　—ঐ

১ গুঁদলি—চালের পরিবর্তে আহার্য শস্য।

৪৪

বনে ফোটে কুরচি ফুল বন করে আলা লো
বিটি ছিলার মিছাই জনম শ্বশুর ঘরে জ্বালা ॥ —ঐ

৪৫

এক মুঠো জারা বিরি কুলিতে ছড়াব লো,
তবু, সতীন, তোকে সাঁতাব। —ঐ

৪৬

নিম ডাল ভাঙ্গি ভাঙ্গি হও পঞ্চ ডালো লো,
আজ আসবেক শ্বশুর নিতে লো,
শ্বশুরের সঙ্গে হাম নাহি যাও লো,
টেংগা বহিতে দিন যায় লো।
নিমডাল ভাঙ্গি ভাঙ্গি হও পঞ্চ ডালো লো,
আজ আসবেক ভাসুর নিতে লো।
ভাসুরের সঙ্গে হাম নেহি যাব লো
ঘোমটা টানিতে দিন যায় লো।
লালে লাল টুপা লিব, ননদ ভুলাতে লো,
তাল ভুড়কা হুঁকা লিব দেওর ভুলাতে লো ॥
আঁশ পালা বাঁশ পালা ছন্‌কাই[১] রাঁধিবো লো,
ছোট দেওর মাগ্‌তে গেলে মু-মুচ্‌কা[২] দিবোলো ॥ —ঐ

৪৭

বার হাতের তসর শাড়ী, তের হাতের দোসি লো,
পায়েতে লাগিম দোসি, ভাঙ্গিল কলসী।
ভাঙ্গুক তাঙ্গুক কলসী তোর কলসীর দাম দিব লো,
তা বইলে কি হ্যাংলার মার খাবো। —ঐ

৪৮

এক মুঠা 'কুকরী'[৩] মাস পেঁয়াজ মেশা ঝাল লো।
ননদিনী '[৪]ছইল', 'ছইল' আরো খোঁজে ঝাল লো ॥ —ঐ

১ ছন্‌কাই—ছং ছং শব্দ। ২ মু-মুচকা—মুখভেংচি।
৩ কুকুরী—মুরগী। ৪ ছইল ছইল—ছল্‌ছল্‌।

৪৯

শাক তুলি লতা পাতা, বাড়ীর শিমুল তলে লো
ছোট ননদ মইয়ে গেল, বেল বরণের দিনে ॥ —ঐ

৫০

[১]টুপায় টুপায় গুড়মুড়ি [২]ঢুঁধে ঢুঁধে ফুললো
ছোট দেওর ঢুজকাইলো—[৩]ছাতা দেখিতে লো।
ছাতা দেখালে দেখালে দেওরা—পান খাওয়ালে লো,
ঘরে আইসে গাইল খাওয়ালে। —ঐ

৫১

কুলি কাদা পায়ে আলতা
তাই আস্তেছে লিতে লো।
হারাল সিন্দূরের কৌটা
মন সরে না যাত্যে লো ॥ —ঐ

৫২

যাইগা রে যাইগা জোড়ি গেল
পিয়া গেল কসুম ব্যাপার।
কুসুম ব্যাপারে পিয়া মজি গেল্,
কিয়া কিয়া আনলো সন্দেশ।
দশ আঙ্গুলে দশ আভরণ,
ধনী লাগে সিঁথেকে সিন্দুর। —ঐ

৫৩

লেহ ননদ তেল সিঁদুর কাঁকয়া,
পিড়ায় বসে কাটহ সিঁথা।
ননদ নাই ল তোর বাবার মন
মাথা বাঁধিতে এতক্ষণ। —ঐ

১ টুপায় টুপায়—ডালায় ডালায়। ২ ঢুঁধে ঢুঁধে—থোকায় থোকায়।
৩ ছাতা—ছাতা পরব।

৫৪

বাঁকা রে বাঁকা পুরথী
বুঝে বসই ছোটকি ননদ,
বুঝতে বুঝতে ননদ পড়ি গেল্
লাজে দুনা গেল শ্বশুর ঘর। —ঐ

৫৫

হাতে লেলো ঠেঙ্গা ধড়ি পায়ে লেলো খড়ম,
রুমুক ঝুমুক পারমু কুলে বুলে গেল,
গেল পহর রাতি আলো ভীন্ সরেগো
কাঁহা যায়ে গো পারবু খেপল রাত,
আঁখড়াই গে ধনী দশ বিশ লগ,
তাঁহা যায়েগে ধনী খেপল রাত।
তোহারি কেথায় পারবু, আমি না পৈতাব
ছুঁয়ি লিহা গো পারবু তাম্বা তুলসী,
তাম্বা তুলসী ছুঁলি হাম মরি যাবু
ওগো ছুটি যাইত সিঁথিকি সিঁদুর।
সিঁথিকি সিঁদুর ছুটলে পারবু সহিতে,
ওগো তাও না সহিব আমি সতীনের ঝাল। —ঐ

৫৬

দুই মিশি গেলে, দেওরা, একাই ঘুর্যে আলে,
কাঁহা রাখলে, দেওরা, আপন বড় ভাই।
আমার ভাই ভোজি বড় নাম যার
ওগো বিজু বনে খেলহ ঝুমুর।
কেইসে ভিজল, দেওরা, মলমল ধুতিয়া,
কোত ভিজল, দেওরা, ঢাল তেরোয়াল।
শিশিরে ভিজল, ভোজী, মলমল ধুতিয়া
রকতে ভিজল, ভোজী, ঢাল তরোয়াল।
কাহাকে মারল, দেওরা, কাহাকে কাটলা,
কাহাকে করিল শিশু রাঁঢ়।

ভাই মারল, ভোজী, ভাই কাটলি
ভইজীকে করলম শিশু রাঁঢ়,
ভাই মারলে, ভাই কাটলে হ, দেওরা, আমার অঙ্গীকার,
ভাত যে দিব, ভৈজী, লুগুয়া যে দিব
নাহি দিব সিঁথিকা সিঁদুর। —ঐ

৫৭

যা কর ত্বয়ারাই ঘুরহ মেজুর[১]
সে যেক আজা হামর,
যা কর ত্বয়ারাই ঘুরহ ঘোড়া,
সে হেকেই জেঠা হামারা
কি নিজে দিয়া, বাপু, লাল পেটি কাগজা,
আমি যাব আপন শ্বশুর ঘর।
তাঁহি যে যাবে বেটি আপন শ্বশুর ঘর
খেলি লিহা করমকা রাত।
ওরে শ্বশুরঘরে ভেঁস্থর বেজার[২]
ভেস্থর মরলে বেটি দসর ভাস্থর পাওরে,
কাঁহা পাবে করমকা রাত।
কাহাই লোহই এ মোহ লোহ লোহ বাঁশ ;
ওগো কাহাই লহি বহি নিহা আম
বাঁশ বনে লহই লহু লহু বাঁশ,
শ্বশুর ঘরে লহি বহিনিয়া আম।
কিয়া করি আনব লহু লহু বাঁশ
কিয়া করি আনব বহিনিয়া আম,
দলা দাঁড়ি আনব লহু লহু বাঁশ
সগড়ি বগড়ি আনব বহিনিয়া আম।
কাহা আমি রাখব লহু লহু বাঁশ।
কাঁহা আমি রাখব বহিনিয়া আম।

১ মেজুর—ময়ুর। ২ বেজার—অসুখ।

*

মাঝা ঘরে রাখব লহু লহু বাঁশ
ছাচা ঘরে[১] রাখব লহু লহু বাঁশ
মাঝাঘরে রাখব বহিনিয়া আম
কিয়া কিয়া খাওত লহু লহু বাঁশ।
কিয়া কিয়া খাওত বহিনী হাম।
ছাচাক পানি খাওত লহু লহু বাঁশ
দহি দুধ খাওত বহিনি হাম।
কিয়া কাজে লাগত লহু লহু বাঁশ
কিয়া কাজে লাগত বহিনি হাম॥
লরা গোঁজা লাগত লহু লহু বাঁশ
কুটুম কাজে লাগত বহিনি হাম॥ —ঐ

৫৮

একদিনকার হলুদ বাটা
তিনদিন কার বাসি লো,
মা বাপকে বলে দিবি বড় সুখে আছি লো। —অযোধ্যা, ঐ

৫৯

ইন্দ করম লজক্যাল, বুড়া আল্য লিতে লো,
কি বল্যে জবাব দিব, বুড়া রইল বসে লো।

৬০

মাহাত ঘরের বহু বিটির পিঠ ভরতি চুল লো,
আগুড় কোণের[২] রেশমী গ্যাঁদা ফুল॥

৬১

কুরমালী মুড়ে ধনী মুড়ল বান
কেইসে ধনী যাইবে নইহর।
আন গো কাসি কাঠি বাঁধহ গিরা
গিরায় চড়্যে যাব বাপের বাড়ী॥ —ঐ

১ ছাচা—বাহির।
২ আগুড় কোণের—গৃহ কোণের।

জাগ গান

রংপুর, রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জিলায় এক প্রকার আখ্যায়িকামূলক গীতিকাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা জাগ গান বলিয়া পরিচিত। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই গান হয় বলিয়াই ইহাকে জাগ গান বলে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এই শ্রেণীর এক প্রকার গানকে জাগা গান ও জাগরণ গান বলা হয়। জাগ গানে সাধারণত মুসলমান সম্প্রদায়ের পীর-দরবেশদিগের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হইয়া থাকে। তবে রাধাকৃষ্ণ এবং নিমাই সম্পর্কেও জাগ গান শুনিতে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক জাগগানগুলির মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণ চরিত্রের রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তবে ইহার অংশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত আনুপূর্বিক কাহিনীর আকারে কোথাও গ্রথিত নহে।

১

রাধা। কালিয়া কৃষ্ণ জন্মিল কাল যমুনারি পানি।
উপজিল কালিয়া কৃষ্ণ ছাড়নু বেচি কিনি॥
হাট ঘাট ত্যজিনু, বড়াই, মথুরা নগর।
ছাওয়াল কানাইর গুয়া খাইয়া কি হইল ঝগর[১]॥
একদিন দরশন হইল ফুল-বৃন্দাবনে।
সেইদিন হইতে ছাওয়াল কানাই আইসে ঘনে ঘনে॥
আগ দুয়ারে আইসে কানাই পাছ দুয়ারে চায়।
সরুয়া টোকরাই[২] খানি দুই হাতে বাজায়॥
সরুয়া টোকরাই খানি যেন স্বরগের তারা।
মদনে মারিল বাণ গেইল কদমতলা॥
কানাই গেল কদমতলা রাধে রইল ঘরে।
ঘরে আমি চন্দ্রাননী ভাবিত অন্তরে॥
চম্পা কলা নয় কানাই মিঠে মিঠে খাঁও।
মোন্দা জল[৩] নয়, হে কানাই, মোজা ধারে খাঁও॥
নেতের বস্ত্র নয়, হে কানাই পিন্দিয়া ওদার চাওঁ[৪]॥

---

১ বিপদ। ২ শম্বুকাবরণ নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
৩ মিষ্ট রস। ৪ লজ্জা নিবারণ করি।

থেটে জাও পামরী রাধে সেইটে কৃষ্ণের নাম।
মরিয়া যাও পামরী রাধে টুটুক রাধার নাম॥

বড়াই। কানে কানে কও হে কথা শুনেক চন্দ্রাননী।
তোর কারণে নন্দের ছাইলা ছাড়চে অন্ন পানি॥

রাধা। নন্দের ছাইলা সুন্দর কানাই সে ভাগিনা হয়।
ধাক্কা দিয়া বাইরে করোঁ বুড়িক মিছা কথা কয়॥
আশ নয় পড়শী নয় মোদের ভাগিনা।
কাইল বিয়ানে[১] আস্‌বে কানাই আমার আঙ্গিনা॥
কাল শিলায় বাটায় নাই খাঁও পিষিয়া।
ঘরে ছিল কাল বিলাই ফেলাইছোঁ মারিয়া॥
কাল মেঘ কোকিলের রাও নাই সয় গো তরে।
ঘরে ছিল কাল গাভী বেচাছোঁ সত্বরে॥

বড়াই। কালা কেন নিন্দ, রাধে, কালাক কেন নিন্দ।
কালা হেন কাজলের ফোঁটা কপালে কেন পিন্দ[২]॥
কালা নয় হে, ও নাতিনী, কালা নয় শ্যাম।
অঞ্চলে লিখিয়া রাখ কালার নিজ নাম॥
ঐ ছাইলা করিলে দয়া পাপ বিমোচন॥

রাধা। খাইলাম তোমার গুয়া, বড়াই, নিলাম তোমার পান।
কয়েন যাইয়া ছাওয়াল কানাইক বাঁশীত দেউক মান॥
চট্‌ দিয়া[৩] যায় রঙ্গের বড়াই কানাইর আগত[৪] কর।
তোক বোল ছাওয়াল কানাই মোর যে বচন ধর॥
যদি চাস রাধিকার নাগাইল[৫] বাঁশীর সৃজন কর॥
এ বোল শুনিয়া ছাওয়াল কানাই না থাকিল রয়া[৬]।
সোনার নয় বুড়ি কুড়ি নিল অঞ্চলে বান্ধিয়া॥
সুবর্ণ মুট কাটারী নিল হস্তে করিয়া।
বৃন্দা বলিয়া কানাই শীঘ্র গেল ধাইয়া॥

১ প্রাতঃকালে। ২ পর। ৩ সত্বরতা সহকারেণ
৪ সম্মুখে। ৫ সঙ্গ। ৬ প্রতীক্ষা করিয়া।

এ আরায় ও আরায়[১] বাঁশ বেড়ায় তো দেখিয়া।
তবু তো বাঁশীর বাঁশ না পাইল খুঁজিয়া॥
তরাই ও তরুল বাঁশ ছেও দিয়া দিল।
গোড়াতে ছেওয়াল বাঁশের আগল টলিল॥
হরি হরি বলিয়া বাঁশ ভূমিত পড়িল॥
গোড়াখানি কাটিল বাঁশের গুরুয়া বলিয়া।
আগখানি কাটিল বাঁশের আগালী বলিয়া॥
মধ্যখানি নিল বাঁশের বাঁশী মাফিক চাইয়া॥
কতকদূর হইতে কানাই কতক দূর যায়।
আর কতক দূর যায়া সে কামারের বাড়ী পায়॥
তোক বোল, ভাম্বু কামার, রয়া তাম্বুল খাও।
রাধা নামে কানাইর বাঁশী আমাকে কেড়ে দেও।
আকাশে পাতালে হাতিনার[২] দুই গোঁজ গাড়িল।
চামের দোয়াল[৩] দিয়া ভিড়িয়া বান্ধিল॥
বীর হনুমান মার্‌লে টান গর্জিয়া উঠিল।
আকর শালে[৪] মাঝে বাঁশী ফোঁড়া আরম্ভিল॥
প্রথমেতে ফোঁড়ান ফোঁড় যেন আকাশের চান।
চন্দ্র সূর্য লাগান বাঁশীতে মাণিক-কাঞ্চন॥
তারপরে ফোঁড়ান ফোঁড় যেন স্বরগের তারা।
তারপরে ফোঁড়ান ফোঁড় বোলে রাধা রাধা॥
এক ফোঁড় দুই ফোঁড় তিন ফোঁড় দিও।
সাতখানি বাঁশীর ফোঁড় গণিয়া ফোঁড়াইও॥
বাঁশী ফোঁড়ে কামার ভাইয়া দিল কানাইর হাতে।
বাঁশী পাইয়া ছাওয়াল কানাই আনন্দিত চিতে॥
বাঁশী পাইয়া ছাওয়াল কানাইর আনন্দিত মন।
কদমতলায় ছাওয়াল কানাই করিল গমন॥
কদমতলায় যাইয়া নিল প্রথম যৌবন॥

১ অরণ্যে অরণ্যে। ২ হাপরের।
৩ চর্ম নির্মিত রজ্জু বিশেষ, ৪ লৌহকারের কারখানা।

নিরাকারে সখীগণ প্রভু যদুরায়।
কদমতলায় থাকিয়া কানাই আড় বাঁশী বাজায়॥
কদমতলায় থাকি কানাই বাঁশীত দিল সান।
বুক ধরফর চন্দ্রাননীর আউলাল্ পরাণ॥
বুক ধরফর চন্দ্রাননীর ধরণ না যায় হিয়া।
কোন জাগায় নিলাজী[১] ডাকে রাধা নাম লইয়া॥
যখন তখন বসি গুরুজনার কাছে।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী আমি মরি লাজে॥
একে তো বাঁশের বাঁশী বিন্দু গোটা গোটা।
হাতে টিপে মুখের স্বরে দিলে দারুণ খোঁটা॥
একে তো বাঁশের বাঁশী সাতখানি ফোঁড়।
কেমনে জানিল বাঁশী রাধা নামটি মোর॥
বাহারে অভাগার বাঁশী কি বোল বলিস মোরে।
বারাও বারাও করে মন পরাণ বিদরে॥
বাঁশীর স্বরে শ্রীরাধিকার ঘরে না রয় হিয়া।
কোন ছলে ছাওয়াল কানাইক দেখিব একবার গিয়া॥
কাঁচা না মান্দারের খড়ি[২] টোকায় ঝাঁপ দিয়া।
ভরণ কলসীর জল ফেলিল ঢালিয়া॥
ধুমার ছলে চন্দ্রাননী বিরাল[৩] কান্দিয়া॥
জল আনিতে যায় রাধিকা ভাবে মনে মন।
সঙ্গের সঙ্গিনী নিল সখি চারিজন॥　　　　　—কোচবিহার

এ মা দয়া নাই রে তোর,
মা হয়ে কেন বেটায় সদায় বলে ননী চোর॥
কেষ্ট যায়, মা, বিষ্ণুপুরে, যশোদা যায় ঘাটে,
খালি গৃহ পেয়ে গোপাল সকল ননী লোটে।
"ননী খা'লো কে রে, গোপাল, ননী খা'লো কে?"

১ লজ্জাহীনা।　২ মন্দার গাছের জ্বালানী কাষ্ঠ। ইহা ভাল জ্বলে না কেবল ধুম হয়।
৩ বাহির হইল।　৪ নটেশাক। বাস্তুকশাক।

"আমিত না খাই নাই ননী বলাই খা'য়াছে।"
"বলাই যদি খাইত ননী থুতো 'আদা' 'আদা',
তুমি, গোপাল, খাইছো ননী ভাণ্ড করেছো সাদা।
ছড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে,
এক লম্ফে উঠলেন গোপাল কদম্বেরই গাছে।
পাতায় পাতায় ফেরেন গোপাল ডালে না দেয় পাও,
গাছের নীচে নন্দরাণী থরে কাঁপে গাও।
"নামো নামো ওরে, গোপাল, পাড়্যা দেই তোর ফুল,
কদম্বেরই ডাল ভাঙ্গিয়ে মজাবি গোকুল।"
"নামি আমি, ওরে মারে, একটি সত্য করো,
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা যদি আমায় মারো।"
"তা কি আর হয় রে, গোপাল, তাকি আর হয়,
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা সর্বলোকে কয়।"
নালা ভোলা দিয়ে গোপাল গাছ হতে নামা'ল,
গাভী "ছাঁদা" রসি দিয়ে দুই হস্ত বাঁধিল।
এ মা দয়া নাই তোর,
এত সাধের নীলমণি বান্ধা রইল তোর ॥
কিবা বন্ধন বাঁধলি, মা রে, বন্ধন গেল কসে,
বন্ধনের তাপে মারে, লোহু চল্‌লো ভেসে।
কিবা বন্ধন বাঁধ্‌লি, মারে, বান্ধনের জ্বালায় মরি,
কাঁচা ডোরের বন্ধন, মা রে, সহিতে না পারি।
কিবা বন্ধন বাঁধ্‌লি, মা রে, বন্ধন পিঠে মোড়া,
বন্ধনের তাপে মা রে ছুটলো হাড়ের জোড়া।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
নন্দ ঘোষের ধেনু রেখে দিব ননীর কড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
হাতের বালা বন্ধক থুয়ে দেব ননীর কড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
বাড়ী ছেড়ে যাব আমি মামাদের বাড়ী,

মাম্মাদের গরু রেখে দিব ননীর কড়ি।
ঐ কথাটি শুনে মার একটু দয়া হ'ল,
হাতের বান্ধন ছেড়ে দিয়ে গোপাল কোলে নিল। —পাবনা

নিম্নোদ্ধৃত জাগ গানটি সোনার হারের জাগ বলিয়া পরিচিত।

৩

গিরি ভাই, গিরি ভাই, ছওর ছওর।
সোনার পীরের চেলা আ'ল বছর অন্তর॥
সোনার হারের চেলা দেখে যে করিবে হেলা।
দুই পায় দুই গোদ বাড়াবি চক্ষে বাড়াবি ঢেলা॥
ঢেলা নয় রে ঢুল্যা নয় রে গায় আইছে জ্বর।
এমন ত দেখি নাই রে সোনার হারের বর॥
সোনার হার ভক্ত ঠাকুর মুখে চাপদাড়ী।
হেলিয়া দুলিয়া গেলেন গোয়ালনীর বাড়ী॥
গোয়ালিনী গোয়ালিনী বসে কর কি?
তোমার পুত্র মার খাত্যাছে এই সভার মধ্যি॥
সুবুদ্ধি গোয়ালের নারী কুবুদ্ধি লাগিল।
সিকার উপর দুগ্ধ থুয়ে পীরকে ভাঁড়াল॥
ঘরে গোয়ালিনী বাথানে মরে গাই।
সাতশএ ধেনু মরে লেখা জোখা নাই॥
আগে যদি জানতেম রে, তুমি সত্যপীর।
আগে দিতাম দই দুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর॥
হই চই করে পীর বাথানে দিল পাড়ি।
বাথানেতে পড়্যা রইছে চোদ্দ বোঝা দড়ি॥
হই চই করিয়া পীর বাথানে দিল ভুষ্যা।
সাতদিনকার মরা ধেনু দন্তে কাটা কুটা॥
হই চই করিয়া পীর বাথানে দিল বাড়ি।
সাতদিনকার মরা ধেনু পায়ে নড়ানড়ি॥
চলো চলো, রাখাল ভাই রে, আর এক বাড়ী যাই।
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাছুর পররাই॥

নিম্নোক্ত জাগ গানটিতে পীরের মাহাত্ম্য কীর্তন শুনিতে পাওয়া যাইবে—

৪

ওখান হতে পীর বিদায় হ'ল পঞ্চমাণিক সঙ্গে নিল
আয় পীর চাল্যাজীর বাজারে।
শোন রে চাল্যাজী, ভাই, সোওয়া সের চাউল দেও খাই
দোওয়া করিব আল্লাহজীর ফকির ॥
শোন রে ফকির মোরে তৈয়ার চাল নাইক ঘরে
ভাড়ালি আল্লাজীর ফকিরে ॥
পীরের মনে ছিল হক্কা চালেতে মারিল তুক্কা
সব চাল শূন্যেতে উড়াল ॥
সুমতি ছিল চাল্যাজীর কুমতি লাগিল।
তৈয়ার চাল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল ॥
কান্দেরে চাল্যাজীর নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরেরই পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছতা পূর্ণ করে খাই ॥

ওখান হতে নারী বিদায় নিল পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
যায় গুড়িয়ার বাজারে।
শুন রে গুড়িয়া ভাই, সোওয়া সের দুধ দেও খাই
দোয়া করিব আল্লাজীর ফকিরে ॥
সুমতি ছিল গুড়িয়ার কুমতি লাগিল,
তৈয়ার গুড় থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা গুড়েতে মারিল তুক্কা
সব গুড় শূন্যেতে উড়িল ॥
কান্দেরে গুড়িয়া নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া দূরে ডাক দিয়া বলে পীরে
মনের বাঞ্ছতা পূর্ণ করে যাই ॥

ওখান হতে বিদায় নিল পঞ্চ মাণিক সঙ্গে নিল
যায় কুমারের বাজারে।
শুনরে কুমার, ভাই, একটি পাতিল দাও খাই,
দোওয়া করিব আল্লাজীর ফকির॥
সুমতি ছিল কুমারের কুমতি ধরিল,
তৈয়ার পাতিল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা পাতিলে মারিল তুক্কা
সব পাতিল শূন্যেতে উড়িল॥
কান্দে রে কুমারের নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে খাই॥
সা জিন্দা ফকরুল্লা ও জিন্দা পীর,
মারিয়া জিয়াতে পারে অপার মহিমা তোমার।
শুনরে খেরুয়া ভাই অন্য বাড়ী যাই।
এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই॥ —ঐ

৭

বাঘে সব নাম লইয়ে ডাকরে,
ও ঠাকুর সোনারায় বাঘ সব ডাকে।
বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঠাকুর হরিনাম দিয়া॥
হরির নাম দিয়া ঠাকুর চলিয়ে পথে যায়।
যত মোগলের ঘাঁটাত[১] নাগাইল পায়॥
যত মোগলের ফৌজ জিজ্ঞাসিল কতা।
মনের গৌরবে ঠাকুর দোগ দোগাল মাতা॥
কমরের পটিকা[২] খসেয়া[৩] ঠাকুরকে বান্দিয়া।
ধাকা'তে ধাকা'তে নইল আগোত[৪] করিয়া॥
ধাকা'তে ধাকা'তে নইল কোট সালের[৫] ঘরে।
বাইশ্ মন পাথর দিল তার বুকের উপরে॥

১। রাস্তায় ২। কোমর পেটি ৩। খুলিয়া ৪। অগ্রে ৫ হাজত ঘর

ছোট মোগল উঠিয়া বলে, বড় মোগল ভাই,
কালিকার বন্ধন, দাদা, চল দেখ্‌তে যাই।
তোনাজিল মোগল জাতি করিল ছিনান[১] ॥
মিটা জলে[২] মোগল জাতি করিল ভোজন।
বন্ধন দেখিতে মোগল করিল গমন ॥
কতেক্‌ দূর ছাড়ি মোগল কতেক্‌ দূর যায়।
কোট সালের ঘরে যায়া মোগল ভুলকি[৩] মারিয়া চায়।
বাইশ মন ফেলাইবে তোমার নাই সোনারায় ॥
ছোট মোগল উঠিয়া বলে বড় মোগল ভাই,
এ বন্ধন ভাল নয়, দাদা, চল বাড়িক্‌ যাই।
বাড়ী যাইয়া বাঁধি আমরা সাতখানি ঘর।
যে ঘরে থাকিলে পরে বাঘক নাই ডর ॥
চিনিবার না পারিল মোগল ছার জাতি,
তোর মোগল মারিয়া যায় নিশা ভাল রাতি।
অরণ্যের কিনারে যায়য়া ঠাকুর মারে হাঁক ॥
এক ঠেলায় চলিয়া আসলো বিশাল এক বাঘ।
বিশাশয়[৪] বাঘ আসিলো বিশাশয়[৫] উট ॥
হ্যাট মুখ হয়য়া আস্‌লো বনের ভল্লুক।
ধর ধর বাঘগণ, বাটার পান খাও ॥
এই ব্যাটা মোগলের সাথে বাদ সাদিয়া দেও।
এতেক হুড়মুড়ি বাঘ উঠিয়া নিল পান ॥
গায়ের ঠেলায় ভাঙ্গিয়া ফেলায় ঘর সাত খান।
ঘর ভাঙ্গিয়া বাঘগুলা হইল কাতর।
লম্ফ দিয়া সোঁদাল[৬] বাঘ বাড়ীর ভিতর ॥
মোগলের মাইয়া[৭] গেইচে অন্নশালের[৮] ঘরে।
নাগাইল পায়া[৯] মোচড়ায় ঘাড় হুড়মুড় ক'রে ॥

১। স্নান ২। মিষ্টি জল ৩। উঁকি
৪। বিংশতি শত ৫। ত্রিংশৎশত ৬। প্রবেশ করিল
৭। স্ত্রীলোক ৮। অন্নশালা ৯। পাইয়া

মোগলের বেটী গেইচে[1] জল ভরিবার।
বাঘক দেখিয়া নদী সাঁতরিয়া যায় তার॥
মৎস্য বলিয়া তারে ঘড়িয়ালে[2] খায়।
আজি কেন বা ঠাকুর মোক্ এতেক তাপ দেয়॥
বাম হস্তে ধরিয়া মোগলক মারে এক পাক্।
মাটিত্ পড়িয়া মোগল করে বাপ্ বাপ্॥
আজি ধ্যানে বা ঠাকুর মোক দ্যান এতেক্ তাপ্।
ধনের কিঙ্কর নোয়াঁও[3] মুই[4] মানের কিঙ্কর॥
চরণের ঘোড়া বেচিয়া সেবা করিম্ তোর!
সেইদিন সোনারায় ঠাকুর দিয়া গেল দেখা।
নরলোকে পুজো তাক্[5] পাইয়া পরিখা॥

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পর বাংলাদেশের বহু লৌকিক কাহিনীই শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের লীলা কাহিনীতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এখানে নিমাইর সন্ন্যাসের কাহিনী শুনা যাইতেছে, ইহাকে নিমাইর জাগ বলে—

৮

নিমাই দুখিনীর ধন,
দুঃখ পাসরার বেটা, রে নিমাই, ওরে নীলরতন॥ ধুয়া
এক মাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজলে।
দুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল॥
তিনমাসের কালে নিমাই লোহু রক্তের গোলা।
চার মাসের কালে নিমাই হাড়ে মাংসে জোড়া॥
পঞ্চম মাসের কালে নিমাই পঞ্চফুল ফোটে।
ছয় মাসের কালে নিমাই মাথার চুল উঠে॥
সাত মাসের কালে নিমাই সাত স্বরে গায়।
অষ্টমাসের কালে নিমাই শুয়্যা নিদ্রা যায়॥
নয় মাসের কালে নিমাই নবডঙ্কা মারিল।
দশ মাসের কালে নিমাই ভূমিষ্ঠ পড়িল॥

১। গিয়াছে ২। জলজন্তু বিশেষ ৩। নহি ৪। আমাকে ৫। কাহাকে।

দশ মাস দশ দিন নিমাইর পুর্ণতা হইল।
নিমাইচাঁদ ভূমিস্থ পড়ে মা বোল বলিল॥
এক মাস যায় মায়ের ধুতি আর মুতি।
আর এক মাস যায় মায়ের মাখ মান্সা শীতি॥
কোথা হতে এল যোগী কেশবভারতী।
কিবা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাইরে বান্যাল সন্ন্যাসী
দেখ দেখ নগর্যার লোক দেখ রে চাহিয়া।
নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চল্‌লো জননী ছাড়িয়া॥
সন্ন্যাসী না হইও, রে নিমাই, বৈরাগী না হয়।
ঘরে বসে কৃষ্ণনামটি মাকে শোনায়॥ —ঐ

জাগরণ গান

পশ্চিম বাংলায় যে সকল দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক গান রাত্রি জাগিয়া গাওয়া হয়, তাহাদিগকে জাগরণ গান বলে। মঙ্গলগানের কোন কোন অংশ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গাওয়া হয়, সেই জন্য সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গল গানকে জাগরণ গান বলা হয়। চৈতন্য সমসাময়িক কাল হইতেই পশ্চিমবঙ্গে জাগরণ গানের ব্যাপক প্রচলন হইয়া আসিতেছে। 'চৈতন্য-ভাগবত' কার বৃন্দাবন দাস তৎকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন,

ধর্ম কর্ম লোকে সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগবণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পুজে কোন জনে।
পুত্তলী পুজয়ে কেহ দিয়া বহুধনে॥

মধ্যযুগের দেব-দেবী মহাত্ম্যসূচক মঙ্গলগানকে সাধারণভাবে দেবদেবীর জাগরণও বলিত; যেমন মনসার জাগরণ, চণ্ডীর জাগরণ, পশ্চিম বাংলার কুমারী মেয়েরা সারা রাত্রি জাগিয়া যে ভাদুগান গায়, তাহাও ভাদুর জাগরণ নামে পরিচিত। জাগরণ গান সুদীর্ঘ বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে।

জাগরণী গান

কৃষ্ণবিষয়ক যে সকল সঙ্গীতের মধ্যে শ্রীরাধিকার রাত্রি জাগরণ করিবার কথা আছে, তাহাকে কোন কোন অঞ্চলে জাগরণী গান বলিয়া উল্লেখ করা হয়। নদীয়া জিলা হইতে নিম্নোদ্ধৃত গান কয়টি সংগৃহীত হইয়াছে।

১

নিশীথে জাগিয়া আকুল হইলাম, গো, সখি বন্ধুর লাগিয়া গো,
কৃষ্ণকে নিল গো হরিয়া ॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন, দেখলাম গো খুঁজিয়া।
কোথায় গেলো কৃষ্ণ গো আমার, না পাইলাম খুঁজিয়া ॥
বনের কপি সঙ্গে গো করি—দেখলাম গো ঘুরিয়া
কোথায় গেলো কৃষ্ণ গো আমার, না পাইলাম ভাবিয়া ॥ —নদীয়া

২

জাগিয়া লও কৃষ্ণনাম গো নগরবাসী, জাগিয়া লও কৃষ্ণনাম।
প্রভাতে গোবিন্দের নাম, সিদ্ধি হবে মনস্কাম,
আরও হবে শরীরের কুশল গো,
বৃন্দাবনের তরু লতা, তারা সবে বলে কৃষ্ণ কথা,
মানব হয়ে কেন ঘুমিয়ে আছ গো ॥ —ঐ

৩

নিশি পোহাইল রে,—ওরে নিশি পোহাইল,
কাকে করে কলরব, কোকিলে করে ধ্বনি
গা তোল, না তোল, পরাণের বন্ধু, আর ত নাই রজনী ॥ —ঐ

জামাল-ছুইফার পালা গান

পূর্ববাংলার শ্রীহট্ট জেলায় জামাল ও ছইফা সুন্দরীর পালা গান নামে এক আখ্যায়িকা গীতি বা গীতিকা প্রচলিত আছে। কাহিনীর নায়ক তরুণ জমিদার সুলতান জামাল এবং নায়িকা গ্রাম্য মোড়লের স্ত্রী ছইফা সুন্দরী। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :

গ্রামের তরুণ জমিদার সুলতান জামাল। জামাল সুদর্শন পুরুষ। সেই গ্রামেরই মোড়লের স্ত্রীর নাম ছইফা। ছইফার স্বামী দরিদ্র হইলেও মোটা

ভাত মোটা কাপড়ে তাহাদের সংসার সুখেই কাটিয়া যায়। একদিন দীঘির ঘাটে জামাল ছইফাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইলেন, তখন হইতে তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ছইফা তাহা জানিতে পারিল, সে স্বামীকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। জামালের হাত হইতে নিজের পত্নীকে রক্ষা করিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া একদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। বহু দূর দেশে গিয়া তাহারা নিরুপদ্রবে বসবাস করিতে থাকেন। জামাল ছইফাকে সন্ধান করিবার জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়া যান। ছইফার তিনি কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই, কিংবা আর কোনদিন গৃহেও ফিরিয়া আসেন নাই। ইহার কাহিনীর আরম্ভ এই প্রকার :

১

গরামের মাঝে ছিলা ধনিলা একজন।
ঐ গরামে কেউ না আছিল তাহার মতন ॥
ধনে জনেতে পুরা চাইরো চন্নিয়ে মিল।
গরাম থাকি ভালা বাড়ী করে ঝিলমিল ॥
বাড়ীর চাইরো ভায় গড়খাই কাটাইয়া।
উচা করি দিছে দেওয়ার ঐ মাটি দিয়া ॥
দেওয়ার খেচিছে ধনী দুই মানুষ উচা।
ছাফ ছুথরা কর‍্যা রাখ্ছে যেমন লেপা পুছা ॥
দেওয়ারের উপরে রুইছে গাছ সারি সারি।
কি সুন্দর নমুনা তার বাগা বলিহারী ॥ —শ্রীহট্ট

জারিগান

মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম পর্ব উপলক্ষে যে সঙ্গীত গীত হয়, তাহাকে জারিগান বলে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান সমাজেই ইহা প্রচলিত থাকিলেও মৈমনসিংহ জিলার জারিগান ঐ অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের অন্যান্য বিষয়ের মত একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। ইহা নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত হইলেও পুরুষের সঙ্গীত এবং বাংলার সমগ্র লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহাতেই একটু পৌরুষের স্পর্শ অনুভব করা যায়। ইহার বিষয়বস্তু কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত ;

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা নিরবচ্ছিন্ন বীররসাত্মক সঙ্গীত নহে। ইহার যুদ্ধবিষয়ক বীররসের অন্তরাল দিয়া করুণ রসের একটি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ বর্তমান আছে। শত্রু দ্বারা ফোরাত নদীর তীর অবরুদ্ধ হইলে এমাম হোসেনের তৃষ্ণার্ত শিশুপুত্র একবিন্দু জলের জন্য যখন আর্তনাদ করিতেছিল, তখন শত্রুশিবির হইতে নিক্ষিপ্ত এক তীরে শিশুর হৃদয় বিদ্ধ হয়, তাহাতেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা লইয়া শিশু প্রাণ ত্যাগ করে। যুদ্ধবৃত্তান্তের মধ্যে স্বভাবতই যে সকল করুণ বিষয় থাকে, তাহার সঙ্গে এই কাহিনীও যুক্ত হইয়া ইহাকে বিশেষভাবে করুণ করিয়াছে। অথচ শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাও ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়া ইহাকে বীররসেরও আধার করিয়াছে। জারিগান দীর্ঘ কাহিনীমুলক গীত (narrative); ইহার একজন মুল গায়েন গানের মধ্য দিয়া কাহিনীটি পরিবেষণ করে, নৃত্যপর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নৃত্যের তালে তালে ধুয়া ধরিয়া কাহিনীটি অগ্রসর করিয়া দিতে সহায়তা করে প্রথমেই বন্দনা গান শুনিতে পাওয়া যায়,—

১

হায় হোছেন।
পুবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর,
একদিগে উদয় গো ভানু চৌদিগে পশর।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী সাগর,
যেখানে বাইতো ডিঙ্গা চান্দ সদাগর।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত,
যেখানে রাইখ্যাছে আলার মাল্লামের পাথর।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান,
উদ্দিশে জানায় গো ছেলাম মমিন মুছলমান।
ইহার পশ্চিমের কথা কহনও না যায়,
রাঁড়িয়ে রান্ধিলে ভাত বরাহ্মনে খায়॥ —মৈমনসিংহ

২

হায় হোছেন।
চাইর কোনা পৃথিবী বানলাম মন করিয়া স্থির,
সুন্দরবন মোকামে বানলাম গাজী জিন্দা পীর।

গাজী সায়বের বাপের নাম শো শাহা সেকান্দর,
পাথর দিয়া বান্ধাইছেন তিনি বৈরাট নগর।
হাত পাতিয়া মাইলে পাথর বুক পাতিয়া লয়,
ছাটনী ভরে পড়লে পাথর জুদা জুদা হয়।
আল্লা আল্লা বল ভাই রে নবী কর সার,
নবীর কলেমা পড়ি হইয়া যাইবা পার।
লাইলাহা পড়রে মিঞা কলেমা রব্ব বাণী,
আর নি লবে মানুষ জনম বল আল্লার ধ্বনি।
আল্লা ভাবো তইক্যা রাখ, যার গো দিলে নাই,
থাক্ বন্দা বেহেস্তে যাইব তার দোজখে জাগা নাই।
দোজখ সাছা, দোজখ মিছা, দোজখ নৈরাকার
এই দোজখে পুইড়্যা মরব বান্দা গোনাগার।
দোজখের কীড়া ভাইরে আঙ্গুল পরিমাণ
সেই কীড়ায় কুড়িয়া খাইব পাপীরো পরাণ॥
ভাই বল বান্ধব গো বল পন্থের পরিচয়,
মইলেনি কেউ সঙ্গে যাবে, ইনি কারো নয়॥ -ঐ

হায় হোছেন।
আইস, মা, ফতেমা, মাগো, তোমার গুণ গাই
অধম দেইখ্যা ছাড় যদি ঐ আল্লার দোহাই।
আইস, মা, ফতেমা, মাগো, ভুবনের ছায়বানী,
এই অধম বালকে লইলাম তোমারো কাহিনী।
তুমি যদি ছাড়, মাগো, আমি না ছাড়িব,
বাজুইন্না নেপুর হইয়া চরণে ধরিব।
খেড়্ওয়ালেরি কান্ধে, মাগো, থইয়া রাঙ্গা পাও,
আমারো কান্ধেতে বইয়া হরফ জুগাও।
তুমি অইও কল্পতরু, আমি অইব লতা,
যুগল চরণ বেইড়্যা রাখব ছাইড়্যা যাবে কোথা।

সভা কইর‍্যা বইছেন মিঞারা মমিন মুছলমান,
সবারো জনাবে আমি অধমের ছেলাম। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে সখিনার বিবাহের বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়—

৪

দিশা : হায় হায়, কাসিদ ভালো, হায় হায়, কাসিদ।
মায় না ভজিলে তারে, ভজিবে এজিদ কিরে,
হায় হায়, কাসিদ, হায় হায়, কাসিদ ভালো।

বয়াত : মরবার বেলা একখান কথা কইয়া গেছিল্ ভাই,
ছখিনারে দিতাম বিয়া কাছুমালীর ঠাঁই,
গো যদি না রয় এ কড়ায়,
আখেরে দোজখী অইব শুন সমাচার॥ (হায়)
হায় হায়, কাসিদ,
জুড়নি আইলো ছখিনারো উদাসের দিন
স্বর্গ তনে চাইর ফিরিশতা লামিল আচম্বিত,
গো বিয়ার উকিল দিব কারে?
এই বিয়ারো উকিল দিব মুছে পেগাম্বরে—(হায়)
হায় হায় কাসিদ,
কি শুনাইলা আয়গো, চাচা, কি করিলা রাও,
কলিজায় উঠায়া মাইলা শক্তিশেলের ঘাও,
গো, চাচা, এই ভব সংসারে;
ভাই হইয়া ভগ্নী বিবা করে কেমন জনে—(হায়)
হায় হায় কাসিদ, হায় হায় কাসিদ ভালো। ইত্যাদি —ঐ

দিশা : আরে ও—ও, আমার সোনাবরণ জয়নাল—
কান্দে জয়নাল বন্ধখানা ঘরে।
এজিদে বাইন্ধ্যাছে ঘর, জয়নাল আছে বন্ধ ঘর,
বাইশ মণী পাথর আছে ছাত্তিরো উপর।
ও ভাইও নাই বান্ধবও নাই, কে লইব খবর।

বয়াত : হায় হোছেন !
পত্র লিখে জয়নাল আবদ্দীন আইক্ষ্যে ঝরে পাণি।
পত্রেরো উপরে লেগে দুঃখেরো কাহিনী॥
পত্র লইয়া যাওরে, কাসিদ, মেওয়াজানির শ'র।
খবরো পৌছাও গো নিয়া হানিফার গোচর॥
এমন সময় জয়নালের কাসিদ পন্থে মেলা দিল।
সাম্‌নে আইয়া জঙ্গলার বাঘ মুড়ি যে ধরিল॥
আমারে যে খাইবা, বাঘ রে, তারো নাই সে দায়।
সঙ্গে যে জয়নালের পত্র কি হবে উপায়॥
খাহরে খাহরে, ব্যাঘ্র, আমারে ধরিয়া।
সঙ্গে যে জয়নালের পত্র দিও পৌছাইয়া॥
এন সময় জয়নালের কাসিদ কোন কাম করিল।
মারো মারো কইরা কাসিদ পন্থে মেলা দিল॥
উপস্থিত হইল গিয়া ফাল্‌গুন দইর‍্যার ঘাটে।
ফাল্‌গুন দইরার ঢেউ দেখিয়া কাসিদ কাইন্দ্যা ওঠে॥
হায় হোছেন !
ফাল্‌গুন দইরার ঢেউ দেখিয়া কাসিদ কাইন্দ্যা ওঠে।
কেমনে হইবাম গো পার খেয়ানী নাই ঘাটে॥
পার কর গো, ছাহেব আল্লা, না জানি সাঁতার।
অঘোর নদী, ভাঙ্গা নৌকা কেম্‌নে অইব পার॥
এন সময় জয়নালের কাসিদ কোন্ কাম করিল।
বাতাসে হিলায়া নৌকা পার করিয়া দিল॥ —ঐ

৬

নিশি প্রভাত-কালে, কোকিল বলে, ওরে সখিনা—
এ বেশে আর ঘুমিয়ে থেকো না,
মাঝ-দরিয়ায় ডুবলো তোমার লাল ডিঙ্গাখানা।
তুমি জাগিয়ে দেখ বিছানা 'পর
খসে পলো নাকের সোনা,
বুঝি গলার হার খসিয়ে প'লো, বিধির কারখানা।

তখন শিরে করাঘাত মেরে বলে,
বিধিরে, তোর কি এই বিবেচনা।
বলে, আর ডাকিসনে কালো কোকিল,
প্রভাতেরও কালে—
শুয়েছিলাম, ছিলাম নিরালে, ও তুই ডাক দিয়ে কেনে,
শোকের অনল দিলিরে জ্বেলে!
একগুণ আগুন ত্রিগুণ জ্বলে,
নির্বাণ হয় না জলে গেলে।
প্রাণপতি মোর ছেড়ে গেছে, বসন্তেরও কালে ;—
আমি কোন্ দেশে যাই, কোথা বা পাই,
কোকিলরে, ও তুই, দে আমায় বলে।
করি এই নিবেদন, হে নিরঞ্জন, তোমার দরবারে,—
তুমি ভালবেসে দোস্ত কও কারে,
কি মহালীলা প্রকাশিলে সেই বংশের 'পরে।
তুমি, কারেও হাসাও কারেও কাঁদাও,
কাহারে ভাসাও সায়রে।
আমার বিয়ের রাতি ম'লো পতি, কোন্ বা বিচারে,
মোস্লেম কয়, তার অসীম লীলা,
সসীমে কে তা বুঝতে পারে। —যশোহর, খুলনা

৭

হানেফ বলে আয় মোর কোলে জয়নাল বাছাধন,
ওহে, যেনা পথে দিছি রে, দুই ভাই, জোরের
ভাই এনাম হোছেন।
সেই না পথে যাবরে আমি, করো আমার গোর-কাফন ॥
রামলক্ষ্মণ গেছেরে বনে অযোধ্যা ছেড়ে ;
ঐ রকম গেছরে দুই ভাই মদিনা শূন্য করে।
ভাই ভাই বলে ডাকছে হানেফ, আর কি
প্রাণের ভাই আছে,
যে বলের বল জয়নাল মরে সে বল ভেঙ্গেছে।

যার বলের বল করছ তুমি, সে কি আর আমার আছে ?
জহর গুলে আন্‌বে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে। —২৪ পরগণা

৮

কোথায় দীনের দুটি ইমামন।
খোদার পিয়ারা, নবীর নয়ন তারা, ফাতেমার বাছারা জীবনের জীবন ॥
মদিনার হারেমে পালঙ্কেতে শুয়ে, অতি আরামেতে থাকতেন
দুটি ভায়ে, দোলনা দোলাতেন জিবরিল আসিয়ে,
কভুবা দু'ভায়ে দুলাতেন পবন ॥
রূপ সাগরের মাণিক নূরের দুটি পুতুল, নবীর সখের বাগের
দুটিতে বুলবুল, তৌহিদের বাণী তাদের মুখের ধ্বনি
মাতাইত আহা এ বিশ্ব ভুবন ॥
পাঠাইয়া ভবে দু'ভায়ে ইমামরে, ভুল করিয়াছিলেন,
বুঝি নিরঞ্জনে, জহরে জহরে সে ভুল সংশোধনে,
বিষ ও খঞ্জর দ্বারা করিলেন গ্রহণ ॥
এজিদের হুকুম, মারওয়ানের বাণী ; ময়মুনার ছলনা,
জায়েদার দুষ্‌মনি, নছিবের দোষে সবে মিলেমিশে
ইমাম হাসানের বধিল জীবন ॥
মধুর সাথে বিষ জায়েদা মিশায়ে,
স্বামীর হাতে দিল সরবত বলিয়ে, বিস্‌মাল্লাহ বলিয়ে
সে বিষ ইমাম খেয়ে ধূলাতে পড়িয়ে হলেন অচেতন ॥
সে যাত্রা বাঁচিলে পুনঃ খাবার সাথে বিষ দিল,
জায়েদা কামিনা, বিষ থলিতে পড়িল কলেজা জলিল,
বিবর্ণ হইল সে চাঁদের বদন ॥
জায়েদা পাপিনী ময়মুনার কথায় সুরা ছিল জলে পানিতে
হীরকচূর্ণ মিশায়, বিষাক্ত নাড়িতে মহাবিষ পড়িতে কলেজা
কাটিতে লাগিল তখন ॥
পিপাসা লাগিল পানি সে চাহিল, হাসানবানু
না জানিয়া সেই বিষাক্ত পানি দিল, সে পানি খাইয়া
ইমাম হাসান যন্ত্রণায় ধূলাতে পড়িয়া লাগিল করিতে আকুল রোদন ॥

বিষের ঘোরে বদন হলো নীল বরণ, চিরকালের মত
মুদিলেন নয়ন, হোসেন ভাইয়ের শোকে আছড়িয়া
পড়েন বুকে, হায় এতিম কাশেমে বোঝাবে কোনজন
মাতম উঠিল মদিনা শহরে, ইমাম শোকে হায় সবে
কিয়ামৎ এক মাতম হবে না তো খতম, ছাতিমারে,
আবদুল হালিম কহেন এ বচন ॥ —মুর্শিদাবাদ

৯

পথের পথিক কোন আজি সাহে মদিনা মোজলুম হোশেনা
খোদার বাহে পল্লন দিলে সায়ে মদিনা মোজলুম হোশেনা।
এই মোহরম সেরেফ বেদাৎ হায় গো বলে যে—
মাবছুদ কাফের সে।
খোদার কসম খোদার তোদের বান্দা বলে না মোজলুম হোশেনা।
এই তো হোল খাঁটি ইমাম, শুন মুসলমান, খুলে দেখ হে কোরাণ।
কোরাণ চেয়ে বড় জিনিষ হাসান হোসেনা মোজলুম হোসেনা।
মোদের সাক্ষাৎ তেরশত শাহিদ হয় জীবন হাজার ব্যথা মন।
তাদের তরে কেন তবে আমরা কাঁদব না মোজলুম হোসেনা॥ —ঐ

১০

হে খোদা তোমার পিয়ারা দুইটি ভাই আলী জাদা,
জহরে কহরে তাদের জীবনটি করলে আদা।
দীনের নবী যাঁদের নানা তাঁদের এই ভাগ্য লিখন।
মা-ফাতেমার নয়নমণি হাসান হোসেন দুটি ভাই,
তাদের উপর এত জুলুম কেন এজিদ করলে হায়।
পানি বিনে মাছুম গণে মারলো এজিদ মালাওণ ॥
নবিজির আউল খানা আজ বন্দি এজিদ জেল খানায়।
তোমার প্রাণের জয়নাল আজি ধূলাতে পড়ে লুটায়।
আয়রে মোদের কারাগারে যাবে বা সবার জীবন ॥
যাবার বেলার হানিফ চাচার সুখবর দিয়ে গেলে,
সকল জালা ঘুচ্‌ব, বাবা, হানিফ কারবালায় এলে।
জীবন বাতি নিভে এল এল না মোর চাচাধন। —মুর্শিদাবাদ

১১

ইমামন কাতরে খত লিখিলেন আম্বাজ শহরে।
খত লিখিতে ইমাম শাহার দুনয়নে অশ্রু ঝরে ॥
ও ভাই হানিফ বলি তোমার দুঃখের কথা
খতে যা পায়, আমি এখন ভাস্‌ছিরে ভাই
দুঃখের আকুল সাগরে ॥
এজিনা কুফর না মাকুল বন্ধ করলে
ফোরাতের কুলা, কাতোরা পানি বিনে আকুল
কত মাচ্ছুম গেল মরে ॥
আমার সঙ্গের সাথী যত তাদের দুঃখ,
বল না কত, হচ্ছে শহিদ শত শত
পড়েছি খোদার কহরে ॥
জলন্ত কারবালার বুকে পড়ে আছি, অতি দুঃখে,
তুমি আছ মনের সুখে ভাই বলে ইয়াদ না করে ॥
শোক সাগরে ভেসে বেড়ায়, উদ্ধারিতে
আর কেহ নাই, পার যদি দুঃখের সময়
উদ্ধার করে এই কহরে ॥
বিষাদ-সিন্ধুর বিষাদ বারি পান করিতে
যেন পারি, খোদার কাছে এই তোজারী ॥
ওমা ফাতেমা, ছুটে আয়, আয় গো শীঘ্র করি,
হায় কি হল, ওগো মা, তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি ॥
দিনের বাতি নিভে যায় নিভে যায়, দেখবি যদি
হায়, মদিনা হায় মরি হায় আয় ছুটে আয়,
হল আঁধার পুরী।
বলতে কথা বুক ফেটে যায়, দেখ মা এসে
আয় ছুটে আয়, হায় মরি মা,
শুক্‌না ডাঙ্গায় ডুবল দীনের তরী ॥
থাকিয়া হোথা বেহেসতে ছিলেন মা
মাতম করিতে এলে শেষে কারবালাতে লয়ে হুর পরী ॥ —ঐ

১২

আল্লাহ্ আল্লাহ্ বল গো বান্দা যতেক মমিনগণ
শোকনামা লয়ে জারি শুন দিয়ে মন ॥
শোকনামা যে শুনিবে দেল করিবে সার,
এক রোজের গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করিবে তার।
মাফ করিবে খোদাতায়ালা হিসাব নিবে না,
বিনি হিসাবে বেহেস্তে জায়গা দিবেন ফাতেমা।
গাছ বড় সার দড় করেছে এলাহি,
নামের গাছটি কামের নয় কো, বড়াই করবে কি
গাছের উপরে যেমন ফিরছে তরুলতা,
আল্লাহ্ নবীর দুই নাম সে বিনা সুতায় গাঁথা।
ফলফুল নাইকো যারে তারে কেবা চিনে,
ফল খেয়ে গাছের তারিফ করে সর্বজনে।
এমনি ফলফুল বেটাবেটি বান্দালোকের ঘরে,
কমতল নসিব যার গো হয়ে বেটা মরে।
হয়ে বেটা মরে যার গো জনম অবধি,
যার মরছে বেটাবেটি কাঁদছে নিরবধি।
হায় গো আল্লাহ্ বারিতালা তামাসা দেখ বসে,
মাঝ দরিয়ায় সোলা ডুবে পাথর উঠে ভেসে।
মাঠের মধ্যে বটবৃক্ষ সেই তো মাঠের মাথা,
একলা মায়ের বেটা ম'লে মা দাঁড়াবে কোথা ?
পাঁচ মাস ছ'মাস সাত মাসও হয়,
আট মাসে বেটার শোক মা'র লাগে কলিজায়
নয় মাসে মা বলে মা চলিতে না পারি,
আমার পিণ্ডি হচ্ছে যেমন পাষাণ চেয়ে ভারী।
দশ মাসে ছাড়ে আহার চোখে নাই রে ঘুম,
মস্তক ফুটে উঠছে ধূমা জলন্ত আগুন।
জলন্ত আগুনের মধ্যে কেবা দিল ফেলে
বল দেখি তোর শোকের ধার বইব কেমন করে।

মা যদি জীবিত থাকে বেটা যদি মরে,
যাবৎ কাল কাঁদিবে মায় বেটা বেটা বলে।
এক রোজ হোসেন আলি তাম্বুর মাঝারে,
বড় ভাই হাসানের কথা পড়ে গেল মনে।
কোন কাড়ালে বন্দী আছি বড় ভায়ের কাছে,
ঐ সখিনার দিব সাদী কাশেম আলীর সাথে।
কাশেম আলি সায়রা বেঁধে সল্লাতলায় গেল,
সাধেরও নহবত কত বাজিতে লাগিল।
সাধেরও নহবত বাজে তাম্বুর মাঝারে,
ফুলের বাসে দামেস্ক শহর মৌ মৌ করে।
জ্বালায়ে মোমের বাতি কেউ না ধরে হাতে,
ঐ সখিনার হল সাদী নিশি প্রহরেতে।
সখিনাকে দিচ্ছে সঁপে ধরে লও তার হাত,
এমন সময় লয়ে এল হাসান আলীর খত।
পড়িয়া খতেরও মেজমান দেখিল তামাম,
শের নামাতে লেখা আছে হাসান আলির নাম।
পিতার মত পেয়ে কাশেম রণে চলে যায়,
কাঁদিয়া সখিনা বিবি ধরে পতির পায়।
ওহে পতি যাচ্ছ কতি শুনহে মোর কথা,
আমারে ভাসায়ে তুমি রণে যেও না।
কাশেম বলে শুন, বিবি, যাচ্ছি আমি কয়ে,
এই দুনিয়ায় থাক তুমি আল্লাহ্ পানে চেয়ে।
এই বলে কাশেম আলি বিদায় হয়ে যায়,
কারবালার ময়দানে কাশেম যাইয়া পৌছায়।
কারবালার ময়দানে কাশেম ছাড়ে একটি হাঁক,
চমকিয়ে উঠিল কাফের পড়ল লাখে লাখ।
দূত গিয়ে দিল খবর এজিদ হুজুরে,
এক দেখি দুরন্ত সেপাই বড় জোর ধরে।
কোথা হতে এল সেপাই, কোন শহরে ঘর,

মক্কা শহরে থাকি আমি দাদু হজরত আলী,
হাসান আলির ছেলে আমি নামটি কাশেম আলী।
দাদিমা ফাতিমা বিবি এই দুনিয়ার সার,
আঠার হাজার আলম আল্লাহ্‌র তিনি করতেন পার।
তার ছেলেকে কারবালাতে তোরা ফেল্‌লি মেরে,
আখেরে পরে হবি কাফের কার নামটি ধরে।
এই বলে কাশেম আলী ছাড়ে একটি তীর,
শূন্য ভরে কাটা গেল সেই পাপীর শির।
মহিম ফতে করে কাশেম চতুর্দিকে চায়,
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে তীর কাশেম আলীর গায়।
কাশেম পড়ল খুলাই রইল শের রইল থাকে,
ডুবিল নবীজীর ভারা দাস্ত কারবালাতে।
আহারে দুলদুলি ঘোড়া কাহার মুখ চাও,
সিতাবি করিয়া তুমি মদিনাতে যাও।
গিয়া ঘোড়া, হল খাড়া অম্বুর মাঝারে,
আসিয়া কাঁদিছে মাতা ঘোড়ার কদম ধরে।
তারপরে সখিনা বিবি এল তাড়াতাড়ি,
হাতের কাঙ্কন সিঁথের সিঁদুর কোথায় রেখে এলি।
রণেতে গেছিলাম, মাগো, রণ করেছি পানি,
রণের সন্ধান, মাগো, আমি কিছু জানি।
গগনে উঠিল যখন সপ্ত প্রহর বেলা,
তখনি খাইল কাশেম জহরের পেয়ালা।
রাগ মাঝে রাগিণী বন্ধ বন্ধ অনুমান,
শিক্ষা-ওস্তাদ বন্দে গাইব শুন তাহার নাম,
ওস্তাদের রচনা জারি গাইব ঘড়ি ঘড়ি,
আমার ওস্তাদ ইরফান আলি রতনপুরে বাড়ী। —মুর্শিদাবাদ

১৩

কোথায় কায়া, কোথায় মায়া, কোথাও বানাও রশি।
কোথায় কেলি কদম্বের চারা কোথায় প্রাণের কানাই বাজায় বাঁশী॥

২—৪

এসো গো মা, সরস্বতী, তুমি আমার মা।
এই অধম সন্তানে ডাকে দয়া ছেড়ো না॥
অবোধ সন্তানের মান মর্যাদা মা তুমি যদি রাখো।
এই তুফানে দিয়েছি খেওয়া তুমি হাল ধরে থেকো॥
মাঠের মধ্যে বৃক্ষ যেমন ফেরে তরুলতা।
একটি মায়ের বেটা মলে তার মা দাঁড়াবে কোথা,
যার হয়ে মরেনি বেটা সে গো আছে ভালো।
যার হয়ে মরেছে বেটা তার কাঁদতে জনম গেলো॥
মাঠের মধ্যে বৃক্ষ যেমন সেই তো মাঠের মাথা।
আল্লার রসুল দুটি নাম বিনা সুতায় গাঁথা॥
নড়াইলে না নড়ে নাম টানিলে না যায়।
একটি নাম লইতে খোদার দুটি নাম আসে॥
খোদার বান্দা নবীর উন্নত তোমরা কেন ভুলো।
আল্লা রসুল বলে আমার জারি শুরু হলো॥ —ঐ

১৪

আল্লা আল্লা বল বান্দা নবী কর সার।
পিপাসা নামা লয়ে জারি শুন সমাচার॥
তোল পার কার থাকি হয় হেঁটু পর।
আবমের আলমিন গো আল্লা পাইল খবর॥
হোসেন কে নড়িতে হলো, হলো সফর বেলা।
পানীর পিপাসায় মরদর শুকাইল গলা॥
হোসেনের কোমরে ছিল বইনামা পাথর।
মুখে দিলে ক্ষুধা-পিপাসা হইত অন্তর॥
সেই সকল চীজ নামা সকল গেল ভুলে।
ফরত হইল হোসেন পানী পানী বলে॥
হোসেন বলে হৈদর ঘোড়া আমার জবাব দাও।
নানাজী দীঘির ধারে এখন আমায় লয়ে যাও॥
নানাজী দীঘির ধারে হোসেন যাইয়া পৌছিল।
হোসেন কে দেখিয়া পানি শুকাইয়া গেল॥

হোসেন বলে নানাজী দীঘি আখোর হারাম খোর।
আব থাকতে আব দিলিনে ছাতি ফাটে মোর॥
নানাজী দীঘি বলে, যাদু, দোষ দিও না মোরে।
আল্লাজীর গজব রে, হোসেন, পানী মানা ঘোরে॥
হোসেন বলে হইদর ঘোড়া আমার দিকে চাও।
বালাখানার মাঝে এখন আমায় লয়ে যাও॥
বালাখানার মাঝে হোসেন যাইয়া পৌছিল।
হোসেন কে দেখিয়া বিবি খোসাল হইল॥
খোসাল হইল বিবি আসিল বাহিরে।
ছদিছতে জানাইল ছালাম হোসেন দোস্তজীরে॥
হোসেন বলে ছদিছতে জানাই সালাম জননীর দুটি পায়
পানীর ও পিয়াসায় সাহান ছাতি ফেটে যায়॥
এক কাতরা পানী, মা গো, খেতে যদি পাই।
আজ এজিদ গোলাম হইল মদিনায় ফিরে যাই॥
শুনিয়া পানের কথা চলিল তথায়।
বালাখানা খুঁজিয়া দেখে পান নাই বাটায়॥
পান পাখী তারা দুজন গেছে আপন স্থান।
জমি পরে পড়িয়া বিবি গড়াগড়ি যান॥
হোসেন বলে মা জী গো বারেক থেকো সথা।
এই পর্যন্ত মায়ে বেটায় হোয়ে গেলো দেখা॥
ঘোড়ায় চড়িয়া যায় হোসেন চখে লাগে ধূলো।
সেই রাস্তায় দেখে হোসেন আছে শ্বেতকুয়ো॥
সেই কুয়োর পানী দেখে করে চলাচল।
সেই কুয়োতে ফেলে দিল মাথার দিস্তল॥
চল্লিশ হাত মাথার পাকড়ী পাক দিয়া ফেলায়।
বিস্‌মিল্লা বলে হোসেন কুয়ায় ঝাঁপ দেয়॥
সেথানে ছিল মাকড়সা তারাই দুটি লাল।
হোসেনকে সাফাইয়া রাখে নিজ দিয়া জাল॥

সেখানে ছিল গিরগিটা সে বড় কাফের।
হোসেনকে দেখাইয়া দিল নিজ লড়াইয়ের শের ॥
সুরঙ্গের পাথারে ছিল এজিদের ঘর বাড়ী।
তাহাই শুনে তামাম সেপাই ছোটে দৌড়াদৌড়ি ॥
ইহাই শুনে তামাম লস্কর তোলে হাতাহাতি।
পিছনে ছিল হইদর ঘোড়া মেলো জোড়া লাথি ॥
হইদরের লাথি যেন কামানের গুলি।
দন্ত ভেঙে পড়ে কাহার, ভাঙ্গে মাথার খুলি ॥
এইরূপে ঘোড়ার লাথি পড়ে গেল সারা।
প্রাণের ভয়ে কেহ, নামাজে হয় খাড়া ॥
এই কথা বলে গিয়ে সহরবানুর তরে।
কারবালা জমিনে রহিল, হোসেন না আসিবে ফিরে ॥
আল্লা আল্লা বল, বান্দা, নবী কব সার।
এইখানেতে জারি শেষ হইল আমার ॥ —নদীয়া

১৫

হা রে ও আমার প্রাণনাথ, এস এস প্রাণ হৃদিবাসরে,
কে রঙ্গিল সোনার তনু গো খোন খোরাবি আবিরে (হারে)।
ধর ধর গো পিয়া এসেছি প্রাণ পিত্তিমা
বুকে বিন্ছ্যা বিষের চিত দেখ নজরে,
অঘোর ঘোরে ঘুম দিল লো (হা হা) সাকিনা লো
তোর ঘরে (হা রে) ॥
এস এস ওগো বর, ধন্য তোমার বাসর ঘর,
আমিও লইব শয্যা তোমারি ধারে।
দাঁড়াও দাঁড়াও নাথ গো—(আমি) রক্তচেলি লই পরি ॥
এস তবে প্রেয়সী চল বাসরে বসি,
রক্তজবার শয্যাপাতি গায় তিমিরে
নিবিড়ে ঘুমাব দোঁহে গো (উঠব) বাসি বিয়ার হাসরে ॥ —বগুড়া

মহরমের বৃত্তান্ত ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ কোন কোন বিষয়ও জারি গানে অবলম্বন করা হইতে পারে, তবে তাহাদের দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।

১৬

আমার গান শুনে প্রাণ বাঁচে না ভাই,
ও মোর ছাবেরউদ্দীন বলিছে তাই
কোথায় যায়ে গানের জোগাড় পাই।
আমার মনে বড় বাঞ্ছা ছিলো
গায়ান গায়ে সাধ মিটাই।
দুই হাতে দুই খঞ্জরী বাজাই ॥
ওস্তাদ আমার আকবর আলী ভাই,
তিনি ত ভেঙ্গে বলে নাই (আ—আ—হা—হা)
একটা জাগার পুকুরে জলে নামিল,
সে যে ডুব দিয়ে কন্যা হোলো
সদাগর এসে তারে ধরে নিল,
ওরে বারো বছরের মধ্যে নারীর
তিনটে সন্তান তার হোলো ॥
ফিরে নারী সেই ঘাটে এলো
সেই ঘাটে না এসে নারী আবার পুরুষ হইল ॥
সে যে পুরুষ হয়ে দ্যাশে চলে যায়,
তাহার মন বলে, হায়রে হায়,
কিনা করতে আর বা কী না হয় ॥
ওরে আমি পুরুষ হয়ে নামলাম জলে
কন্যা হয়ে উঠলাম নায়,
বারো বছর করলাম বাণিজ্য সদাই
সেও ত বয়াতি সৎ সমন্দ নয়,
বয়াতি বলেন চাঁদ সভায় ॥ —বগুড়া

১৭

এ ধন যৌবন, কভু নয় আপন,
নিশিকা স্বপন মোছা দেখতে পাই।
কাহে ধন কাহে জন, কাহে পুত্র পরিজন,
কাহেকে বলরে আপন আপন ভাই ॥

লেকা লেংটি তাজ, ডোর কপ্‌নি সাজ,
মউত কালে সব নিদরদে খুলে লেগা।
দুই হস্ত পদকা ধরি, বন্ধন লাগাবে ডুরি,
থাকৃসে তেরে দাখিলে ক'রে দেগা।
হায় গো, ভাবো সে বারিতালা,
ঘুচিবে সকল জালা আখেরে পাবে ভালা কাম।
মা খাতুন জিন্নাত ইয়াদ করো মুখেতে বল নবীজীকো নাম॥
লালচাঁদ ভণে নবীজীকো একমনে, আরজ করি বারে বারে।
করিম-রহিম হাদী ভাবো সে গুণনিধি
আখেরে কে করিবে পার॥
আমার নবী যেমন আর কি অমন, ভবের মাঝে হবে—
এই নবীর নামে, কতো বান্দা, পার হবে যাবে॥ —যশোহর, খুলনা

১৮

আমার গান শুনে প্রাণ বাঁচে না ভাই,
ও মোর ছাবেরুদ্দিন কইছে তাই।
কোথায় যায়ে গানের যোগাড় পাই।
আমার মনে বড় বাঞ্ছা ছিলো গায়ান গায়ে সাধ মিটাই।
(আরে) দুই হাতে দুই খঞ্জরী বাজাই॥
আরে বয়াতি সৎকথা কও, বয়াতি কও বেউলার কথা,
কি হ'লো বয়াতি বলো চাঁদ সভায়॥ —বগুড়া

১৯

আমার নবী চেনা হল ভার,
জিন্দায় যদি না পাই তারে মোলেও তো পাব না আর,
অবর হতে সংবাদ এলো নবী হলেন ইন্তেকাল,
তবে হায়াত আল্ মারছিলন নাম লিখলেন কোপরেয়ার।
দেখে শুনে অনুমানে মনে ধাঁধা হয় আমার,
আমার মনে হয় নবী মোলে রহিতো না আর এ সংসার।
নবী সত্য আছেন বর্ত্ত বুঝে কর ভাব নিহার,
হিরুচাঁদের চরণ ভুলে আমার পাঞ্জু গেল ছারখার। —মুর্শিদাবাদ

২০

মদিনাতে রছুল নামে কে এল রে ভাই,
কায়া ধারী হয়ে ফেরে কেন তার ছায়া নাই।
ছায়াহীন যাহারো কায়া ত্রিভুবন তাহারি ছায়া,
সেই নবীজির মর্ম জানা অবশ্যই চাই।
তুলনা দিতে তাঁহারে কেহ নাই ত্রিসংসারে,
মেঘে যেমন ছায়া ধরে ধুপেরি সময়।
ছায়াহীন যাহারে দেখি সরিক নাই সে না সরিকি ;
ফকির লালন বলে তাঁর হকি কি বল্‌তে ডরায়। —ঐ

২১

খোদা খোদা আল্লার কিরা দোস্ত মোহম্মদ,
অজুদে মজুদে সাঁই, দমে কিয়ামত।
বিসমোল্লাতে বিস্ত হয় কিছু কারে দয়াময় ;
কোরান কয় নামাজ রোজা, বেহেস্ত যাবার রাস্তা সোজা,
হজরতে কয় নামাও বোঝা কর এবাদত।

জালের বারশে গান

হুগলী জেলার জেলেনীদের মধ্যে এক শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা জালের বারশে গান নামে পরিচিত। ইহা জেলেনীদিগের প্রেম-সঙ্গীত।

জালের মাথায় জাল দড়িরে আমার মাথায় রে ডালি।
ওরে কেমনে বেচিব মাজুরে ঐ না গৃহস্থের বাড়ী রে॥
(নছিব এই ছিল)
কি খেনে জল আনতে গেলাম রে উজান নদীর ঘাটে,
ওরে সেইখেনে পুড়িল কপাল রে ওই না হালকা জালের সাথে রে
সাত ভাইয়ের বুন আমিরে পরমা সুন্দরী,
ওরে ছোট ভাইবৌ দিছলো গালিরে জালিয়া ভাতারি রে।
নছিব এই ছিল॥

জিতুয়া গান

উত্তর বাংলার একশ্রেণীর লঘুবিষয়ক প্রেমসঙ্গীত জিতুয়া বা রং পিরিত বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে কৌতুক রস প্রাধান্য লাভ করে।

১

নদারীর বেটাটা কেনে ডাকালু মোক,
লইজ্যা সরম নাই কি তোর ঘরোত আছে বাপ মাও মোর,
শুনিয়া ফেলাবে ওরে ঘরোত তোর নাইরে কিছুই,
কি বুঝিব নেড়ের বেটা, কলেক আধেক কার্জ গেলে
হাল গরু তো খোয়াব কি মোক বিয়া করেক। —জলপাইগুড়ি

আজি চালত কইল সে চলে, কুমড়া গে,
ও মাই জাংগিত ফলেছে ধুমা দেখা দেখি মানসি হ'ল, মাই,
সালাছিস ছাড়িয়া (মাই গে)
তুই ত মোর চিকণ কালারে মোর কালা,
তুই মোর ভাবিস নারে, মুই একটা বুদ্ধি ফান্দাইমু
(কালা) তোরে না বাদে॥
কি বুদ্ধি ছান্দিম ফান্দাসে মাই গে,
বাপ যে হইল তোর ভারি,
কান্দিতে কান্দিতে বুঝি (মাইগে)
(ও মোর) জীবন যাবে চলি, (মাইগে)
সে লা মোক দেখিবার আসিবে,
ও বাউ বুদ্ধি করিম গেলা যুত করিয়া দিমার বাউ
(ও) মুই শাড়ীত অড়ন দিয়া॥
এ কাঠে কোলে করবে যুত মাই অন্য ঠে দেখিবে দিয়ে,
মোর মত অভাগার হাতত তোক কি মাই দিবে॥
শেষের বুদ্ধি আছে কালারে ওই মুই হোই মার পাগলী,
সত্য করি কনু (কালা) ও মুই (তোর) পায়ের শিকলী॥

যত চেংড়িলা বালাবাড়ী পাতিসে গে ওংগের খেলা
ও কি ও মরি কেনে বা ও ঝা
কাম করিয়া ফেলেয়া গেছে সে চাল্লি কুথা।
ওইয়া আনলেক জড়েয়া বাশের বিকিনা আনিয়া,
ওইয়া গোট্টেক মারোয়া রাতি দিনেক ধরেয়া
কামটা নিলেক সারিয়া।
জিরয়া মারেছে গো আই ও নদীর বালুকা।
সাড়ি করি বসাইবা সে কই নাগে রয়
কাল ঢেংচী মাইটা ধরিলেক নিস্তর ॥
একটা চেংড়াক আনিয়া ওইটা সাজাইল দুলুয়া।
ধোলি মাইয়াটা সাজিল কইন্যা ॥ —ঐ

জেলের গান

জেলেদিগের গোষ্ঠীবদ্ধভাবে মাছ ধরিবার সময় একশ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে জেলের গান বা জেলে সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তবে তাহা কর্মসঙ্গীত বা work song এর অন্তর্গত হইবার যোগ্য।

কি করে মাছ ধরব জেলে
আমার কোলেতে কচি ছেলে,
কি করে মাছ ধরব জেলে ॥
মাছ ধরেছি ট্যাংরা পুঁটি
বিকতে যাব বাবুর কুঠি
বাবু দিল পয়সা দুটি
তুই লিস না আমি লিব,
কি করে মাছ ধরব।
আমার সরু বালি বাঁধ ভেঙ্গে গেল,
কি করে মাছ ধরব বল। —মেদিনীপুর

জোলার গান

তাঁতী তাঁত বুনিবার সময় যে গান গাহে, তাহাকে তাঁতীর গান বা জোলার গান বলা যায়। ইহাও কর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত।

আল্লা কাঁদে নবী কাঁদে কাঁদেরে মালতী ফুল
আল্লা বিনায়ে বিনায়ে কাঁদে বনের ধাদকি ফুল॥ —পুরুলিয়া

ঝাড়খণ্ডী

ছোটনাগপুরের অদিবাসী অঞ্চল প্রধানতঃ ঝাড়খণ্ড বলিয়া পরিচিত। ইহার পুর্ব সীমান্ত অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম মেদিনীপুর পুরুলিয়া, পশ্চিম বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে বাংলা কীর্তন গানের যে একটি শাখা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ঝাড়খণ্ডী কীর্তন গান বলিয়া পরিচিত। প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পর হইতেই এই অঞ্চলে বাংলা কীর্তন গানের এই শাখা প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ক্রমে সংমিশ্রণ লাভ করিয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচয়িতাদিগের পদ রচনা অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের কাহিনী ইহারও অবলম্বন এবং বাংলা কীর্তন গানের যে কয়েকটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়-স্বীকৃত শাখা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে ইহাও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। ক্রমে ইহাও একটি বিধিবদ্ধ ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলেও বৈষ্ণব সাধন-ভজনের শাস্ত্র-স্বীকৃত ধারার মধ্যে ইহাও স্থান লাভ করিয়াছিল। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম এবং গোপীবল্লভপুর ঝাড়খণ্ডী কীর্তন গানের প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

বর্তমানে ইহার গীত-রূপের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, কিংবা ইহার অনুশীলনের ধারাও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার কি পদ্ধতি ছিল, তাহা আজ অনুমান করিয়াও বলিতে পারা যাইবে না। তবে ইহার একটি লৌকিক রূপ সমগ্র ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহাই ঝুমুর (পরে দ্রষ্টব্য) নামে পরিচিত। ঝুমুরের সঙ্গে এই অঞ্চলের আদিবাসী সমাজে প্রচলিত গীতিসুরের সংমিশ্রণ হইয়াছে।

ঝাঁপান গান

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জিলায় প্রধানতঃ পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে শ্রাবণ মাসে বিশেষতঃ শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন কোন কোন নির্দিষ্ট স্থানে সাপের ওঝা কিংবা গুণিগণ একত্র হইয়া জীবন্ত সর্প সহ সমবেত কৌতুহলী জনসাধারণের

সম্মুখে সর্পবিষ দূর করিবার কৌশল দেখাইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কোন কোন স্থানে বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওঝা বা গুণীরা যে গান গাহিয়া থাকে, তাহাকেই ঝাঁপান গান বলা হয়।

ঝাঁপান গানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়, কশ্যপ মুনি স্বর্গের দেবতা ; ভগবানের কৃপাবলে তিনি বহু তন্ত্রমন্ত্র পাইয়ছিলেন, তাহা দ্বারা সাপে কামড়ানো লোকের প্রাণ রক্ষা হইত। একদিন স্বয়ং মহাদেবের আদেশে কশ্যপ মুনি মর্ত্যধামে ঐ মন্ত্রাদি প্রচার করিতে আসিবেন স্থির হইল। সেই সময় সুর ও অসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। কশ্যপ মুনি ঐ সময় সুধাপাত্র হাতে সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হন। সেই সুধাপাত্র সহ দেবতাগণ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান। তখন সেখানে হইতে তাঁহাকে পুনরায় উক্ত কাজের জন্য মর্ত্যে আসিতে হয়। এখানে আসিয়া তিনি প্রথমে শঙ্খপুরে বসতি স্থাপন করেন। তখন তাঁর নাম ছিল ধন্বন্তরি। সেখানে আসিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে ১২৬ জন শিষ্য তৈয়ারী করেন। তিনি ঐ শিষ্যদিগকে মনসা দেবীর জন্মকথা ও তৎসম্পর্কীয় নানা কাহিনী, সাপের মন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেন। তাঁহার প্রথম দুই শিষ্যের নাম সুষেণ ও সুমান। ঐ সঙ্গে ঔষধ স্বরূপ কিছু গাছের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। গাছগুলির নাম অস্থি-সঞ্চারিণী, জীব-সঞ্চারিণী জ্যোতিরূপী, তেজোময়, বিশল্যকরণী ইত্যাদি। তারপর হইতে মর্ত্যধামে ঐ সমস্ত মন্ত্র ও ঔষধ প্রচলিত হয়। যাঁহারা এই মন্ত্রতন্ত্র শিক্ষা করেন তাঁহারা মনসাদেবীর অর্চনা করেন। তাই মনসাদেবীর পূজার সময় ঝাঁপান গান হইয়া থাকে।

১

মা, মনসা, মন আশা পিপাসা পুরাও জননী।
আমি অতি মূঢ় মতি ভজন সাধন নাহি জানি ॥
তন্ত্র ফুলে গেঁথে মালা, এনেছি মনসা বালা,
দিয়ে মন্ত্র বরণ ডালা, পুজিব চরণ দুখানি ॥
করুণা করে কটাক্ষে, অহিকুল করেছ রক্ষে
নির্দয় যেন পুত্রের পক্ষে, হয়োনা বিশ্ববন্দিনী ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পুরে, স্বীয় শক্তি সবিস্তারে
পুজনীয়া ঘরে ঘরে, হয়েছো পুরাণে শুনি ॥ —মুর্শিদাবাদ

২

চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সদাগর।
মনসার সাথে বাদ করে নিরন্তর।
দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাহারে ॥
মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।
বলে চেঙমুড়ী বেটা কিসের দেবতা ॥
হেতেল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফেরে।
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে ॥
বলে একবার যদি দেখা পাই তার।
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর ॥
আপদ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি।
পরম কৌতুকে হবে রাজ্যে বসতি ॥
এইরূপে কিছুদিন করিয়া যাপন।
বাণিজ্যে চলিল শেষে দক্ষিণ পাটন ॥
শিব শিব বলি যাত্রা করে সদাগর।
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙ্গার উপর ॥
বাহ বাহ বলি ডাক দিল কর্ণধারে।
সাবধান হয়ে যাও জলের উপরে ॥
চাঁদের আদেশ পেয়ে কাণ্ডারী চলিল।
সাত ডিঙ্গা লয়ে কালীদহে উত্তরিল ॥
চাঁদ বেণের ঝগড়া মনসার সনে।
সাধু কালীদহে দেবী জানিল ধেয়ানে ॥
নেত লইয়া যুক্তি করে জয় বিষহরী।
মম সনে বাদ করে চাঁদ অধিকারী ॥
নিরন্তর বলে মোরে কাণি চেঙমুড়ি।
বিপাকে উহারে আজি ভরাডুবি করি ॥
তবে যদি মোর পুজা করে সদাগর।
অবিলম্বে ডাকি আনে যত জলধর ॥

প্রভঞ্জন বলবান পরাৎপর বীর।
কালীদহে কর গিয়া প্রবল সমীর॥
পুষ্প পান দিয়া দেবতার প্রতি বলে।
চাঁদবেণের সাত ডিঙ্গা ডুবাইবে জলে॥
দেবীর আদেশ পেয়ে ভীম বেগে ধায়।
বিপাকে মজিল চাঁদ কেতকায়ে গায়॥ —ঐ

৩

মা মনসা তব মন্ত্র করি যে প্রচার।
বিষ নাশিতে মাতা তব অধিকার॥
শক্তিবলে, মা, ভক্তি কে রাখিতে পারে।
বিষের হাতেতে কেউ জিয়াইতে নারে॥
যৌবন মিলিয়া তো, মা, পূজা যে করিল।
বিষের হাতেতে তারা সকলি তরিল॥
কৃপা কর, ওগো মাতা, দয়া কর মোরে।
সর্প দংশনের বিষ ফুঁয়ে যেন উড়ে॥
ঘোর রাতি হইল দেখি মহা অন্ধকার।
কে খাইল নাহি জানি কোন সর্পবর॥
যদি হয় ষোল চিতে তবু না হয় বিষ দিতে।
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে নাই বিষ
মা মনসার আজ্ঞে॥ —ঐ

৪

বাপের বাড়ী যায় গৌরী রাগ করিয়া হরে।
অঙ্গের ভূষণ তাহার উড়াল ঝড়ে॥
তাহা দেখি ব্রহ্মা বিষ্ণু টলিয়া উঠিল।
সেই বিষ কাল কুটোর বিষ জন্মিল॥
আপনি হরি বংশীধারী জানিয়া অন্তরে।
ব্রহ্মতেজ রাখিলেন শঙ্খের ভিতরে॥
সেই হুঙ্কারে কম্পে যত ঋষিগণ।
সেই বিষ পান করিলেন যত নাগগণ॥

পান করে নাগগণ হয়ে সুজীবন।
অতঃপর জীবগণে করিয়ে দংশন ॥
বিষের জ্বালা জীব না পারে সহিতে।
তখন স্মরণ করিলেন কৃষ্ণকে ॥
দয়া কর মা, মনসা, হৈয়ে সদয়।
মহাবীর গরুড়কে পাঠাইয়া দেয় ॥
গরুড় স্মরণে বিষ উড়ে তোরা যা।
হাড় মাংস বিষ তুই ভস্ম হয়ে যা ॥ —ঐ

৫

সর্ব জয় মঙ্গলা রাধে বিনোদিনী রায়।
বৃন্দাবন মন্দিরে গাইব ঠাকুর কানাই ॥
আজকে রাধে কুম্ভ কক্ষে জল ভরিতে যায়।
ধীরে ধীরে চিকন কালা পিছে পিছে যায় ॥
জল ভর জল ভর, সখি, বিরস কেন মন।
আমারে ছাপায়ে রাখ গুটিক রাজার ধন ॥
আপনার ধনরে কানাই আপনি রাখ ঢেকে।
তোমা হেন নাগর কানাই কে আনিল ডেকে ॥
কেহ ত আনেনি ডেকে এসেছি আপনি।
তাইতে কিছু হয়েছ বেজার রাধে বিনোদনী ॥
বেজার কেন হব, কানাই, বেজার কেন হব।
ভাল মন্দ তুটি কথা কাছে কাছে বলিব ॥
পরের রমণী দেখে, কানাই, প্রাণ ধরিতে নার।
নিজ টাকা ভেঙ্গে, কানাই, বিবাহ না কর ॥
বিয়ে করতে বল, রাধে, কোথায় পাব কড়ি।
তোমার গলার হারগাছটি দাও খোঁপা বাঁধা দড়ি ॥
যেয়ো না যেয়ো না, রাধে, প্রাণে দিয়ে ব্যথা।
তোমার মত সুন্দর, রাধে, কানাই পাবে কোথা ॥
আমার মত সুন্দর রাধে কানাই যদি চাও।
গলাতে কলসী বেঁধে যমুনায় ঝাঁপ দাও ॥

ডুবে মরতে বল, রাধে, সঙ্গে নাহি চল।
কি দেখি মরিব ডুবি তাই আমারে বল॥ —ঐ

৬

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঝাঁকে চলে মাছ।
রাধে গেলেন জল আনিতে কানাই করে বাচ॥
ধন্য তোমার মাতা পিতা, ধন্য তোমার হিয়ে।
একলা পাঠাল রাধে কলসী কাখে দিয়ে॥
যমুনার তুফান ভরে প্রাণ কাঁদিছে ভোরে।
একা যেও না, রাধে, ফিরে চল ঘরে॥
মন যদি মোর ইন্দ্র হত রমণী নিত সাথে।
মনের সুখে স্নান করিও সাহান বাঁধা ঘাটে॥
সূর্য করে ঝিলিমিলি চন্দ্র করে আলো।
রাধেকে দেখে গৌরব করে, কৃষ্ণকে বলে কালো॥
ছোট ঘরে বড় প্রদীপ মেঝে তুল তুল করে।
বাবাকে কামড়াল সাপে ঝিয়ে গিয়ে পড়ে।
মা মনসার স্মরণে বিষ কামাখ্যার বরে॥ —ঐ

৭

রাজা হবে রামচন্দ্র মনেতে জানিল।
কৈকেয়ী মধ্য পথে বাধ সেজেছিল॥
সাধ করে কৌশল্যা দিলেন গোচরণের ফোঁটা।
সুন্দর বলিতে রাম ধরিলেন জটা॥
শিরে জটা ধরে রাম বনেতে চলিল।
পঞ্চবটীর বনে গিয়া উপনীত হইল॥
পত্রেতে আর বিচিত্রেতে বাঁধিলেন কুটীর।
ছল করিয়ে রাবণ রাজা সীতা করে চুরি॥
হা সীতা বলিয়া রাম লাগিল কাঁদিতে।
লক্ষ্মণ বলিল কিছু শ্রীরামেরও কাছে॥
শুন শুন ওগো, দাদা, প্রভু নারায়ণ।
সীতার লাগিয়া তুমি করো ক্রন্দন॥

আজ চুরি করিল সীতা লঙ্কার ঈশ্বর।
কিছুদিন পরে তাহার করিব উদ্ধার ॥
এইখানেতে দুই ভায়ে একত্র হইয়া।
উপনীত হইল আসি কিষ্কিন্ধ্যা আসিয়া ॥
সেইখানকার রাজা ছিলেন বালি মহারাজ।
একে একে দিচ্ছি আমি তাহার পরিচয়।
তার ভাই সুগ্রীব ছিল বড়ই ফিঁচালী ॥
রামের সঙ্গে তিনি গাঁতাই মিতালী ॥
মিতালী পাতায়ে তখন সুগ্রীব মহাশয়।
রাজার নিকটে কুমন্ত্র দেয় কিছু তায় ॥
কুমন্ত্র পেয়ে রাম পুরিল সন্ধান।
ঐশিক বাণেতে বালি তেজিল জীবন ॥
বালিরে বধিয়া রাম লঙ্কাপুরে গেল।
বিভীষণের সঙ্গে তখন মিতালি পাতাইল ॥
মৃত্যুশর বাণে রাবণ করিল নিধন।
মিতালী পাতায় তখন প্রভু নারায়ণ ॥
নিধন করিয়া তিনি অযোধ্যার পতি।
সীতারে লইয়া তিনি করেন বসতি ॥

—ঐ

৮

আমি ঘুমাইনি গো জেগে আছি।
কাল সাপে খেয়ে গেল প্রাণপতি ॥
কোথায় গো, শাশুড়ী মাতা, এসো শীঘ্রগতি ॥
মা গো, কি করিব কোথায় যাব,
পতি বিনে প্রাণ ত্যজিব,
পতি ছেড়ে নাহি দেব আমি যে মা সতী ॥
দেখাবো গো মনসা কালী।
তোরে আমি ভাল চিনি ॥
তুমি করলি মোরে অভাগিনী না পোহাতে রাতি ॥

পতি আমার নয়ন তারা করবো না নয়ন ছাড়া,
হয়ে থাকবো সহমরা তোরে দেখাবো শক্তি ॥
তোরে বা বলিব কত, হলো কি তোর মনচিত্ত
নারী জাতি তুই বলিসতো, নাই কি লো তোর পতি ॥ —নদীয়া

৯

বেহুলা, কাঁদাবে লোহার বাসর ঘরে,
পতি যদি বাঁচে, বেহুলা, সতী বলবো তোরে ॥
শুন শুন, বেহুলা, বলি এই লো তোরে ॥
বুদ্ধির বিচিত্র তোর শ্বশুর,
করলো লোহার বাসর ঘর,
তার মধ্যে রাখলো বেহুলা লখিনদার।
তোর শ্বশুরের সঙ্গে আমার পূর্ব মনো রাগে
লখিনদারে করবো হত এই বাসনা জাগে।
আমার ভয়ে চাঁদ বেনে সাঁতালী পর্বতে,
রক্ষা পাবে লখিনদার থাকবে নির্বিঘ্নেতে।
এই বাসনা দৃঢ় করে রাখিল তাহারে ॥
চাঁদ বেনে না করে আমায় ভকতি,
দেখাবে তাহারে কিছু আমার শকতি,
লখিনদারে নাহি পাবে, কেঁদে করবে কি।
অকারণে দুঃখ পাবে, ওলো বেনের ঝি,
মলিন হয়েছে অঙ্গ ফেলে দে লো সাগরে ॥
মরা পতি লয়ে কোলে বসে থাক মিছে,
মরিলে কি কোন কালে পুনরায় সে বাঁচে,
নয়কো মিথ্যা আমার কথা জানে জগত জনে।
তোমার মত এমন বোকা নাইকো কোনখানে,
আমি তোর থাকতে বৈরী, পতি দেয় তোর ফিরে ॥ —ঐ

১০

ওমা পদ্মযোনী শিবের নন্দিনী
বিষময় বিষহরি নাম গো ॥

ওমা আমি নারী অভাগিনী
তাই তোমারে নাহি চিনি
বলেছি অনেক কু-বাণী ক্ষম নিজ গুণে গো ॥
তুমি মা ভবের আরাধ্য, নয়কো কিছু তোমার অসাধ্য,
আমি তব অনুগত জিয়াব এই সাধ গো ॥
মোরে কৃপা করে ত্রিনয়নী
অধমে সদয় হয়ে বর দাও তুমি।
পতি যেন পাইগো আমি এই মিনতি করি গো ॥
মা গো ভেলায় লয়ে মরা পতি
কতদিন আর থাকব হৈমবতী।
এই অবলার কত গতি তুমি গতি দায়িনী গো ॥
ওলা ছয় মাস আছি ভেসে জলে,
আমার কেউ নাই, মা, ভূমণ্ডলে,
পতি কোথায় পাব গেলে
দাও মা তুমি, মা, বলে গো ॥
মাগো, নারীর ধর্ম পতি শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে ঘোষে যথেষ্ট।
তাই সহেছি দারুণ কষ্ট পতির লাগি আমি গো ॥
অপরাধী নই তো আমি, সাক্ষী মোর অন্তর্যামী
কিবা দোষে করলে তুমি পতিহারা মোরে গো ॥
যদি মোরে দিলে দেখা, আমি পেয়েছি তোমারে একা,
কি করে বাঁচিবে, সখা, ছাড়বো না শুনে গো ॥
বেহুলার কাঁদনে কাঁদনে পাষাণ গলে যায়।
হায়রে, সোনার বেহুলা জলে ভেসে যায় ॥
শুনগো, বেহুলা দেবী, বলি যে তোমায় ॥
অপরাধী নয়কো তুমি তাহা আমি ভাল জানি।
অবসান দুঃখ-যামিনী হইবে নিশ্চয় ॥
লয়ে চল মরা পতি, যেথায় পিতা পশুপতি।
নিশ্চয় বাঁচিবে বলি যে তোমায় ॥

১১

আমার এই নিবেদন শুন গো,
দেব ত্রিলোচন পতিরে দাও ফিরে গো ॥
আর পতিহারা হয়ে সতী কেমনে জিয়াবে গো ॥
যদি পতি নাহি পাব, স্ত্রী হত্যা নিশ্চয়ই হব,
স্ত্রী হত্যার পাপ তব লাগিবে নিশ্চয় গো ॥
দেবতার মাঝে দেবী পেয়ে অপমান।
ক্ষণেক বিলম্বে দেবী লখাইকে জিয়ান ॥
লখাইকে সাজিয়ে দিল কাপড়ের কাণ্ডারী,
সম্মুখে রাখলেন ও তার অস্থির ভাণ্ডার গো ॥
যেখানে যা পান তার অস্থি খালি খালি,
হস্তপদ দিয়ে দেবী জুড়িলেন আপনি।
মুখ মণ্ডল কিবা সুবর্ণ বন্ধন মতি গো ॥
ময়ূরের স্মরণে বিষ উড়িছে ধিকে ধিকে ॥
আর কেঁদোনা কেঁদো না, ঝিয়া বেহুলা সুন্দরী গো ॥
এখনি উঠিবে তোমার স্বামী গুণমণি গো ॥
মৃত্যু সঞ্চারিণী বিদ্যা কর্ণে করিলে সার,
আজ কালনিদ্রা করে উঠেন লখিনদার।
পতিদানে রঙ্গ রসে নাচে বেহুলা সুন্দরী গো ॥
চিয়াও চিয়াও শব্দ করি ঝাড়ছে বিষহরি
লখিনদার প্রাণ পেয়ে আরম্ভিল পুজা গো ॥
পুজিত মনসা দেবী বিশ্বমাঝে হলো ॥
সতী বলে ত্রিজগতে বেহুলা প্রমাণিত হলো গো ॥ —নদীয়া

১২

গায়ক (চাঁদ বেনে) প্রশ্ন করিতেছেন ও জবাব দিতেছেন—
মহাদেবের তিন কন্যা তাও আমি জানি
তুমি আবার কোন কন্যা বল গুণমণি।
অল্পেতে ছাড়ব না, যাদু, মনের বাসনা
সত্য পরিচয় দেবে শুনবে সর্বজনা।

কি ভাবেতে তোমার জন্ম কোথায় থেকে হলে,
কোথা থেকে মনসা নাম তুমি হে ধরিলে।
কি ভাবেতে তুমি গেলে পাতাল ভবনে
বাসুকির ভগিনী তুমি হলে কি কারণে।
সাপ সঙ্গে করে আজি দেবতা হতে চাও,
কোথা হতে সর্প পেলে আজি বলে যাও।
শিব শম্ভু ছাড়া আমি অন্যে নাহি পূজি,
কিবা পূজা দিব তোমায় আমি না পাই খুঁজি।
শঙ্খ পদ্মমণি নাম আমার পূর্বে ছিল
আশ্রমেতে আমার এক পক্ষী বাসা ছিল।
ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে পক্ষী মাটির বুকেতে,
যত্নে রাখিলাম পক্ষী আমার আশ্রমেতে।
দলে দলে থাকে পক্ষী গণা নাহি যায়,
কোথা হতে সর্প এসে পক্ষী খেল তায়।
সাপের বিরোধী আমি সেই দিনেতে হলাম,
পুনরায় আবার আমি তপস্যা আরম্ভিলাম।
তপস্যা করিলাম আমি দেবী দুর্গাবতী,
সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলা দ্রুতগতি।
এই হেন্তাল ধর, সাধু, ধরহ সত্বর,
সেই অবধি হলাম আমি নাগের বিরোধী,
চন্দ্রকান্ত নাম মোর চম্পাই যে বসতি।
কোটীশ্বর নামে সওদাগর ছিল মোর পিতা,
এই পর্যন্ত সাঙ্গ করি মোর পরিচয় কথা।

২য় পক্ষের ধুয়া—

আমার নামে চাঁদের ধ্বজা, করব না কালীর পূজা,
এই আমার মনের বাসনা গো।

গায়ক—

দিব না দিব না পূজা ফিরে যা মনসা,
সাপ সঙ্গে দেবতা হতে তোর এই মনের আশা।

চন্দ্রধর নামটি ধরি, চম্পাই নগর বসতি করি,
অন্য কোন দেবতার পূজা আমি আর না করি।
এই পর্যন্ত চাঁদের কথা সাঙ্গ করে যাই।
মমিন মতে আল্লার ধ্বনি দিবেন যত মমিন ভাই,
যত আছেন কণ্ঠীধারী হরি বলুন সবাই।

১ম পক্ষ (মনসার ভূমিকায় যিনি) ধুয়া দিলেন—

ও মরি গাব গাছে—
কত ময়না টিয়া ফলকে পায় না আডফলকে নেবে ক্যাচকেচে?

গায়ক—

আমার পাল্লা, দাদা, এমনি গাধা,
দেখে কিছু বালির গাদা চিনি বলে খেল দাদা।
যেমন রাম ছাগলে গাড়ী টানে, রামকে দেখায় ভূতের ভয়,
তেমন আবোল তাবোল এই আসরে অনেক কিছু কয়ে যায়।
পূজা নিতে এলাম আমি দিলে নাকো আমার পূজা
শুন, ও চাঁদ, তুমি ও মরি গাব আছে।

পুনঃ ধূয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন—

ও পুজা দে দে, রে চাঁদ, নইলে মরবি গরলে গো।

গায়ক গাহিতেছেন—

পাঠায়ে দিয়েছেন পিতা তোমার নিকটে গো,
দিবে কিনা দিবে পূজা দেবী মনসার।
অল্পেতে ছাড়িব না, চাঁদ গো, বলি তো তোমায়।
এই বারেতে ব্যক্ত করি জন্মের কাহিনী,
আমারি জন্মের কথা বলেন জননী।
কৈলাস হইতে শিব যায় পদ্মবন ধরি,
পদ্মের নিকট ছিল শ্রীফলের গাছ।
শ্রীফলেরি গাছ গো অতীব সুন্দর,
ফলের সাজানো আছে অতীব মনোহর।
এতবলি ভোলানাথ চলিল সেখানে,
ভগবতীর স্তন বলি মনে মনে গণে।

অকস্মাৎ শিববীর্য হইল পতন
পড়িল সেই বীর্য পদ্মেরি বন।
কোথা থেকে এক পক্ষী আসিল তখন,
খাদ্য বলি সেই পক্ষী করিল ভক্ষণ।
পুনরায় শিব-শুক্র করে উদ্গীরণ,
পদ্মের নাল ধরিয়া গেল পাতাল ভবন।
বাসুকি কদ্রু আর ছিল প্রজাপতি,
দেখিয়া ধরিলা মোরে অতি দ্রুতগতি।
সেই হইতে কদ্রু মোরে রাখিল সেখানে,
পুনরায় পাঠিয়ে মোরে দিল পদ্মবনে।
কদ্রু বলিল মোরে, শুন পদ্মাবতী,
তোমার পিতার নাম দেব পশুপতি,
দেখা হইবে তার সঙ্গে যাও পদ্মবনে,
সেই হইতে আমি আসি সেই পদ্মবনে।
এই হেতু নাম মোর হল পদ্মাবতী।
পদ্মেরি বনে দেখি ভোলা মহেশ্বর,
পিতা পিতা বলি আমি ডাকিনু সত্বর
তার পর আসে শিব আমার নিকট।
বলিল মোরে, শিব, শুন নারী জাতি,
দুই কন্যা আছে মোর লক্ষ্মী সরস্বতী।
তুমি আবার কোন কন্যা কেবা তাহা জানে,
আলিঙ্গন দিতে শিব যায় পদ্মবনে।
এত বলি পদ্মাবতী গণিল প্রমাদ,
পলায় ভয়েতে পদ্মা মাথা করি হেঁট।
পিতা পিতা বলি তারে ডাকে বারবার,
তবু না মানেন সেই ভোলা মহেশ্বর।
এতবলি পদ্মাবতী ডাকিল বাসুকি,
বিষ পাঠাইল তবে কদ্রু আর বাসুকি।

সেই বৃষ্টি করে ভুলায় মহেশ্বর,
বিষে জর জর হয়ে শিব পড়ে পৃথিবীর পরে
এত বলি প্রজাপতি গণিল প্রমাদ,
পিতা কন্যাতে যুদ্ধ ধ্বংস অনিবার।
ত্বরা করি আসে তবে দেব প্রজাপতি,
ঘন ঘন বলে তবে, শুন আশুতোষ,
তোমারই ওই কন্যা ও দেখহ সত্বর।
বিষে জর জর তনু দেব পঞ্চানন,
শুনিয়া ধ্যানেতে মগ্ন হল ততক্ষণ।
কন্যা কন্যা বলি মোরে সম্ভাষণ করে,
বিষ হ'য়ে নিলাম আমি নিজ মূর্তি ধরে।
সেই হতে নাম মোর হল বিষহরি,
দিলাম পরিচয় আমি শুন, চাঁদ অধিকারী।
এই পর্যন্ত আমার কথা সাঙ্গ করে যাই,
মা মনসার নামে হরি বলিবেন সবাই।

দ্বিতীয় পক্ষের (চাঁদ) ধুয়া—

ও তুই শোন মনসা কালী,
কি ভাবেতে নিবি পূজা তাই আমি শুনি।

গায়ক—

দিব না দিব না পুজা দিব নাতো আমি,
শুনরে আমার কথা নাগের জননী।
অঙ্গহীন দেবতার পূজা করবো না তা জানি,
কি ভাবেতে হল তোমার চক্ষু আজ কাণী।
কে করিল চক্ষু কাণা তুই হলি বিষহরি,
আবার মহাদেবের কন্যা বলিস সভার ভিতরি
আর একটি কথা আমার মনে পড়ে যায়,
এই আসরে, ও মনসা, দেবে পরিচয়।
কে তোমায় পুজেছে বল তাই পুজব তোমায়,
তোমায় পুজে কি বা বল ফল হবে আমায়।

এবার আমি যাব বাণিজ্যেতে
যা পারিস তুই করিস পাছে।
যাব আমি সিংহল বাণিজ্যে।
তবে অল্পে অল্পে ক্ষান্ত করি
শোন বলি, রে বিষহরি!
চাঁদ বদনে চাঁদের মুখে বলুন হরি হরি।

পুনঃ ধুয়া—

কথার ভাব না জেনে ভব সাগরে নামলে কেমনে,
নামলে কেমনে, তুমি নামলে কেমনে—।

প্রশ্ন— শোন বলি ও মনসা অল্পে অল্পে জানাই ভাব,
এই আমার মনের আশা, আজ বলে যাই তোমারে গো,
কোন খানেতে ও মনসা তোমার ছয় পা হয়েছে,
আজ বলে যাবে এই আসরে সভারই মাঝারে গো।
বললাম কথা তোমার কাছে, মিথ্যা কিছু নয় গো এতে,
পদ্মাপুরাণে আছে সর্বলোকে জানে গো।
তবে এই পর্যন্ত চাপান দিয়া আমার সাঙ্গ হয়ে গেল,
একবার চাঁদ বদনে চাঁদের মুখে হরি হরি বল।

১ম পক্ষ (মনসার) ধুয়া—

পূজা দিলি না, ওরে চাঁদ, তুই করলি অপমান গো।

গায়ক— যারে যারে চাঁদ বেনে তোর মুখে পড়ুক বাজ গো,
দেখবো দেখবো, চাঁদ বেনে, তুই কত শক্তিমান গো।
সপ্ততরী বুড়ুক তোর কালীদহেরি মাঝারে গো,
আজ ছয় পুত্র মরবে চাঁদের ছয় বৌ করব রাঁড় গো।
যে অপমান করলি, চাঁদ, আর বা কারে বা কবো,
কালীদহের মাঝে তোরে শেষে বুঝে নেব।
তবে এই পর্যন্ত আমার কথা ক্ষান্ত করে যাই,
মা মনসার নামে হরি বলিবেন সবাই।
শক্তিরূপা মা জননী তোমরা কেন ভোলো,
আজ মা মনসার নামে একবার হরি হরি বোল।

গায়কের প্রশ্ন পুনঃ (ধুয়া) :—

চাঁদ বেনে তোর মাথায় ভাঙব ধানে,
দেখব দেখব, চাঁদ বেনে, তুই থাকবি রে কেমনে।
শোন শোন, চাঁদ বেনে, আজ বলি যে তোমারে,
সপ্ত ডিঙার নাম বলিবে আসরের মাঝারে,
সপ্ত ডিঙার কিবা গুণ কিবা তাদের নাম,
বল বল এসব কথা সবার মাঝারে গো।
এই পর্যন্ত দিলাম চাপান তুমি মনে রেখে যেও,
তোমার চাপানের কথা মনে হল।
কোন সময়েতে আমার নাকি ছয় পদ হয়েছে,
জানবি কিরে, চাঁদের পো তুই, বলে যাই তোমাকে
মহাবল হরণ করিতে যে দিন আমি চম্পাই পুরী,
সম্মুখে দেখিলাম আমার চাঁদ অধিকারী।
শোন শোন, বেনের পো, তুই বুঝাব কেমন করে।
সহসা সে হরের কন্যা সে কত মায়া ধরে॥
বারে বারে পুজার জন্য কত সেধেছি তোমারে,
ও তুই দিলি না পুজা দেবী মনসারে।
পুজা না দিয়ে, চাঁদ, তুই করলি অপমান,
সেই অবধি ফিরে গেলাম নেতার বিদ্যমান।
শ্বেত মাছির রূপ ধরে যখন আসিলাম এখানে,
নেতা আমার সঙ্গে এল মোহিনীর ছলে,
বিরক্ত হইয়া চাঁদ তুই মারলি হেন্তাল ছুঁড়ে,
মাছির মূর্তি ত্যাগ করি লইলাম হেঁতালে।
হস্তে লয়ে হেন্তাল বাড়ী ধায় ঊর্ধ্বশ্বাসে,
ভেবে তুমি দেখ যদি তোমার মনে কিছু আছে।
কবে তুমি দেখ, চাঁদ, আমি মাছি মূর্তি ধরে,
ছয় পদের পরিচয় দিলাম আসরের ভিতরে।
এই পর্যন্ত আমার কথা সাঙ্গ হয়ে যায়,
মা মনসার নামে হরি বলিবেন সবাই।

২য় পক্ষ (চাঁদ) ধুয়া—

ডিঙা ভাসাও, হে মাঝিগণ, আজি বলে হরি হরি,
হরহে বিপদবারণ, এই বিপদে করি স্মরণ,
আজ কৃপা করে তোমার চাঁদরে কর আজ উদ্ধার হে

গায়ক— আজ বাণিজ্যেতে যাব আমি শোন বিষহরি,
শিব-শম্ভুর নাম আমি করিলাম স্মরণ,
বিপদে করিবে রক্ষা দেব পঞ্চানন।
প্রথম ডিঙির নাম নামে চন্দ্রকলা,
দ্বিতীয় ডিঙির নাম পবন-তনয়
বিনাপালে চলে ডিঙা পবন বেগে ধায়।
তৃতীয় ডিঙার নাম মনে এবার হল,
তৃতীয় ডিঙাতে আছে, আছে তিনটি কোণা,
তিন দেবতা থাকে তাতে নাম ত্রিলোচনা
প্রথম কোণেতে থাকে শিবশম্ভু মোর।
দ্বিতীয় কোণেতে থাকে দেব চক্রধর,
তৃতীয় কোণেতে থাকে দেব চতুর্মুখ।
এই তিন দেবতা লয়ে বাঁধিলাম বুক।
চতুর্থ ডিঙার কথা মনে এবার পড়ে,
যে ডিঙা দিল মোরে দেব পঞ্চাননে।
পঞ্চমুখী ডিঙাবলী নাম রেখেছি আমি,
পঞ্চম ডিঙার কথা সভাস্থলে বলি।
পঞ্চম ডিঙার আছে অপুর্ব কাহিনী
হেন্তাল সহ দিল ডিঙা দেবী ভগবতী।
কেমনে আসিবি তাতে তোর ক্ষমতা নাই,
তারপরেতে ডিঙার কথা তোরে বলে যাই।
এই ডিঙার নাম মোর আছে মধুকর,
যে ডিঙায় থাকে আজি চাঁদ সদাগর।
ছয় ডিঙার নাম আমি আসরেতে বলি,
আর এক ডিঙার নাম এখনো আছে খালি।

এই ডিঙার নাম আমার নামে ত্রিপুরারি,
এই ডিঙায় ঘুরি সদা চম্পাই নগরী।
আমার ডিঙার নাম আসরেতে হল,
চাঁদের নামেতে একবার হরি হরি বল।
আর একটি কথা আমার মনে পড়ে যায়,
সাধ্য কিরে, ও মনসা, আসিবে হেথায়।
এই পর্যন্ত দিলাম ক্ষান্ত চাঁদের কাহিনী,
চাঁদ বদনে সবে মিলে বলুন হরি হরি।

পুনঃ ধূয়া—

সাধ্য কি, ও মনসা, তুই তরী আজ ডুবাবি গো।
শোন শোন, ও মনসা, আজ বলি যে তোমারে।
যাওয়ার সময় কিছু কথা মনে আমার পড়ে।
বলব কথা সভাস্থলে কথা মিথ্যা নয়,
এইবারে দিবে, মনসা, তোমার চোখের পরিচয়।
একেতো ত্রিনয়না কেন এক চক্ষু কাণা,
কে করিল কাণা আজ সভাতে জানাও গো,
একে তুমি নারী জাতি, চক্ষুও তোমার অন্ধ অতি,
পুজা নিতে এলি তুই চাঁদের বাড়ীতে গো।
তবে যাক যাক বেশী কিছু বলার দরকার নাই,
এই পর্যন্ত দিলাম ক্ষান্ত আজ সভাতে জানাই।

১ম পক্ষ (মনসা) ধূয়া—

কোথায় পবন-নন্দন বিপদে করি স্মরণ,
ত্বরা করি এস আজ হেথায় গো।

গায়ক— যাওরে যাওরে পবন কুমার কালীদহের মাঝে,
চাঁদ বেনে গিয়েছে আজি বাণিজ্যের আশে গো।
প্রত্যেক ডিঙাতে আছে তার শিবলিঙ্গ অতি,
সেখানে যাওয়ায় আমার নাহিক শকতি।
এতেক বলিল যদি দেবী পদ্মাবতী,
শিবলিঙ্গ লয়ে এল হনুমান অতি।

দেখব দেখব, চাঁদবেনে, তুই কত শক্তি ধরিস,
এইবার লবো আমি কালীদহেরি মাঝারে।
এত বলি যায় মনসা নেতা যেথা আছে,
আস্তে ব্যস্তে কহে গিয়া নেতার ওই কাছে।
শোন বলি, নেতা, তুমি চলেছে আজ চাঁদ ধনী
পূজা নিবার উপায় আর কি আছে ?
এতেক শুনিল যদি নেতা ঠাকুরাণী,
শোন শোন, ও মনসা, এক অপূর্ব কাহিনী।
কি ভাবে ডুবাবে তুমি চাঁদের মধুকর,
বিশ্বকর্মার নিমিত সেই অতি মনোহর।
যে পরিমাণ জল আছে কালীদহের মাঝে,
তারও দুইগুণ ডিঙা চাঁদের তৈরী আছে।
এতেক শুনিল যদি দেবী পদ্মাবতী
গঙ্গারি নিকটে যায় অতি দ্রুতগতি
গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে দেবী পদ্মাবতী,
আসিল তখনি গঙ্গা কালীদহের গতি,
তিনগুণ জল বাড়ে কালীদহের মাঝে,
দেখব দেখব, চাঁদ বেনে, তোর এবার কেবা আছে।
পবন পবন বলে পদ্মা করিল স্মরণ।
কালীদহের মাঝে ডিঙা দিল বিসর্জন।
এই তো চাঁদ শক্তিধর আজ্ঞা বুদ্ধি কেন হর,
আজ ছেড়া কাঁ্যাথা গলে লয়ে নগরেতে ঘোর।
এই পর্যন্ত দিলাম ক্ষান্ত মনসার কাহিনী,
মা মনসার নামে একবার বল হরি হরি। —মুর্শিদাবাদ

১৩

ধূয়া— কালিন্দীর বিষের তেজে প্রাণ বুঝি যায় গো।
উঠ উঠ, প্রাণনাথ, আর কেহ নাই গো॥
পয়ার—মাগো, মনসা মঙ্গল কবি বিষ্ণুপ্রাণে গায় গো॥
মাগো, কাক কাঁদে কোকিলা কাঁদে আর কাঁদে মা গো

মাগো কিনা সাপে খেলে যাদু অঙ্গ জলে যায় গো ॥
মাগো কাল সাপের কালকুটা বিষ তাই করেছে সার গো ॥
মাগো সোনার আঁচির সোনার পাঁচির সোনার বাসর ঘর গো ॥
মাগো তিন দিনকার বাসি মড়া রহিল বাসরে গো ॥
মলাম মা মনসা লেজের জলনে গো।
ব্যথা দূর কর, মাতা, চরণে ধরি গো ॥
মাগো ভাসিতে ভাসিতে যাবে উজানী নগর গো।
মাগো ভাসিতে ভাসিতে যাবে কালীদহের কূল গো ॥
মাগো ঢেঁকির মত কালী নাগ তার কুলার মত ফণা গো ॥
মাগো বেহুলা সুন্দরী ভেবে বলে আমার কেহ নাই গো ॥
মাগো সিদ্ধ হ'ল শরীর রে শূন্য হল কাল গো ॥
মাগো ধূপ ধূনা মণি মন্তর নই বিধি সাজাবে গো ॥ —ঐ

১৪

ও মা যশোদে দেখে যা কানায়ের রীতি,
কালীদহে ফুল তুলিতে নেমেছে কতি।
মস্তকে ময়ূরের পুচ্ছ বাঁধন-ছাঁদন দড়ি,
আজ দধিয়া মন্থনা করে যশোদা রোহিণী।
নাম ওরে মাখন চোরা কৃষ্ণ নীলমণি,
অধিক বেলা হইলে বাপ না উঠিবে ননী।
হায়রে গৌরাঙ্গের মণি কি ভাবে উঠিল,
শ্যামলী ধবলী বলি হাঁকিতে লাগিল ॥
কৃষ্ণ আদির কথা কিছু শুন দিয়া মন,
আজ গোধেনু চরাতে রাখাল এসেছেন গোকুল।
তৃষ্ণায় আকুল ব্যাকুল হোল যতেক রাখাল,
সবাই বলে ভাই কানাই কোথায় পাবো জল।
শুনে কথা কৃষ্ণ তখন হাস্যমুখে কয়,
জল খেয়ে এসো গো ভাইরে তোমরা কালীদয়।
বাছুরী চরান রাখাল পাঁচন লয়ে হাতে।
জল খেতে যান রাখাল হাসিতে খেলিতে ॥

কালীদহের জল দেখে হরষিত মন,
অঞ্জলি পুরাইয়ে জল করিলেন ভক্ষণ।
বিষজল খেয়ে রাখাল ত্যজিল জীবন,
একা গোষ্ঠে বসিয়ে ভাবেন যাদুমণি,
এত দেরী রাখালের আজ শব্দ নাহি শুনি।
পীতধড়া পরিধান করলেন যাদব রায়,
ভাই ভাই বলিয়া কানাই উৰ্দ্ধমুখে ধায়।
মরেছিলো যত রাখাল ক'রে বিষপান,
কৃষ্ণচন্দ্র গিয়ে তাদের দিলেন প্রাণদান।
ভয়েতে বঞ্চিত হরি যারে লাগি ভয়।
আজ হরি বলে ঝাঁপ দিলেন সে কৃষ্ণ কালীদয়।
কালীদহে ঝাঁপ দিয়ে বীর বিষ করিলেন দর্প।
সেই কথা শুনিলেনও কালনাগিনী সর্প।
গোকুলেতে থাকি আমি রাখালের ঠাকুর,
আয়রে, কাল-নাগিনি, তোর দর্প করব চুর।
শ্রীদাম তখন দৌড়াদৌড়ি মায়ের অগ্রে কয়,
আজ তোমার হরি রামকৃষ্ণ ডুবেছেন কালীদয়।
কি কথা শুনালি, শ্রীদাম, আরও বলি শোন,
আজ শুক্‌না কাষ্ঠেতে যেন জ্বালালে আগোন।
কাহারও করি নাই মন্দ, সকল করি ভাল,
কোন অপরাধে কৃষ্ণ আমায় ছেড়ে গেল।
নাহি পরে বসন রাণী নাহি বাঁধে চুল,
কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন কালীদহের কুল।
বুদ্ধি কেন হর কৃষ্ণ, বুদ্ধি কেন হর,
(আজ) সাঁওতালি পর্বতে গরুড় স্মরণ কর।
এল, এল গরুড় বীর গো, মারো পাকোসাট,
কাদাপানি শুকাইল ঠাঁই হোল মন ডাট।
দু'টি পদ তুলে দাও, বাপ, নাগিনীর ঐ মাথে,
কত ফুল চাও, বাবা, তুলো দু'টি হাতে।

আমারও দুঃখের কথা বলো মায়ের ঠাঁই,
(আজ) বিষের জ্বালাতে কাল হলেম রে কানাই ।
কাল, কাল কানায়ের পু গিরি বাঁধা মাথে,
শুক্ল বস্ত্র পরিধান বাঁশী নাওরে হাতে ।
কালিন্দীর জল ছিল রে ভাই, অমৃত জল হ'ল,
কালীদহের মরণে বিষ কালীদহে মলো ।
দোহাই গো মা কামরূপ কামিক্ষাশ্বেরী,
সভাজনে চাঁদ বদনে বলুন হরি হরি ॥
নামটি আমার অহীভূষণ মহুলাতে বাড়ী,
আমারও ওস্তাদের নাম তাঁরে স্মরণ করি ॥ —ঐ

১৫

ধুয়া : ওমা যশোদে মেরেছে তোর ছেলে, সত্যি কথা বল গো খুলে
মথুরায় জন্মিলেন কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের বালা ।
আজ ষোলশো রমণী লয়ে দিনে করে খেলা ॥
ষোলশো রমণীর মধ্যে রাধে মোহন ছিল,
কক্ষেতে কলসী নিয়ে জল আনিতে গেল ।
জল ভর, জল ভর, রাধে, বিরস কেন মন,
আজ আমারে ছাপিয়ে রাখ গুটিক রাজার ধন ।
গুটিক রাজার ধন, কানাই, আপনি রাখ ঢেকে,
আজ তোমার মত নাগর, কানাই, কে আনিল ডেকে ।
আমারে কে ডাকবে, রাধে, এসেছি আপনি,
আজ আমারে দেখিয়ে, রাধে, বেজার কেন তুমি ।
বেজার কেন হব, কানাই, বেজার কেন হব,
যে কথা বলেছ তুমি কাহারে জানাব ।
লোকে বলে ছেলে কানাই, ছেলে এমন হয়,
পথে ঘাটে দেখা হ'লে নানা কথা কয় ।

১৬

কি জানি, মাগো, কাহার পাপে সদাগরকে অভিশাপ দিলে,
ভস্ম যেন তুমি হোয়ো ॥

ওমা গো, একদিন তুমি নীচের ঘরে জন্ম নিয়ে বসেছিলে,
সেই নাকি গো রাগ করে মনসার চোখ কানা করিলে, ও মা মনসা।
কি জানি কোন রাগের ছলে ঝাঁটার খিল পেয়েছিলে,
সে খিলেতে চোখকানা, ওগো, তুমি যে করিলে, ও মা মনসা॥

১৭

আমার প্রাণ থাকিতে তোমার পুজা দিব না, ও মা মনসা॥
যাই বল তাই বল, মাগো, তোমার পুজা দিব না॥
বাম হস্তে পুষ্প নিয়ে তোমার চরণে পুষ্প দিয়েছিলাম॥
সেই রাগেতে পুড়ে কানি মনে প'লো অনেক শুনি,
ছয়পুত্র দিলে বিসর্জন॥
সাত পুত্র বাণিজ্যে যাই, মায়া হনু করে তাই, পাঠালে সেখানে॥
এই কি গো তোমার লীলা বুঝলাম তোমার ছলনা,
ও কাণি, তোমার পুজা দিব না॥ —ঐ

১৮

আমি ডুবাব গো ডুবাব,
তোমার পুত্রগণে ডুবাব।
আমি নাকি কানি বলে তুমি ইঙ্গিত করেছিলে॥
বাম হস্তে পুষ্প নিয়ে আমার পদে দিয়েছ,
বংশে দিতে বাতি রাখবো না কোন মতে॥
সওদাগর তোমার সঙ্গে করেছি রে পণ,
কত সৈন্য সামন্ত নিয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে॥
পদে ধরে করিবে রোদন।
ভুলবো না আর সে কাহিনী মনে আছে জানাজানি॥
দেখি তুমি কোন মতে পালাও রে এবার॥ —ঐ

১৯

রাবণ যাসনে, গো করি মানা পঞ্চবটীতে,
সীতা দেবীর রূপ দেখিলে পারবিনে ভুলিতে॥
সেখানে আছে দু'জন জটাধারী, তাদের আছে সুন্দরী নারী,
তারা আছে বনেতে॥

শূর্পণখা বলে, দাদা, শীঘ্র করে যাও গে সেথা।
নাক কান কেটেছে আমার নাই কি মনেতে ॥
শুনে শূর্পণখার কথা মারীচকে ডেকে বলে তথা,
মায়ামৃগ হওগো তুমি পঞ্চবটীতে ॥
মারীচ চলিল বনে রাম-লক্ষ্মণ আছে যেখানে,
মায়ামৃগ হয়ে তখন চলিল ধেয়ে ॥
মায়ামৃগ ধরিতে রাম বনে প্রবেশিল তখন
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলে মৃগ ডাক দিল তিনটে ॥
ডাক শুনে সীতাদেবী বলে লক্ষ্মণে
তোমার দাদা পড়েছে বিপদে যাওনা তুমি বনে।
সীতা দেবীর কথা শুনে লক্ষ্মণ বনেতে চলিল,
যোগী বেশে রাবণ এসে রথ লাগাইল।
সীতাদেবী গোলকের বাইরে এলে
রাবণ তাকে তুলে নিলে।
নদীর তীরে জটায়ু যে ছিল,
তার সঙ্গে শূন্যে রাবণের লড়াই হল।
রাবণের ছোরার আঘাতে জটায়ু মরিল,
সীতাকে নিয়ে রাবণ তীরবেগে লঙ্কা ছুটিল।
এইখান থেকে সাঙ্গ করি করবোনাক বেশী দেরী
বিরুদ্ধ পার্টি কি বলিছে শুনিবে দশেতে ॥ —ঐ

২০

পুজা না পেয়ে দেবী মনে দুঃখ ভারি।
পিতারে জানায় গিয়ে আপন দাবী ॥
সদাগর না পুজে মোরে বলি তোমারে।
ধীরে ধীরে কয় দেবী অতি রোষ ভরে ॥
পুজা যদি না করে মোর এবার ঐ রাজা।
এবার কিন্তু দেবো আমি বড় কঠিন সাজা ॥
বাসর ঘরেতে খাব সোনার লখিন্দর।
শোন শোন শোন, পিতা, ওগো গঙ্গাধর ॥

শুনিয়ে তখন ওগো মনসার বাণী।
চিন্তিত হলেন বড় গঙ্গাধর যিনি॥
ধীরে ধীরে কন্যারে কহেন পঞ্চানন।
ক্রোধ না কর গো, মাতা, শোন না বচন॥
পুজা তোমার হবে, মাগো, ভেব না অন্তরে।
করিবে তোমার পুজা এ তিন সংসারে॥
কোন কথা নাহি শোনে নাহি হয় স্থির।
ক্রোধ ভরে চলে গেল হইয়া অধীর॥

আদেশ : কালি যা রে যারে করিতে দংশন।
আজকে রাতে আমার কথা না হবে লঙ্ঘন॥
একবার দুইবার তিনবার ডাকে।
যত সব নাগগণ এসে ওঠে কাঁকে॥
আদেশ করেন মনসা জাতিনাগ ছিলেন যে জন।
যাওরে, বাছা, যাওরে যাওরে, বাছা, লখিন্দর কারণ॥
সাঁওতাল পর্বতে দেখ লোহার বাসর ঘর।
সেথায় দেখ বাসর জাগে বেহুলা-লখিন্দর॥
বেহুলারে না করে ঘা লখিন্দরে খাও।
আমার আশা আজকে তুমি মেটাও রে মেটাও॥
শুনিয়ে তখন সে মনসার বাণী।
ধীরে ধীরে যান তখন পাষণ্ড ফণী॥
সাঁওতাল পর্বতে গিয়ে উঠিল যখন।
লোহার বাসর ঘর দেখে চমকিত মন॥
ধীরে ধীরে প্রবেশিল সুড়ঙ্গ পথে।
বেহুলা-লখিন্দর শুয়ে আছে দুজনাতে॥
লখীন্দর গো নিদ্রা যায় বেহুলা রয় জেগে।
সর্প দেখি বেহুলা প্রার্থনা যে মাগে।
খেওনা খেওনা, ওগো, আমার পতি ধন।
ভিক্ষা মাগি তব কাছে পতির জীবন॥

ফিরে যাও গোখরো তুমি যাও গো এখন।
ধীরে ধীরে ফিরে গেল না করে দংশন॥

প্রতিশোধ : ক্রোধে জ্বলি দেবী কয় ফণীরে তখন।
মম বাক্য লঙ্ঘনকারীকে ত্যজি অনুক্ষণ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে দেবী কালকূট যে জন।
ত্বরা করি এসে দেখা দিল গো তখন॥
ধীরে ধীরে বলেন দেবী পূর্ব বিবরণ।
ত্বরা করি যাও গো, বাছা, লখীন্দর ভবন॥
শীঘ্রগতি গেল তখন কালকূট কাল সাপ।
সাঁওতাল পর্বতে উঠি ছাড়িল সে হাঁপ॥
নিশি ভোরে ঢোকে কাল, ঢোকে লোহার ঘরে।
দুই জনেতে নিদ্রা যায় অঘোরে ও ঘরে॥
কালিনাগ যায় গো তখন লখাই চরণ পাশে।
কি দোষে দংশিব আমি এরে বিনা দোষে॥
মশার রূপ ধরি কালি বসে তার পায়।
এক দুই তিন লাথি পড়িল তার গায়॥
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র গো সাক্ষী থেক তুমি।
বিনা দোষে না দংশিল সেই কাল ফণী॥
শীঘ্র করি এসে বলে আস্ত বিবরণ।
কোলে তুলে নিলেন দেবী পুলকিত মন॥ —ঐ

২১

কালীদহে ঝাঁপ দিলেন দয়াল যাদুমণি।
একে একে বেড়ে ধরেছে একশো নাগিনী॥
গাই গোখরো সেজে এলো কেউটে মারে ছোঁ,
ও ভাই মেচওয়ালা সেজে এল, আকাশ প্রমাণ কালো,
দন্তধরা ঘুরঘুরে খেঁকার।
ড্যাঙ্গায় হতে বলে রে, ভাই বলাই রে, কানাই,
ও ভাই বুদ্ধি কেন হর॥
সময়ে আছে গরুড়-বীর তাহে স্মরণ কর॥

অতি ধীরে ধীরে কৃষ্ণ ধীরে করে রা।
গরুড়ের মাথায় পড়লো টনকের ঘা॥
আসিলেন তো গরুড় বীর মারিল পাকসাট্।
কাদা পানি শুকাইল ধূলো হ'লো নাশ॥
শাঁখিনী, চিতিনী সাপের বুক দুর দুর করে,
সাপের মাথায় জ্বলে মণি।
হেন সাপ খেয়ে গরুড়ে বিষ করেছে পানি॥
শুন কৃষ্ণ দেবের বাণী!
ঘা চাইতে নাই লো বিষ ফুঁয়ে করুম্ পানি॥ —বর্ধমান

২২

মলো মলো বেনের পো লকিন্দার বালা।
কাল সাপে কালকুটের বিষ তাই করেছে জ্বালা॥
শোনে আকুল ব্যাকুল হলো বেহুলা বেনের ঝি।
উচ্ কপালী প্রভু খেলি, কাজ করিলি কি॥
কাঁদে মনসা তোর শাশুড়ী চারিদিকেতে চায়।
না শুনে কথা হৃদয়ে ব্যথা প্রভু লয়ে যায়॥
দুপুর বেলায় চাঁপাতলায় গেলেন বেহুলার শোকে।
মাথার উপর ওড়ে কাগা, কাগা বলিয়া ডাকে॥
হাতে হতে আংটী নিয়ে ফেলে দিলেন তাকে।
সায়া বেনেনী কমলা মাকে দিলেন তাহাকে।
মোর দেবতা বটে, মনসা, মুই হবো তোর দাসী।
কালসাপে কালকুটের বিষ করবো ভস্মরাশি॥
হর হর হর বিষ ভাই ফিরালো ঘরে।
ত্রিমতি স্মরণে বিষ নিবারণ করে॥ —ঐ

ঝুমুর—কৃষ্ণলীলা

ছোটনাগপুরের পূর্ব সীমান্তবর্তী যে অঞ্চল ক্রমশঃ পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার আদিবাসী সমাজে যে নিতান্ত সহজ এবং সরল প্রকৃতির লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত একদিন প্রচলিত ছিল,

তাহাতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইবার ফলে রাধাকৃষ্ণের নাম গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিবার পর হইতেই এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার ফলে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচনার অনুকরণে এক শ্রেণীর লৌকিক পদাবলী রচিত হইয়াছিল, তাহাও ঝুমুর নামেই সাধারণ ভাবে পরিচিত ছিল। আদিবাসীর সঙ্গীতের নাম ঝুমুর। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লৌকিক পদাবলীর সঙ্গে আদিবাসীর ঝুমুর অন্তর ও বহির্মুখী নানা পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া সত্বেও তাহা ঝুমুর বলিয়াই পরিচয় লাভ করিল। ক্রমে দেখিতে পাওয়া গেল, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচনার যে একটি বিশিষ্ট রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতেও বাহিরের দিক হইতে সেই রীতিকে অনুসরণ করা হইতেছে। ইহার সঙ্গীতে যে সুর ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তাহা বিশুদ্ধ কীর্তন গানের কোন সুর কিংবা রাগরাগিণী নহে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা কীর্তনের সুর ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই ভাবে এই অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এক নূতন পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিল ; বৈষ্ণব পদাবলীর সর্ববিষয়ক অনুকরণ করিতে গিয়া ইহার মধ্যে কোন মৌলিক বিশেষত্ব প্রকাশ পাইবার সুযোগ পাইল না। অনুকরণের মধ্যেই ইহার সকল প্রয়াস সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর অনুকরণে ইহাদের মধ্যে কোন কোন কবি তাহাদের নিজ নিজ নাম ভণিতা রূপেও ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন ভণিতা ব্যবহার ব্যতীতও এই শ্রেণীর পদ রচিত হইয়া লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যও রক্ষা করিল। তবে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর প্রভাব ইহার কেবল মাত্র বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল, তাহা ইহার অন্তরঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না। ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ উত্তরাধিকার নহে, কারণ, উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ হইতে হইলে ইহার ভাব এবং রূপ উভয়েরই উত্তরাধিকারের কথা আসে, কিন্তু ইহাতে ভাবের দিক দিয়া কোন উত্তরাধিকার স্থাপিত হইতে পারে নাই ; এমন কি, রূপ এবং আঙ্গিকের দিক হইতেও বৈষ্ণব পদাবলীতে যে ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে তাহা ব্যবহৃত হয় নাই ; অথচ ইহাতে আদিবাসী ঝুমুরের সহজ বাংলা ভাষাও ব্যবহৃত হয় নাই। বরং তাহার পরিবর্তে অলঙ্কার-সমৃদ্ধ বাংলা গীতিভাষার বিশিষ্ট একটি রূপ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঝুমুর গানগুলির রচনার দিক দিয়া লৌকিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ না হইলেও ব্যক্তির রস ও শিল্পচেতনার স্পর্শ ইহাদের এখানে সেখানে মুদ্রিত হইয়াছে; অর্থাৎ ইহাদিগকে অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহারা সামগ্রিক ভাবে লোক-মানস হইতে সৃষ্ট হইবার পরিবর্তে ইহারা রচনা-কর্মের দিক দিয়া কোন কোন সময় যেন ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি। এই ধারাই অনুসরণ করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখা গেল, ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ প্রত্যেকটি পদ রচয়িতার পরিচয়-জ্ঞাপক এক একটি ভণিতা বা কবির নামও আসিয়া যুক্ত হইতেছে। ইহা লোক-সঙ্গীতের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। লোক-সঙ্গীত ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা মুদ্রিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহা ব্যক্তিবিশেষের নামে সমাজে প্রচার লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ঝুমুরের সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যে সকল ঝুমুর গানের মধ্যে পরবর্তী কালে ব্যক্তি-বিশেষের ভণিতাও যুক্ত হইয়াছে, তাহাও লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত হয় নাই ; কারণ, এই অঞ্চলের লৌকিক রস-চেতনার উপর ভিত্তি করিয়াই ইহারা রচিত হইয়াছে ; কোন আলঙ্কারিক বন্ধনকে ইহারা স্বীকার করে নাই। সেইজন্য এই অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র এই শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ যে গীত-রীতি ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রাচীন (calssical) বৈষ্ণব পদাবলীর গীত-রীতি নহে, এই অঞ্চলেরই লৌকিক গীত-রীতি। রাধাকৃষ্ণের নাম ইহাদের সঙ্গে সংযুক্ত বলিয়াই ইহাদিগকে পদাবলী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না, ইহাদিগকে লৌকিক পদাবলী বলা যাইত ; কিন্তু সেইভাবে ইহাদিগকে উল্লেখ করা হয় না, ইহাদের সম্পর্কে লৌকিক নামটি অর্থাৎ ঝুমুর এই নামটি বিসর্জিত হয় নাই। ভণিতার ব্যবহার অবান্তর মাত্র, ইহা দ্বারা বিশেষ কোন সঙ্গীতের সাম্প্রদায়িক কিংবা গোষ্ঠীগত পরিচয় বুঝায় না, ইহা এই অঞ্চলেরই গানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এ' কথা সত্য, আদিবাসী ঝুমুর যেমন বাস্তব জীবন ভিত্তিক স্বাধীন গীত-রচনা ছিল, ইহাতে তাহার পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণলীলার সুনির্দিষ্ট ধারাটি প্রবেশ করিয়া ইহার স্বাধীন প্রেমবোধ বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী যে একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করিয়াছে, ইহাও সেই ধারাকেই বাহ্যতঃ স্বীকার করিয়া লইয়াই সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়াছে। তাহার

ফলেই ঝুমুরের ক্রমবিকাশের ধারা এই পথে আসিয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে আদিবাসীর জীবন হইতে ঝুমুরের যে স্বাধীন রূপ একদিন বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা একটি নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করিয়াও যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল, তাহার ক্রমবিকাশ কেহই রোধ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র যে ধারাটি বৈষ্ণব সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে রাধাকৃষ্ণের লীলাকুঞ্জে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই ক্রমবিকাশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভণিতার জন্য ইহাদের বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই, যদি ইহাদের বিলুপ্তি ঘটে, তবে কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণ কাহিনী এবং অলঙ্কারযুক্ত ভাষার কৃত্রিমতার জন্যই ইহাদের বিলুপ্তির আশঙ্কা করা যায়। কারণ, পুর্বেই বলিয়াছি, একান্ত আঞ্চলিক ঐতিহ্যের উপরই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া একান্ত ব্যক্তিরসচেতনার উপর ইহাদের জন্ম হয় নাই। সেইজন্য কেবলমাত্র ভণিতার জন্যই ইহাদের লোক-সঙ্গীতের যে গুণ, তাহা বিনষ্ট হইতে পারে নাই। তবে এ'কথা সত্য, আদিবাসী ঝুমুরের যে সংক্ষিপ্ততা এবং ভাষার দিক দিয়া যে নিরলঙ্কারতা দেখা যায়, তাহা বহু পুর্বেই বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্কে আসিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল ; ভণিতাযুক্ত ঝুমুর গানই আকারে দীর্ঘতম, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের এই সর্বশেষ ধাপে আকারের দিক দিয়া ইহারা দীর্ঘতম রূপ লাভ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত নিদর্শনগুলিই ইহার প্রমাণ।

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচনার সমান্তরাল ভাবে যে বাংলার সমাজে একটি লৌকিক পদাবলী রচনার ধারাও প্রচলিত ছিল, এই সংগ্রহগুলি তাহারই নিদর্শন। ইহাদিগকে এখানে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচনার ক্রম অনুসারে উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী ইহা রচিত হয় নাই, সুতরাং গৌরচন্দ্রিকা, পুর্বরাগ অনুরাগ বলিতে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র যাহা বুঝিয়াছে, ইহাতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

গৌরচন্দ্রিকা

১

এসো গৌর হে, গৌর হে গৌর হে,
তোমার ভাই নিতাইকে
সঙ্গে লয়ে একবার এস হে।

তোমার কাঙ্গাল কাছে একবার এসো হে।
তোমার সাঙ্গ পাঙ্গ লয়ে একবার এস হে।
রাধা নাম জপিয়ে গোরা পরম যতনে
সুরধুনী ধারা বহে দুটি নয়নে।
ধারায় ধরা ভেসে যায় গো
আমার শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন ধারা।
দুখানি করে তেমনি করে বাঁশরী বাজায়॥

—বেলপাহাড়ী, (মেদিনীপুর)

২

যখন জনমিলি, নিমাই, নিম তরুতলে।
হয়ে কেন না মরিলি না করিতাম কোলে॥
না করিতাম কোলে, নিমাই, না করিতাম কাঁধে।
অভাগিনী মায়ের দুগ্ধ না নিতাম চাঁদমুখে॥
নিমতলে জন্মিলি, নিমাই, নিম মালা গলে।
মা বলিয়া ডাকলে, নিমাই, সকালে বিকালে॥
পণ্ডিতা হইলে, নিমাই, লোকে বলে দরদী।
এমন সুজন হলে, নিমাই, মাকে কেন ছাড়িলি॥
পনর বৎসর, নিমাই, তোর না পড়িল রে।
চৌদ্দ বৎসরে সন্ন্যাসী সাজিলি রে॥ —ঐ

৩

গৌর গৌর গৌর আমার, আমি কুথা গেলে পাব,
গৌর পথের পথিক যারা, আমি তাহারে শুধাব।
গৌর আমার হৃদয়মণি,
গৌর সে তো উদাসিনী হয়ে আমি যাব।
গৌর আমার দুঃখহরা, অধরা মন যায় না ধরা,
অধরায় ধরা গোরা, আমি অধরায় ধরিব।
গৌর আমার কোথায় কোথায় কোথায় গো।
কোথায় আমি করবো নইলে আমি যেয়ে গো,
শেষে আমি প্রাণ ত্যজিব।

গৌর আমার কুলের তরী যাচি কুল অবতারি,
লগনে কয় ভারিভুরি,
আমি আর না মানিব ॥ —ঐ

ভজ গৌরাঙ্গ কর সাধু সঙ্গ
কত আনন্দময় পুরী হে,
নিতাই কদমের বৃক্ষের তলে বইসে রে।
গৌর হরি নাম বল বল রে ॥
দেহ নহে মোর ভোজের বাজি, বলে কলে চলে
যেমন লুনের গাদায় জল সামালে
আপনি যায় গলে রে।
বড় ঘর বড় বাড়ী মিছাই আশা রজনী প্রভাত হইলে,
পক্ষী ছাড়ে বাসা রে ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি পল্লী হইতে সংগৃহীত হইলেও আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত ;

এবার নাম এনেছে দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার,
(তাই) প্রাণ-যমুনা বান ডেকেছে আনন্দ অপার
তোদের লাগি এনেছি রে,
এবার সবার হাত ধরে করবো সব পার।
নাম এনেছে দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার ॥
নাম এনেছে শঙ্কা হরণ
আয় কে লবি অভয় শরণ
সব জীবের জীবন আমি জীবন-কর্ণধার ॥
নাম বিলাব ঘরে ঘরে
প্রেমে জীবন দিব ভরে
এবার পরশমণির পরশ পেয়ে ঘুচবে অন্ধকার।
নাম এনেছে দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার ॥

মহাশক্তি নামে ভরা
সর্ব দুঃখ দৈন্য হরা
নামে জাগবে এবার বসুন্ধরা এ ভব সংসার।
এবার নাম এনেছে দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার॥
নামের নিশান উড়িয়ে দিয়ে
চলব তোদের সাথে লয়ে
এবার বিশ্ব জুড়ে রাচব রে আনন্দের বাজার।
নাম এনেছে দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার॥
দুঃখ কি আর ভাবনা কিরে
দাঁড়া দেখি আমায় ঘিরে,
দে আমারে এক ফোঁটা রে ভালোবাসা তার
নাম এনেছে দয়াল ঠাকুব প্রেমের অবতার॥
আয় ছুটে আয় দুয়ার খুলে
দুঃখ ব্যথা সকল ভুলে
প্রেম লবি আর প্রাণ জুড়াবি
পরবি নামের অলংকার
নাম এনেছে দয়াল ঠাকুর প্রেমের অবতার॥ —ঐ

৭

গৌরাঙ্গ বিহনে প্রাণে মরি,
কোথায়, হে গৌর হরি,
আসিয়া নদীয়াপুরে
সকল পাপী উদ্ধারিয়ে,
গৌরাঙ্গ বিহনে প্রাণে মরি।
এসো হে গৌরাঙ্গ হরি॥ —ঐ

৮

এলো রে চৈতন্যের গাড়ী সোনার নদীয়ায়
নিত্যানন্দ টিকিট মাষ্টার
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনীয়ার
শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে ড্রাইভার সেই গাড়ী চালায়॥

নামটি দয়াময় খ্যাপাময়।
গরীব দুঃখী কি সুবিধা
যেতে কারো নেই কো বাধা,
বিনি পয়সায় টিকিট বিক্রী করে ঐ রামানন্দ রায়॥
ক্ষ্যাপারে ঘণ্টা হল টিকিট কই নিলি,
আসবে শমন করবে দমন, শুন ক্ষ্যাপা মন তাই বলি॥ —ঐ

৯

আহা মরি মরি,
জীবন নিমাই কে তোরে এমন করেছে রে।
নয়নানন্দ চাঁচর চিকুরে কোন্ ঘোরে খুঁড়ে মরেছে রে।
আজানুলম্বিত কর-যুগলে দণ্ড কুমণ্ডল দিল কোন খলে
কে রে পাষণ্ড, দয়া নাই তিলে, বনমালী কে বা নইলে রে।
ওরে দেখে দশা তোরে মায়ের বিদরিছে হিয়া,
বিরলে বসিয়ে কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া চরণ ধরিয়ে কাঁদিছে যতিয়া
দুনয়নে ধারা ঝরিছে রে॥ —ঐ

১০

পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব, হেরবো রূপের নব গোরা,
গৌর পাগল, নিতাই পাগল,
চৈতন্য পাগলের গোড়া।
অদ্বৈত পাগল হয় রসে ডুবে
প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল,
আরেক পাগল দেয় না ধরা,
তারা তিন পাগলে যুক্তি করে
মক্কায় করলে নেমাজ পড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব ভেক নিয়ে
নাম বাড়াল বাউল পাড়া,
গোঁসাই গোবিন্দের বচন পাবি চরণ
জীয়ন্তেতে হবি মরা॥

পরের কেন খাও গো নবনী।
চুরি করার দায় দিয়েছে সব গোপিনী॥
কিবা অভাব আমার বল, গো বাছা, তুমি।
ননী খাওয়া আজ ঘুচাব তোমার সকলে বলে শুনি॥
দধি দুগ্ধ এত করে খাচ্ছ রে তবু তোমার তৃপ্তি নাই,
পরের ধনে কেবা ধনী কার ওরে আমার নীলমণি,
কত লোকে বলে কোথা যাব রাধার বিনোদিনী ;
মনের আশা এই কুয়াসা কহিস নারে কহি তোমার জননী,
কুকর্মেতে আর মন দিস্‌না কোলে এসো, যাদুমণি।
ভণে বংশী কৃষ্ণলীলা ঝুমুর গানে আগমনী॥ —ঐ

আমার কিষ্টর জ্বর হয়েছে পড়ে আছেন একপাশে,
লড়ে না চড়ে না কিষ্ট মা বলেও ডাকে না।
অন্ত্য এলো বৈদ্য রূপে বাঁচাতে, মা হয়ে করেছেন মানা॥
কারো দুয়ার যাব না।
কিষ্টর গলায় পত্তরমালা, ধৃতি বিনে সাজে না॥ —ঐ

ওরে গোপাল আমার ঘুমো রে ঘুমো রে সোনা,
ঘুমো চাঁদের কোণা ;
মুরলী গড়ায়ে দেব যত লাগে সোনা
ওরে গোপাল আমার॥ —ঐ

গোপাল সত্য কথা বল রে মাকে,
ব্রহ্মাণ্ড অতুল কাণ্ড
আমি ব্রহ্মাণ্ড দেখি তোর মুখে।

এ বদনে তোর নানাবিধ নারী,
নানাদেশ গ্রামে নানাবিধ গাড়ী,
কত ছুটছে হস্তী হয়, নানাবিধ গাড়ী ॥
ওরে, উড়ছে ঘোড়া উর্ধ্বমুখে,
সত্য কথা বল রে মাকে ॥
এই বদনে তোর দেখি বিষ্ণুময়,
বিষ্ণু করেন পুজা বিষ্ণু পদদ্বয়,
কত দেবালয়, শিবালয় আর ইন্দ্রালয়
আমি কেন রে দেখি তোর মুখে।
সত্য কথা বল রে মাকে ॥
এমন বিদ্যা কোথায় শিখিল, যাদুমণি,
এই মহীমণ্ডলে যত আছে প্রাণী,
আমি কাল সকলি দেখি তোর মুখে ॥
ঐ বদনে তোর মৃদুমন্দ হাসি,
ঐ বদনে দেখি গয়া, গঙ্গা, কাশী
নানাতীর্থসহ তীর্থ বারাণসী,
আমি সকলি দেখি তোর মুখে।
এই বদনে তোর মেষ মহিষ-গোপাল,
গোচারণ করছে কত তোর মত রাখাল।
তাদের কারো হাতে লড়ি, আর কারো আঁচলেতে মুড়ি,
কেউ বা সারের ঝুড়ি নেয় কাঁখে।
সত্য কথা বল রে মাকে ॥ —ঐ

বাঁধিস্ নে মা জোরে, মাগো, তোর পায়ে পড়ি,
খুলে দে মা হাতের দড়ি,
নইলে, মাগো, চলে যাব দেশ-দেশান্তরি
যমুনা পার হয়ে যাব, পরের মাকে মা বলিব,
বাঁধিস নে মা জোরে ॥ —ঐ

সবাই বলে কালো কালো
আর তোকে কেউ না বলে ভালো,
পরের কথায় মন ব্যথা কেন হও গো বিদর।
আর গিবৃহে আমি রইব না মা তোর ॥
চূড়াটি দে গো বেঁধে মুরলিটি দে গো হাতে,
আজ বিদায় নিয়ে ছন্দ করি আমি যাব মা দূরান্তর
আর গিবৃহে রইব না মা তোর।
আজ পরাণ হয় মা তোর কাতর,
আজ গিবৃহে রইব না মা তোর ॥ —ঐ

৭

ব্রজের বংশীধারী,
ননীচুরি করে কালা রাধানিধি।
চোর এসেছে চোর এসেছে হা হা করে যত ব্রজনারী,
গিয়ে দেখে সবে মিলি ননী খায় চুরি করি,
ত্রিভঙ্গটি করিবারে গো কলঙ্ক করে কুঞ্জবিহারী ॥
ভাণ্ড ভেঙ্গে ক্ষীর সর খায় মাধব চুরি করি।
গৃহকর্মে মজেছিলাম গো মোরা সব কুলনারী ॥
কেমনেতে আসি ছোড়া লো ঢুকিল সাহস করি।
পরে আসিয়ে দেখি তারে মায়ের কাছে রহে চুপ করি।
ওগো রাণী, তোর গোপালের উপদ্রব সহিতে নারি।
এ জালা নিত্যকালের তারে বারণ করে দাও কৃপাকরি ॥
প্রতিদিন এত ক্ষতি করে কালাচাঁদ বড়ই ভারি।
বংশী বলে দয়া করি, রাণী, পাঠাও না রাণীর বাড়ী ॥ —ঐ

৮

ফুলকেশ বেশ ধরি রঙিয়া বালক ঘেরি
তবে ছিল নন্দেরই নন্দন হে,
আইস ভাই প্রাণের কানু, চান্দ মুখে পুরো বেণু
দেখ আমার ধবলী চলিল দূর বনে।

ছাড়ি যাব না, ভাই, তারে,
আজ গোপাল গিয়েছিল, রাঙ্গ বাঁধা পায়ে ছিল ॥ —ঐ

৯

বিন্দাবনে মোহন খেলাম
হইল স্মরণ ওগো মধুর বিন্দাবন
ওঠরে, কানু, লয়ে ধেনু চল রে গোচারণে ॥
তুই না গেলে চলে না, ভাই, ধেনু বসে গোণ ॥
বুকে লয়ে নীলমণি ননী দেয় রে নন্দরাণী ।
বিদায় দিতে প্রাণ গোপালে ব্যাকুল জীবন ॥ —ঐ

১০

খেলা ছাড় ও, কানাই, গগনে আর বেলা নাই,
গোঠের লীলা সাঙ্গ করে ধেনু লয়ে ঘরে যাই ।
ওই মা যশোদা দ্বারে তাই দাঁড়িয়ে তোমার তরে,
ও সে ননী হাতে বসে রয় ॥ —ঐ

১১

হৃদয়লোকে প্রাণ যায় গলিয়া,
আমি থাকব কার মুখ চাহিয়া ।
তোমা বিনে কেমনেতে রহিব প্রাণ ধরিয়া,
আমায় ডাকতে কেহ নাই মা বলিয়া ।
পিতামাতা ছেড়ে গেলি অন্তর করে বিদরিয়া
ওরে গোপাল প্রাণ বাঁচাতে আঘাতে আমারে দেখা দিয়া ।
একবার মা বলিয়া ডাক বাছা পুত্র আমার উঠিয়া ॥
কোথায় গিয়ে আছ তুমি আমারে ভুলিয়া
কেঁদে বলে বংশীরাজ মায়ের কোলে এস বক্ষ যায় ভাসিয়া ॥ —ঐ

১২

আমি বেঁচে গেছি ভাগ্যেতে
তাদের প্রাণ পেলে সাপের বিষেতে ।
ব্রজের যত ছেলে প্রাণ দিল বিষ-জলেতে ।
আমার অঙ্গের সঙ্গত সবাই এখন আছে মৃত দেহেতে ॥

বনে বনে রাখালি করিতেছিলাম তৃষ্ণায় গিয়েছি কালীদহে।
ঐ জলপানে থাকতে নারে তারা পড়ে গেলে ভূমেতে।
জলে কালকুট আছে বলে জানেছিলাম না গো মনেতে।
বংশী বলে ঐ কালীকে দমন করিল কালা ত্বরিতে ॥ —ঐ

১৩

নন্দ ঘোষ বলে, ও কুতুহলে,
আজি কানাই বলাই যাব সঙ্গে লয়ে যাব মধুমণ্ডলে ॥
কেঁদে যশোমতী কয়, ও নন্দ মহাশয়,
কানাই বলাই কেন নিয়ে যাবে কংসালয়ে ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

১

বাঁকাভাবে বাঁধে চূড়া,
দাঁড়াইয়েছে হয়ে ট্যারা গো,
তাহে সব গুঞ্জ বেড়া;
বনমালা গলে সখী যাস্‌নে তোরা জলে
ফাঁদ পেতে আছে কালা কদম তলে ॥ —ঐ

২

করেতে মোহন বাঁশরী, আর দাঁড়াইয়া ছিল আসি,
শশী যেন নেমেছে ধরায়;
শ্রীকৃষ্ণ বাউলে বলে, বাঁচবি তাড়ায়ে দিলে গো—
ঐ লজ্জা ভয় দুইটি অন্তরায় ॥

৩

যমুনারই কদমডালে পা ঝুল্যায়ে বসে আছে,
কালার হাতেতে মোহন বাঁশী কানেতে কদম্বের ফুল,
মাথাতে ময়ূরের পাংখা কালার গলেতে দুলিছে মালা।
বারণ করে দে গো শ্যামকে বাঁশী বাজাতে,
ঐ বাঁশী আমার মন হরেছে ॥ —বাঁশপাহাড়ী

১

আজ সকালে উঠিয়ে রাই আর ধরিলেন পসরা,
প্রেমে উলসিত হয়ে যাব মথুরা।
সাথে সাজিল গো, সাথে বাইলাম গো দধি পসরা।
মথুরার পথে যেতে প্রেমে মাতুহারা॥
আড় নয়নে চাহে দেখি কুরঙ্গী পারা
পথে সাজিলো গো, মাথে বাইলাম গো দধি পসরা।
হেন ভরজু রামের এই তো আশা
ওহে পাগলিনীর পারা
হরি বিনে দরশনে না যায় পায় ধরা। —ঐ

২

নদীর ধারের গোয়ালী দধি বিকে যায়
দহিকে লুটে খায়।
গোয়ালী তো কান্দে কান্দে যায়।
লুটে খায়া ভালো করল সুদে কড়ি দিয়ে,
ঘরে যাইয়া বলিব কি সকল দহি ভাল বিকেছে। —ঐ

৩

এখন, সই, রাইনতে গেলাম আপন মাথা খাইয়ে,
হেনকালে দিলেন শ্যাম মুরলী বাজিয়ে।
মুরলীর গান শুনে ঘরে রয়না প্রাণ॥
প্রথমকার ডাল রাইন্দে দিলাম বাসরে।
শাক দিয়ে শুক্তোনি অম্বলে দিলাম ঝাল,
শুধু হাঁড়ি চাল দিয়ে মেটাইলাম জ্বাল।
শেষে ব্যস্ত হয়ে ঢালিলাম জল।
ভাজা ভাজা চালগুলি উঠিল সকল॥
শিম মড় মড়, শিম মড় মড়, শিম দিয়েছি বেঁটে
কটু তেলে বেগুন ভেজে নামিয়েছি ঘেঁটে।

ওগো সখি, করব কি, কেষ্ট এলে দেব কি,
এরেং টেরেং কাম্‌রাঙ্গা বিনা রসে মধুটাঙ্গা ॥[১] —ঐ

৪

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নবঘন মেঘ ডাকে
বিজুলী চমকে লাগে ডর, চল যাব ঘর।
কদম তলায় নিশি হল ভোর।
একড়া কদমের তলে, কৃষ্ণ ঘুমালো বলে
বাঁশীটি তো নিয়ে গেল চোরে,
না জানে শ্যাম ঘুমের ঘোরে।[২] —বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

নিম্নোদ্ধৃত পদটিকে উৎকণ্ঠিতার পদ বলিয়াও উল্লেখ করা যায়।

রাধা কহে সখি সনে
চল শ্যাম দরশনে, বৃন্দাবনে
বাঁশি বাজিল যখনে গো বৃন্দাবনে।
রাধা রাধা নাম ধরে বাজে বাঁশী প্রেমভরে, ফুলশরে
হিয়া বিঁধিল মদন গো ফুলশরে।
কি করিবে লোক লাজে
পাই যদি রসরাজে হৃদয় মাঝে
রাধা অতি উৎকণ্ঠিতা চল চল, ও ললিতা,
ভবপিতা ভাবে সে নীলরতন গো ॥ —ঐ

গোকুলেতে যত গোপিনী ছিল,
একে একে সব কলসিনী নিল।
কেউ না আনতে পারে বারি,
লজ্জা রাখ মোর, গিরিধারী।
লজ্জা রাখ মোর, বংশীধারী ॥

১। পদটির সহিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বংশীখণ্ডের "সুসর বাঁশীর নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি" পদটির বহু মিল দেখা যায়। ভাষা এবং ছন্দে সাদৃশ্যও যথেষ্ট।

২। পদটি বংশীখণ্ডের (চুরি) "যমুনার তীরে কদম তরুতলে" পদটির অনুরূপ।

আমি যদি বারি না আনিতে পারি,
আসিবে ব্রজের নারী—লজ্জা রাখ মোর, গিরিধারী।
লজ্জা রাখ মোর, বংশীধারী ॥
আমায় হে কালিয়া জলে পাঠাইয়া
নিশ্চিন্তে থেক না হরি, রাবণে সংহারি সীতারে উদ্ধারি
ফিরিলেন অযোধ্যাপুরী।
লজ্জা রাখ মোর, গিরিধারী
লজ্জা রাখ মোর, বংশীধারী ॥ —ঐ

৭

অতি প্রভাতে চলে গেছিলাম যমুনার জলে
লীলা খেলে করে কত ছলে।
আচম্বিতে পড়ল, পড়ল ঢেলা রাধার-কলসীতে
আমি নিতি নিতি রঙ্গ তামাসা নারিব সহিতে।
নন্দ গোয়ালার বেটা
ঘটাইছে গো বিষম লেঠা,
আমার কলসী ভাঙ্গে পথে
কলসী ভাঙ্গুক তা হোক পারি,
আমার কলঙ্ক হইল জগতে।
আমি নিতি নিতি রঙ্গ তামাসা নারিব সহিতে।
কদম্বের ডালে বসি বাজাইছে গো মোহনবাঁশী
গোপীদের মন ভুলাইবার তরে,
অধম সুত বইসে আছে
দুটি চরণ ধূলির আশে
নিতি নিতি রঙ্গ তামাসা নারিব সহিতে। —ঐ

৮

আমি লোচনা (ছলনা) করে যাই গো জলে
আমার শ্যাম থাকে গো কদমতলে
টেরসা নয়নে কত চাইছে
ওগো, আড় নয়নে মুচকি হাসি।

ভালা বিঁধিছে মদন বাণে।
    কুলবতী কুলকে ডরায়
তারা প্রেম করে গো কেনে
    ওগো মরি মরি, হায়, পাছে পরাণ যায়।
সখি গো, আমি রইতে নারি ঘরে
    ওগো, পীরিতি, কাঁটা ভীষণ লেঠা
আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়ে।
    রাধাচরণ দাসের বাণী
আমি কি বলিব গো তুরে।
    শ্যাম সোহাগে সোহাগিনী
ধৈরয ধরগো, ধনি, তোমার মিলিবে গো সেই নাগরে। —ঐ

৯

    কুলবতী কুলকে ডরায়॥
বল কে সে রমণী গৌর বরণী
    ওদিকে ভানুসুতা কূলে যাইছে রে।
কবরী মণ্ডিত মালতীর মালে,
গজমতির হার জ্বলিছে গলে,
ও যে সিঁদুরের বিন্দু শোভিতেছে ভালে।
ও যে রূপে রজনী আলো করিছে রে,
    কে সে রমণী গৌর বরণী।
ও নিশাপতি সনে যেন
    সেই মত শোভে যত সখিগণে,
সুবর্ণ কলসী করিছে ধারণ দ্বিরদ গমনে চলিছে রে।
    কে সে রমণী গৌরবরণী॥ —বাঁশপাহাড়ী

শ্রীরাধার পূর্বরাগ

১

শুন কমলিনী সব প্রাণ ধন
তোমা ছাড়া হলে না বাঁচে জীবন।

ধনিয়া কিশোরে সেদিন বলিছে,
সেদিন হইতে আমার পরাণে জাগিছে।
উঠিতে বসিতে সেই মন জাগিছে,
কোনখানে, ধনি, হলে না মিশিছে।
হিয়ার মাঝারে কেমন লাগিছে,
ও চোরা যৌবন গোবিন্দ সেবিছে॥ —পুরুলিয়া

২

ও যার অঙ্গ বাঁকা, বচন বাঁকা বাঁকা যুগল আঁখি,
হৃদয় নিদয় পাষাণ ও তার শোন গো বিধুমুখী।
ও মন চুরি করে বাঁশীর স্বরে ও তো জানে জগৎজনে।
তার সঙ্গে রাই প্রেম করে, সে কি প্রেমের মরণ জানে॥ —ঐ

ও কি নীল জলধর, সখি, ও কি নীল জলধর (রং)
যমুনা-মলিন দেখ সব নীল কি নীল কি নীল।
কেমনে যাই ঘর, সখি
প্রাণ নিল যে নাগর
চিত নিল চিত নিল মোর
সখি, মন নিল যে নাগর।
দেখ কত শিখি নাচে, শিখি শিখি
কত আকুল ব্যাকুলে ছুটে নিরন্তর, সখি.
বন বনকে উড়ে, দেখ্ দেখ্ কেষ্টুরে
একি নীল জলধর।
শুন শুন কে উড়ে, দিতেছে সু-স্বর, সখি.
একি নীল জলধর!
শয়নে স্বপনে সে বিনে সে বিনে
তবু বিনে সখি সে নট নীল জলধর!
নাচিছে চপলা এখনো চপলা
জগতের জ্বালা ঘুচাও সত্বর, সখি,
একি নীল জলধর।

অতি সকালের কালে গিয়েছিলাম তরুমূলে
সখি এমন কভু দেখিনা।
হাতেতে বাঁশরী হরি বদনে ধরি মৃদুস্বরে করে গাওনা।
কিবা রূপের ত্রিভঙ্গিমা
রূপের কি দিব তুলনা॥
চূড়াটি বেঁধেছে টেরা তাতে তো কিঙ্কানি বেড়া,
গায়ে চুয়া চন্দন লেপন,
রূপের কি দিব তুলনা।
যেরূপ ধেয়াই গো মনে সেরূপ জাগিছে প্রাণে,
ওরূপ ধেয়াই আসি চেতনা।
শোন, সখি, আমি করি নিবেদন,
যদি আমার হত কতনা।
রূপের কি দিব তুলনা॥ —অযোধ্যা, (পুরুলিয়া)

শিশু সময় কালে না জানি জ্বালারে,
সদাই সঙ্গিনীর সঙ্গে ধূলায় করি খেলা।
ধনি-দুলালিনী ধূলায় করি খেলা রে ধনি হে,
হায় হায় হায় হায় রে হায়।
তুমি ধনী দুলালী উদাসী-বালা
বড় আনন্দ মনে কোথায় পালি এ ধূলা রে ধন!
তুমি ধনীর দুলালী উদাসী বালা,
দিনার দিন বাড়ে যেমন শশীর কলা॥ —ঐ

যাইতে যমুনার জলে দেখা হল কদম তলে
আমার সেই কালাচাঁদে,
একুল ওকুল কালাচাঁদ ভবকুলের ভেলা,
গৃহে আমার মন মানে না বিনে কদমতলা॥

শিখি পুচ্ছ মোহন চূড়া তায় বামে হেলা,
বঙ্কিম নয়ন-শরে মরমে বিঁধিলা,
গৃহে আমার মন মানে না বিনে কদমতলা,
ভণে বামা অতি দীনে কি করিবে কুলমানে
আমি পাই যদি গো কালা॥ —ঐ

কাঁচ মরকত নবীন জড়িত সুকোমল তনু শ্যামল,
ভুরু দুটি আঁকা ঈষৎ বাঁকা বাঁকা আঁখি দুটি ঢুলু ঢুলু॥
দেখে যা, সখি, ভরিয়া আঁখি রূপে বন কত আলো,
কুঞ্চিত কেশ শিরে বনাইয়া, কে মোহন চূড়া বাঁধিল!
কত যতনে জড়িত, রতনে মণ্ডিত,
তদুপরি শিখি-পাখা দিল।
ছি ছি কি কুলের গৌরব, সখি বিনামূল্যে বিকাইব বল,
সে যদি আশ্রয় দেয় তবে হয় রামকৃষ্ণের জীবন সফল॥ —পুরুলিয়া

৮

পূর্বে দেখিলাম আসি পথে বন্দী হয়ে শশী
কিশলয় অগ্রেতে উদিত।
চকোর ভ্রমর দোঁহে হয়ে লুব্ধ মন তাহে
আজ হেরি একি বিপরীত॥
রং— রাতুল পদ অতুল কিশলয় ময় আঙ্গুল
নখ লিখে শশী গগনে উদিত।
নয়ান যেনি চকোর সম তনু-মন মধুকর
লুব্ধ মন সেই পদে শরণাগত।
হেই হে গরুড় নারায়ণ। —পুরুলিয়া

৯

বঁধূর লাগি পরাণ রাখা দায় গো, পরাণ রাখা দায়।
দেইখেছি তারে পথে ঘাটে জল আনিতে পুকুর ঘাটে
দেইখে আমার হিয়া মাঝে হল বরিষায়।
গো বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়।

হেরিল মুখ চন্দ লোকে বলে ভালো মন্দ
আমি বলি বরাত মন্দ,
নাহি যদি পাই।
গো বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত পদটির শেষাংশে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদের একটি অংশ মিশিয়া গিয়াছে। অনেক সময় গ্রাম্য গায়ক অর্থ বুঝিতে না পারিয়া গানের এক অংশ অন্য অংশের সঙ্গে জুড়িয়া দেয়।

১০

বাছিয়ে কুসুম তুলিলাম বনে,
না বুঝিয়া মালা গাঁথিলাম কেনে,
ওই পরাইব শ্যামের গলে হে,
ওই চম্পক বরণে রাধা বিনোদিনী
মনে পড়ে চাঁপা ফুলে, নইলে হৃদয় স্মরে,
চাইলে কি মন ভুলে, অবলা কবলা প্রবল হল।
দেরে ভাই, সুবল, অকুলে কূল,
আমার যেরূপে কিশোরী মিলে গো। —ঐ

১১

যাইতে যমুনার জলে, শ্রীরাধা সখীরে বলে
তরুতলে কালিয়া দাঁড়ায় গো।
একাকী যে যাব যমুনায়।
দেখিলে যুবতী নারী, শ্যাম বাজায় বাঁশুরী
আঁখি ঠারি রমণী ভুলায় গো,
একাকী যে যাব যমুনায়।
সেই ভ্রমর কালিয়া, নারীকুলে ভাঁড়াইয়া
অধর চুমিয়া মধু খায় গো,
একাকী সে যাব যমুনায় গো॥ —ঐ

১২

বাঁকা নয়ন মজালে আমারে,
খনে খনে পড়ে মনে শ্যাম নটবরে।

যেদিকে ফিরাই গো আঁখি
সেই দিকে নাগরে দেখি
আমার ফিরালে না ফিরে আঁখি
কাল রূপ হেরে গো।
বাঁকা নয়ন মজালো আমারে ॥ —ঐ

১৩

কক্ষে কুম্ভ নিয়ে চলিলেন রাধে যমুনার ঘাটে,
সামনেতে দেখিলেন কালা চাঁদে রে।
যমুনার ঘাটে রাধা হেরে শ্যাম রাই ॥ —ঐ

১৪

বাঁশী বাজায় কে কদম তলায়,
ওগো ললিতে, চল, ওগো ললিতে,
চলিছে না পা আমার পথ চলিতে,
ওগো, পথ চলিতে ॥ —ঐ

১৫

হাই হাই বিকেল বেলাতে
কে তোরে জল আনতে বলেছে,
ঘরের বাইরে জল ফেলে জল আনতে গেলে।
না জানি কোন কালার সনে মন মজেছে ॥

১৬

মধুর মুরলী তানে মন নাহি মানা মানে
আনমনে তারি ধ্যানে দিন যায়।
সজনী লো দিন যায়।
এ বাঁশরী যাকে মারে, ঘরে সে কি রইতে পারে ?
কুলনাশা বাঁশী সবার কুল মজায় ॥ —ঐ

১৭

সারা বন বুলি বুলি বন পুষ্প তুলে আনি,
মালি ফুল সবায়ে ভালো, গো ললিতে।
চল চল দূতী ফুল তুলিতে, গো ললিতে।

চল চল সখী ফুল তুলিতে, টগর মল্লিকা জবা,
গো ললিতে, চল চল সখী ফুল তুলিতে ॥ —ঐ

১৮

একা কেনে যাব যমুনায়
কদমতলায় কালিয়া দাঁড়ায় গো ॥
যমুনায় যাইবার পরে শ্রীরাধিকার সখী বলে,
আঁখি ঠেরে রমণী ভুলায় গো।
একা কেনে যাব যমুনায় ॥
শোন হে ভবপিতা সঙ্গে যাব শ্যাম ললিতা,
ললিতা গেলে পরে হবে শ্যাম রায়,
একা কেনে যাব যমুনায় ॥ —ঐ

১৯

ও যাইতে যমুনার জলে দাঁড়াইলে কদমতলে গো,
চাঁদমুখ হেরি ভুলিতে না পারি
গুমরে গুমরে করি রোদন।
ওগো, কবে হবে গো, সখি, যুগল মিলন।
যখন ফুলটি কলি ছিল,
তখন কত ভোমরা এসেছিল, এখন ফুলটি ফুটে গেছে,
বসে না ভমরা, কেন না এলো, ওহে মনচোরা ॥ —ঐ

২০

কি কহব তোরে দূতী, কি কহব তোরে।
আজ স্বপনে হাম ভেটলি নাগরে।
জুঁই ও চামেলি ফুল গাঁথলি সকালে
ধীরে ধীরে তুলে দিল চূড়ার উপরে।
দেড় পহর রাতি আসল অবসরে।
হাসয়ি উঠলি শ্যাম পালঙ্ক উপরে ॥
হেন উদয় সাড়া রইল দুয়ারে।
নিদ ভাঙ্গল হাম পড়ল ফাঁপরে ॥ —ঐ

২১

ফিরে যমুনা যাইয়ে শ্যামরে হেরিয়ে
ঘরে এলো বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি।
ওরে, বাম করপর ধরিয়ে কপাল
মহাযোগিনী পারা,
রাধার ও দুটি নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘের ধারা।
হেন বেলা তথা আওল ললিতা
রাধা দেখিবার তরে,
সে দশা দেখিয়ে ব্যথিত হইয়ে
তুলিয়া লওল কোলে,
গণি দাসে কয় বেজেছে হৃদয়
কানুর কটাক্ষ বাণে॥ —ঐ

২২

ওগো রাই রাজবালা,
মনে হোস্‌না গো তুই উতালা॥
শ্যাম সায়রে সাঁতার দিবি
ধনি, ভিজাস নেরে চুল।
না হয় হাবুডুবু খেয়ে মরবি
রাখতে নারবি কুল।
ও তুই কুল হারালে সব হারাবি লো
পাবি না তুই মান-ভেলা।
ওগো তুই অন্তরেতে বাসবি ভালো
বাইরে বাসবি পর।
ঘুরে ফিরে চাসনে ধনি দিস্‌ না লো নজর।
ইসারাতে কইবি কথা
কাজ কিলো তোর মুখ মেলা॥

ওগো বাঁশীর ধ্বনি শুনলে পরে
ধনি, যাসনে গো জলে ;
ঘরে পরে কানাকানি করে সকলে।
ওরে, জানলে পরে সেই কুটিলে
গঞ্জিবে তোরে তিন বেলা।
দীনহীন সুরেন্দ্র কয়, করিয়ে বিনয়
অন্তিমেতে দিও চরণ হইয়ে সদয়।
শ্যামের বামে সদয় হয়ে
উদয় হও এই বেলা।
ওগো রাই রাজবালা,
ধনি, হোসনে গো তুই উতালা॥ —বাঁশপাহাড়ী

২৩

আমার ভালোবাসা বিনে আমি রইব কেমনে গো,
বহু দিনের ভালোবাসা আমার ভাঙ্গলো কেমনে গো।
কি কহিব, সহচরী, গুমুরে গুমুরে মরি গো,
নিলাজ নিঠুর সে যে জানিলাম এতদিনে।
কি শেল বিঁধিছে মোরে বাজিছে হৃদয় মাঝারে গো।
এ দুঃখ কাহারে বলি আমি ভাবি রাত্রি দিনে গো।
মনে পড়ে রূপ-গুণ ভুলেও ভুলা যায় না কেন গো॥ —ঐ

২৪

হেন গৌরাঙ্গিয়া বলেছেন বাণী, চিনিলে না চিন তুমি,
চিনা দাও হে বংশীধারী (গো) চিনিতে না পারি আমি।
হেলে দুলে যায়, মম পানে চায়, ধনি কত না করিছে চাতুরী।
চলি যায় গো যেমন নবীন মেঘের বিজলী গো॥ —ঐ

২৫

সখীগণ— হ্যাঁ লা রাধিকে, কালা কালা করিস বটে,
তার গুণ কি আছে লা বল না শুনি গা,
রাধিকা— কালার গুণের কথা বলব তোরে কি তা,
বলব কি বল, আর তোকে, জলকে যে যাই ছল করে,

যমুনার ঐ তীরে, কলসী কাঁখে ধীরে
ননীচোরা নামটি ধরে বেড়ায় ঘুরে।
আবার কদম তলায় চুপটি করে বসে থাকে,
গোপিনীদের বসন হরে॥ —ঐ

২৬

জলকে এসে আমার কাল হইল,
জলের ঘাটে বেলা ডুবিল।
গুণের বঁধু ইসারাতে কি জানি কি বলিল,
ঘরকে যেতে মন সরে না কি করি ভাবি বল।
জলের কলসি উছলে পড়ে ভিজে আমার আঁচল।
ফুলশরে জর জর অন্তর মোর আকুল,
কি করি, হায়, না হলো উপায় মন হল মোর চঞ্চল,
বিপিন ভণে বঁধুর জন্যে চোখ হইল ছল ছল॥ —ঐ

২৭

আমি ধৈরয ধরিতে পারি না হায়,
দেখা দিও হে মোর বন্ধু, শ্যামরায়,
তোমায় না দেখিয়া যাই দিশা, রায়,
দেখা দিও হে মোর বন্ধু, শ্যামরায়।
ধৈরয ধরিতে নারি নারীর প্রাণেতে,
উপায় বল গো, বৃন্দে, ওই কৃষ্ণ প্রেমেতে
উপায় বলগো বৃন্দে॥ —বেলপাহাড়ী, (মেদিনীপুর)

২৮

মরেছেন বাঁচা আছে ওরাই চাতকিনী।
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদে বিনোদিনী॥ —বাঁশপাহাড়ী

২৯

আগুন ঘাঁটিয়ে পিছু না বুঝিয়ে
যেজন পিরীতি করে,
পিরীতির অঙ্কুর হতে কত দুঃখ পাইগো চিতে॥ —ঐ

৩০

কেমনে পাব তারে গো, সই, কেমনে পাব তারে,
স্বপনে দেখেছি যেরূপ বিরাজে অন্তরে গো।
কেমনে পাব তারে।
গেছিলাম যমুনার জলে
সে কালা কদম্বের তলে
ওপর দিকে নয়ন দিলে
আমি হেরিব গো কদম্ব ফুল,
কেমনে পাব তারে গো, সই!
এই করিলে দারুণ বিধি
কেন আমারে সাধিলে বাদী
কৃষ্ণ হেন গুণনিধি, বিধি, দিয়ে নিলে হরি,
কেমনে পাব তারে গো, সই, কেমনে পাব তারে। —ঐ

৩১

কৃষ্ণ আসবার কালে হেরিব গো রসরাজে,
আমার মন স্থির হরির সঙ্গে,
(ওগো) এ অনুমান করি বনে বেড়ায় সুন্দরী।
বনফুল তুলি বড় রঙ্গে।
জুঁই চামেলী ফুল সুরজ মণি সমতুল
নাগেশ্বরী অতি সুন্দরী।
সুগন্ধ পুষ্পের মালা
ধনি গাঁথে যতন করি
আসিতে আসিতে হে বঁধুর গলে পরাইব,
আর দেখিতে দেখিতে গো শ্যামের অঙ্গে লাগাইব —ঐ

৩২

চাইলে চোখের কাছে নিকটে আছে,
অমন তনুটি ঐ কে গড়িল কোন্ ছাঁচে।
অঙ্গ নাই ত্রিভঙ্গ বাঁকা মদনমোহন
শির নাই চূড়াটি বাঁধা রাধার লিখন।

মুখ কর নাই কিন্তু মুরলী বাজায়,
কণ্ঠ কর নাই মোহনমালাটি দুলিছে হিয়ায়।
কটিতে ধটি নাই, নাম পীতবাস, চরণ নাই কেমন নাচে,
কর্ণ নাই সুবর্ণমণি কুণ্ডল দুলিছে,
নাক নাই তার নোলক কিবা ঝলক দিতেছে।
তাই গুরু পদ যার সম্পদ কয় গৌরাঙ্গ দাস। —বাঁকুড়া

৩৩

শুন রে সঙ্গিনী,
বিগত রজনী ধনী ঘুমে অচেতন।
স্বপনে আইল কিবা পুরুষ-রতন॥
রূপে জিনি লব (নব) ঘন গো শ্যামল বরণ।
আসি মোর শয্যা পাশে দাঁড়াইল, মৃদু হেসে করিল চুম্বন॥
চাঁচর চিকুর কিবা বাঁকা দুনয়ন গো শ্যামল বরণ॥
আসি মোর পালঙ্ক পাশে,
ধরি দুই বাহু তোরে করিল চুম্বন।
বুকে বুকে মুখে মুখে মধুর মিলন গো শ্যামল বরণ,
দ্বিজ হরির এই মিনতি শুন শুন ও শ্রীমতী,
অন্তিমে যেন পাই হরির রাঙ্গা চরণ॥ —ঐ

শ্রীকৃষ্ণের পুর্বরাগ

১

কত গরবে চলেরে ধনি যখন নদীতে সিনান যায়,
মনে লাগে বুকটা বিছায়ে দি ধনি পা দিয়ে যাক তায়।
মাথায় কলসী, কলসী কাঁখে ঐ ঘুরে ঘুরে চাইতে থাকে,
নাম ভুলে যাই বলব কাকে ঘটল বিষম দায়॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

তবে শুনরে, সুবল, বলিরে আমি,
কদমতলাতে গেছিলাম আমি
বেলি অবসান কালে।

এক বেজ নারী কাঁকে কুম্ভ করি
আমি গেছিলাম যমুনার জলে রে।
বেলি অবসান কালে রে॥ —ঐ

৩

আঁখি জর জর রূপদল মন দেখি,
হা গোরী, মিঠ মধুর তোর বাত রে।
আঁখি জর জর রূপদল মন দেখি,
হা গোরী, ঝলকত পাতি সারি দাঁতের!
ভুর ভুজঙ্গিনী দংশিল মন প্রাণে,
হা গোরী, বিষে হারল গোটা গাতরে।
রাধা কিষ্ট ভণে বড় আশা ছিল মনে,
হা গোরী, দরশনে জুড়াব পীরিতরে
হেন হনুয়া বলে বড় আশা ছিল মনে
হা গোরী, দরশনে জুড়াব পীরিতরে॥ —পচাপানি

কলসী রে, তোর গলে ধরি,
নিয়ে চল মোর বন্ধুর বাড়ী,
খানিক দূরে বাড়ী দেখা যায়রে,
পিতলের কলসী॥
যমুনার জল কালো,
সান করিতে লাগে ভালো॥
জলের ছায়ায় যৌবন দেখা যায়রে।
পিতলের কলসী॥
কলসী রে এই কি ধর্ম, মজিলে হয় সোনার মর্ম
না মজিলে মাটিতে মিলায় রে।
পিতলের কলসী॥
কলসীতে ভরিয়ে পানী ঠমকি পড়িছে খালি
কলসীর জলে পাছা ভিজে যায় রে!
পিতলের কলসী॥ —পুরুলিয়া

শুন রে, সুবল, বলি রে বাণী !
কদম্বতলাতে গেছিলাম আমি বেলা অবসান কালে রে।
এক ব্রজনারী কাঁইখে কুম্ভ করি গেছল যমুনার জলে।
(সুবল) হেরিলে নয়ন ভুলে চাইলে নয়ন জুড়ায়রে,
তবে মধুর বচন মাথাতে বেণী,
তাহার উপরে যেন সোনার গাঁথনী,
(সুবল) ঝরি ঝম্পা পিষ্টে দোলেরে।
এক ব্রজনারী গেছল যমুনার জলেরে ॥
পায়েতে নূপর মধুর সাড়া,
হাতেতে কিঙ্কিনী ময়ুর বেড়া ভুজে ভুজঙ্গিনী দোলেরে,
অধম আতুর বলে বিধু বঁধুর নাসাতে বেসর দোলে রে।

—অযোধ্যা

শ্রীরাধার অনুরাগ

১

গাঁথিব বনফুলের মালা যতনে সাজাব ডালা গো,
এসো এসো, প্রাণবল্লভ, রাধাপ্রেম ডোরে হৃদয়-মাঝারে।
দিবানিশি রাখিব শ্যামকে তবু না ছাড়িব হে,
এসো এসো, মদনমোহন, দয়া কর মোরে গো হৃদয়-মাঝারে।
তুলসী চন্দন দিয়ে পুজিব রাঙ্গা চরণে,
নরোত্তমে এই মিনতি দুঃখ কারে বা জানাব গো।
হৃদয়-মাঝারে ॥ —বেলপাহাড়ী

একা ঘরে রইতে নারি তোমা বিনে বংশীধারী
পথ চেয়ে বসে থাকি সদর দরজায়।
থেকে কাজ কি হেথায় লে বন্ধু পালিয়ে যাব
মোরা দুজনায় ॥

আমরা দুজন মুক্ত পাখী   করিব না সংসারে বসতি
টাটা-হাওড়া দিয়ে যাব কলিকাতায় ॥
এ নব যৌবন তরী   শুন শুন সহচরী
লে আমরা সাঁতার দিব দিব গো দরিয়ায় ॥
নিধিরাম বলে হরি তোদের পিরীত দেখে লাজে মরি
দিবারাত্রি ভাবি বসে উঠান কিনারায় ॥ —ঐ

দিবা অবসানে নিকুঞ্জ কাননে বাজালে মোহন বাঁশীরে।
আমি শুনে সে বাঁশরী বাঁচি কি নাগরী
নাগরে না ভালবাসিরে।
কাননে বাজাও বাঁশী,
হায় হায়, ব্রজবধূ কুল নাশিবে।
কে বাঁশী গড়ল কেবা গুণ দিল রে
আমার শীল কুল নিল হরি রে ॥ —বেলপাহাড়ী

৪

অল্প বয়সে পিরীতি করিয়ে রহিতে না দিবি ঘরে,
বঁধু, আমায় বনবাস দিয়ে আমি মরিলে হইব শ্রীনন্দের নন্দন।
তোমারে সাজাব রাধা সেদিন তুমি জানিবে, বঁধু,
নারীজনমের কি যন্ত্রণা অবলার প্রাণে কত জ্বালা,
ত্রিভঙ্গ হইয়ে বাঁশরী যখন বাজাইব যাইবে জলে ॥[১] —ঐ

কুসুম শরে দইছে অন্তরে
ওহে, প্রাণধন, তুমি আমার জীবনের জীবন।
আমি তোমায় ছাড়া না রব কখনও
ওহে প্রাণধন, তুমি আমার জীবনের জীবন। —ঐ

১ এই পদটি মহাজন পদাবলীর 'অল্পবয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে' পদটির সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া গিয়াছে; পদ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত। কিন্তু এখানে কোন ভণিতা নাই।

৬

আমার হাতের কাঁকন সদা প্রভুর চরণ সেবন
গলায় গজমতির শ্যাম।
আমার নয়নের অঞ্জন, সদা শ্যাম দরশন,
মুখে হরে কৃষ্ণ হরে নাম।
আমার মস্তকে সিঁথি প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে মতি
মুখে হরে কৃষ্ণ হরে নাম। —বাঁশপাহাড়ী

৭

রাধা রাধা নাম ধরে বাঁশী ডাকে প্রেম ভরে,
উঠিয়া দেখিনু আমার প্রিয়া নাই মোর পাশে রে।
মন বাঁধব কিসে, আমার প্রিয়া পরদেশেরে
মন বাঁধব কিসে।
সে ভ্রমর কালিয়া নারীকুলে জড়াইয়া
অধরে বসিয়া মধু চুমে রে।
ঐ গুণ গুণ বাঁশী বাজে বাঁশী দিবানিশি
ব্রজবধূর কুল নাশি শ্রীরাধার কুল নাশেরে।
সে যে নিঠুর হরি কত জানে ছল চাতুরী
আশা দিয়ে গেল হরি ভবপ্রীতা রহিল তার আশেরে॥
—বেলপাহাড়ী

নব নব নব যৌবনে
এ প্রাণ জুড়াব লো কেমনে।
মন যারে চায় পাব কোথায়, দিন কেটে যায় দিন গুণে,
উদাস আঁখি থাকি থাকি ডাকে কারে গোপনে।
কার তরে আজ লাগে গো লাজ, লোর বহে দুনয়নে,
জর জর থর থর কাঁপে তনু মদনে,
কার সাথে কার হাতে বল সঁপিব এ ছার প্রাণে।
কুলে কালি দিব ঢালি কহে কবি বিপিনে॥ —ঐ

ভাব করে শ্যাম হইল ভাবনা,
এ ভাব করবো না হে করবো না।
প্রেমের মালা বিষের জ্বালা, সে জ্বালা আর পারব না,
তোমার সঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে আর আমি তো ভাসবো না।
প্রেমের পাখায় ভর দিয়ে হায়, প্রেমের আকাশে উড়ব না॥
প্রেম-দরিয়ায় প্রেমের ডোঙ্গায় আমি আর শ্যাম,
ভাবের পথে অনেক কাঁটা সে পথে শ্যাম যাব না,
বিপিন ভণে জেনে শুনে আগুনে হাত দিব না॥ —ঐ

১০

যত সখী সঙ্গে লয়ে চল যাব যমুনার কূলে,
শ্যামকে পেলে গলে ধরে কাঁদব যত সখি,
তোরাই বলে দেওনা গো প্রেম কোনখানেতে আছে॥ —ঐ

১১

ঝিঙা ফুলে লিলেক জাতিকুল গো পিরীতি হইল শূল।
ধর্ম ছিল চাঁপার কলি ভাইব্যে ভাইব্যে হলাম কালি,
কালার এ পিরীতি আমার ডুবালো দু'কূল।
(গো পিরীতি হইল শূল)॥
একে আমার জীর্ণ তরী, তায় চাইপ্যাছেন বংশীধারী,
মাঝখানে লাগায়ে তরী ডুবালো দু'কূল গো।
পিরীতি হইল শূল॥ —পুরুলিয়া

১২

শ্যামকে রাখিব আদরে হে হৃদয় মাঝারে॥ ধ্রু॥
হেরি ও মুখচন্দ্র লোকে বলে ভালোমন্দ
প্রাণনাথ বিনা আমি যাব কোথা বল রে।
(সখী) আমি যাব কোথা বল রে।
কালার এ পিরীতি জ্বালা, আমার প্রাণে দেয় জ্বালা,
হৃদয়ের আলা কালারে আনিয়া দে রে॥

(ভারা) কালারে আনিয়া দে রে,
(সখী) কালারে আনিয়া দেরে।
শ্যামকে রাখিব আদরে হে ॥ ধ্রু ॥ —ঐ

১৩

কোথা গেলে কোথা পাই
কোথা গেলে গো আমি তারে দেখা পাই,
কোথা গেলে গো আমার পরাণ জুড়াই
কোথা গেলে গো আমার শ্যামকে দেখা পাই —ঐ

বাঁশের বাঁশী দিবানিশি আকুল,
ও প্রাণ, গৃহে রইতে নারি,
বাঁশী কাল হোল ভারী
যখন বাঁশী পঞ্চ স্বরে ডাকে নাম ধরি।
বাঁশের বাঁশী দিবানিশি
আকুল হৈয়ে ও শুনি, গৃহে রইতে নারি ॥ —ঐ

১৫

এখন, সই, রান্‌তে গেলাম আপন মাথা খেয়ে,
হেনকালে দিল শ্যাম মুরলী বাজাইয়ে।
মুরলীর গান শুনে ঘরে দাঁড়ায় না প্রাণ,
প্রথমকার ডাল রেঁধে দিলাম বেসর ঘটে
শাক দিয়ে স্থকতানি অম্বলে দিলাম ঝাল।
শুধু হাঁড়িতে চাল দিয়ে মিটাইলাম জাল!
শশব্যস্ত হয়ে ঢালিলাম জল,
ভাজা ভাজা চালগুলি উঠিল সকল।
সিম মরমর, সিম মরমর, সিম দিয়েছি বেঁটে,
কটু তেলে বেগুন ভেজে নামিয়েছি ঘেঁটে।
অবশেষে ক্ষীর ছড়িয়ে নুন দিয়েছি ভুলে,
দুধ লাড়াচাড়িয়ে নামায়ে হিং দিয়েছি গুলে।

ওগো, সখী, করব কি কৃষ্ণ এলে দিব কি,
প্রথম সই রান্‌তে গেলাম আপন মাথা খেয়ে ॥[১] —ঐ

১৬

যখন বাঁশীতে করে গান ছটফট আমারি প্রাণ,
যাব যেমন মন জানে নারায়ণ,
আমি নাকি পাঁজুরার পোষা পাখি ॥ —ঐ

১৭

চৈত চাতকী বৈশাখে খরা,
পিয়া বিনা, বন্ধু, জিয়ন্তে মরা।
যেতে হবে গো হ'তে হবে গো ঘরছাড়া,
বেইরাতে বলে গো, কুলে ভয় করে।
যখন কালা বাজায় বাঁশি ত্যাখন আমি রাঁধতে বসি ॥
শুক্‌নো কাঠে জল ঢেলে ধুঁয়ায় আলতো কাঁদি গো,
বেইরাতে বলে গো বাঁশি বারে বারে,
বেইরাতে বলে গো বাঁশী—শ্বশুর ঘরে ॥ —ঐ

১৮

যাইয়ে যমুনার জলে আমি গেছিলাম মাধবীতলে
ও ফুল তুলিবার চাহরে।
ওরে, কৃষ্ণ-কাল-ভুজঙ্গিনী আমার দংশিল হিয়ায় রে।
কালবিষে জর জর তনু পাছে প্রাণ যায় রে।
শুন, বিন্দে, সহচরী আমায় যদি না মিলাবে হরি
আমি বলছি সবাই রে।
ওর নাম নিলে দশম দশা, সখী, ঘটিবে আমার রে,
অন্তরেতে ঝরি, ওরে ভাই, আমায় বিষ দ্বিগুণ বাড়ে।
আমি কি করি উপায় রে।
ওরে বাঁশীর স্বরে কালায় চালন করে
ও বিষ দ্বিগুণ বেড়ে যায় রে।

১। তুলনীয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বংশীখণ্ডের পদ "কে না বাঁশী বায়ে বড়াই কালিনী নই কূলে ॥"
ইহার আর একটি পাঠ অন্যত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পৃ. ৬১০ দ্রষ্টব্য

যে সাপে দংশন করে, ওরে, সেই সাপে চুষণ করে
হলাহলি মিটে যায় রে,
অধীন চৈতন্যায় ভণে হোল প্রাণে বাঁচা দায় রে ॥ —ঐ

১৯

গৃহের অনল দ্বিগুণ জলে,
পিয়া বিনে প্রাণ সদা ঝুরে, শুন শুন সহচরী।
বিহান বৈকালে আশে কোন ছলে যেমন দুনয়নে দেখি।
দেখো, না ভুলিও, প্রভু, মোরে, না ভুলিও কভু মোরে ॥
তবে বংশীতে যখন করহে গান ছটফট করে প্রাণ,
যেন পিঞ্জরায় ধরা পাখী।
আমার যেমন মন জানে, নারায়ণ, কাহারে রাখিব সাক্ষী।
দেখো, না ভুলিও, প্রভু, মোরে।
শ্রীদাস ঝুমরি বাঁধে।
এত যে মিনতি প্রিয়ার তরে,
ওহে, শ্যাম রায়, ধরি তোমার পায়, নিতান্ত না দিও ফাঁকি হে ॥ —ঐ

২০

কুল নাশি তুই মাশুল কই দিলি।
ও তুই মনকে কেন ভুলালি ॥
মুখের মধু দিয়ে, বঁধু, খাওয়ালি পানের খিলি।
তারপরে অন্তরে কেন তুষের অনল জ্বালালি ॥
ঘর বাঁধতে দিলি না তুই রাস্তার মাঝে কাঁদালি।
একুল ওকুল দুকুল গেল মাঝ-দরিয়ায় ডুবালি ॥
হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে, দিলি মুখে চুণকালি।
বিপিন ভণে অকারণে লোক-হাসি তুই করালি ॥ —ঐ

২১

ভুল বুঝে শূল দিস্‌না অন্তরে
তোমায় ভালোবাসি অন্তরে।
তোমায় যদি পারতাম আমি
দেখাতাম বুক চিরে ॥

তোমার নামটি বুকে লেখা আছে সোনার আখরে,
মনমোহিনী দিয়ে, ধনি, নিয়েছ এই মন কেড়ে ॥
তাই তো তোমার ফুলবনেতে আমি মরি গুঞ্জরে।
তোমার ছাড়া দিশাহারা, নাই কেহ যে সংসারে,
বিপিন বলে দিওনা শেল, যেও না আমায় ছেড়ে ॥ —ঐ

২২

বাঁশী বাজে গহন বনে সুধাসম বাজে প্রাণে গো,
বিঁধিয়ে মদন-বাণে আমার অন্তরে কত ছলে বাজে বাঁশী,
বলে, এস, রাই কিশোরী গো,
টলমল পরাণ করে অধম বিনা রে ॥ —ঐ

২৩

শ্যাম হে, তুমি আমার বাকি কি রেখেছ ?
যেদিন নয়নে নয়নে নয়ন বিঁধেছ।
যদি জেগেছে নয়ন আমার
প্রাণ যে করে কেমন কেমন ॥
কেমন যাদু করেছ।
শ্যাম হে, তুমি নানা ছলে
আমার কুলমান সব হরে নিলে,
আমার বলিতে কি রাখিলে ?
আমার আখের খোয়া করেছ।
দীন দ্বিজ ফণী ভণে
যেদিন তোমার মনে আমার মনে
তোমায় ভালোবাসি মনপ্রাণে।
শ্যাম হে, তুমি আমার বাকি কি রেখেছ ॥ —ঐ

২৪

আর কেন বাজাও বাঁশী আমি বাঁশীর স্বরে উদাসী,
শুনে বাঁশী রাধার মন কি চিনেছ, কালশশী ॥
কুলমান করে দান হয়েছি তোমার দাসী।
বাঁশের বাঁশীরে মন ভুলালে প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।

ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে গোচারণে মুচকি হাসি।
বনে বনে ধেনু চরায় কত ক'রে ভালোবাসি,
কন বংশী কলিযুগে টুসুগানে রাধাকৃষ্ণ নামে ঘোষি॥ —ঐ

২৫

শুন গো বৃন্দে, কই আমার প্রাণ-গোবিন্দে
গোবিন্দ বিহনে প্রাণে মরি।
গত হল নিশি আমার এলো নাকো কালশশী।
আমি আর ধৈর্য ধরিতে নারি গো।
(আমার) কই এলো নিঠুর হরি,
আমি তিলে না দেখিলে প্রাণে মরি গো।
আমার কই এলো নিঠুর হরি
ভাবি মনে মনে শ্যাম, বঁধুয়ার সনে,
সুখেতে বঞ্চিত এ শর্বরী।
জ্বালিয়ে মোমের বাতি গাঁথিলেম মালতী।
আমি শ্যামের গলে দিব মনে করিগো।
আমার কই এলো নিঠুর হরি॥
আমি আর ধৈর্য ধরিতে নারি গো,
কোকিলার কুহু স্বরে বিঁধিছে অন্তরে
ঝঙ্কারে ভমরা-ভমরী।
অস্ত শশধর, উদয় দিবাকর
দেখ, সখী, পূর্ব দিকে হেরি গো।
আমার কই এলো নিঠুর হরি।
আমি তিলে না দেখিলে প্রাণে মরি গো।
আসিবার আশে মনের হরিষে,
আমোদিত কুঞ্জে বিহরি,
আইল অসময় আমার কই এলো রসময়,
তাই বাণেশ্বর আছে পথ হেরি গো,
কই এলো আমার নিঠুর হরি। —ঐ

২৬

কালার কুটিল প্রণয় ফাঁদে
পড়িয়ে সতত পরাণ কাঁদে দুখে যায় চিরকাল
আমি চাই না চিকন কালা,
গরল অন্তরে মুখে সুধাধরে
কে বলে গো ভালো কালো
আমি চাইনা চিকন কালা,
প্রেমরীতি কিগো রাখাল জানে!
গোধন চারণ বেড়ায় গো বনে কানে পরে বনফুল,
চরাইতে ধেনু বাজাইতে বেণু এ সকল পারে কেবল
আমি চাইনা চিকন কালা॥ —বেলপাহাড়ী

২৭

কালশশী বাজায় বাঁশী কাঁদি নিরলে বসি,
ডুবলো আমার কুল-কলসী কলঙ্ক সায়রে গো,
বাঁশীর স্বরে কালা মন নিল হরে গো বাঁশীর স্বরে॥ —ঐ

২৮

ঐ বাঁশী বাজে ঐ বনমাঝে আমি যেতে নারি লোক লাজে,
ঘরের পতি বাদী ননদী কুটিলা, কলঙ্কিনী বলে জগতে রটিলা,
আরো বলে সদা বাঘিনী কুটিলা কলঙ্কিনী মরে লাজেরে,
গেল গেল কুল গেল॥ —ঐ

২৯

অতি পরভাত কালে গিয়াছিলাম যমুনার জলে,
শিমুল ফুলে তেজ্য দিয়ে কুসুম ফুলে মন মজাইলে।
বুঝ বুঝ গুরুজনা, বুঝ বুঝ সাধুজনা,
বুঝ বুঝ রসিকজনা, কোন ফুলে কেমন মধু,
ভ্রমর ভাবও জান না।
মধু লোভে হে ভ্রমর বনে গুঞ্জরে,
শুধু কি পলাশের মধু ভ্রমর চুষিয়ে বেড়ায়,
কোন ফুলে কেমন মধু—ভ্রমর ভাবও জান না॥ —ঐ

৩০

কি কলঙ্ক দিয়াছ মোরে,
আর চন্দন বলে আমি মাইখ্যাছি শিরে।
লাজ ভয় করি দূরে বেজের যত গোপিনী ছিল,
একে একে কলঙ্ক নিল,
(প্রথম) আমি যদি বাড়ী না আসিতে পারি,
হাসিবে জগতের নারী লইজ্জা রাখো মোর, গিরিধারী,
কি কলঙ্ক দিয়াছ ॥ ধুয়া ॥
তুমি যে কালিয়া জলে পাঠাইয়া অমন নিশ্চিন্ত না থাইক্য হরি,
সত্য যুগেতে রাম রাঘব হরি, হনুমান আইসে সাগর বন্ধন করি।
জনক-নন্দিনী উদ্ধারিবেন তিনি এখন বধ কর কুশ-লবে রে।
তুমি যে কালিয়া জলে পাঠাইয়া
অমন নিশ্চিন্ত না থাইক্য হরি।
লইজ্জা রাখো মোর, গিরিধারী, হেয় নরুয়া বলেছে তাই,
পইড়ে পরভু আজ্ঞায় রাঙ্গা চরণ পায়,
যা কর তা কর, ওহে নটবর,
আমি হামে যে অবলা নারী রে ॥ —ঐ

৩১

পরথম পহর রাতি, রে বন্ধু, আড় বাঁশী দিও তান,
ঘরেতে শ্রীরাধিকার উড়িল পরাণ।
বন্ধু, সময় জানিয়া অসময়ে বাজাও বাঁশী
আমার মন তো জানে না।
দ্বিতীয়া পহর রাতিরে, বন্ধু, যাও গোয়ালার পাড়া,
কেড়ে নেব মোহন বাঁশী নেব গলার মালা।
বন্ধু, সময় জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী আমার মন তো মানে না।
তৃতীয় পহর রাতি, রে বন্ধু, নিভে গেল বাতি,
এমন নিঠুরের সঙ্গে কে করে পীরিতি।
বন্ধু, সময় জান না।

অসময়ে বাজাও বাঁশী আমার মন তো মানে না।
চতুর্থ প্রহর রাতিরে, বন্ধু, পুর্বের উদয় ভানু,
কপাট খোল বাতাস লাগুক মীরাবতীর গান।
বন্ধু, সময় জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী আমার মন তো মানে না॥ —ঐ

৩২

শুন গো, মাধব, তুমি তুমায় কি বলিব আমি
এখন সইতে নারি সেই যৌবনেরই জ্বালা,
প্রাণসখা হাওয়াতে নিভিল দীপ-আশা,
নানাজাতি ফুল আনে, ওগো, মালা গাঁথলাম তোমার জন্তে,
সেই ফুলমালা হইল বাসি,
প্রাণসখা, হাওয়াতে নিভিল দীপ-আশা।
হরিপদ ভণে বসি আসবেন ও রাই প্রিয়সখী
আমার শ্যাম বিনে ভেবে ভেবে তনু হল ক্ষীণ।
এখন সহিতে নারি সেই যৌবনেরই জ্বালা।
প্রাণসখা, হাওয়াতে নিভিল দীপ-আশা।

৩৩

সরল দেখে প্রেম করিলে এত কেন নিঠুর হলে,
দেখা পেলে কেন মুখ তুলে শুধায় না,
আমি মরি তোমার তরে, বঁধু তো তুমি আমায় চাওনা।
অবলারে শেল দিয়া অবলারে দুঃখ দিয়া কখন ভালো হয় না,
সারদা শিংএতে কয় নানা ফুলে মধু রয়
ভ্রমর মধু ছাড়া রয় না।
ও ডাল ভাঙ্গে শুকায় মধু ভ্রমর আর তো ফিরে চায় না। —ঐ

৩৪

পীরিতি বা কর কেনে অবলারে প্রাণে মার,
আগু পেছু না ভাবিলে, দূতী,
জ্বালা হ'ল আমার গো করিয়া পীরিতি।

সত্য সোমায় বলে পড়ে প্রভুর পদতলে,
আগুপিছু না ভাবিলে, দূতী।
জ্বালা হ'ল আমার গো করিয়ে পীরিতি॥ —ঐ

৩৫

বাঁশরীর স্বরে ডাকিছে গো শ্যাম বল বল বল, সখী,
কেমনে ফেলিয়ে যাই গো জল।
আসি দেখি যাই যাই তারে পাই না পাই,
আমি কেমনে হেরিব মোহন ঠাম
বাঁশরীর স্বরে ডাকিছে, গো শ্যাম,
কিশোরী কিশোরী ডাকিছে বাঁশরী
সঘনে ফুকারে আমার নাম।
বাঁশী ডুবালো ডুবালো মজালো মজালো
হরে নিল আমার কুলমান॥
ওগো জটিলার দ্বারী কুটিলা প্রহরী গঞ্জনায় সদা ঝুরে গো প্রাণ,
একে কুলনারী পাসরিতে নারি কেমনে আমার পুরিবে কাম। —ঐ

৩৬

দিবা অবসানে নিকুঞ্জ কাননে কে বাজায় মোহন বাঁশি,
রাধা নাম ধরে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে অতুল প্রেম প্রকাশে।
কাননে বাজে ও বাঁশি ব্রজ-বধূর কুল নাশি,
শুনিয়া বাঁশরী বাঁচে কি নাগরী নাগরে না ভালোবাসে রে,
হেন লয় মনে যেয়ে কুসুম বনে সাধে পরি প্রেম-ফাঁসিরে,
গৃহে ননদিনী যেন ভুজঙ্গিনী শাশুড়ী গরল রাশি রে।
মিলিতে সাধ রে বাধা দেয় সবে ভবপীতা প্রেম ভণে রে॥ —ঐ

৩৭

বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে, রেখেছি প্রাণ ভরিয়ে গো,
মদনে বিঁধিছে হিয়া আমার জীবন সহে না॥ —ঐ

৩৮

যদি না পাই দেখা তোমা ধনকে কাজ কি আমার এ জীবনে,
তোমা বিনা দুন্যা অন্ধকার আমি দিনেও দেখিতে পাই না॥ —ঐ

৩৯

গৃহে মন থাকে না মনে করি চলে যাব,
আমি কুল তো রাখব না।
তোমার সঙ্গে করি পীরিতি আমার এই তো গতি গো
বুঝি গো তোমার এমন রীতি সরম রাখবে না ॥ —ঐ

৪০

যমুনাকে জলকে গেলে কত কি লোকে বলে,
শুনে আমার অন্তর জলে জীবনে সহে না ॥ —ঐ

৪১

ঘরে আছে শাশুড়ী,
আমার মন যেমন কেমন করি,
কত কি কুবাক্য বলে সইব গঞ্জনা ॥ - ঐ

৪২

বাঁশীর সুরে আমার মন নিল হরে গো,
কালশশী বাজায় বাঁশী, আমি কাঁদি বিরলে বসি গো,
ডুবাল আমার কুল-কলসী কলঙ্ক-সায়রে ॥

৪৩

অমন করে বাঁশী বাজাতে বারণ কর গো সহচরী,
আমার কর্ণেতে পশিছে স্বর অঙ্গ কাঁপে থরথর,
নদীকুলে যাই কেন এমন হয় গো বুঝিতে নারি।
অমন করে বাঁশী বাজাতে বারণ কর গো, সহচরী ॥ —ঐ

৪৪

ও কে রে বনে বাজার রে বাঁশী,
অমন করে বাঁশী বাজাতে বারণ কর গো, সহচরী।
প্রবেশে আসি মরমে আমার সখী রে,
বড় দেয় রে জালা ও বালা সরলা বল কেমনে ধৈরয ধরি।
আমার কর্ণেতে পশিতে স্বর অঙ্গ কাঁপে থর থর,
কেন এমন হয় গো বুঝিতে না পারি।

অমন করে বাঁশী বাজাতে বারণ কর গো, সহচরী,
ঘাটে বসে কোন মহাজন কুলবধূর কাঁদায় জীবন।
সখীরে, আঁখি ঝরঝর হৃদি দরদর মরমে মরমে মরি।
ঐ রাধা নামে বাঁশী বাজাতে বারণ কর গো, সহচরী,
শাশুড়ী ননদের ঘরে লজ্জাতে প্রাণ সদাই ঝরে গো,
ছি ছি কি লাঞ্ছনা, বড় দেয় গঞ্জনা লাজ সরমে মরমে মরি,
অমন করে বাঁশী বাজাতে বারণ কর গো, সহচরী॥

—বাঁশপাহাড়ী

৪৫

কহ কহ সতী প্রেমশূন্য নদী তাহারি কেমন জল গো,
তাহারি সে জল অতি সে গম্ভীর উপরে শিহরিল জল লো।
যেই গো সেজন তাই ডুবেছে রাধার প্রেম সায়রের মাঝে,
কাঁচা অম্বল রসে টলমল তার প্রাণ সরোবর লো। —ঐ

৪৬

খনে খনে আমাকে ভেদিল,
বংশী সে কুলের শেল মন হরে নিল।
যেমনি হৃদয়ের খল সেই জানে নানা ছল,
বাঁশী সে কুলের শেল আমার মন হরে নিল॥ —ঐ

৪৭

রাধা কহে, সখিসনে চল শ্যাম দরশনে,
বৃন্দাবনে বাঁশী বাজিছে সঘনে,
খসিল টিকলি তোর নিদে আঁখি লাল ঘোর,
বহি গেল নয়ানে কাজর।
ভুলিলে কি ভোলা যায় ও শ্যাম তোমারই গঠন,
হিয়ায় বাঁধা রইল জনমের মতন॥ —ঐ

৪৮

সখী, কে বলে পীরিতি ভালো গো,
নিঠুর কালিয়ার সনে পীরিতি করিতে
কাঁদিতে জনম গেল গো।

প্রথম পীরিতি করল যখন, করে এনে দিত রমণীরঞ্জন,
অবশেষে আমায় করিল বঞ্চন সে ধন হরিয়া নিল গো,
দাস জ্যোতি বলে আগে না বুঝিয়ে কঠিন করেছ ভুল গো,
সখী কে বলে পীরিতি ভালো গো ॥

৪৯

আমার মন উতলা সদাই পরাণ কাঁদে,
বাঁকা প্রেম-ফাঁদে নিল দুকুলে হরে।
বাঁকা শ্যামের বাঁকা নয়ন ফাঁদে
বাঁকা সকল শরেতে, বাঁকা নয়ন ফাঁদেতে
আমি ধৈরয ধরিতে নারি নারীর প্রাণেতে
উপায় বল গো, বিন্দে, ওগো বিন্দু প্রেমেতে,
নয়ন ধারা ঝরে বহে নয়ন-বারি তুফান বানেতে ॥ —ঐ

৫০

কৃষ্ণপ্রেমে মাতি জলে যাসনে কলাবতী
ওগো, ধনি, ধৈর্য বাঁধ,
হঠাৎ যদি কানাই আসে চৈলা যাবি, বাঁধ না পাশে,
ধুঁয়ার ছলেতে বসে কাঁদ, ধনি গো, তুই ধৈর্য বাঁধ ॥
দুখের ভাব মুখে রাখবি আর চোখে চোখে কথা বলবি
পলকে পাতবি ছাঁদ।
প্রথমের কথা মনে রাখবি ঘুমাস না তুই জেগে থাকবি,
ধরবি যদি চাঁদ, ধনি গো, তুই ধৈরয বাঁধ ॥ —ঐ

৫১

মেঘ আঁধার রাতি বিজুলী চমকে
এমন সঙ্কট পথে এলে কার সাথে,
বঁধু, এত রাত কিসে ?
এলে, বঁধু, ভাল করিলে, তুমি বস পালঙ্কেতে,
তোমার পা ধুয়াব নয়ন জলে মুছাইব কেশে।
যার সঙ্গে যার ভাব থাকে মরিলে না টুটে বঁধু,
লাল শালুকের ফুল ফুটে আঁধারেতে ॥

৫২

হে প্রাণধন, কেমনে রাখিব জীবন ॥
যারে না দেখিলে, রইতে নারি তিলে তিলে গো,
আমায় ছেড়ে কোথা সে এখন ॥
চলনে চলনে মনে পড়ে বদনে, চলিতে না চলে চরণ ॥
কি করিব কোথা যাবো, কোথা গেলে তারে পাব,
ঘরেতে না ঠহরে মন, শুন বলি, গুণমণি, অধম বিনার বাণী,
আর না হেরিবে সে বদন ॥ —ঐ

৫৩

ফুল তুলি নানা জাতি, নির্জনে বসি মালা গাঁথি গো,
বঁধুর গলে দিব বলে আমার আশা ছিল ॥
অধম বিনার বাণী, শুনি বলি, ওগো ধনী,
পর-পিরীতের এমন ধারা যেমন হাতে চাঁদ পাইল ॥

৫৪

আমার ভালোবাসা বিনে আমি রইব কেমনে।
বহুদিনের ভালোবাসা আমার ভাঙ্‌ল কেমনে ॥
কি কহিব, সহচরী, আমি গুম্‌রে গুম্‌রে মরি গো।
নিলাজ নিঠুর সে যে জানিলাম এতদিনে ॥
কি শোক বিঁধিছে মোরে, বাজিছে হৃদয়-মাঝারে,
এ দুঃখ কাহারে বলি আমি ভাবি রাত্রিদিনে।
মনে পড়ে গুণ, ভুলেও ভুলতে পারি না গুণ,
কিসে হবে শান্তি তাহা অধম বিনা গুণে ॥

৫৫

ওরে প্রেম করে ডুব দিবে বলে
আমি জানি না গো, সখি।
একে নারী কুলবালা, ওগো, তাতে যৈবন জ্বালা,
ওরে, বড় খেদ মনে উঠে থাকি থাকি।
ওরে, বিধাতা করেছে আমায় এমন পিঁজরার পাখী ॥
ওরে, প্রেম করে ডুব দিবে বলে, আমি মানি না গো, সখি।

দারুণ মদনানলে আমার দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
তিলেক নিবারণ হয় না, সখি।
ওরে তুষের অনল যেমন, আমার জ্বলে ধিকি ধিকি।
ওরে প্রেম করে ডুব দিবে বলে আমি মানিনা গো, সখি॥
ভণে বামা অতি দীনে আমি আগেতে মানিলে মনে,
এমন প্রেম আর কে করতো, রে সখি।
ওরে, পরাইয়ে প্রেমফুলের মালা, কালা দিয়ে গেল ফাঁকি,
ওরে, প্রেম করে ডুব দিবে বলে আমি মানিনা গো, সখি॥

—কাঁঠালি গ্রাম

৫৬

দিবা অবসানে নিকুঞ্জ কাননে কে বাজায় মোহন বাঁশী রে।
রাধা রাধা বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, অতুল প্রেম প্রকাশিয়ে।
কাননে বাজালো বাঁশী ব্রজবধূর কুল নাশি রে॥
শুনিয়ে বাঁশরী বাঁচে কি নাগরী,
আমায় নাগরে না ভালোবাসেরে।
কাননে বাজাত বাঁশী ব্রজবধূর কুল নাশিরে,
হেন লয় মনে নিকুঞ্জ কাননে সবে পরে প্রেমের ফাঁসিরে।
গৃহে ননদিনী যেন ভুজঙ্গিনী মাধবে মিলিত রাধায় রে,
কাননে বাজাত বাঁশী ব্রজবধূর কুল নাশিরে।
কহে ভবপীতা শীঘ্র যাও তথা পরে সব প্রেমের ফাঁসিরে॥ —ঐ

৫৭

আমার প্রাণ কাঁদে, রে সখী, ঝরে দুনয়ন,
নিশি গেল আপনিতে দেখা না হইল সাথে গো।
কোথা রইল আমার ঐ প্রাণের ধনি,
কামবাণে পঞ্চশরে বিন্ধ তনু জরজরে গো।
দিবানিশি বিন্ধে আমার হিয়াতে মদন॥
ফুলের মধু ফুলেই রইল ভ্রমর না করে পান।
যতনে রাখিলাম তারে রেখেছিলাম হৃদয়ে ধরে গো।
এবার আমি হলাম অপর না বাসে তার মন॥

রসেতে তাহার জীবন, রস ছাড়া না হয় কথা গো,
না ভাবিও শুন বিনার বচন। —ঐ

৫৮

তুমি বনমালী আমি কুসুমকলি,
তোমার প্রেমসূতায় মালা গাঁথব,
দুজনে মিলিয়ে রহিব, তুমি শশধর আমি ফণিবর
তোমার আলোক পেলে আমি হাসব,
দুজনে মিলিয়ে রহিব।
ভালোবাসা এমনি আশা পেলে তার মিটে আশা,
তিলে তারে না দেখিলে থাকি মন গুমরে।
দেখা দিবে, ওগো ধনি, দেখা দিবে নিরজনে॥ —ঐ

৫৯

ব্রজের যতেক যুবক জন, বাঁশীরে সবাই বলে রাধা,
ভালা, বাঁশীরে, কিবা আছে মনে বল না।
এমন তোমার কঠোর মন হরি নিলে সব গোপীদের মন,
বন্ধু, তাও কি দয়া হইল না।
এ'ঘর দুয়ার পতিত পিয়ার ভরম শরম ত্যজিলাম দুই,
তাও কি দয়া হইল না, বন্ধু!
যখন তুমি বাজাও হে বাঁশী,
কলসী লইয়া যমুনায় আসি
ভালা, বাঁশীরে, তোমার দয়া হইল না।
হেন উদয়সিংএ বলে দুটো জোড় হাতে
তাও কি, বাঁশী, দয়া হইল না, ভালা বাঁশীরে॥ —ঐ

৬০

পুন বাজাও বাঁশী, কালশশী, এই যমুনার কুলে,
কোথায় আছো কোন বিজনে,
এস আমার মানস-বনে,
এস চূড়া ধরা করে, বাঁশী নিয়ে আঁধার গোকুলে
এই যমুনার কুলে।

ঐ নীল যমুনায় দুকুল ভাঙ্গা সহসা ডাকতো বান,
সত্যসুখে অধীর হয়ে যাক বয়ে উজান।
ডাকছে তোমায় গোপবালা গাঁথ প্রেম ফুল মালা।
তাদের ঘুচাও জ্বালা পরম আশায় আর থেক না ভুলে॥ —ঐ

৬১

থাকি যবে মম ভবন মাঝে বেষ্টিত গুরু স্বজন সমাজে,
থাকি কুলধর্ম ধ্যানে কি অদ্ভুত জ্ঞান ভেঙ্গে দেয় ধ্যান,
আচম্বিতে পশি বাঁশী কানে গো।
ওলো সহচরী, শ্যামের বাঁশরী বল্ কি মোহিনী জানে,
বল্ কি মোহিনী জানে॥
কুলধর্ম নারীর অচ্ছেদ্য বন্ধন খুলে যায় তার এমনি আকর্ষণ,
বাধা কিছু নাহি মানে।
যতনে যেমন লোহার বন্ধন টিকে না চুম্বক টানে গো।
মন্ত্রের প্রভাবে বিহরে ফণি, ফণীর ভাবেতে থাকিতে পারিনি,
আকুল বাড়ায় প্রাণে।
কেন কুলবালা হয়ে উতলা বাহিরে টানিয়া আনে গো।
ওলো সহচরী, শ্যামের বাঁশরী বল কি মোহিনী জানে॥ —ঐ

৬২

অঙ্গের বসন পরশে হরষ মন দরশনে নয়ন জুড়ায়,
বল তবে কি পাওয়ায় দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়,
লোকে বলে. ভুল তারে।
হায়, আমি কি ভুলিব তার, সে ভুলে তো ক্ষতি নাহি তার।
বল কি হবে পরের কথায় দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়॥ —ঐ

৬৩

শ্যামের বাঁশী দিবানিশি, ওগো, ডাকে নাম ধরি,
আকুল হইল প্রাণ, গৃহে রইতে নারি।
জ্বালা দিত বড় ভারীরে বাঁশী কাল অইল,
গুরুজনা পরম্পরা—ওগো উপায় না হেরি
আকুল হইল প্রাণ গৃহে রইতে নারি।

রে বাঁশী কাল হইল—হায়, আমার কি হইল
কি করি ঠিক করি, বল ॥
তিলেক না ছাড়ে দ্বার ননদী প্রহরী,
রে বাঁশী কাল হইল।
গেলে যে কুল যায় আর না গেলে যে মরি,
দুর্যোধন বলে, গেল প্রাণ গুমরি গুমরি। —ঐ

৬৪

কেমনে যাইব গো জলে, সখি, কেমনে যাইব জলে।
কালিয়া কুটিল কত করে ছল,
দাঁড়ায়ে যমুনার কূলে, সখি, কেমনে যাইব জলে।
নাম ধরে সদা বাজায় গো বাঁশী
বাঁশীর স্বরেতে মোর নিল আকর্ষি,
সখী, গৃহকর্ম যাই ভুলি, ননদের গঞ্জনা সহিতে পারি না।
কান্দিতে বসি রান্নাশালে,
কদম্বতলে কালা করে গো থানা, অপমানের কিছু বাকি রাখে না,
সখি, তো নন্দের ছেইলা।
কত করি মানা শুনিলে শুনে না
আঁচল ধরিয়ে টানে, সখি।
দুর্যোধন বলে তবু মন গলে
আঁচল ধরিয়া টানে, সখি ॥ —ঐ

৬৫

শুন গো মরম সই সরম তোমারে কই,
নিঠুর প্রেমে উপজিল জ্বালা বিন্ধিয়া নয়ন বাণে,
জরজর কৈল প্রাণে অকুল ছাড়াইল আমার।
আমরা কুলবতী নারী কুলকে তো যেতে মরি—
ও ললিতে গো, আর না শুনিব বংশীধ্বনি,
জগতে নাম হইল কলঙ্কিনী।
অগাধ শীতল বারি, আছে কমল সভা করি।

মধু বিনে অলি নাই বসে গো যেমনি পদ্মের দশা,
মধু হীনা ফুলে ভ্রমর না বসে গো ॥
শীত বসন্ত কালে বৃক্ষ তরু মূলে
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে লাল ফুল,
সেই সে ফুলের গন্ধে মজেছেন গো ব্রজবাসী
ভাবিতেছে গৌরাঙ্গিয়া তবে গো ॥ —ঐ

৬৬

আগে না বুঝে, রাই, কালার-পীরিতি কেনে করিলি
ননদী গুরু গঞ্জনা প্রাণে কত সইলি।
কালা ভজার জ্বালা কত তুই তো হাতে হাতে দেখলি,
আবার কি সাধেতে রাধা সাধে গায়ে কাদা মাখলি।
ওলো, ডুবিলি, রাধে, এই পাগলীকে ডুবালি ॥ —ঐ

৬৭

শ্যাম গরবে গরবিনী গরবে ভরা গা,
যোগী ঋষি পায়না যারে সে দাঁড়ায়ে কুঞ্জ দ্বারে,
বিনোদিনী, বদন তুলে চা।
এখন কই ছিলি কোথা কই প্রাণকান্ত কোথা
আচম্বিতে মুখে নাহি রা, গরবে ভরা গা।
বঁধু, তোমার নামটি ধরে ডাকতে নারি,
মুখে রা রা উপারি অন্তরে বহিয়া গেল ধা।
পৃথক যুগল দেখতে নারি শুন শুন রাই কিশোরী
পাগলী ভাসে হাসে লয়ে যা।
শ্যাম গরবে গরবিনী গো গরবে ভরা গা। —ঐ

৬৮

শুন, ওগো কালশশী,
আর কেন বাজাও বাঁশী দিবানিশি,
তুমি বাঁশীর স্বরে মন করিলে চুরি হে।
পহিলে, ওগো, অবলা নারী ॥

গোকুলে গোপীদের ঘরে তুমি মুনী চুরি করেছিলে,
ও তোর চোরা স্বভাব গেল না তুমার হে।
পহিলে অবলা নারী॥
আর না বাজাইও শ্যাম, বাঁশীতে রাধার নাম,
নইলে ভেঙ্গে দিব তোমার ঐ বাঁশরী হে,
পহিলে অবলা নারী॥
দেখিয়ে পরের নারী তুমি ধৈরজ ধরিতে নার, হরি,
লাজের লেশ নাহিক তোমার হে,
পহিলে অবলা নাহি॥
তুমি বাঁশীর স্বরে মন করিলে চুরি হে,
পহিলে অবলা নারী॥ —ঐ

৬৯

বাঁশরীর স্বরে ডাকিছে শ্যাম,
আমি পাই কি না পাই যাই কি না যাই,
হেরিবারে বাঁকা মোহন বাম
বাঁশরীর স্বরে ডাকিছে শ্যাম।
বাঁশরী বাঁশরী কিশোরী কিশোরী
কিশোরী মনে মরে গো রাই।
বাঁশরীর স্বরে ডাকিছে রাই॥ —ঐ

৭০

প্রতিপদের চাঁদ যেরূপে উদয়
দেখিতে দেখিতে অস্তগত হয়।
স্থায়ী না থাকে গগনে;
সেইরূপ রীতি শ্যামের পীরিতি হইল কপাল গুণে॥ —ঐ

৭১

শুন গো, মরম সই, সরম তুমারে কই,
সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়াছে মুখ ফাঁদ
ব্যাধ রূপে কদমের তলে।

নাচয়ে কদম্বতলে ভরিতে নামিলাম জলে
জল ভরি কলসী হেলায়ে ॥
শ্রবণে দংশিল বাঁশী মরমে রহিল পশি মরেছিনু মন মোর ছিয়ে ॥
একই নগরে থাকি, কভু নাহিঁ তারে দেখি,
সে কভু না দেখয়ে আমারে। আমি কলাবতী বামা,
সে কেমনে জানে আমা করে দিল তারে —ঐ

৭২

সখীসঙ্গে বিনোদিনী কৃষ্ণ আলাপনে।
হেনকালে শ্যামের বাঁশী বাজিল বিপিনে ॥
আর না বাজিহ বাঁশী আর না বাঁজিহ ॥
সাজিয়ে চলিলাম কুঞ্জে আর কেন বাজো ॥
সরল বাঁশের বাঁশী তুমি অন্তর সরল।
কৃষ্ণসুধা পান করিয়ে তুমি উগার গরল ॥
যে ঝাড়ের বাঁশী তুমি তার নাগাল যদি পাই,
ডালমুলে উপাড়িয়ে যমুনায় ভাসাই ॥
যদুনাথ দাস বলে বাঁশী কি বা দোষী।
যা বলে মুরলীধর তাই তো বলে বাঁশী ॥ —ঐ

৭৩

একে নারী কুলবালা তাথে যৌবন জ্বালা
আমি আপন দুঃখে থাকি,
বিধাতা করেছে যেমন পিঞ্জরার পোষা পাখী ॥
দারুণ বিরহ জ্বালে দিবানিশি হিয়া জলে,
তুষের অনল যেমন জলে ধিকিধিকি ॥
প্রেম করে দুখ দিবে বলে না জানি, সখী,
আমার কুল গেল কলঙ্ক হল বঁধু হে তোমার লাগি,
আমার শ্যামবধূ চলে গেল কোন পথে ॥ —ঐ

৭৪

মোহন প্রেমহারে বাঁধবো তারে প্রেম সজনি,
চুরি করে পালিয়ে গেছে ভাঙ্গা প্রেমের হৃদয়খানি।

সই লো সেই প্রেমের খেলা,
নূতন প্রেমে দেইলো জ্বালা,
প্রেম পিয়াসী প্রেম নাগরী কোথায় আছে।
খুঁপি চুলটি আউলে দিয়ে বাঁধবো রে সই চাঁদে লিয়ে,
চাঁদ চাঁদ চাঁদের আলো, চাঁদ এসে সই মিলবে ভালো॥ —ঐ

৭৫

যখন আমরা কাম করি, বাঁশী বাজে নাম ধরি,
ওই বাঁশী কুল লিতে চায়গো, বল, বৃন্দে, রইব কেমনে।
শাশুড়ী ননদী বাদী, আর চুপে চুপে কাঁদি গো,
আমি আর কাঁদি ইনায়ে বিনায়ে,
বল, বৃন্দে, রইব কেমনে, গোকুলে রইব কেমনে।
পীরিতি হইল শূল কেমনে রাখিব কুল গো,
আমার কুল রাখা হইল বিষম দায় গো।
বল, বৃন্দে, রইব কেমনে গোকুলে রইব কেমনে॥
অধম দুয়ারী গায় ভাসে দুখ আদরিয়ায় গো,
আমার ঐ দুখে তনু জরজর গো,
বৃন্দাবনে রইব কেমনে, গোকুলে রইব কেমনে॥
সবাই মিলি যুক্তি করি আমরা দেশে দেশে ফিরি,
কালিয়া কুটিলের প্রেম আমি পাশরিতে নারি॥ —ঐ

৭৬

কিবা জ্বালা হল আমার কালার পীরিতি।
নিরবধি আঁখি ঝুরে, প্রাণ কাঁদে।
নবীন বায়ুতে মীন যেমন না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে।
কালা নিল জাতি-কুল, প্রাণ নিল বাঁশী।
কালিয়া শ্যামের লেগে হব বনবাসী॥
কালো কেশে কালো বেশে নোটন বাঁধিব।
যখন শ্যামকে পড়বে মনে এলায়ে দেখিব॥

শ্যাম নামের হার গাঁথিয়ে গলায় পরিব।
শ্যাম নাম করে আমি পথে চলে যাব॥
ননদী ক্ষুরের ধার শাশুড়ী বড় রাগী।
নয়ন মুদিলে বলে, কাঁদে শ্যামের লাগি॥
এ'ঘর বসতি ছাড়ি যাব বৃন্দাবন।
বিরলে কান্দিব গিয়া তরুলতা সম॥
শুনিলে সে তরুলতা কহিবে শ্যামেরে।
তা শুনিয়ে প্রাণনাথ যদি দয়া করে॥
শশিশেখর বলে শুন বিনোদিনী।
শ্যামের সঙ্গে প্রেম হয়ে এই হল জানি॥ —ঐ

৭৭

দিবসেতে বংশী বাজে, রাই, গুরুজনার মাঝে—
চারিদিকে বাধা বাঁধা তার মাঝে কুরঙ্গিনী,
উপায় না দেখিয়ে পায়, যেন মতে গৃহে রবে রাধা।
ধ্বনি শুনি ধনী উনমত মনোমোহিনী
ঠেকিল গো উপ উপরোধে, বংশী বাজিছে, জয় রাধে রাধে॥—ঐ

৭৮

আর, সখি, অগ্রে কৃষ্ট হৃষ্টপাত
চাপ বংশী স্বর নাদ জ্বালা মোর গুরু দুরুজন।
শনি ইন্দু ছয় রিপু অগ্রসিয়া আছেন বপু
দাবানলে মদনে বেদন।
হেন মতে ধনী, শরেতে হরিণী
বাধে না গো দগধে এই ব্যাধে,
বংশী বাজিছে জয় রাধে॥
তবে গেলে যায় কুলমান,
না গেলে সে ভাঙ্গে প্রেম
হৈল ধনির মনে বিষম বাদ
সতী গৃহে গুরুজন যেন দশ বন্ধন।
শুনিয়া তুরঙ্গ বংশীর নাদ॥

না দেখি উপায় কমলিনী রাই
পাড়ল দারুণ পরমাদে।
বংশী বাজিছে জয় রাধে রাধে॥
উপায় না দেখিলে প্যারী বল শুন ওহে হরি,
তুয়া নাম সঙ্কট-ভাঞ্জন।
দ্রৌপদীর খণ্ডিলে লজ্জা, সভাতে পড়িত ভার্যা
তেন কর অধীনেতে রণ
গৌরাঙ্গিয়া হীন সেবে নিশিদিন,
সঁপিলাম গো মন আমি ও যুগল পদে।
বংশী বাজিছে রাধে রাধে॥ —ঐ

৭৯

কুপ ক'রে পাখী ঝোপেতে লুকালি, ওই যে জাগাহিলি গাছে।
শোনরে, কোকিলা, তোরে বলি, এত সুখে কেন দাগা দিলি
পড়ে রইল কমল কলি, অলি কাঁদে ওই,
কোকিলা ডাকি কি হ'ল,
ডাকি ডাকি কেন ভাঙ্গাইলে ঘুম।
পরের পরাণে বঁধুয়া
যাও যাও তোমার ভালবাসা গৃহে—
সে আছে মরমে মরিয়া, আগে না বুঝিয়া,
প্রেমে রাজি হইয়া সঁপেছিলাম তোমায় যাচিয়া। —

৮০

কি কলঙ্ক দিয়াছ মোরে!
আর চন্দনে বলে (আমি)
মাইখ্যাছি শিরে লাজ ভয় করি দূরে,
ব্রজের যত গোপিনী ছিল, একে একে কলঙ্ক নিল,
(এখন) আমি যদি বাড়ী না আসিতে পারি
হাসিবে জগতের নারী।
(লজ্জা) নইজ্জা রাখ মোর গিরিধারী,
কি কলঙ্ক দিয়াছ মোরে॥ (ধূয়া)

তুমি যে কালিয়া জলে, পাঠাইয়া
অমন নিশ্চিন্ত সব থাইক্যা, হরি।
সত্য যুগেতে রাম, রাঘব হরি
হনুনামে আইসে সাগর বন্ধন করি।
জনক নন্দিনী উদ্ধারিবেন তিনি এখন বধ করি কুশলবে রে।
নইজ্জা রাখো মোর গিরিধারী ॥ ধ্রু
হেয় নরুয়া বলেছি তাই
পইড়ে পরভুর আজ্ঞায় রাঙ্গা চরণ পায়।
যা কর তা কর, ওহে নটবর,
আমি হামেশে অবলা নারী রে ॥ —ঐ

৮১

দাঁড়ায়ে তরুর মুলে, আড় বাঁশীটি জয় রাধে বলে,
ওই বাঁশী ওরাই ডাকে ও নাম ধরে গো।
আমায় বলে দাওনা কে বটে গো কে বটে গো,
ওপার হতে শুনি জল ঘাটে বাধা ঘাটে
আমায় বলে দাওনা কে বটে।
তবে বগলীনাথ ছুতারে বলে
আজ কাজ কি লো যমুনার জলে।
সঙ্গে আছে ননদিনী সত্য কথা মিথ্যা করে,
পাছে ভাবি আমার ঐ কলঙ্কই ঘটে।
আমায় বলে দাওনা কে বটে
ওপার হতে দেখি না জলঘাটে ॥ —ঐ

৮২

শুন গো, বিন্দে, দিবানিশি প্রাণ কাঁদে গো,
আমি থাকিতে না পারি ধৈর্য ধরিয়া।
গো বৃন্দে, এখনও না এলো কালিয়া ॥
শুন গো সহচরি, আনগো গরল খেয়ে মরি গো,
আজি এ জীবন রাখিব কার লাগিয়া।
এখনও না এলো কালিয়া ॥ —ঐ

৮৩

আমার শ্যাম বিনে ভেবে ভেবে তনু হইল ক্ষীণ।
এখন সহিতে নারি সেই যৌবনেরই জ্বালা,
প্রাণসখা, হাওয়াতে নিবিল দীপ আলা।
তবে জলেরই ওপরে বিক্ষ আকাশে তার মূল,
ওহে পঞ্চটী ফুলে ফুটে আছে একইটি বকুল।
সাধু—সে কেমন ফুল।
নীল নীল শ্বেত জবা, এখন ফুটে পদ্মফুল।
ওই ফুল তুলিতে গেলে হবি রে বেভুল।
হেন ভরজু রামে ভণে সে কেমন ফুল,
ওই ফুল তুলিতে গেলে হয়েছি বেভুল॥ —ঐ

৮৪

আঁধার ভাদর রাতি দেখিয়া তড়পে ছাতি
পতি নাহি পালঙ্কের উপর।
(সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে)॥
একে তো অবলা বালা দোসরে যৌবন জ্বালা
কেমনে রহিব শূন্য ঘরে।
সখীরে, প্রাণ দহে মদনের শরে
শুন শুন সহচরী তো দিগে বিনয় করি
বাঁচাও আসিয়া সে নাগরে।
(সখীরে, প্রাণ দহে মদনের শরে)॥ —ঐ

৮৫

উচ্চস্বরে বাজে বাঁশী শ্রীরাধার নাম ধরি, বাঁশীর স্বরে মরিল বনের হরিণী।
নব নব নবরঙ্গিনী ব্রজের গোপিনী কি খেনে জন্মিল বাঁশী,
বাঁশী করে সর্বনাশী।
এমনি পিরিতের ধারা ভুলায় যেমন ক্ষেপার পারা,
ছাড়া জাল শরে বিন্ধা হরিণী।
মথুরা বলেন গৌরঙ্গ পিরিতি করা হইল দায়,
না শুনিলে গুরুজনার বচন, মরি। —ঐ

৮৬

খপাঁয়ে কেন ফুল দিলি গুঁজে, ও তুই না বুঝে আর না সুজে।
কুল দিলি তুই মন দিলি কই, অন্তরেতে শেল বাজে।
তুমি কি বুঝিবে, বঁধু, যার জ্বালা হে সেই বুঝে।
পুরুষ যে ভরমা জাতি, নারীর ব্যথা সহজে
বুঝবে না। কি যে যাতনা, মরমে মরি লাজে॥
ফুলে তোমার ছিল কাঁটা অন্তরে তা বিঁধেছে।
তুমি তো বেসেছো, বঁধু, বিপিন বসে কেঁদেছে॥ —ঐ

৮৭

চোখ ঠার শ্যাম কেন অবলায়, ঘরে আছে ননদ নাওরা।
তোমার টানে মন কি মানে, বাসে না মন সরে হায়।
ঘরের বাহিরে হতে নারি, বেদনা বেঁধে হিয়ায়,
তোমার সাথে নিরালাতে কেমনেতে মিলব, হায়॥
কেমনেতে মনের আশা মিটাব প্রেম পিয়াসায়।
আকুল ব্যাকুল হিয়া পড়েছি হে দোটানায়।
বিপিন ভণে তোমার প্রেমে কুল রাখা হয়েছে দায়॥ —ঐ

৮৮

কালার গুণের কথা বলবো তোরে কি তা,
জলকে যাই ছল করে, যমুনার ঐ তীরে।
কলসী কাঁখে ধীরে ধীরে ননীচোরা নামটি ধরে বেড়ায় ঘুরে।
আবার ও কদম তলায় চুপটি করে,
বসে থাকে গোপিনীদের বসন হরে।
কালো শশী বাজায় বাঁশী সকল কাজে সকাল সাঁঝে।
প্রাণ আমার, হায়, হয় উদাসী মন বসে না আর ঘরে॥
শুনলো, সখি, স্বপনে নিরখি আমার সে প্রাণবধূ আসিবে।
(আমার) নাসার যে স্বরে, পরশ সে করে।
গেল ঈসত ঈসত হাসিয়ে, ও সখি, বড় সুখে ছিলাম ঘুমায়ে।
দিল মদনা মোক্ষ জাগায়ে॥ —ঐ

শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ

১

শুন গো, রাই, বলি তোরে, তোর সঙ্গে পীরিত করে,
আমার এই হলো ঘটনা।
পরাইয়ে ফুলের মালা, সখী, আমায় যাতনা দিও না।
আগে যে বলিলে, ধনি শেষে না ছাড়িব তোরে আমি,
সেও নবীন প্রেমের ঘটনা।
সেও নবীন প্রেমের ছলনা॥
পরাইয়ে ফুলের মালা, সখী, আমায় যাতনা দিওনা।
মনে রেখ, চাঁদবদনী, যেন আমায় ভুলো না।
নব নব প্রেমনাশে হোল ধনি তোমার দোষে
আমার যাওয়া হলনা,
রাধা শ্যাম দরশান শুন, চাঁদ বদনী
যেন আমায় ভুলো না॥ —ঐ

২

ফুল ফুটেছে যৌবনে আমার, এ বাস লুকাবো কেমনে তার,
অবিরত ভ্রমর কত ঘুরে থাকার চারিধার।
রাধিকারে প্রেমের ডোরে বারে করি হার গলার
করে বুকে ঘুমায় সুখে কে লিবে, সই, দুখ আমার।
বিপিন ভণে ঐ যৌবনে কারে দিব উপহার॥ —ঐ

৩

চাঁচর কেশ ঘুচাইব, মস্তকে জটা বাঁধিব
ত্যজি চন্দন, অঙ্গে ছাই মাখিব।
বনমালা দূরে ফেলি, রুদ্রাক্ষ পরিব গলে,
বসন ত্যজি বাঘাম্বর পরিব।
শিঙ্গায় বাজাব জয় রাধা রাধা, তেয়াগিব বাঁশী।
ভুলিব ব্রজের শোভা গোপীকৃষ্ণ মনোলোভা,
ভুলিব বাল্যের সখাগণ, ভুলিব কালিন্দী নদী।
ময়ুর কোকিল ভৃঙ্গ আদি ভুলিব সাধের বৃন্দাবন।

ভুলিব ভুলিব সব নহে সেতো অসম্ভব
ভুলিতে পারিব রাইয়ের বিধু মুখের হাসি।
বৃন্দে, বোস গো তবে আসি,
এ জীবনে বৃন্দাবনে আসি কিনা আসি ॥ —ঐ

৪

বল ভাই, সুবল, ওকে বটে বল,
যমুনায় কে আনতে যাচ্ছে জল ॥
কাঁখে কুম্ভ বাহু তুলে যাইছে যমুনার জলে গো।
কপালে সিঁদুরের ফোঁটা করে ঝলঝল ॥
গৌরাঙ্গেতে নীল বসন, কেমন সেজেছে ভূষণ গো।
পায়ে আলতা চোখে কাজল ধনি ভাবে টলমল।
শ্যাম পীরিতির এমনি লেঠা ছাড়িলেও না ছাড়ে সেটা গো।
সিঁয়া কুলের কাঁটা যেন লেগেছে হিয়ায় ॥ —ঐ

৫

যার জন্যে মস্তকে বাঁধি বাহন,
যার জন্যে বাজাতাম বাঁশরী।
যার জন্যের ঘাটে দানী
যমুনায় বহি তরণী।
যার জন্যে করি গোচারণ।
সে রাধা ত্যজিল মোরে,
রইবনা আর ব্রজপুরে হব কাশীবাসী।
বৃন্দে, বোস আমি আসি।
তেয়াগিয়ে মহামায়া যাব যথা যোগমায়া
বিরাজিতা সে, বৃন্দে, শিখরে পৈরাগে কামনা করে,
তেয়াগিয়া কলেবরে যেন দয়া জনমায় অন্তরে,
যেন রাখে রাই রূপসী, বৃন্দে, বোস আমি আসি ॥ —ঐ

৬

একই মনে দুই জনে বসিহে সখারি সনে,
স্মৃতি হইল মরমেক বাণী, আমার সুবল সখারে—

কোথায় আমার সুচান্দ বদন, ধনিরে।
কণ্ঠেতে জিনিয়ে কুম্ভ অধরে তাহার বিম্বরে।
স্মৃতি হইল মরমেক বাণী.
কোথায় আমার সুচান্দ বদন, ধনিরে।
মৃগটি জিনিয়ে কুম্ভ অধর তাহার মধুর,
স্মৃতি হইল মরমেক বাণী সুবল সখারে—
কোথায় আমার সুচান্দ বদনী কি দিব রূপের সীমা
দিতে নারী তাহার উপমা।
গৌরাঙ্গের জুড়ি যুগল পাণি
সুবল সখারে কোথায় আমার সুচান্দ বদনী ॥ —ঐ

উৎকণ্ঠিতা

আমার মন উতলা সদাই পরাণ কাঁদে বাঁকা প্রেম ফাঁদে,
নিল দুকুল হৈরে বাঁকা শ্যামের বাঁকা নয়ন ফাঁদে।
বাঁকা নয়ন ফাঁদেতে।
আমি ধৈরয ধরিতে নারি নারীর প্রাণেতে
উপায় বল, গো বিন্দে, ওগো বিন্দু প্রেমেতে,
নয়ন ধারায় ঝরে বহে নয়ন বারিতে,
তুফান বানেতে ॥ —বাঁশপাহাড়ী

বাসক সজ্জা

১

ঘন ঘন পথ হেরি ব্যাকুলিত হল প্যারী,
কহ, সখি, করি কি উপায়।
দ্বিতীয় পহর নিশি নাই আইল কালশশী
কার কুঞ্জে হলেন উদ্দীপন।
পথ হেরি হেরি আমার ঝুরত নয়ন গো
নাই আইল মদনমোহন।

তবে বুঝি বিধি হইল বাম, কুঞ্জে নাই আইল শ্যাম,
কার কুঞ্জে বিরাজিলেন হরি।
দ্বিতীয়া পহর নিশি নাই আইল কালশশী
পাতিয়া ফুলের সজ্জা ;
লজ্জারই কারণ গো, কই আইল মদনমোহন।
ওগো সখি, আমি বলে আশা দিয়ে
কোথা সে রইল ভুলে কোকিলা ছাড়ে নিঃশ্বাস
নিশি হইল অবসান।
কুঞ্জে কী আইলেন লম্পট বিহারী,
হৃদয়ে মদন করিছে দহন,
বিফলেতে যায় গো সখি, আমার এ নব যৌবন
কই আইল মদনমোহন॥
আর, সখি, জল বিনে পুষ্করিণী,
চন্দ্র বিনে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হলেন অকারণ।
সূর্য বিনে যেন দিবা পত্নী বিনে নব যুবা
এই বলি রাধা কান্দে অনুক্ষণ।
শ্রীনাথ সিংহ ভণে বড় আশা রইল মনে,
বিরহ বিচ্ছেদে রাইএর নিশি জাগরণ। —ঐ

২

ছোট ছোট কুঁড়িয়া ঝিটাসে ভিজিল নীল শাড়িয়া,
রে মাধব, এখনও না আইল কালিয়া।
আমার পীরিতি দেখি রিসাই মরে পাড়ার লোকে গো,
রে মাধব, এখনও না আইল কালিয়া॥

৩

সাজিলেন গোপীগণ ফুল তুলিতে কুঞ্জের বন,
আজ্র রে চাঁপার কলি তুলিয়ে বেড়াই,
মালা গাঁথিব সবাই আসিবেন মাধব হরি দিব গলায়,
মালা দেখি উঠে জ্বালা কই এলো কালা।
শুকনা বিচ্ছেদের ফুল, ফুটেছে আলো॥

গোবর্ধন কাতার বলে মালা দেখি মন টলে,
কৃষ্ণ প্রেমের ব্রজের গোপী মাতিল সবাই।
মালা গাঁথিব সবাই আসিবেন মাধব হরি দিব গলায়। —ঐ

৪

পুরানো বাসরের সাজ কই আইল রসরাজ,
ভবপিতা ভাবিছে বিবরণ গো, সজনি,
কই আইল মনচোরা, গো সজনি ॥
পুরাণো কৌতুকের আভা, আজ মলিন চাঁদের শোভা গো,
আজ রজনী হইয়া গেল ভোর গো, সজনি,
আইজ নাই এল মনোচোর, সজনি, এল না মনচোর ॥ —ঐ

৫

শ্রীমতী বসেন বিরলে ললিতা সখীরা বলে,
শুন শুন ওগো সহচরী।
ওগো আজি মোদের শুভদিন, আসিবেন শ্যাম নবঘন।
শ্যাম গো, শয্যা করবো যতনে।
কি আনন্দ আহা মরি, হেরব সুখে বংশীধারী,
বসাইব রত্ন সিংহাসনে।
ওগো পূজিব যুগল পদ্ম পুরাইব মনের সাধ,
হৃদয়ে বিধি সদয় এতদিনে।
ফুলেরই ওড়না, ফুলেরই ঝরনা, ফুলেরই মশারি শোভা পায়,
চারিদিকে অলিকুল, গুঞ্জরিছে অলিকুল
পূজিব তার রাঙ্গা চরণ ধায় ॥ —ঐ

৬

বঁধুর গলে দিব মালা, দিদিগো, কুল রাখিব না,
প্রথম পীরিতি হইতে আমি বঁধুর গলে দিব মালা,
তবু আমি কুল রাখিব না ॥ —ঐ

৭

মালা গাঁথা রইলো,
কি কারণে বঁধুর আমার মন ভাঙ্গিল।

যার লাগি গৃহত্যজি, থাকি গো নির্জনে বসিগো।
সে বঁধু ছাড়িয়া মোরে কোথা রহিল ॥
শেফালী চামেলী বেলি, যুঁই চাঁপা পারুল গো,
আধা ফোটা ফুলে আমার সাজি ভরিলো।
ফুল তুলি নানা জাতি, নির্জনে বসি মালা গাঁথি,
বঁধুর গলে দিব বলে আমার আশা ছিল ॥
অধম বিনার বাণী, শুন বলি ওলো ধনী,
পর-পীরিতির এমনি ধারা যেমন হাতে চাঁদ পাইল ॥ —ঐ

পাতিয়া ফুলের সজ্জা, একি হইল লজ্জা।
বিফল হল, নাগর কুঞ্জে না আইল,
বধিয়ে অবলা বালা, কোন দেশেতে গেল কালা,
বিরহ জ্বালায় আমার পরাণে দহিলে গো।
পিরীতি করিয়ে অতি, ছেড়ে গেল ব্রজপতি,
পুর্ণিমা রাতি আমার আঁধার হইল গো ॥
বিনয়ে বলে শুনগো দূতী, পুরুষ ভ্রমরা জাতি,
উড়িয়ে গেল ভ্রমর কোন ফুলে মজিল গো। —ঐ

৯

শুনগো ও দূতী করি গো মিনতি,
কোথা রহিল মনচোরা।
কেন এলো না গো গিরিগোবর্ধন ধরা ॥
কুসুম ফুটিল মধু ভরা হল, বিফলে বিহনে ভমরা
কেন এলো না গো গিরিগোবর্দ্ধন ধরা ॥
অবলা কামিনী জাগিয়ে যামিনী,
ভাবে ভাবে সকল অঙ্গ জরা
কেন এল না, গো গিরিগোবর্ধনধরা ॥ —ঐ

১০

গাঁথিব ফুলেরই মালা যতনে সাজাব কালা,
আমি ঘুচাইব মনের জ্বালা দুঃখ যাবে দূরে।

বন্ধু, হৃদয় মাঝারে শ্যামকে রাখিব আদরে।
না আইল নন্দলালা কেমনে মিটাব জ্বালা,
থাক থাক প্রাণবল্লভ বাঁধা প্রেম-ডোরে হৃদয় মন্দিরে।
শ্যামকে রাখিব আদরে॥ —ঐ

১১

যাগো যা ললিতে আন গো কুসুম তুলে,
করে রাখরে চুয়া চন্দন,
শ্যাম অঙ্গে করিব লেপন॥
ধুয়াব যুগল চরণ সুবাসিত জলে।
কুঞ্জেতে আসিবে হরি কুঞ্জ সাজাও,
বনমালী সবার সাজাব নানা ফুলেতে
যাগো যা ললিতে॥ —ঐ

১২

কই এল না লো, সই, লম্পট নিষ্ঠুর চিকন কালিয়া।
আসার আশে রইলাম বসে কই এলোনা সই কালাশশী,
বিরহ বিচ্ছেদে নিশি জাগিয়া,
রজনী প্রভাত হল, জাগিল বিহঙ্গ কুল,
পুবে অরুণ কিরণ ঢালিয়া,
ফুলের বিছানা পাতি, অকারণে গেল রাতি,
সারি সারি মোমের বাতি জ্বালিয়া।
দ্বিজ ফণী বলে কি করিব এ ছার প্রাণ আর না রাখিব।
প্রাণ ত্যাজিব অনাথ গো নয়ন খাইয়া॥ —ঐ

১৩

গাঁথিয়া মালতীর মালা, মালা রইলো ডালায় তোলা,
পুষ্পহার গেল শুকাইয়া।
মালা দেখে উঠে জ্বালা কই কুঞ্জেতে উঠে কালা॥
একলা কুঞ্জে কতই মনে পড়ে গো,
এমন বসন্ত সময়ে গো অন্ধকার দেখি বৃন্দাবনে গো।

কোকিলার কুহুস্বরে প্রাণ আমার কেমন করে,
কুহু কুহু ময়ুর ফুকারে।
হরি বিনে বৃন্দাবনে অন্ধকার রাত্রিদিনে,
আমার শ্যাম রয়েছে বিচ্ছেদ কাননে গো॥
ছিলাম শ্যামের গরবিণী করে গেল কাঙ্গালিনী
অনাথিনী রয়েছি পড়িয়ে গো।
আর যেদিকে নেহারি আঁখি সব শূন্যময় দেখি,
ভাবিতেছি রসিক চাঁদ তবে গো॥ —ঐ

১৪

বঁধুর লাগিয়া সাজ বিছাইনু গাঁথিলাম ফুলেরি মালা,
তাম্বূল সাজিলাম দীপক জ্বালানু মন্দির না হইল আলা॥
সখি, কোন সে নাগর এল, প্রাণবঁধু আসবে বলে
কোন সে নাগর এল॥
মালা গাঁথা আমার বিফলে গেল মালা শুকালো তাপে,
মরে মনস্তাপে কেমনে পরাণ রাখি লো।
আমার বড় সাধ মনে, এ রূপ-যৌবনে মিলিব বঁধুয়ার সনে,
দাও দাও মালা ভাসিয়ে দাও
কুঞ্জে নাগর এল না গো,
ফুলের আলিস, ফুলের বালিস, দাও দাও মালা ভাসিয়ে দাও।—ঐ

১৫

কৃষ্ণ আসিবেন আশে, শ্রীমতী রসরাজে
আসর বঞ্চিব হরির সঙ্গে,
আর এ অনুমান করে বেড়ায় সুন্দরী।
যুঁথি চামেলি ফুল, নাগেশ্বরী ফুল
পঙ্কটি ফুলের রঙ্কটি, ধনি, বাছ্যা তুলি রে।
শ্যামের সঙ্গে বঞ্চব বলে,
যত বেদনা হইবে বন্ধুর অঙ্গে।
আসিতে আসিতে শ্যাম গলে পরাইব,
যাইতে যাইতে গো শ্যামের অঙ্গে হারি দিবে॥

তুলে আনিব জবা গলেতে করিব শোভা
টগর মল্লিকা জয়া কেতকী চম্পক কিয়া
নাগেশ্বরী অতীব সুন্দরী,
আসিতে আসিতে হারি দিবি ॥
কুঞ্জেতে আসিবেন নাগর হেন পীতাম্বরে বলে,
ফুল গাঁথ যত্ন করে কুঞ্জেতে আসিবেন নাগর,
আসিতে আসিতে গো শ্যামের সঙ্গে পরাইবে
যাইতে যাইতে হারি দিবে। —ঐ

১৬

কুঞ্জেতে আসিবে হরি, কুঞ্জ সাজাও সহচরী,
বাসর সাজাব নানা ফুলেতে, ও ললিতে,
চল চল যাব ফুল তুলিতে।
ফুলের বিছানা করি ফুলের বালিশ করি
আসন বিছাব শ্যামের কোলেতে,
ওগো ললিতে, চল চল যাব ফুল তুলিতে ॥ —ঐ

১৭

কেন আশা দিয়ে না আইল শ্যামরায়
আমার বিফলে যামিনী যায়,
কোকিল, কুহুরে শেল সম বুকে,
কেন আশা দিয়ে না আইল শ্যামরায়,
আমার বিফলে যামিনী যায়।
বঁধু না আইল আশা না মিটিল, ধৈরয ধরা নাহি যায়।
নিশি পোহাইল বঁধু না আইল,
আশা না মিটিল, ধৈরয ধরা নাহি যায়। —ঐ

খণ্ডিতা

খণ্ডিতা নায়িকার লক্ষণ সম্পর্কে 'সাহিত্য দর্পণে' উল্লেখিত হইয়াছে,

পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্য সম্ভোগ চিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীষা কষায়িতা ॥

যাঁহার প্রিয় অন্য নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগের চিহ্ন নিজ দেহে ধারণ করিয়া প্রিয়ার নিকট উপস্থিত হন এবং তাহা কর্তৃক ঈর্ষা-কষায়িত দৃষ্টি দ্বারা অবলোকিত হন, তিনিই খণ্ডিতা।

১

রহিলে কোন কাজে না বল, শ্যাম, লোক লাজে,
দাঁড়িয়ে ফিরিয়ে কেন যাও, হে শ্যাম,
দেখা দিতে অবসর নাই।
এমনি করে চায় যে লাগে বঁধু হে—
তাগিদে টেনে উঠালে।
অপমানে তখন যাবে কেঁদে কেঁদে,
ও ফিরে যাও মানে মানে নিলাজ হে,
ওরে যাও মানে মানে ॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

যাও যাও ফিরে যাও ফিরে যাও,
মন বাঁধা যেখানে পরের পরাণ বঁধু,
দাঁড়িয়ে আছে ওখানে ॥ —ঐ

নিঠুর কালিয়া, জানিলাম তোর কপট হিয়া।
নিশিভোর এলে সাঁজের বেলা বেলা-বলিয়া ॥
সন্ধ্যা বেলায় আসি বলে দেখা দিলে নিশি ভোরে ;
কোনখানে পোহালে নিশি রাধারে আশা দিয়া ॥
ছি ছি বধূ এই কি রীতি গড় করি তোমার পিরীতি,
আমার অকারণে গেল রাতি মোমের বাতি জ্বালিয়া ॥
সারা নিশি জাগরণে, রাই আমাদের আছে মাঝে,
রাই আমাদের আছে মাঝে,
অধম শ্রীপতি ভণে যুগল চরণ ভাবিয়া ॥ —ঐ

৪

বলি চন্দ্রমুখী কি করিব সখী,
কেন লম্পট কুঞ্জে এল না গো।

বিষাদের বাতি জ্বেলেছে শ্রীমতী
তাহাতে আহুতি দিও না হে,
ফিরে যাও হে, মরম বঁধু
আমার এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।
নিবেদন করি যাও ফিরে হরি,
কত নারীর সঙ্গ করিয়াছ রঙ্গ
বঁধু শ্রীমতীর অঙ্গ ছুঁয়ো না হে।
গোবিন্দ দাস ভণে আশা করি ঐ চরণে॥
রাধে মান করিলে শ্যামকে পাবি না,
শুন ওগো পিয়ারী কহিতে বিচারি,
ফিরে গেলে শ্যাম আর আসিবে না॥

—ঐ

হের সহচরী যায় বিভাবরী
এলো না কপটের মূল রে।
কোকিলা কুহরে বিঁধিছে অন্তরে
মদনে বিরহ শূলরে॥
সুমধুর স্বরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
কুঞ্জে চুমি নব ফুল রে।
সুধাকর কর অনল প্রখর
গরল ভেল তাম্বূল রে॥
অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক যেমন,
সাপিনী নিল দুকুল রে।
কণ্টক সমান শয্যা অনুমান
দহিছে মম কুল রে॥
মরিবার তরে সে মজিল পরে
পরপ্রেমে প্রেমাকুল॥
ভবপ্রীতা ভণে মানস দর্পণে
হেরি সে রূপ অতুল রে॥

—পুরুলিয়া

তোমা বিনে, বিধুমুখী, চারিদিকে শূন্য দেখি,
প্রাণ বিরহে জলে জ্বালায় রে।
ফুলশরে হানে হিয়া পরে মোর মন জলে জ্বালায় রে।
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না কপট আমারে,
পাপিনী সম্ভোগ করেছে তোমারে।
ধিক্ ও নিষ্ঠুর কালা,—
শুন, হে অশুচি! উচ্ছিষ্টেতে রুচি না করে ব্রজেন্দ্রবালা।

৭

বিছাইলাম ফুলশয্যা লজ্জা হইল ভারী,
কার কুঞ্জে উয়ালে নিশি বাঁকা বংশীধারী।
আমরা গো বোষ্টম জাতি, তুলসীরো মালা গাঁথি,
ভাব ছাড়া না রহিতে পারি, গাঁথি মালা যতন করি।

—বেলপাহাড়ী

৮

যৌবনের যত জ্বালা, নাহি জানে অবলা
দংশে বিরহ ভুজঙ্গিনী, বরষিছে রিমিঝিমি
জলে সদা খেলে মীনি।
আঁধারো ভাদর নিশি নাহি সুঝে দশদিশি
কাঁদি ধনী একা কুঞ্জে বসি॥
টুটল চিত আশ মন ভেল উদাস,
কৈসে বাঁচত বিরহিণী রাধা কহে ললিতায়,
ভবপ্রীতা প্রেমে গায় কেঁদ না শ্যাম সোহাগিনী॥ —ঐ

৯

সখী দেখনা ওটা কেটা বটে কি জন্য দাঁড়িয়ে ওখানে গো,
যা যা তারে বলে দে ওহারে সরে যাই যেন মনমাঝে।
হের, সখী, ভালে শোভিছে সিন্দুর রাগে অঙ্গ গর গর,
সখী, সহে জর জর দহে কলেবর সরসর, বন্ধু, যাও মানে।

দেখ না বটে ওটা কেটা বটে শঠ শিরোমণি নিষ্ঠুর কালিয়া,
চন্দ্রা কুঞ্জে গিয়ে নিশি জাগাইয়া
ভোরে এল কালা দিতে প্রাণে জ্বালা।
আমার এ জ্বালা, যাবে কি জনমে
আঁকা বাঁকা অঙ্গ বাঁকা বাঁকা চেয়ে,
কালিয়া এসেছে কোন্ অভিপ্রায়ে
আমি হেরবো না সে কালা।
ফিরে যেতে বল বিফলেতে গেল বহিয়া,
দীন বালক দাসে ভণে ও রাঙ্গা চরণে।
স্থান পাই যেন ঐ চরণ তলে॥ —ঐ

১০

শুন বলি ওহে, হরি, তোমায় নিবেদন করি,
কি জন্য দাঁড়িয়ে কুঞ্জের দ্বারে।
ভালো যদি আছে কাজ ফিরে যাও রসরাজ,
চন্দ্রাবলী কি বলবে তোমারে, রাং কি পিতল সোনা,
চিনলি না, ভাই, পিতল সোনা,
চিনির পানা ছেড়ে খেলে চিটা,
কমল ছাড়িয়ে, বঁধু, নিমিখে মন মজাও তুমি,
উঠাইয়ে বৃক্ষের গাছে চারি পাশে কাঁটা দিলে
বাঁশী বলে মরুক গাছে তোদের এই বিবেচনা
বাড়ায়ে নিঠুর প্রেম করা হবে না। —ঐ

১১

শুন হে লম্পটাধম এবে তোমা জানিলাম বঁধু হে—
ভালবাসা মিছে সে কেবলি,
মুখেতে মধুরে ভরা অন্তরে গরলে ভরা, বঁধু হে,
ভালবাসা মিছা সে কেবলি।
দীনার নিবেদন না আইল নবঘন
বঁধু হে, মিছা সে কেবলি।

কানাই (কানাফুল) ফুটত আশা লাগে রে, সজনী,
এবারে আওত ভয়া (ভায়া) মোর।
কানাই উড়ত আশা ছুটে রে, সজনী, নোইরে আওত ভয়া মরি।
বিনন্দ সিংহ বলে ঝুমুরি বানাইবো বলে
কানাই উড়ত ছুটত রজনী, এবে রে আওত ভয়া মোর।

—অযোধ্যা

১২

শুন কালো সোনা লম্পটের এই গোড়া রাধে—
বাঁশীর স্বরেতে হারাস নে কুল,
সামাল, গো ধনি, হস্ না বাউল।
শুন গো ললিতে, বলিতে রাজসুতে, রাধে,
যমুনারই জলে যাস্না তুই—
সামাল গো ধনি হস্ না বাউল।
নরোত্তমা ভণে থাকবি গো সাবধানে, রাধে,
যমুনারই জলে যাস না তুই,
সামাল গো, ধনি, হস্ না বাউল॥ —অযোধ্যা

১৩

কোকিলার ডাক শুনি নিজ ভাবে গুণমণি গো।
আমার কলাপি কলাপি ওঠে ছাতিয়া,
ওরে পাখী, কেন ডাক নিশি ভোর রাতি।
নিশি হ'ল অবসান, না এল মোর বাঁকা শ্যাম হে।
সে যে আমায় দিয়ে গেল ফাঁকিরে ওরে।
দিবানিশি কেঁদে মরি—না এল মোর বাঁশীধারী গো,
আমার ঝর ঝর ঝরে দুটি আঁখিরে ওরে পাখী॥ —ঐ

১৪

ওই কলপে কলপে ওঠে ছাতি রে,
ওরে পাখী, কেনে ডাক নিশিভোর রাতিরে—
নিশি হৈল অবসান, আর না আইল মোর বাঁকা শ্যাম।
ওই কলপে কলপে ওঠে ছাতি রে॥ —বেলপাহাড়ী

১৫

বলি, চন্দ্রমুখী, কি করিব সখী,
কেন লম্পট কুঞ্জে এল না গো।
বিষাদের বাতি জ্বেলেছে শ্রীমতী
তাহাতে আহুতি দিও না হে,
ফিরে যাও হে মরম বধূ।
আমার এখানে দাঁড়ায় থেকো না।
নিবেদন করি যাও ফিরে, হরি,
কত নারীর সঙ্গ করিয়াছ রঙ্গ,
বঁধু শ্রীমতীরে আর ছুঁও না হে।
গোবিন্দ দাস ভণে আশা করি ঐ চরণে
রাধে মান করিলে শ্যামকে পাবি না।
শুন ওগো পিয়ারী কহিতে বিচারি,
ফিরে গেলে শ্যাম আর আসিবে না।
ফিরে যাও হে মরম বঁধু॥ —ঐ

১৬

বলি, চন্দ্রমুখী, কি করিব, সখী, কেন লম্পট কুঞ্জে এলোনা,
বিষাদের বাতি জ্বেলেছে শ্রীমতী তাহাতে আহুতি দিও না।
ফিরে যাওহে সরমে, বঁধু, আমার এখানে দাঁড়িয়ে থেকোনা।
নিবেদন করি যাও ফিরে হরি আমার এখানে দাঁড়িয়ে থেকোনা হে।
তুমি কত নারীর সঙ্গে বঁধুর হে করিয়াছ রঙ্গ,
শ্রীমতীর অঙ্গ ছুঁয়োনা হে ফিরে যাও হে সরমে বধূ।
আমার এখানে দাঁড়ায়ে থেকো না।
গোবিন্দ দাস ভণে পড়ে শ্রীচরণে
রাধে মান করিলে শ্যামকে পাবি না। —ঐ

১৭

লুকালে কি লুকা যায় নয়নে তার চিহ্ন পায়,
অসি চিহ্ন আছে যার বসনে হে।

উঠহে, শ্যাম, না থাক মোর পাশে,
আজ চন্দ্রাবলীর মন ভাঙ্গে পাছে গো।
উঠ, শ্যাম, না থাক মোর পাশে ॥ —ঐ

১৮

শুন বলি, ওহে হরি, তোমায় নিবেদন করি,
কি জন্য দাঁড়িয়ে কুঞ্জের দ্বারে।
এত যদি ছিল মনে আগে না বলিলে কেনে,
হরি দিল জ্বালা অন্তর মাঝারে, যাও চন্দ্রাবলীর মন্দিরে,
রাঙ্ কি পিতল সোনা, চিনাল নারে কালো সোনা।
চিনির পানা ছেড়ে খেলি চিটা
কমলা ছাড়িয়া বন্ধু শ্রীচরণে মন মজাও, বন্ধু,
ভেবে দেখ কষ্টি কেমন মিঠা।
সে স্বাদ পড়িল ধূলায়।
ওহে নিষ্ঠুর কালা হরি দিলে জ্বালা অন্তর মাঝারে,
যাও চন্দ্রাবলী মন্দিরে যদি নিভে ছিল হৃদের আগুন,
আগুন দ্বিগুন জেলে দিলে,
তোমারে দেখিলে আগুন দ্বিগুণ ওঠে জ্বলে,
উঠাইয়ে বৃক্ষেরই গাছে পিছে কাঁটা দিলে,
বাঁশী বলে মর কাছে তাদের এই বিবেচনা,
এমন কুটিল সাথে প্রেম করা হল না। —ঐ

১৯

কোথারে নিঠুর কালিয়া কোথা রয়েছিলে শ্যাম ভুলিয়া,
অভাগিনীর অন্তর জালিয়া, ওরে বিধি, দিলি দাগা,
রাধার প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে এত মধু আছে যাও, হে নাগর, ফিরি নগরে ফিরিয়া,
রাই আমাদের করেছে মান কেন কুঞ্জে নাগর দাঁড়াইয়া,
এসো এসো নাগর ফিরিয়া কোথা রয়েছিলে শ্যাম ভুলিয়া।
অধমা নগেনা ভণে রাধাকৃষ্ণের চরণ বিনে।
আমি হৃদে রাখিব তুলিয়া কোথা হে নিঠুর কালিয়া ॥ —ঐ

২০

বাঁকা লম্পট, শঠ কপট, কুটিল কঠিন কঠোর কালিয়া হে,
অবলা মানসে পতঙ্গে পোড়াবি বিরহ অনল জ্বালিয়া হে,
টুলু টুলু তুটি বঙ্কিম নয়ান এসেছ কি ভুলিয়া হে,
তোমার অঙ্গের পাবন, না লাগে যেমন কুঞ্জ হতে যাও চলিয়া হে,
জগত জগত না ডাকিবে আর শ্রীরাধারমণ বলিয়া হে।
বাঁকা লম্পট, কাঠ কপট, কুটীল কঠিন কালিয়া হে॥ —ঐ

২১

শুন হে লম্পট, শ্যাম, এবে তোমা জানিলাম,
বঁধু হে, ভালোবাসা মিছে সে কেবল,
মুখে ত' মধুর ভরা অন্তরে গরল ভরা
দীনার নিবেদন, না আইল নবঘন,
বঁধু হে, ভালোবাসা মিছে সে কেবল॥ —ঐ

২২

নিশি কোথা ছিলে, হে শ্যাম, কার পুরালে হে মনস্কাম বন্ধু হে,
প্রভাতে আসিলে কি কারণে নির্লজ্জ হে, ফিরে যাও মানে মানে।
একলা নারীর কুঞ্জে দাঁড়িয়ে ছিলে কি বা কাজে, বন্ধু হে।
লাজ নাই, শ্যাম, নির্লজ্জ বদনে।
অর্ধ চন্দ্র করি দেব এখন বাহির করি।
কাঁদিতে কাঁদিতে, শ্যাম, যারে অপমানে।
দীন নরোত্তম ভণে, দুঃখ দিলে শ্যাম কি কারণে,
দাগা দিলে শ্যাম হেন নবযৌবনে॥ —পুরুলিয়া

২৩

আসব বলে ছিলে ঠিক সময়ে কৈ এলে হে,
বিফলেতে গেল আমার গেল যামিনী।
গত নিশি কোথা ছিলে কার প্রেমেতে মজে ছিলে হে,
প্রভাতে কি কাজে এলে, বল হে শুনি।
ফিরে যাও, হে প্রাণের বঁধু, বাসি ফুলে নাই মধু হে,
বিপদ হবে হলে তোদের লোক জানাজানি।

হেন যামিনী ভণে, প্রেম রাখবি গোপনে হে,
গলে বস্ত্র দিয়ে তোদের প্রেমকে প্রণামি
আমি জানি হে জানি বঁধুর মুখের ফুটানি ॥ —বেলপাহাড়ী

২৪

কোন রমণী প্রণয় ফাঁদে, ভুলাইয়েছে কালাচাঁদে,
বুঝি আমার প্রাণে দিয়ে অবহেলা গো।
এলো না লম্পট কালা ॥
ময়ূরা ময়ূরী যথা নৃত্যগীত করে,
তারাও তাদের রোদন শুনে মন কেমন করে গো,
এলোনা লম্পট কালা ॥
হেন হরি পারে আমায় এ করিবারে নৌরাশা,
ঐ দেখ, বনে লয়ে বধেন কুলবালা।
এলো না লম্পট কালা ॥

২৫

কি রীতি কুটীল কালিয়া তব বল বল বল, বধু, সকালে হে।
লয়ে কোন কামিনী জাগিয়ে যামিনী প্রভাতে জ্বালাতে আসিলে হে ॥
গত নিশি, বধূ, কার আবাসেতে জেগেছিলে, বঁধু, রসের আবেশে হে।
প্রভাতে উঠিয়া ওরূপ দরশে দিন গেল মোদের সফল হে ॥
নয়ানের কাজল বয়ানে লেগেছে বদন মলিন হয়েছে হে,
সিন্দুর বিন্দু ললাটে শোভিছে দ্বিজাঘাত কে বা করিল হে।
একি হল, কালা, ছিন্ন বসন মালা,
হেরি হৃদে জ্বালা জ্বলিছে হে।
(ও) ঢুলু ঢুলু আঁখি কেন কমল-আঁখি,
হর কি হরি সাজিলে হে।
একি নিরঞ্জন যাবকের চিহ্ন শ্রীবৎস-লাঞ্ছনা কে দিল হে,
মোদের শুনিতে, হে পীতবসন, নীল বসন কোথা পাইলে হে।
নখাঘাতে ক্ষত বক্ষঃস্থল তব ধূসর মলিন শ্রীঅঙ্গ,
দাসজ্যোতি বলে হেরে তাম্বূলের দাগ,
সংযোগে বিয়োগ বাড়িল হে ॥ —ঐ

২৬

উঠে যাও, শ্যাম, না থাকো মোর কাছে।
চন্দ্রাবলীর পাছে মন ভাঙ্গে গো।
যাও চন্দ্রাবলীর কাছে।
লুকালে কি লুকা যায়, নয়নে তার চিহ্ন পাই,
রতি চিহ্ন বসনে তার আছে গো, যাও চন্দ্রাবলীর কাছে ॥
সিঁদূরের বিন্দু ভালে বল, হে শ্যাম, কোথায় পেলে।
ছি ছি, বঁধু, লাজ নাই তোমার গো, যাও চন্দ্রাবলীর কাছে।
দু'গালে চুণ কালি, ঘুচাব তোমার চতুরালি,
ছি ছি, বঁধু হে, লাজ নাই তোমার।
উঠে যাও, শ্যাম, না থাকো মোর কাছে, চন্দ্রাবলীর পাছে মন ভাঙ্গে ॥

২৭

সাজিলেন গোপীগণ ফুল তুলিতে কুঞ্জবন,
ওহে, তুলিতে চাঁপার কলি খুঁজিয়ে বেড়ায়।
মালা গাঁথ সবাই ও ফুল তুলব সবাই।
আসবে নাগর হরি দিব সে গলায়।
আসবে লম্পট হরি দিব সে গলায় ॥
মালা দেখে উঠে জ্বালা যাই কুঞ্জেতে এলো কালা।
মালা গাঁথব সবাই ফুল তুলব সবাই ॥
আসবে নাগর হরি দিব সে গলায়।
আসবে লম্পট দিব সে গলায় ॥
গিরি গোবর্ধনে বলে বনে ফুল দেখে মন টলে,
কৃষ্ণ প্রেমে ব্রজের গোপী মাতিল সবাই।
মালা গাঁথব সবাই ও ফুল তুলব সবাই,
আসবে নাগর হরি দিব সে গলায়।
আসবে লম্পট হরি দিব সে গলায় ॥ —ঐ

২৮

হেরলো, সজনী, ভেল প্রভাতী।
শীতল সমীরে শিহরে অতি ॥

দোলে তরুপাত, ডাকিছে বিহঙ্গ জাগিয়া।
সুন্দর সিন্দুর রাখিলো যেমন শ্যামাঙ্গী বসুধা সীমন্তে শোভন।
তরুণ অরুণ কিরণ দিল ঢালিয়া এখনো না এলো কালিয়া॥
লম্পট বনমালিয়া,
সরোবরে যায় কুলবালাগণ নিশা জাগরণ অলস নয়ন।
চঞ্চল চরণ ঘুম ঘোরে যায় টলিয়া॥
ভ্রমর নিকর মধু পান তরে নলিনী কানন অন্বেষণ করে,
গুন্ গুন্ স্বরে মন প্রাণ লয় কাড়িয়া॥
অস্তাচলগত রজনী রঙ্গন কুমুদিনী করে নীরবে রোদন,
যায় আঁখিনীরে নিশির শিশির ভাসিয়া॥
চকোর চকোরি বসি দুঃখমনে চক্রবাক্ সুখী পিয়ার মিলনে,
পতি দরশনে জাগে কমলিনী হাসিয়া॥
যাও সহচরী থাক দ্বার দেশে যদি সে কপট আসে নিশাশেষে,
বলিও সরোষে, যাও হেথা হতে চলিয়া।
যায় ভালো তবু থাকে কিছু মান,
নহে প্রতিশোধ কারো অপমান,
নহে সুবিধানে কহে ভবপ্রীতা ভাবিয়া॥ —পুরুলিয়া

মান

১

শ্যাম কাঁদানো ভালো নয়, ধনি,
ধনির ধনির গুণমান ঐ রাধা বিনোদিনী।
যোগী পায় না যোগসাধনে,
নারদ পায়না বীণার তানে।
সে ধনে কি কাঁদাতে আছে, রাই রাধা বিনোদিনী।
ব্রহ্মা পুজে শতদলে শ্রীহরি তার চরণ তলে
রাই রাখো রাই রাখো বলে লুটাইতেছে ধরণী॥
এ মান ভুজঙ্গ হয়ে পালটিয়ে তোমায় খাবে,
কৃষ্ণ সনে এ বারতে হবে কৃষ্ণদাসের ঐ বাণী॥ —বেলপাহাড়ী

নিলাজ হে, যাও ফিরে যাও মানে মানে,
বল গো যেন আর আসে না।
যে দিল মনের বেদনা মনের যাতনা,
আমি ঐ কাল রূপ আর হেরব না।
কালো দূরেতে মিশালো গো, তাই ফিরে যেতে বল॥ —ঐ

৩

শুন, ওগো রাইকিশোরী, আর দুয়ারে দাঁড়ায়ে হরি গো,
আঁখি দুটি ছল ছল কান মলিন হয়েছে,
হেরিয়া নিলাজের মুখ, আমার ফেটে যায় বিষাদের বুক গো।
চোরা যেন দাঁড়ায়ে থাকে কারাগারের কাছে।
কান মলিন হয়েছে লম্পট দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তোমার বিরহ জ্বরে আর জর জর হয়ে মরি গো।
আসিতে সাহস নাই তার তোমার কাছে লম্পট দাঁড়ায়ে রয়েছে
ভবানী বারিকে কয় আর শ্যাম কাঁদানো ভাল নয় গো,
কর ক্ষমা আমি তারে ডেকে আনি কাছে।
লম্পট দাঁড়িয়ে আছে কান মলিন হয়েছে॥ —ঐ

৪

শ্রীমতী বসেন বিরলে ললিতা সখীরা বলে,
শুন শুন, ওলো সহচরী, কি আনন্দ, আহা মরি,
হেরব মুখের বংশীধারী বসাইব রত্ন সিংহাসনে,
পুজিব যুগল পত্র মিটাইব মনসাধ।
হৃদয় বিধি উদয় এতদিনে গোবিন্দ আসিবেন কুঞ্জবনে॥ —ঐ

৫

মরি মরি একি মনোহর,
মুখপাতে মুখ জুড়াইল রসিক অন্তর।
শতদল শোভিছে জলে ভ্রমর বেড়ায় মধুর ছলে,
ফুল ফুটছে নানা ফুলে ডাকে পিকরব,
ঘাট বাঁধানো পরিপাটি দু'ধারে ফুল সেঁউতি পাটি।

বকুলে ঢেকেছে মাটি নবীন তরুবর
মরি মরি একি মনোহর। —ঐ

৬

ধনী কুটুম এলে, বঁধু,
ভক্তির কথা কি বলব, শ্যাম, পান তামাক তাম্বূলে, বঁধু।
জল খাবার দিই চিড়া গুড় স্বর্ণ কাঞ্চন থালে, বন্ধু।
বলে আরো ভালো হত একটু ঘৃত দিলে, বঁধু।
ভাত তরকারি সিদ্ধ হলে জল গেল বলে, বন্ধু।
খাবার বেলা দেয় তারে, ভালো মাংস ঝালে, বন্ধু।
খাওয়া ধোওয়া পরে গেল, বিছানা পাড়ব বলে, বন্ধু।
লেপ বিছানা দেয় তারে বালিশ মাথা তোল, বন্ধু।
বিছানায় শুয়ে কথা বলে, নানা কৌতূহলে, বন্ধু।
বড় বড় বাড়ী করেছে, কত খরচ পড়ল, বন্ধু।
কলি যুগের এমনি ধারা, গরীব জীয়ন্তে মরা, বন্ধু।
বিনা যায় পথে চলে, চায়না কেউ মুখ তুলে বন্ধু॥ —ঐ

৭

ওরে, নয়ন, কেন আমারে দুঃখ দিলি।
কেন, নয়ন, আমারে কাঁদালি রে॥
ওরে নয়ন পরে নয়ন, কেন চাও দিবস রঞ্জন রে,
কেন, নয়ন, আড় নয়নে আমারে ভুলালিরে।
মাত্র তোমারই পানে চেয়েছিলাম দুদিন রে,
অবশেষে, ওরে নয়ন, মন হরে নিলিরে॥
চড়াইয়ে চড়ব ডালে, ছেদন করিলি মুলে রে,
অবশেষে, ওরে নয়ন, দরিয়ায় ভাসালি রে। —ঐ

৮

ধনি, এই কি ঘটালি পতিকুলে কলঙ্ক রাখলি গো।
শুনে যদি আয়ান দাদা তোরে কি বলিবে রাধা
তোর কেন সাদা গায়ে কালি গো।

তুই, ধনি, ছিলি সতী এখন কেন এমন মতি
এখন কেন কলঙ্কের ডালি গো।
কে তোরে কৌশল ক'রে বেঁধেছিল প্রেমডোরে
যে ডালে বসিল কাটালি গো।
সে লম্পট ননী চোর, পরিচিত নহে তোর
তারে বশ কেমনে কাটালে।
কৃষ্ণ রাখিতে বলে জলকে গিয়ে সন্ধ্যাকালে
কুল মান সকলি ডুবালি গো॥ —ঐ

৯

আজ কেন, সই, হলি উতলা,
তোরে কে দিল ফুলের মালা।
প্রেমের মধু দিল, বঁধু, তাই কি এত চঞ্চলা,
বল না শুনি, রমণী, তোর মনের কথাগুলা।
কাজ ভুলে আজ লাজ ভুলে আজ কার তরে গান গাও বল,
কার বাঁশী শুনে পিয়াসী মন হয়েছে চঞ্চলা,
বাজালে আঁকা বাঁকা চোখে খেলছি, সই, কি খেলা।
বিপিন ভণে কার ধিয়ানে বসেছ সাঁঝের বেলা॥

১০

কাল অঙ্গ গড়াইব চাঁচর চুলকে জড়াইব,
কাজ নাই মোর চুড়াধড়া ফিরে নিয়ে যাও মোহন-বাঁশরী॥
কাঁদলে কি হবে গো ফিরে যাও গো, কেশরী।
জরানলে পুড়ে মরি সেদিন না দান ভাই পারি।
কাঁদলে কি হবে গো ফিরে যাও গো, কেশরী।
যে দুঃখ পড়েছে মনে গিয়েছিলাম গোচারণে।
কাঁদলে কি হবে গো ফিরে যাও, কেশরী॥ —ঐ

১১

শুন, প্রাণেশ্বর, ত্যেজ, যে দুঃখেতে অঙ্গ জরজর,
দিবানিশি মন উদাসী ভাসি নয়ন সলিলে,
কুটিলার বাক্যবাণে মন প্রাণ দহিলে,

জলকে গেলে ঘাটের পথে মুখ ঢাকিব জলেতে,
আমায় দেখে কানাকানি করে হে সকলেতে।
চন্দ্রাবলী সুখের ভাগী, এ অভাগী দুঃখিনী,
যাও হে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, সুখময় গুণমণি।
মম কুঞ্জে এলে, হরি, কত কথা কয়ে যায়,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে কেহ না দেখিতে পায়।
যা হল সে হল, নাথ, আর এখানে এসো না,
যাও হে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, সুখময় কালোসোনা,
জানকী কহিছে ধনি এ কথাত হল্য না,
কৃষ্ণ না এলে তোমার প্রাণে ব্যথা সইবে না। —ঐ

১২

বলে দিব বৃন্দাবনে বলে দিব বৃন্দাবনে,
পুরুষ হয়ে নারীর পায়ে ধরিলে কেমনে।
ছি ছি, বঁধু, কি করিলে কলঙ্ক রাখিলে গো কুলে,
এই কথাটি বলে দিব আমি রাখব না গোপনে।
বলে দিব বৃন্দাবনে, শুন, ওহে কালসোনা,
তোমায় কে শেখাল এ মন্ত্রণা।
ছি ছি, বঁধু, লাজ-লাগে না তোমারই বদনে।
বলে দিব বৃন্দাবনে ॥ —ঐ

১৩

দ্বিজ হরি রায়ে গায়, ভাঙ্গা প্রেম কি জোড়া যায় গো,
ভেবে দেখ মন, ছিটা দুধে না বসে আর সর গো ॥
খুলে কথা গোচরে বল, ধনি, বল গো ॥ —ঐ

১৪

মা, নলিতে, অভয়া, কুঞ্জের দ্বারে হ'ও গো দ্বারী,
আসলে কি না বংশীধারী কুঞ্জেতে।
কালরূপে বঞ্চিত হলাম আজ হতে ॥
কুঞ্জে আসছেন চিক্কণ কালা,
কেড়ে লিব বনফুলের মালা।

এখন হতে তাড়িয়ে নিলে আমাকে,
কালো কেশ চারিদিকে মুড়াইলাম।
না যাব মন যমুনাকে লো,
কালোবরণ সখীরা যাও দূরে।
কালোরূপে বঞ্চিত হলাম আজ হতে।
ফুলমালা দিব ননীর গলে ॥ —ঐ

১৫

পা দিব না আর তোমার ফাঁদে,
পা দিয়ে হে পরাণ কাঁদে।
কত ছলে কথা বলে, দিলে হে স্বর্গের চাঁদে।
তারপরে ডুবালে, বঁধু, অতল গভীর খাদে ॥
মন মাতানি কথা জানি, জানি না প্রেম নিভাতে,
কাজ ফুরালে যাবে বলে, ফেলে আমায় বিপদে।
অনেক ব্যথা পেয়েছি, শ্যাম, পড়েছি হে বিপদে।
বিপিন বলে কভু ভুলে পড়ব না প্রেমের ফাঁদে ॥ —ঐ

১৬

শতদল কমলের মাঝে বিরাজ করে রসরাজে,
এমন ভাসান পদ্ম সরোবরের মাঝে।
নিভান অনল জ্বেলে দিলে যেমন জীবন্ত জীবনে ॥
যেখানেতে ভালোবাসা সেখানেতে যাও হে।
শ্যামকে খুঁজি বনে বনে পাইনে শ্যামের দরশন।
এই বার শ্যামের দেখা পেলে শ্যামের ধরব দুটি শ্রীচরণ ॥
বাড়ায়ে নবীন পীরিতি ভাঙ্গল এতদিনে।
সে অন্যায় কাজ করবে যদি রক্তেতে বহাব নদী,
নতুবা মাথা খুঁড়বো তোমার পায়েতে।
যেখানেতে ভালোবাসা তুমি সেখানেতে যাও হে।
কলা ধরে যাও গো চলে এসেছিলে নিশি ভোরে।
সিন্দুর কাজল লাগল ঘসা পায়েতে,
যেখানেতে ভালোবাসা তুমি সেখানেতে যাও হে ॥ —ঐ

১৭

কথা কও, রাই, বদন তুল, অশেষ দোষে দোষী হল্য,
আমার চরণ ছাড়া কোর্যনা তোমার চরণ ছাড়া কোর্যনা।
তুমার জন্যে দিবানিশি, রাধার জন্যে বাজাই বাঁশী,
সদাই আঁখি নীরে ভাসি দেখো মোরে ঠেলোনা।
তুমি যে মোর নয়নতারা, না দেখিলে হইয়ে সারা,
তুমি মোর প্রাণহরা, ও রাই, তোমায় বইতো জানিনা।
তোমার জন্য ব্রজে এলাম নন্দের বাধা মাথায় নিলাম,
বনে বনে গো চরালাম তাও কি তুমি জান না।
তোমার জন্য দিবানিশি রাধা বল্যে বাজাই বাঁশী,
সদাই আঁখিনীরে ভাসি দেখো মোরে ঠেল্যোনা।
সচঞ্চল পদ করিতে অচল পুজলাম তোমার চরণ যুগল,
আমার বলতে তুমি কেবল একবার ফিরে চাইলে না।
মানিনী, আর কেন মানে, ফিরে চাও, রাই, নয়ন কোণে,
পাগলী কয় শ্যাম সঙ্গে মানে ফিরে যাও আর এসো না। —বাঁকুড়া

শ্রীরাধার মানভঞ্জন

রাধার প্রতি— শুন প্রাণ সই,
আমি রাধার বই আর কারু নই,
সত্য করি সহচরী কলঙ্ক বিনাশিব,
কাল-অবধি ব্রজে রাধার সতী নাম ধরাব।
যদি না পারি গো, সখি, কলঙ্ক বিনাশিতে,
বৃথা মন কৃষ্ণ নাম ধারণা এ ধরাতে।
সদাই মম অনুগত, আমারে বই জানে না,
কেমনে দেখিব চক্ষে তারি এত যন্ত্রণা।
কলঙ্ক ভয়ে সোনার বরণ কালি হয়েছে।
প্রফুল্ল কমল যেন শিশিরে শুকায়্যেছে॥—অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

২

রাধার প্রতি— তোমা বিনা, বিধুমুখী, চারিদিক শূন্য হে,
প্রাণে বিরহ জ্বালা হে।
রাখ রাখ মোরে, বিনোদিনী,
তোমার ধরি দুটি পায়।
ফুলশর হান হিয়া পরে, মন জ্বরে মরে যাই
রাখ রাখ মোরে, বিনোদিনী
তোমার ধরি দুটি পায়॥ —ঐ

কৃষ্ণের প্রতি— কেন মানের দায়ে ত্যজলে আমায়, ও বংশীধারী,
আমি করব না মান রাখতে প্রাণ
মানে, মাধব, এসো হে ফিরি॥
তুমি রাখ মালিনীর মান,
তাই তো করেছিলাম হে মান,
এখন পায়ে ধরার সেই অপমান,
আমায় তুমি দিলে হে দ্বারী ও বংশীধারী॥
—বাঁশপাহাড়ী

৪

গত বিভাবরী নেহারী শ্রীহরি পরিহরি নব কামিনী,
আসি রাধা দ্বারে সভয়ে নেহারে—
কাছে বৃন্দা দ্বারবাসিনী॥ —ঐ

৫

আঁখি ঠারে ভাঙ্গিল না মান, ভাঙ্গলো না মৃদু হাসিতে,
মোহন তালে বাজিয়ে বাঁশী নারিলে মান নাশিতে।
বাঁশীতে যার হবার নয়, শ্যাম, হয় কি তা কাশীতে।
কাশী যাবেন কালশশী শুনে মরি হাসিতে,
সঙ্গে যদি যেতে পারি রেখ সেবাদাসীতে।
কোথায় এমন শিখেছিলে নারী ভালোবাসিতে।
ভবপিতায় বাঁচাও হরি, সংসার জলরাশিতে॥ —বেলপাহাড়ী

৬

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।

চিনিলে না সহচরী আমি রাধার প্রহরী

দ্বারে থাকি ধরে আমি ঢাল।

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥

সিঁদ কাঠি নয়, রূপসী, করেতে মোহন বাঁশী,

রাধা নামে সাধা সদাকাল।

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥

করিতে দেবীর পূজন করি কমল চয়ন

তাই কাঁটা দাগ হৃদয়ে বিশাল।

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥

পুজেছিলাম ভগবতী তাহার প্রসাদে, দূতী,

সিন্দুর চন্দনে মাখা ভাল।

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥

অভিসারে নীলবাস আঁধারে নহে গো প্রকাশ

তাই, পথ ভুলে এমন বেহাল।

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥

ভবপ্রীতানন্দ ভণে খেলে হৃদি-বৃন্দাবনে

তাই কাঁটা দাগ হৃদয়ে বিশাল ॥ —পুরুলিয়া

কলহান্তরিতা

১

অতি ভালো বাসাবাসি কোথা রে ঐ প্রাণ-পিয়াসী,

বিড়ম্বেতে দাঁড়িয়ে প্রাণ কেন তোমার পোহাও নিশি

ঐখানে কালার সনে গেঁথেছিলাম মালা,

কালাকে কাজল করে নয়ানে রাখিব সই।

বিরলে বসিয়া রূপ আউলাইয়া দেখিব ॥ —ঐ

২

সখীকে ডাকিয়ে রাই, এ কথা কারে শুধাই,
কাল বরণে হেরিব না নয়নে।
ওগো কালো বরণ না হেরিলে তবে কাজল পর কেনে ;
রইতে নার কেঁদে মর মান কর গো কেনে।
ওগো সখি, গুমরে গুমরে মর, মনের কথা কহিতে নার
চূড়া বাঁশী বইছে মদন বানে,
পরম ঈশ্বর হরিকে ধরালি চরণে ॥
হীন বরণের বাণী, শুন রাধে কমলিনী,
শ্যামকে খুঁজব বনে বনে, যদি শ্যামের দেখা পাই ধরিব চরণে,
রইতে নার কেঁদে মর মান কর গো কেনে ॥ —ঐ

৩

শুনলো, বিশাখা সখি, আর কেন চন্দ্রমুখী,
মিছা কেঁদে মিছা ভেবে তবু ক্ষীণ করিলি।
এখন কেঁদে কহ কি হবে, ভেবে বল কি হবে।
কাঁদিতে হবে বছর সত্তর তবু ত কাঁদনার শেষ করিবে,
মিছা কেঁদে মিছা ভেবে তনু ক্ষীণ করিলে।
হেন কালিয়ায় ভণে পড়েছি শ্রীচরণে এখন কেন্দে কি হবে। —ঐ

৪

কৈগো, মাধবী, মাধব এলো পীরিতি করিয়া গেল গো,
ফিরে না চাহিল আঁখি আমার,
কাজ কি এ অভিমানে,
এ যৌবন রাখব কার আশায় ॥
যদি না নাগর মিলে কি হবে জলাঞ্জলি ঢেলে দিব,
খুঁজি কালার পায়।
আমার কাজ কি অভিমানে ॥
তরু সব ফলে ফুলে, বিজলী মেঘের কোলে,
নিশি কোলে শশী খেলে আমি মরি যাতনায়।
আমার কাজ কি অভিমানে ॥

দ্বিজ মদনে ভণে বনফুল শ্রীচন্দনে গো,
পুজব চরণে আমি সমর্পিয়া তায়।
আমার কাজ কি অভিমানে ॥ -ঐ

৫

হেরল, সজনি, আর এ সুখ-রজনী, দংশেতে সর্পিনী সমান,
বঁধু মোরে বাম, কলপে অবলার পরাণ।
চন্দ্র ঝলকত পাখীরা গাওয়ত অলি করে গুণগান।
বঁধু মোরে বাম, কলপে অবলার পরাণ।
কহে ভবপিতা শুনলো, ললিতা, বাঁকা শ্যামসেনে আন ॥ —ঐ

৬

পরের মন নিতে জান, দিতে জান না,
গৌরাঙ্গিয়া পাপীর প্রাণে দাগা দিও না।
অস্তর শিবাকে সমর্পণ করি, তাহাতে আবার রাম গুণ ধরি
খচন্দ্র হরিয়া পরে এই মাত্র বাণী
কহি নীলমণি চলি গেলা মধুপুরে,
ত্যজিল মোরে লম্পট নটবরে ॥
শুন, সহচরী, স্বরূপ বচন রবিসুতা ঋতু করিব সেবন,
এ জ্বালা জুড়াবার তরে ॥ -পুরুলিয়া

নৌকাবিলাস[১]

১

হে খেয়াধর যমুনা করিও পার,
এস ত্বরা, কাণ্ডারী, মোরা যাব হে মথুরাপুরী,
দধি দুগ্ধের কড়া আছে দর।
শুন বলি, সহচরী, কেন না আনিছ তরী
নাবিকটা অতি সুন্দর,
শুন ওরে, বোকা মাঝি, আর না করিও ফন্দিবাজী
দধি দুগ্ধ নষ্ট হবার ডর

১ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের নৌকাখণ্ডের কয়েকটি বিখ্যাত পদের ধ্বনি এই সকল পদে শোনা যায়।

শুন গো, রাই কমলিনী, অধম বিনার বাণী
গালি না দিবে না ভাবিয়ে পর ॥ —ঐ

২

এস এস যত রমণী,
আমি পার করে দিব এখনি,
ধৈর্য ধরে বস তরীতে কুলবতী কামিনী,
দেরী না করিব আমি তোমায় আমি জানি।
পার হতে বড় সাধ গো তোদের নায়ে বস বস আরোহিণী
বংশী বলে যমুনা পার হয়ে গেল যত ব্রজবাসিনী ॥ —ঐ

৩

আগেতে পার করবো ঐ ধনিকে, বিনামুল্যে পারে গেলে,
বিকাবি, গো তুই, জনমকে ; ভাঙ্গা তরীর এমনি ভয়,
দুজনে চাপিলে হয়,
তিন জনে চাপিলে তরী যায় রসাতলে।
ও যার অলিশশী উড়ছে গো লাখে লাখে,
ও যার নীল বসনে নীল বসনে দাঁড়াইছে গো, বিশাখারে,
আগে পার করবো ঐ ধনিরে।
বড়াই বলে একে একে পার করো যার কপালে থাকে।
দেখুক খ্যাপা দূর হতে পুরাক মনের সাধকে।
আগে পার কর রাই ধনিকে ॥ —ঐ

৪

পার করে দাও, হরি গো, কুলে,
মোরা কাঁদি হে নদীর কুলে।
রাখালি করিতে আগে চরাতে গোধন দিনে,
নিজ করে পার হয়ে যায় নেই তো জানা, গোপাল।
শীঘ্র এসো, নাইয়া, আমায় পার করে দাও কুলে।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তোমায় যমুনার নাবিক বলে ॥
দধি বিকা দীন দুঃখীরা হাট করবি বাজার গেলে।
গোপীগণে কাতর দেখি তারে কর দিল রাজা বলে ॥ —ঐ

রসোল্লাস

১

জয় দাও হে আ মরি, সজনী,
আমি দেখবো তোমার রূপখানি,
নীলাম্বরী শাড়ী পরি দুলায়ে মাথার বেণী,
আলতা পরা পায়ে নুপুর বাজাবি রিণিঝিনি।
বাহু ডোরে বাঁধবো তোরে আদরে নিব টানি,
করবো দুজন প্রেম-আলাপন মধুর মধুর বাণী,
পানের খিলি মুখে তুলি দিব লো তোমার ধনী,
বিপিন বলে নদীর কূলে মন মজাবি মোহিনী॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

মকর মেলায় ছাতা পুখুরে, বঁধু, আসবি হে মনে করে,
থাকব বসে তোমার আশে সুবেশে সুলঙ্কারে ;
ভাবের বঁধু প্রেমের মধু, দিব তোমায় আদরে।
তোমার আমার মিলন সেথা হবে অনেক দিন পরে।
বনফুলের মালা গেঁথে সাজাব ফুল হারে॥
অনেক কাল ভালবাসা রেখেছি হৃদয় ভরে।
বিপিন ভণে শ্রীচরণে দিব হে উজাড় করে॥ —ঐ

৩

এ রাধিকা সই রাস দেখি বলিছেন অষ্টসখি,
বলিছেন হে—বলতে জান ভাল
খুলে বল হে, খুলে বল হে।
মুখে মধু তোমার অন্তরে কেনে বিষ
খুলে বল হে, খুলে বল হে॥
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর কষ্ট দিয়ে কেন মার,
বলি, শ্যাম হে, আমার ঘটিল জঞ্জাল।
খুলে বল হে, খুলে বল হে॥
কেঁদে দুর্যোধন কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়,
খুলে বল হে, খুলে বল হে॥ —ঐ

৪

পুর্ণিমা কার্তিক মাসে দ্বিতীয়া চতুর্দশী,
তার অর্ধেক নিশীথে পুর্ণকালশশী।
সেই কালে প্রবেশিলা শ্রীনন্দের নন্দন।
রাসলীলা আরম্ভিলা সখি শ্রীবৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে নীলমণি করিছে বংশীর ধ্বনি।
শ্রীরাধার গোপিনীর নাম ধরি।
ডাকিছে রসিক মুরারি গো, শ্রীরাধাগোপিনীর নাম ধরি ॥
শুনিয়া বংশীর ধ্বনি রাধে শিরোমণি,
আকুল হইয়ে রাই ভাবিছেন আপনি।
সুধার সহিত চিত হৃদে প্রবেশিল।
চারিদিকে ব্রজাঙ্গনা যাইতে লাগিল ॥
বেশ ভূষণ পরি সাজিল ব্রজের নারী।
বৃন্দাবন মাঝে যেখানে রসরাজে ॥
(আর) সুধায় মিশ্রিত সুরপুরী সুরধাম,
এক বংশে রাধা কৃষ্ণ হয়ে করে গান,
আদি আদি গোপীগণ আর ব্রজনারী,
রূপেতে আলা করেছেন সেই বৃন্দাবন পুরী।
চাঁদকে যেমন তারায় ঘেরে গগন উপরে,
তেমতি গোপিনী, রাধে, বেড়িয়ে গোবিন্দ গো।
বাঁশীতে জয়রাধে শ্রীরাধে বাজে গো বৃন্দাবন মাঝে।
সুচিত্রে চম্পক লতা ললিতে বিশাখা,
রঙ্গদেবী তুঙ্গদেবী ইন্দু বিন্দু রেখা।
এই অষ্ট সখির মাঝে শ্যাম যন্ত্রে দিল তালি,
সভামধ্যে দাঁড়ালেন তখন সেই সুন্দর বনমালী ॥
ধো, ধো, ধো, ধো মৃদঙ্গ বাজে আঠার মোকাম ধমকে।
টমকে টমকে চমকে চমকে যেন শোন বিজুলী ঝটকে।
কি আনন্দে নাচত রাধা গোপী শ্যাম সঙ্গে,
এই মতে রাসলীলা হইল বৃন্দাবনে ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি অন্ত না পাইলা,
আশী চৌরাশী ত্রেগণা বৃন্দাবনের সীমা।
আমি কি দিব উপমা।
বিপ্র রঘুনাথে বলে. কি দিব উপমা গো ॥ —ঐ

৫

ঝালদা পরগণায় বলি চল সবাই রাস দেখি,
রাস দেখি উলসিত মন, বাছারে সুলোচন।
কি বলিব ধনি রাসের মিলন, বাছারে সুলোচন,
তার চারি ধারে চারি চুড়া
মাঝে চুড়া কিবা শোভা, বিদ্ধিব বিদ্ধিব বলি,
সবাই করে ঠেলাঠেলি হায়রে ধেনুক টালিয়া যায়,
বসিছেন রাজার কাছে দূরে গো দুর্যোধন ॥
চলে গোপীগণ হরষিত মথুরায় গমন,
তবে রাস ওপর পাশাপাশি ওগো সঙ্গী খেলে হরহরী।
সঙ্গে যায় শ্রীমতীগণের গোপীগণ বলে গোপীগণ।
হরষিত মথুরায় গমন।
হেন সতু দাস কহে. ওগো, বহুত ভাবিও মনে
সঙ্গে রয় শ্রীমতীর গোপীগণ ॥ —বেলপাহাড়ী

৬

আন গো কমতি ফুল ওগো আমার প্রাণ বেয়াকুল,
সগ্‌গ মত্ত পথছাড়া জাগিল অন্তরে,
বারণ করি গো তোরে তারে নারে গো।
বারণ করি গো তোরে।
তবে শালুক ফুলের বরণ কালো,
ওগো সে ফুলে করো নিয়ে আলো,
ওগো ক্ষেপা ভোলায় রাখিল ওগো সগ্‌গ মত্ত ॥ —ঐ

৭

হরি চরণে যত নারী সেবিছে হরিষ মনে।
একদিন যত সখী সবে গিয়ে দেখি গো নিধুবনে ॥

গোপাঙ্গনা ব্রজাঙ্গনা কামনায় প্রেম করে মনে মনে,
কুলশীল লাজ ভয়ে মানে কি হৃদয় নয়নে,
স্বচ্ছন্দে স্ব-পতি ত্যজি আসি শ্যামের বিহনে,
মম কুঞ্জে আজ পেয়েছি হে, আজ বড় শুভদিন।
কতদিনের ভালবাসা মনে আছে কি গোচারণে,
বিনা সুতায় গাঁথি মালা হে, দিব গলায় পরায়ে।
কুঙ্কুম-কস্তুরী আদি কেহ পুজয় চুয়া চন্দনে,
ব্রজলীলা দেখিবারে আসলেন দেবগণে
বৃন্দাবনে রাসলীলা হইল বংশী ভণে॥ —ঐ

৮

রাসমণ্ডল ঘেরিয়া রস রাস ভেশ ভরিয়া
ও যে টল টল ঢল ঢল,
নব নব ভাব গোর গোর নবীন নাগরী রাসে ধরাধরি
নাচিছেন নব নাগর, হায়, মরি মরি।
হায় সঙ্কট তবু ভুরু ভঙ্গ চরণ চমকে চারি অঙ্গ
সিঞ্চিত কাল কঙ্কণ কিঙ্কিণী, নাচিছে নব নাগর॥ —ঐ

৯

হায় বোমের (ব্রহ্মের) রজনী সাজরে গোপিনী;
পঞ্চম স্বরে তুলিয়ে তান মধুর গোপিনী করও গান
বাজ রে মোর দুঙ্গা (মৃদঙ্গ) ভালরে ভাল,
উছলিত প্রেম সাগর নাচিছে নব নাগর। —ঐ

১০

বলে, শুন গো সহচরি, আমার কে করিল বসন চুরি,
ও বসন ফিরায়ে দেও গো, কে আছে কদমের ডালে।
বারে বারে বলি গো তোমারে শীল-কুল গেল বাঁশীর সুরে,
ঐ বাঁশীকে কে বলে ভাল, বাঁশীয়ে ঘটালো জঞ্জাল গো।
বাঁশীকে কে বলে ভালো, নাকে দিব কুণ্ডলী,
গলে মতি মুগার হার, ধনি, বেণীটি বেঁধেছে কি সুন্দর গো,
বাঁশীকে কে বলে ভালো গো॥

১১

চোরা কেন বসন হরিলে,
মোরা কাঁদি কালিন্দী জলে।
সঙ্গিনী সঙ্গেতে যবে কাপড় রেখেছি নদীর কূলে,
কালীদহে সাঁতার দিয়া পারাপার হয় আনন্দেতে সকলে।
স্নানান্তে চেয়ে দেখি বসন নাই নদীর কূলে।
লইয়া মাধব মুচকি হাসি বসেছে গাছের ডালে।
মরি মরি লাজে, মরি, উঠি নাহি স্থলে,
সরম ভরম নাই হে তোমার যবে বিবসনা করিলে।
উপকারী জন, প্যারী, কোন মুখে প্রাণ কাঁদালে,
বিবেচনা নাইরে তোর সবে যার গালি খাওয়ালে।
ঘরে লোকে জানতে পেলে বলবে কালাচাঁদে ভুলেছিল,
এত অনুরোধে মাধব বসন দিল, পরে সবে ঘরে গেল॥ —ঐ

বিপ্রলব্ধা

বলি, চন্দ্রমুখী, কি করিব সখী,
আমার কোনমতে প্রবোধ মানে না।
বিরহ অনল হইল প্রবল জলেতে অনল নিভে না
হায়রে, মরম সখি।
কেন নাগর কুঞ্জে এলো না।
স্বপনেতে, সখি, শ্যাম আসে দেখি আমায় বলে প্যারী,
কেন উঠিয়া চমকিয়ে চাই দেখিতে না পাই।
দেখা দিয়ে ঘুচাও যাতনা আমার।
গোবিন্দ দাস ভণে পড়ে শ্রীচরণে
হরি, এত কেন দাও হে যাতনা।
রাধা চন্দ্রমুখী তার দুখে দুখী
দেখা দিয়ে পূরাও মন-কামনা। —বাঁশপাহাড়ী

২

নিশি অবশেষে দেখি কেঁদে বলে বিধুমুখী,
সুখের নিশি দুখে গেল অনলেতে।
কে হরিয়া নিল গো আমার প্রাণনাথে,
পিয়াপন্থ নিরখিয়ে অন্ধ হল দুটি আঁখি।
গেল বঁধু না এলো প্রাণ দেখা দিতে।
শুনিয়ে কোকিলের তান গৃহে না রবে প্রাণ,
গেল বঁধু না এল প্রাণ দেখা দিতে,
অধম ছিদাম বলে যোড় হাতে ॥

বনফুলে গাঁথা মালা না আইল মোর নাগর কালা,
আশা বিফলেতে গেল নাগর না আইল।
সারা নিশি জেগে আশা বিফলেতে গেল।
প্রথম পিরীতি আদরে ধরি গলে নলে ছলে কইলে কত,
কৌশলে বুঝাল নাগর না আইল,
হীন সদনে, বলে আশা কিগো বিফলেতে গেল,
নাগর না আইল ॥ —ঐ

৪

হেরল পাশ হামি বিগত সুখ রজনী
যান সুধাকর।
শুখালো পুষ্পমালা। শ্যাম মনোহর
কৃষ্ণ কই না আইল ঘর ॥
প্রস্ফুটিত মুকুল মলিন অলি বিনে,
আমের বনে নিরন্তর ॥
গুণ গুণ স্বরে খেলা করে
সুখের ভ্রমরা নিকর ॥
কুঞ্জে বসি একাকিনী চিন্তে কমলিনী
ভাবপ্রিতা ভাবে হরির চরণ সুদূর ॥ —ঐ

ফুলশয্যা রইল বাসি কেন ভ্রমর তুইরে আসিস ॥
নিতি ভ্রমর করে আনাগোনা।
ও, না লিব পীরিতি রতন কাঁচা সোনা ॥
যখন ফুল ফুটিল ফল ছিল তখন ভ্রমর আইল গেল।
এখন ভ্রমর কোন ফুলে মজিল রে, ও ললিতা ॥ —ঐ

৬

গগনে উঠিল বেলা, গাঁথিলাম মালতীর মালা,
সেই মালা গেল শুকায়ে।
মালা দেখে উঠে জ্বালা কুঞ্জে না আইল কালা
ও আমার রাই রহিল বিচ্ছেদের কানন গো
এমন বসন্ত সময়ে গো ॥
যেদিকে ফিরাই গো আঁখি, সেই দিকে শূন্যময় দেখি,
ও আমি রাত্রি দিন থাকি কুঞ্জ বনে গো ॥ —ঐ

৭

শুন গো বিন্দের দূতী আর কি আসিবে আমার কমল-আঁখি,
ঐ দেখ ডালে বসে কোকিল কুহরে গো,
হেন হরিপদ ভণে, আশা রহিল রাঙ্গা চরণে,
অন্তিমকালে না হয় যেন শমনের জ্বালা গো,
এমন বসন্ত সময়ে গো ॥ —ঐ

৮

যে মধু যামিনী রাই না এলো রসরাজ প্রাণবঁধু কোঁ এলো ॥
নবীন প্রেমে আমায় দাগা দিল নাগর কোঁ এলো ॥
কার প্রেম-ফাঁদে পাখী ধরা গেল নাগর কোঁ এলো ॥
আতর-চন্দন-চুয়া, পুষ্পমালা পানগুয়া,
সকল পড়িয়ে রইল আমার নাগর কেন না এলো ॥
প্রাণ মনকে কোঁ এলো কার প্রেম ফাঁদে পাখী ধরা গেল ॥
অঙ্গের বসন আইজ সকল হইল বাদী চন্দন গরল হইল।
করপুর তাম্বূল জল বাসি রইল কেন নাগর না এলো ॥

নবীন প্রেমে আমায় দাগা দিল কোকিল পাড়ে তো গালি।
ভ্রমরা বিষের ডালি শবদ শ্রবণ গেল।
ভবপিতা বলে আমায় দাগা দিল কেন নাগর না এলো॥
নবীন প্রেমে আমায় দাগা দিল কেন নাগর না এলো॥ —ঐ

বিরহ

১

তবে হেন গুন গাই কুথা গেলে কুথা পাই।
আমি কুথা গেলে তারে ছাখা পাই॥
কুথা গেলে পরাণ জুড়াই।
কুথা গেলে আমার শ্যামকে দেখা পাই॥ —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

২

চম্পকের হার পরালে কেনে
মালা গেঁথে অন্য ফুলে কেন না তাই দিলি গলে।
চাঁপা ফুলে হিয়া জলে যাতনা হয় প্রাণে।
সুবল, কি করিলি বিষম বিপদ ঘটালি,
বিরহানলে জ্বেলে দিলি বাঁচিব কেমনে।
থর থর কাঁপে অঙ্গ অনঙ্গেরই বাণে,
দাস পীতাম্বর লয়ে সাথে যাবে সুবল যাবে ছুটে,
রক্ষা কর, ভাই, বিপিনেতে কিশোরী মিলনে।
চম্পকের হার পরালি কেনে॥ —বাঁশপাহাড়ী

৩

নিশি অবশেষে কেঁদে বলে বিধুমুখী,
গেল বন্ধু না আইল প্রাণ, প্রাণ দিতে,
কে হইরে নিলি গো আমার প্রাণনাথে।
পিয়া পন্থ নিরখি অন্ধ হইল দুটি আঁখি
কোকিল ধ্বনি শুনি গো আচম্বিতে,
কে হইরে নিল গো আমার প্রাণনাথে।

আমরা হে ব্রজের নারী জনম দুটি খানি গো,
প্রেম ছাড়া হে আমরা রইতে নারি।
কে হইরে নিল গো আমার প্রাণনাথে।
অধম শ্রীদামে বলে দুটি জোড়হাতে।
কে হইরে নিলি আমার প্রাণনাথে॥ —বেলপাহাড়ী

৪

বঁধুর বিরহে পরাণ গেলে মৃত দেহ রেখ তমালের ডালে,
দগ্ধ না কোর আগুনে, কৃষ্ণ কোনকালে আইলে গোকুলে
ফেলে দিবে তার চরণে, আমার কি কাজ ··· ···। —ঐ

৫

সজল জলদ ত্রিভঙ্গ বাঁকা অন্তিমেতে সেরূপ হলো না দেখা,
বড় খেদ রইল মনে পীতাম্বর পাঠায় মধুপুরে আনিতে মধুসূদন। —ঐ

৬

বহুত যতনে রইলাম চাম্পা ও তার চিবরা চিবরা পাতারে,
ওরে ফুল তুলিবার কালে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে,
অভাগিনীর কর্ম দোষেরে নাগর গুণের নাগর শ্যাম,
ও তার মুখে নাই কোন কথা রে নাগর গুণের নাগর শ্যাম।
অতি যতন করে বাঁধিলাম সাগর ও তার মাণিক পাইবার তরে রে॥
ওরে সাগর শুকাল মাণিক লুকালো অভাগিনীর কর্ম দোষেরে।
ও তার মুখে নাই কোন কথারে নাগর গুণের নাগর শ্যাম।
বঁধুয়ার বাড়ীয়ে জোড় নারিকেল অভাগিনী বাড়িয়ে রে।
বেল পাকিল বধ্ না আইল দিয়ে গেল বুকে শেল রে।
ও তার নাগর গুণের সাগর, শ্যাম, হলুদ বাটিতে বসিলেন গৌরী,
ও তার পড়ে গেল মনে রে ও তার মুখে নাই কোন কথারে॥ —ঐ

ভুলে বলিছেন হরি, ও ভাই তারে বিনয় করি
গরল মোহরা ঘায়ে মরি হে,
বলি দারুণ বিরহ জ্বালা আর সইতে নারি।

যদি না মিলাতে পারি, গলেতে লাগাব ছুরি,
(এনে দে মোরে) গরল মোহরা খায়।
কুসুম চম্পক কানে, শ্রীরাধা করিছেন মনে
প্রেমেরি আগুন উঠিছে লহরী।
আমি পড়েছি বিষম ফাঁদে, বলি না লোক-লাজে,
গৌরাঙ্গ আর দিশা দিতে পারি না হে। —ঐ

৮

লতা পাতা সব শুকাল বনের কোকিল বোবা হল,
আমার বিনে রাই কমলিনী, আমার বিন্দাবন শূন্য হল।
বিনে রাই কমলিনী ॥ —ঐ

৯

যখন থাকি রান্না পাশে তখন তোমার কানাই আসিলে
ধোঁয়ার ছলনায়, ধনি, কাঁদবি দেখরে বন্ধু, কি বলিব তোরে।
তুমি যে চলিয়া গেলে ছেড়ে অবলারে,
বন্ধু, কি বলিব তোরে।
তোমায় আমি ভালবাসি অন্তরে অন্তরে
বন্ধু, কি বলিব তোরে ॥
বন্ধু সে চলিয়া গেলে আমারে ছাড়িয়ে।
ফিরে না চাহিলে, বন্ধু, কি বলিব তোরে ॥ —ঐ

১০

এল না, সখী, এমন সময়ে কান্ত এল না,
শুন বলি সহচরী, কেন না আসিছেন হরি,
দুরন্ত বসন্ত কালে আমায় দিতেছে যাতনা।
আইল বসন্ত ফুটে ফুটন্ত,
ফুলের মধু ফুলে রইল ভ্রমর কেন এল না।
সখী, কামবাণে পঞ্চশরে বিন্ধে তনু জরজরে,
কত যে যাতনা মরমের বেদনা সে কি বুঝে না।
অধম বিনা দিনেই কানা কিছু ভাব ত জানে না গো।
মনের আশা মনেই রইল আমার হল না ভজনা, সখী ॥ —ঐ

১১

নিঠুর কালিয়া কেন অবলায় দুঃখ দিলি রে, গুণের বঁধুয়া
মাঘেতে মধু মিঠা, গাঢ় মিঠা সিম রে।
ফাগুনে দ্বিগুণ মিঠা বেগুনেতে নিমরে।
চৈত্র মাসে শ্রীফল খেয়েছিলেন রামরে,
বৈশাখেতে শোল মাছ আর পাকা তেঁতুল রে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকা, আষাঢ়েতে কাঁঠাল রে,
শ্রাবণেতে দই খই, ভাদরে পাকা তাল রে।
আশ্বিনেতে নারিকেল, কাতিকেতে ওল রে।
অগ্রাণেতে নয়া অন্ন, চিংড়ী মাছের ঝোল রে।
পৌষ মাসে মুলা-মুড়ি খেতে বড় মিঠারে,
ঝোলাগুড়ে ছাচি ছেনা, আর বাঁকা পিঠা,
হেন বিনার মতে কি বলিব পান্ত ভাতে।
বেগুণ পোড়ায় ছাঁচি তেল আর খিচুড়ীতে ঘি রে॥ —ঐ

১২

সরল দেখিয়ে প্রেম করিলে ওহে, একবার কেনে নিঠুর হইলে,
ওহে, দেখা পাইলে আমায় মুখেতে সুধাইও না।
ওরে অবলারে দুঃখ দিয়া কখনও ভালো হয় না।
আমি মরি তোমার তরে, বঁধু, তুমি ফিরে যেওনা,
হাসে হাসে বলহিতে কথা বইস্‌তে এসে আমার হেথায়,
ওহে, দিবানিশি করতে আনাগোনা।
ওহে আমার মত কোন রমণী, বঁধু, তোমায় ছেড়ে দেয় না
আমি মরি তোমার তরে, বঁধু, তুমি ফিরে চাও না।
সারদা সিংহেতে কয় যখন ফলে মধু হয়,
মধু ছাড়া ভ্রমর কোথা যায় না।
ডাল ভেঙ্গে ফুল শুকায় গেলে ভমর আর তো সেথায় রয় না;
আমি মরি তোমার তরে,
বঁধু, তুমি ফিরে চাও না॥ —ঐ

১৩

প্রফুল্ল অইল ফুল ভমরা বিনে বিফল
মকরন্দ পড়ে ঝরি ঝরি,
কে করিবে মধুপান ব্রজে নাই মোর প্রাণধন
ফুলশরে জর জর বাঁচিব কি করিয়া গো।
হরি গেল মধুপুরী॥ —ভীমার্জুন (মেদিনীপুর)

১৪

না বুঝে লম্পট সনে পীরিতি করে গোপনে
কুলমান সব গেল চুরি,
মূল দিয়ে নিল কুল শেষে হল ডুমুর ফুল,
নাগর পুন না আইল ব্রজে ফিরি গো,
হরি গেল মধুপুরী॥ —ঐ

১৫

ডুবেছি না ডুবতে বাকি, বঁধু, পাতাল কত দূর গো।
ভাবের ঘাটে পার কর, বঁধু, রাখতো এবার গো॥ —ঐ

১৬

যেদিকে ফিরাই গো আঁখি, সেদিকে অন্ধকার দেখি,
অন্ধকার দেখি কুঞ্জবনে গো, এমন বসন্ত সময়,
যেদিকে ফিরাই গো আঁখি সেদিকে কাল দেখি গো,
ওহে, কেমনে ধরি আমার দিন গো॥ —ঐ

১৭

যাও হে, আসিতে বল বল ঝটকরি,
শ্যাম বিনা উপবাসী আমরা আছি দিন চারি।
কুলে রইতে নারি গো।
চিতে না মানে শ্যাম ভারী॥
দুঃখিনীর দুঃখনীরে বিদেশীরা ভাঙ্গে হাঁড়ি গো।
পর পুরুষের রূপ হেরি আমরা পাসরিতে নারি গো।
কুলে রইতে নারি গো।

শ্যাম বিনা উপবাসী আমরা আছি দিন চারি।
হেন দ্বিজ টিমা ভণে, আমায় ভাঁড়ালে, হরি,
বড় আশায় শেল দিলে অবলায় হল রাঁড়ী
কুলে রইতে নারি গো॥ —ঐ

১৮

ছিলে, হে রাখাল রাজা, হয়েছে নৈতন কুবুজা,
বাঁকায় বাঁকায় ভালো মিলিল, রাই ধনি কেমনে ভুলিল
ইকি সহে মোদের প্রাণে, কুবুজা বসেছে বামে।
বাঁকায় বাঁকায় ভালো মিলিল, রাই ধনি কেমনে ভুলিল॥
খাওয়ায় মোগেরই গুঁড়া, কেড়ে নিল পীতধড়া,
মোহন চুড়া ভূমে পড়িল, বাঁকায় বাঁকায় ভালো মিলিল
নরু বলে, ওহে হরি, তোমায় বিনে রাইকিশোরী,
দানী বলে তোমার নাই কি মনে।
বাঁকায় বাঁকায় ভালো মিলিল॥ —ঐ

১৯

ঘরের না থাকিলে পরে ছল করে বসে দুয়ারে,
বঁধুয়ার বদনে চাইলে পরে আমার রাগ ভুলে যায় অন্তরে,
বঁধুয়া হে, কি গুণে ভুলেছ, হে বন্ধু, কি করে ভুলেছ আমারে। —ঐ

২০

আসি বলে বঁধু গেল, কত না বয়স হলো,
আমার এ নব যৌবন গেল অকারণ,
ফিরে এল না এল না শ্যাম ধন।
করিয়ে পীরিতি বাড়া তিলে না করিত ছাড়া।
মোরে ত্যজিল ত্যজিল সখি বৃন্দাবন।
ফিরে এল না এল না শ্যামধন।
কঠিন কুটিল মন কুজন সে নয়।
সুজন জানে না জানে না ধারা প্রেমধন।
ফিরে এল না এল না শ্যামধন।

এ দ্বিজ গোপালে ভণে, যাব আনিতে নবঘনে
রাধে, মিলাব মিলাব পেলে দরশন
ফিরে এল না এল না শ্যামধন ॥ —ঐ

২১

বৃন্দে গো, তোর করে ধরি, যাও বৃন্দে, মধুপুরী,
আন গিয়ে নিঠুর বংশীধারী রাখবো নয়নে নয়নে,
দ্বিজ ফণী আছে ঐ আশা করি গো হরি গেল মধুপুরী ॥ —ঐ

২২

এস, বঁধু, করি দরশন তোমায় মনে পড়ে ঘন ঘন,
কোথা আছ হে, প্রাণের বঁধু, হেরি নাই তব মুখ-ইন্দু হে।
একা ঘরে মরি ডরে আমি বিধবার মতন।
দিনের বেলায় কাজে থাকি ভেবে ভেবে পোহায় রাতি,
হাতের নাড়ু দেখিয়ে তুমি হরে নিলে মন।
তোমার সঙ্গে পীরিতি করি দিবানিশি কেঁদে মরি হে,
আমায় ফাঁকি দিয়ে, বঁধু, তুমি অপরে দিলে মন।
কি করে রাখিব জীবন বুঝালেও বুঝ মন হে।
প্রেমের আগুন জলিছে দ্বিগুণ শুকনা নদীর ঢেউ যেমন।
হেন বিনায় বলে. এমনি ভাবে আর ক'দিন চলে,
পরের জন্য নারীর জীবন, কেন হল না মরণ ॥ —ঐ

২৩

আঁধারি ভাদর রাতি, দেখিয়া তড়পে ছাতি
পতি নাহি পালঙ্কের উপর।
সখী রে, প্রাণ দহে মদনের শরে ॥
একে তো অবলা বালা, দোসরে যৌবন জ্বালা
কেমনে রহিব শূন্য ঘরে,
সখী রে, প্রাণ দহে মদনের শরে।
শুন শুন, সহচরী, তোদিগে বিনয় করি,
বাঁচাও আনিয়া সে নাগরে।
সখী রে, প্রাণ দহে মদনের শরে ॥ —ঐ

২৪

শুন গো, প্রিয়সখী, শ্যাম আমার পোষা পাখী,
লোহার পাঁজর কেটে সে পাখী পালাল গো।
তার বিনে পান (প্রাণ) গেল গো।
আদরে চাপাতাম বুকে নাম শিখাতাম মুখে মুখে,
দুঃখসুখে পাব বলে বড় আশা ছিল গো,
তার বিনে মান গেল গো।
এবার মনকে বুঝাইব আর পাখী না পুষিব গো,
এমন নিঠুর পাখী যে কোথা পালাল গো।
তার বিনে পান গেল গো॥ —ঐ

২৫

পীরিতি করিয়ে কালা বিদেশে রহিল,
যৌবন জ্বালা আমায় সহিতে হ'ল।
ও বিশাখা গো, মন-আগুনে তনু জরে গেল।
চড়াইয়ে তরুর ডালে, ছেদন করিল মূলে,
হুতাশনে ঘিত ঢেলে দিল।
ও বিশাখা গো, মন-আগুনে তনু জরে গেল।
যৌবন জ্বালা আমায় সহিতে হোল,
মন-আগুনে তনু জরে গেল॥
হেন শ্রীনাথ সিং এর বাণী এমন বলে নাইত জানি
অমৃতেতে গরল মেশাইল।
ও বিশাখা গো, মন-আগুনে তনু জরে গেল।
যৌবন জ্বালা আমায় সহিতে হোল।
মন-আগুনে তনু জরে গেল॥ —ঐ

২৬

অল্প বয়স দেখি পিরীতি করল সখী,
আমার জড়ানো পিরীতি ভাঙ্গি গেল গো।
কাঁহে নিন্দা বৈরাগী ভেল॥

পাকা কদম দেখি ফাবড় মারিল সখী গো
কচি কদম পড়ি গেল,
দ্বিজ মাধবে বলে পাকা কদম খাবো বলে
কচি কদমে দাখা গো।
আমার মনের আশা মনে রয়ে গেল গো,
কাহে নিদা বৈরাগী ভেল॥ —ঐ

২৭

ঘন ঘটা রাতিয়া চমকে বিজুরিয়া,
থাকি থাকি উঠে বিরহ আগুলিয়া।
কোথায় রইলে, প্রিয়তম, তুমি না দেখ আসিয়া হে—
বিফলেতে গেল জীবন-যৌবন বাহিয়া,
তাই থর থর কাঁপে অঙ্গ হানে রাতি পাতিয়া,
ভকত কিশোরে বলে, থাক ধৈর্য ধরিয়া।
মিটাইব মন আশা, বদন চুমিয়া হে॥ —ঐ

২৮

আমি তোমায় ভালবাসি অন্তরে অন্তরে,
তুমি যে চলিয়া গেলে, অবলারে ছেড়ে, বঁধু,
কি বলিব তোমারে, বঁধু!
স্বপনে দেখেছি আমি নিশি ঘুমঘোরে,
চমকি উঠিয়া দেখি পাই না তোমারে।
ছায়াতলে থাকিব কি করে, বঁধু,
তুমি যে চলিয়া গেলে চাহিলে না ফিরে।
তুমি যাইবে যেথা, আমিও যাইব সেথা,
তোমায় না দেখিলে বাঁচিব কেমনে।
দ্বিজ মুক্তীশ্বরে বলে ভুলিব কেমনে, বঁধু, ভুলিব কেমনে?
পীরিত করা বড় জ্বালা সহে না অন্তরে, বন্ধু॥ —ঐ

২৯

মিছে কেন কাঁচা রসে, ধনি, মজাইলি মন,
জল দিলে রং ধুয়া যায়, ধনি, করবি কি এখন।

প্রথম পীরিতি কালে বলেছিলে আশা দিলে গো,
অবশেষে কুল ঘুচালি, ধনি, করবি কি এখন।
ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো, যদিন যায় তদিন ভালো গো,
নিভলে বাড়ি আঁধার হবে, ধনি, করবি কি তখন।
হেন বিনয় বলে তার পীরিতে শুধু মন ভুলে গো,
অবশেষে ছেড়ে দিলে, ধনি, করবি কি এখন ॥ —ঐ

৩০

কোথা কার কামিনী দিবস রজনী,
বঁধু হে, ভাবে ভাবে অঙ্গ হল জরি।
কেন এল না, হে গিরিগোবর্দ্ধন ধরা,
আসি বলে গেলো কেনই সে না এলো,
কোথা রইল, মনচোরা, কেন এল না হে ॥ —ঐ

৩১

পীরিতি ঘটায়ে কালা গেল দূর দেশে,
যইবন জ্বালা সে ত কালা আমায় সইতে হইল।
পীরিতি ঘটায়ে কালা গেল দূর দেশে,
মালা গুণে তনু বইয়ে গেল, ওগো সখা গো।
ওগো চড়ায়ে তরুর ডালে ছেদন করেছে মূলে
হুতাশনে ঘৃত ঢালি দিল, ওগো সখা গো।
বৃন্দাবনে ছাড়িয়ে কৃষ্ণ মথুরাতে রাজা হৈল
কুবজারে পাশে বসাইল ॥ —ঐ

৩২

শ্যাম খুঁজিতে রাই বালা, গো দূতী, আজ উপনীত হইল মথুরাতে,
আর হেলিয়ে দুলিয়ে দুবাহু দুলায়ে নইয়ে যাব গো রাজার হুজুরে
দ্বারী, দ্বার ছাড়িয়ে দাও হে আমারে,
তবে দ্বারী বলে এস গো দ্বারে,
জিজ্ঞাসা করিয়ে আসি হে তারে রাজা কি উপমা দেয় আমারে,
রাজা মহাশয়, বাণেশ্বরিয়া কয়, নইয়ে যাব গো রাজার হুজুরে।
দ্বারী, দ্বার ছাড়িয়া দাও আমারে ॥

৩৩

ঝাঁপ দিব যমুনার জলে গলে ছুরি নিব বলে
ও ললিতা, কুথা হে নবীন বংশীধারী ॥ —ঐ

৩৪

হে প্রাণধন, কেমনে রাখব জীবন—
যারে না দেখিলে রহিতে নারি তিলে তিলে,
এখন কোথায় আছে সে রতন।
চলনে চলনে মনে পড়ে বদন গো চলিতে না চলে চলন,
সদা মন চঞ্চল কি করিতে কি বা হল গো, হৃদেতে বিঁধিতে মদন
এখন কোথায় আছে সে রতন ॥
বিনা বলে শুনগো, ধনি, তোর গূঢ় তত্ত্ব সবই জানি,
আর না হেরিবে সে বদন।
এখন কোথায় আছে সে রতন ॥ —ঐ

৩৫

আইল বসন্ত কোথায় প্রাণ-কান্ত,
অভাগিনী ক্লান্ত ভাবিয়া—কোথা হে নাগর কালিয়া।
আসিব বলিয়া গেলে হে চলিয়া
সে আশাতে আমি বসিয়া ॥
চাতকিনীর মতো চাহিয়া আছি পথ
দিবস রজনী জাগিয়া, কোথা হে নাগর।
রমণী জনম বৃথাই জীবন
সুখ-দুখ-সিন্ধু বাঁধিয়া।
গর্জেছিল বিধি ওহে প্রাণনিধি
পাষাণ হয়ে যেতো চলিয়া।
কোথা হে, নাগর কালিয়া ॥
হাতে দিতে বিধু ওহে প্রাণবঁধু,
কত সতো প্রেম করিয়া ;—
ছটু রায় বলে এমত করিলে
তুষের অনল যেতো জ্বলিয়া ॥ —ঐ

৩৬

করিয়ে চাতুরী করি বাড়িবুড়ি তুমি, হে নিঠুর হরি।
প্রেম করে দুখ দিবে বলে আমি না জানি।
প্রাণ ফোটে মুখ না ফোটে, আমি অবলা নারী,
আমায় দুঃখ দিবে বলে আমি না জানি। —ঐ

৩৭

বাঁকা লম্পট কাঠ কপট কুটিল, কঠিন কঠোর কালিয়া হে।
অবলা মানুষে পতঙ্গে পোড়ালি বিরহ অনল জ্বালিয়া হে॥ —ঐ

৩৮

বঁধু, আমার বড় দয়াহীন, সখি, শ্যাম নাগর আমার বড় দয়াহীন।
কালার লেগে কেঁদে ভেবে আমার তনু হল ক্ষীণ॥ —ঐ

৩৯

প্রেম কি সহজে হয়, আগাম কি গাম ভাবতে হয় গো,
জোড়া প্রেম ভাঙ্গিল কিসে তোর গো।
ওগো, ধনি, খুলে কথা আমারে বল গো,
আগে কেন দিয়ে আশা, এখন কেন নিরাশা গো।
তোমার হাতে ধরি বিনয় করি, আমায় না বাসিও পর গো।
এই তোমার রূপের মণি, হৃদয়ে জাগিছে ধনি,
খনে খনে পড়ে মনে, ঐ মৃদু মুখের স্বর গো।
ওগো, ধনি, খুলে কথা আমারে বলগো।
হেন রাখালে কয়, ভাঙ্গা প্রেম কি জোড়া যায় গো,
ছিটা দুধে যেমন না বসিল সর গো,
ওগো, ধনি, খুলে কথা আমারে বল। —ঐ

৪০

আমি দুখে থাকি তাহে ক্ষতি নাই, তুমি সুখে থাক এই মাত্র চাই।
তব সুখে সুখী, চিকণ কালো নন্দকুল চন্দ্রমা।
আমার কোথা গেল সই কোথা গেল,
তোরা এনে দে গো, দেখা, শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
আঁকা বাঁকা আমার চিকণ কালা।

কোথা গেলে পাই এ জ্বালা জুড়াই,
এত সুখে দুঃখ কেবা দিল।
কারে দোষ দিব নিজ কর্ম ফলে পাওয়া নিধি পুনঃ হারানু হেলে,
কোথা গেলে তারে পাব বল।
রসের মুরতি অবলার পতি, যার জন্য হারাই কুলমান গতি,
সে আজ আমার প্রতি বাম হল্য।
যে এনে মিলাবে পরাণ বান্ধবে
পাগলিনী তার দাসী হল্য। —ঐ

৪১

আমায় বিরহ দিয়ে ভুলে রইল সেথায় কি সে গিয়ে,
এস, প্রিয়ে, কামনায় বিঁধিছে আমার অন্তরেতে।
একবার ফিরে চাও হে নয়নেতে।
অন্তর জর জর মুখানল লাগে তো মোর,
এ যৈবন আর রইবে না হে যাবে দুদিন পরেতে।
ফিরে একবার চাও হে নয়নেতে, জল ছাড়া মীন যেমন, বঁধু,
তুমি ছাড়া হইলে আমি তেমন, ভুলিলে না ভুলিব, বঁধু।
আমি ধরিব তোমার গলেতে, ফিরে একবার চাও হে নয়নেতে,
এ যইবন আর রইবে না হে।
বনমালী দাসে গায়, সখিরে, ঐ যাতনায় আমার প্রাণ যায়,
নিভাইলে নিভা যায় না অনল, সখি, নিভাবো গো কিসেতে।
ও সখি, বলনা গো আমাতে, ফিরে একবার চাওনা নয়নেতে,
এ যইবন আর রইবে না হে॥

৪২

দয়া করে দেখা দাও হরি,
ছাড়িয়া গেলে হে একা করি।
কোথায় লুকালে ওহে ত্রিভঙ্গ গোকুল-বিহারী।
কুলের নারী বনে এনে ত্যজিলে, হে বনচারী॥
আর চলিতে পারি না হে বিপদ ঘটিল আমারি।
কি করিয়া বেড়াব আমি বল তুমি বিচারি॥

চরম শোকে মনের দুঃখে ডাকি সদা তোমারি।
তোমার বিরহে যদি পরাণে মরি লক্ষ্য হবে বংশীধারী ॥
দেখা দিয়ে জুড়াও জীবন, আহা, হায় হায়, প্রাণে মরি।
ক্ষম অবলারে দেবী বলিছে বংশীধারী ॥ —ঐ

৪৩

ওহে, এল বসন্ত আমার কোথা প্রাণকান্ত
অভাগিনী ক্লান্ত ভাবিয়া।
হইতেছিল মোর প্রেমের অঙ্কুর,
(আমায়) কেন দিল বিধি ভাঙ্গিয়া।
আমার কোথায় হে নাগর কালিয়া,
মোরে কেমনে রয়েছে ভুলিয়া।
আসিব বলিয়া গেলে হে চলিয়া,
আমি যে আশায় রইলাম বসিয়া।
চাতকীর মত আমি চেয়ে পথ, দিবস রজনী জাগিয়া।
রমণী-জনম বৃথাই জীবন, সুখদুঃখ-সিন্ধু বাঁধিয়া।
আমায় গড়েছিল বিধি ওহে কৃপানিধি,
আমি পাষাণ হইলে যেতাম গলিয়া।
মোরে কেমনে রয়েছ এখন ভুলিয়া ॥
ওহে, হাতে দিয়ে, বিধু, ওহে প্রাণবন্ধু, কত শত প্রেম করিয়া,
ছুটু রায় বলে এমন করিলে,
যে তুষের অনল দিলে জালিয়া ॥ —ঐ

৪৪

যাবে যাও চলে রাখবে মনে আমারে,
মনের আগুন দিয়া সোনার বঁধুয়া যায় চলিয়া।
দেখা হলে বলবে নাগরে
বুকেতে পাথর চাপা দিয়া
সোনার বঁধু যায় চলিয়া,
বুকেতে যেন ঢেঁকির প্রহার পড়ে গো
দেখা হলে বলবে নাগরে ॥ —ঐ

৪৫

আর আমি এই জীবন রাখবো না।
দরিয়ায় ঝাঁপ দেব, কালোসোনা ॥
আর মনে কিবা কাজ, এই মনে লাগিল চিন্তা-ভাবনা।
জগতে আর কি আছে, সখী, তাহা বুঝে দেখ না ॥
স্বচ্ছন্দে পালালে তুমি কোন দিন বলিলে না।
কে আর বাজাবে বাঁশী রাধা নামে ঘোষণা ॥
কে নিবে আমার ভার, দীননাথ, কোন মতে ব্রজে থাকবে না।
বংশী বলে কলি যুগে ধৈর্য ধর, রসময়ী, প্রাণ ত্যজনা ॥ —ঐ

৪৬

তোমার লাগিয়া ছাতি মোর যায় ফাটিয়া,
ভর্তি যৌবনে দাগা দেল থাকি থাকি,
আমা হৃদে মারে শেল ॥
এ ভর যৌবন কি করে প্রাণ
কেন বিধি আমায় নারী জনম দেল,
থাকি থাকি হৃদে মারে শেল ॥
এ ছিল কপালে লেখা, আর কি, বন্ধু, পাব তোমার দেখা,
দারুণ ফাঁদে পড়ি গেল ॥
হীরু লালে কহে বাণী, শুন শুন গো, ধনি,
দারুণ ফাঁদে পড়ি গেল
থাকি থাকি আর হৃদে মারে শেল ॥ —ঐ

৪৭

এল না এল না ব্রজে আর বংশীধারী,
বল গো জীবন জুড়াই কিসে কেমনে প্রাণ ধরি।
তিনদিন পরে আসবো বলে, চলে গেল মথুরাতে,
সমবৎসর না ফিরিল আমায় পরিহরি ॥
কুল মান সব গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হল,
মুখ দেখাতে নারি লাজে তাও তার লেগে মরি ॥

আর কি সেদিন হবে সখি, আসিবেন সেই কমল-আঁখি,
দ্বিজ সাথী গায়, পিঞ্জরের পাখী কে করিল চুরি,
এল না এল না ব্রজে আর বংশীধারী ॥ —ঐ

৪৮

সুবলে ডাকিয়ে রাই একথা কারে শুধাই
কালবরণ হেরিব না তুনয়নে।
কালবরণ না হেরিলে কাজল পর কেনে
রইতে নার কেঁদে মর মান কর কেনে।
হীন বরণের বাণী, কেঁদে কয় কমলিনী,
শ্যামকে আমি খুঁজবো বনে বনে।
যদি শ্যামের দেখা পাই ধরিব তুই চরণে ॥
বৃন্দে মুখ হেরি বলিছেন রাধে প্যারী, শুন, সহচরী,
চল গো সঙ্গিনী, প্রাণ যমুনায় দিব ডারি
বৃন্দে, আন বংশীধারী।
আমরা গোপের নারী,প্রেম জালা সইতে নারি,
উঠিছে লহরী।
মরি মরি মরি প্রাণ যমুনায় দিব ডারি আন বংশীধারী।
শ্রীনাথ সিংহে ভণে কালায় তুটি কর যুড়ি
বৃন্দে, আন সহচরী ॥ —ঐ

৪৯

শুধাই, গো বিশাখা সখী, আর ভাবিও না চন্দ্রমুখী,
মিছা কেঁদে মিছা ভেবে কেন তব তনু ক্ষীণ করবে।
এখন কেঁদে বল কি হবে।
পুর্বে কইরাছিলাম মানা, খলের সঙ্গে প্রেম কোর না,
পরে জানে কি পরের বেদন, কার তুঃখ কোনখানে।
কেঁদে বল কি হবে এখন কি তোর কান্না ফুরাবে।
শত বৎসর তোমায় কাইনৃতে হবে,
পাপ কইরাছ দণ্ড পাবে, ধনি, কার তুঃখকে নেবে,
এখন কান্দে বল কি হবে মিছা কেন্দে মিছা ভেবে।

রাধে, তনু ক্ষীণ করিবে এখন কেঁদে বল কি হবে,
এ’ সারা জগতে বটে, কুমন্ত্রণা ঘটে ঘটে,
শ্রীনাথ সিংহ ওই পদতলে পড়ে
মিছা কাঁদে মিছা ভাবে। —ঐ

৫০

সরল কি কুটিলে তুমি, চিনিতে না পারি, আমি সখীরে।
জানা যায় না ব্যবহার জানিতে তোমার মন,
কত করি যতন সদাই আকুল অন্তরে,
তোমার মুখের হাসি আমি বড় ভালোবাসি, সখীরে,
কিন্তু পাই না দেখিবারে।
যদি পাই গো দেখা করো মুখ বাঁকা,
মরি মরম বিরহানলে।
আমার সারাটি জীবন গেল তোমারই তরে।
সুখ কিবা দুঃখ নেহ তেমতি তোমারই স্নেহ
তুমি মার কিংবা রাখ হে।
কবে যে করিবে দয়া, আমি জানি তাহা,
আমি আছি আশা লয়ে
সারাটি জীবন গেল তোমারই তরে।
মন্দ বলে ঘরে পরে সুখী রামকৃষ্ণ বটে
অভাব গো রাই তোমার॥ —ঐ

৫১

আজো কুঞ্জে না ফিরে এলো হরি, ফিরে হরি গো,
চৈত্র বৈশাখ দু’মাস খরা, প্রিয়া বিনে সাথী জীয়ন্ত মরা,
আইল ভাদ্র প্রাণেতে কাতর
করে গেলে রমণীর মন চুরি গো,
আজ কুঞ্জে না ফিরে এলো হরি গো।
আশ্বিনেতে দেবীর পূজা, কার্তিকে চন্দ্রের শোভা,
ঐ শোভা হেরি মনে পড়ে হরি, আমি ধৈরজ ধরিতে না পারি,
আজও কুঞ্জে না এলো হরি।

অগ্রহায়ণেতে, সখী, বসন্তকাল, ফলে ফুলে ভরিল ডাল,
ঐ ফুল হেরি মনে পড়ে হরি ধৈরয ধরিতে না পারি,
আজও কুঞ্জে না ফিরে এলো হরি গো ॥ —ঐ

৫২

নীলাম্বর শাড়ী পরিতে না জানি
বাঁধিতে না জানি কেশ গো,
অল্প বয়সে পীরিতি করিয়ে
চলে গেল কোন দেশ গো।
এই তো পীরিতির সময় কাল,
ফলে ফুলে কত ভেঙ্গেছে ডাল,
ঝরে ঝরে কত পড়িছে পাত।
জল বিনে কত চাতক পাখী,
বন্ধু বিনে কেমনে থাকি ॥ —ঐ

৫৩

শুনগো, বিন্দে, বলি তোরে,
(আমারে) যে জ্বালা দিয়েছে মোরে,
ও যে ছ্যাড়ে গ্যাছে সেই কমল-আঁখি,
ওরে দুঃখ বলি কারে সখী বিচারিয়ে থাকি।
প্রেম করে ডুব দিবে বলেই, আমি জানি না গো, সখী,
একে নারী কুলবালা, ওগো, তাতে নারী যৌবন-জ্বালা,
বিধাতা করেছে এমন পিঁজরার পাখী।
দারুণ মদনানলে, আমার দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
তিলেক নিবারণ হয় না, সখী,
ওরে তুষেরই আগুন আমার জ্বলে ধিকিধিকি।
ভণে বামা অতি দীনে আমি আগেতে জানিতেন মনে
এমন প্রেম আর কে করতো, সখী,
ওগো পরাই যে প্রেম ফুলমালা,
কালা দিয়ে গেল ফাঁকি প্রেম করে দুখ দিবে, সখী ॥

—বাঁশপাহাড়ী

৫৪

জানিলে মনে ও কি প্রেম করিতাম বিদেশী সনে।
অনেক পুণ্যেরই ফলে জন্ম নিলে পরকুলে,
চুরিদারী মিছা কথায় ঘুচাও না জমিদারী
শুন শুন প্রাণেরি হরি,
বুঝলে সে জমিদারী,
না বুঝলে যমালয় পুরী।
দশ জনকে ঠিক রাখিবে, মনরে বুঝে সুজে কলম দিবে,
এমনি করে কলম দিবে
যেন না যায় চাকরী।
অধম কালিয়া ভণে পড়ে প্রভুর শ্রীচরণে
ও প্রেম যে হল জালা,
শ্যামকে রেখো না কয়েদ করে। —ঐ

চম্পকের হার পরালে কেনে মালা গেঁথে অন্য ফুলে,
কেন না তাই দিলে গলে চাঁপা ফুলে হিয়া জলে।
যাতনা হয় প্রাণে॥
ওরে, সুবল, কি করিলি, বিষম বিপদ ঘটালি,
বিরহানল জেলে দিলি বাঁচিব কেমনে॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ অঙ্গেরই টানে।
দাস পীতাম্বর লয়ে সাথে যাবে সুবল যাব মাঠে।
রক্ষা কর ভাই বিপিনেতে কিশোরী মিলনে॥ —ঐ

৫৬

তোর পীরিতের রীতি বুঝা গেছে,
রমণী কাঁদানো কি মনে আছে।
মথুরাতে হয়ে রাজা, বামেতে লয়ে কুবুজা,
রায় রাজা কটাল সাজা আর কি মনে আছে।
সাজে না হে রাজ-সিংহাসন কাননেতে গোধন চারণে॥ —ঐ

৫৭

বেইরালো গো দূতী শ্যাম খুঁজিতে
উপনীত হলেন মথুরাতে।
অমনি শ্যামেরে খুঁজিতে খুঁজিতে
হেলিয়ে দুলিয়ে বাহু দুলাইয়ে
আমরা যাব হে রাজার হুজুরে
দ্বারী, দ্বার ছেড়ে দাও হে আমারে
একই বয়সে সকল ধনি।
কোথায় ধাম তোরা কারই রমণী পরিচয় দে আমারে।
ওহে, আমরা কাঙ্গালিনী যোগীর ভিখারিণী,
লয়ে যাও হে রাজার হুজুরে,
দ্বারী, দ্বার ছেড়ে দাও হে আমারে।
দ্বারী বলে, দূতী, তোরা বস গো দ্বারে,
জিজ্ঞাসা করি আসি রাজারে,
রাজা কি আজ্ঞা দেয় আমারে।
তুমাদের সঙ্গে রাজ বরাবরে লয়ে যাব রাজার হুজুরে।
তখন দ্বারী দূতী সম্বরিয়ে
উপনীত হলেন রাজ কেছারিতে,
অমনি বলিতে লাগিল রাজারে।
বাণেশ্বরে কহে, রাজ মহাশয়,
বিন্দের দূতী দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
তারা আসিবে কি যাবে ফিরিয়ে,
দ্বারী, দ্বার ছেড়ে দাও হে আমারে॥ —বেলপাহাড়ী

৫৮

ইহ নব যৌবন বয়ে গেল অকারণ
অসময়ে ছেড়ে গেল হরি,
কোকিলার পঞ্চম স্বরে বিন্ধিছে মোর অন্তরে,
দারুণ বিরহ জ্বালা আর সহিতে নারি গো।
হরি গেল মধুপুরী॥

বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়।
(সখী) বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়।
দেইখ্যাছি তায় পথে ঘাটে জল আনিতে পুকুর ঘাটে
দেইখা আমার হিয়া মাঝে জল বরিষায়।
(সখী) বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়॥
হেরি ও মুখ চান্দ লোকে বলে ভালো মন্দ
আমি বলি বরাত মন্দ নাহি যদি পাই,
(সখী) বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়॥

ভাব-সম্মিলন

১

বঁধু, রাতি হল কিসে,
এলে সহজ পথে এলে কোন মতে,
ভাদর আঁধার রাতি বিজলী চমকে,
বঁধু, রাতি হল কিসে?
বস হে পালঙ্কে চরণ ধোয়াব, বঁধু, মুছাব কেশে
বল, রাতি হল কিসে,
যার সঙ্গে যার ভালোবাসা মরিলেও না ছুটে,
যার সঙ্গে গোপন পিরিত সেই তো মজা লুটে,
বল রাতি হল কিসে? —ঐ

নিকুঞ্জ মন্দিরে রাধিকারে সঙ্গে করি
অতি সুখে শ্যাম নিদ্রা যায়।
উঠ উঠ, প্রাণনাথ, নিশি হৈল অবসান
সুযতনে শ্যামেরে জাগায়।
উঠ উঠ, প্রাণনাথ, নিশি হইল অবসান,
হেনকালে উঠিলেন হরি।

ভোরজাগী পাখী সব কলরঙ্গে কলরব
উল্লু আজি বিবরে লুকায়,
হেনকালে উঠিলেন কানাই
উঠ উঠ, প্রাণনাথ, দিবস হইল প্রভাত,
হেনকালে উঠিলেন কানাই ॥ —ঐ

৩

বল বল বল দেখি, পরাণ-পুতলী, কেমনে আইলে কাননে,
দেখি দেখি দেখি কতনা বেজেছে অতি স্থকোমল চরণে।
নয়ন-সলিলে ধুয়াইয়া দিব, এস হৃদয়ে রাখিব যতনে,
হৃদি হতে কাম বিষ যাক দূরে তব নখমণি পরশনে।
বল, রাধে রাধে, সব অপরাধে ক্ষমহ শ্রীরাধে নিজগুণে,
তোর নামের বাঁশী বাজাই দিবানিশি বেঁচে আছি তোর নামের গুণে।
ঐ নামের ভিতর রয়েছে স্বরূপ দেখেছে জগৎ নয়নে ॥
তাই স্থির হত্যে নারি পরাণ ব্যাকুল বুঝি গেল কুল,
হাসিবে গোকুল ননদিনী তায় লো স্থির হত্যে নারি।
দ্বিজ হীরা ভণে দোঁহারি চরণে
বিনা আকিঞ্চনে সঁপেছি কায় লো ॥ —ঐ

৪

টগর মল্লিকা জয়া কেতকী চমক কিয়া,
আজ কুঞ্জে আসিবেন নাগর আসিবেন নাগর।
আসিতে আসিতে গো বঁধুর গলে পরাইব,
আসিতে আসিতে গো বঁধুর অঙ্গে লাগাইব ॥ —ঐ

৫

সব দেখি জলেতে গেল জল লয়ে তারা তখনি এল,
বেলা থাকি থাকি গেল চন্দ্রমুখী,
সবাকার পেছু আলে গো রাধে।
এতখন কোথা ছিলে গো রাধে ॥
রাধে, মনে গণি গণি রাধা বিনোদিনী,
শ্যাম-কলঙ্কিনী হলে গো রাধে, এতক্ষণ কোথা ছিলে।

তবে আউল বাউল মাথার কেশ অঙ্গে ধূলি কেন, গো রাধে,
মনে গণি গণি রাধা বিনোদিনী,
শ্যাম-কলঙ্কিনী হলে গো, রাধে, এতক্ষণ কোথা ছিলে।
তবে চিকুর চাঁচর হিয়ার মাঝে,
চাঁপা ফুল কোথা পেলে, এতক্ষণ কোথা ছিলে,
বদন তুলে কথা বল না, রাধে, এতক্ষণ কোথা ছিলে॥

—পচাপানি (বাঁশপাহাড়ী)

৬

সঁপেছ হে গোধন চরাতে,
ভুলিতে নারি তোমার পীরিতে।
দিবসে গোধন চরাও, রচি সাধ পোরাও নিশীথে।
পায়ের ঝুমকো খুলে প্যারী যায় গো বাঁকার কুঞ্জেতে॥
নিঃশব্দে যায় কমল রাতে মিশাতে,
শ্যামসঙ্গে রসরঙ্গে ভাব কর গোপনেতে।
ফুল হারা গেঁথে মালা দিব শ্যামের গলেতে।
বাঁকাকে একা পেলে ভাব করবো চির মতে॥
ঐ কালোরূপ কোথায় পাব পৃথিবীর জগতে,
বংশী বলে রাধাকৃষ্ণ সঙ্গম হইল গোধন চরাতে॥ —ঐ

৭

মলিন হয়েছ কি দুঃখে, হেসে কথা বল মুখে
মম দুঃখের কর সান্ত্বনা।
তোমায় নাহি দেখি, করে দুটি আঁখি
আমার হৃদয় করে দহনা॥
(রং) অনেক দিনের পরে দেখা
ভালো আছ কি হে তাই বল না॥
ছিল তোমার সরল হৃদয় এখন কেনে হলে নিদয়
আমার মনে ওঠে ভাবনা।
খুঁজি হে আপনারে, আমি হলাম তোমার
কিন্তু তুমি আমার হলে না।

অভ তুমি বাসতে ভালো সে সব তোমার ভোমরা গেল,
আমার মনের সাধ মিটিল না।
নরোত্তমা ভণে, এই দুঃখী জনে
কেন দেখা দিতে চাও না॥ —পুরুলিয়া

৮

বন্ধু, নিজ পীতবাসে কত ভালোবেসে,
আমার দিন দিল গো মুছায়ে, দিয়ে দিনে দিনে মদনমোহন
মন প্রাণ নিলে কাড়িয়ে॥
—মানবাজার (পুরুলিয়া)

৯

শ্যাম গো শীতলপবন পরশে আমার হৃদয় প্রকাশয়ে,
কুম্‌কুম্‌ কস্তুরী আনে মনোহরী হরি নিল সব হরিয়ে॥ —পুরুলিয়া

১০

আমার অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া
কদম তলিয়া—আমি নয়নে লুকায়ে থুব দিব লাগো ছাড়িয়া।
আমি বহু জন্ম গৌরী আরাধি
আমি পেয়েছি গো মনের মানুষ,
শ্যাম গুণনিধি আমি হৃদে রাখি নিরবধি।
আমি জুড়াব তাপিত হিয়া॥
বঁধুর অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে জীবন জুড়াব প্রাণের জ্বালা জুড়াব।
কত শত বহুমূল্য ভূষণে অঙ্গ সাজাব।
আমি নয়নের সাধ মিটাইয়া, নয়নে নয়ন দিয়া,
আমি বঁধুর মধুর কথা শুনিয়া দুটি শ্রবণ জুড়াব।
প্রাণের জ্বালা জুড়াব,
শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে মহানন্দে আপন হারাব।
আমি বঁধুর অধর-সুধা পিব বদনে বদন দিয়া।
এসো এসো, বঁধু, এসো দুটো প্রাণের কথা কও,
আমি বেশ করে জেনেছি তুমি একা কারু নও।
নইলে ছেড়ে যাবে কেন গোরা পাগলীকে কাঁদাইয়া। —ঐ

১১

কেবা আইলে, বঁধু, এত যদি ছিল মনে,
দিনে না বলিলে, বঁধু, এ্যক তো জোছনা রাতি,
আছে কত পাড়া পড়শী কি সাহসে এলে তুমি
তারা পাছে হাসবে, বঁধু। —ঐ

১২

ওগো, খেলারসে ছিলেন কানাই ছিদামের সনে।
হেনকালে পড়ে গেল রাধিকারে মনে॥
সখী নাই, দূতী নাই, কারে লয়ে যাব।
শ্রীরাধিকার কুঞ্জে গিয়ে নাপিতানী হব॥
কাঁখেতে আলতা ঠেকা হস্তেতে নরুণি।
ধীরে ধীরে চলেন যথায় বিনোদিনী।
ঘরে কেগো, ঘরে কেগো, বিনোদিনী রাই।
আলতা পরাবার জন্য নাপিতানী যাই॥
আলতা পরাবার জন্য ডাকে ঘনে ঘন।
কুঞ্জে ছিল অষ্ট সখী শুনিল শ্রবণে॥
অষ্টসখী বলে, ওগো, কত নিবে কড়ি।
নাপিতানী বলে আমি নিব ছয় বুড়ি॥
ছয় বুড়ি কড়ি আমি অগ্রে গুণি লিব।
যে জন পরিবে আলতা তাহারে পরাব॥
অষ্টসখী বলে আমরা কেহ না পরিব।
কুঞ্জে আছেন শ্রীরাধিকা তাহারে পরাব।
বইস কম্বলাসনে হেলাইয়া গা।
ধীরে ধীরে তুলি দেও গো দক্ষিণের পা॥
এল তো সুন্দরী রাই হস্তে সরু শঙ্খ।
ধীরে ধীরে তুলেন কানাই দুই পায়ের নখ্‌থ॥
নখ্‌থ চাঁছি কৃষ্ণ তখন ভাবে মনে মনে।
আপনা নিজ নাম লিখি শ্রীচরণে॥

কি করিলি, নাপিতানী, একি করিলি।
আমার বঁধুর নাম চরণে লিখিলি ॥
জল এনে দেগো, সখী, আলতা ধুয়ে দেব।
আমার বঁধুর নাম পায়ে না রাখিব ॥
শ্রীযমুনার জল এনে আলতা ধুয়ে দিল।
আলতা ধুয়ে গেল কৃষ্ণের নাম না উঠিল ॥
তখন শ্রীরাধিকা ধেয়ানে জানিল।
নাপিতানী নয়গো আমার বঁধুয়া আপনি ॥
রাধাকৃষ্ণের দুইজনে মিলন হইল।
গোবিন্দদাসের মনে আনন্দ পড়িল ॥ —ঐ

প্রার্থনা

১

কে গো মাধবী এলো পিরীতি করিয়ে গেল গো,
ফিরে না চাহিল আঁখি আমার।
কাজ কি এ অভিমানে এ যৌবন রাখব কার আশায়।
যদি না নাগর মিলে কি হবে জলাঞ্জলি ঢেলে দিব।
খুঁজি কালার পায় ॥

তরু সব ফলে ফুলে বিজলি মেঘের কোলে,
নিশি কোলে শশী খেলে আমি মরি যাতনায় ॥
দ্বিজ মদন ভণে বনফুল শ্রীচন্দনে গো,
পুজব চরণে আমি সমর্পিয়া তায় ॥ —বেলপাহাড়ী

২

মাধবে বিনয় করি কহেন রাধা রাধেশ্বরী
তোমায় হেরে জুড়াব নয়ন হে,
প্রাণধন মাত্র অদর্শনে বিদায় উদয় মনে
কুসুম শরে দহয়ে মদন।
হে প্রাণধন, তুমি আমার জীবনের জীবন।

মনে হয় অঙ্গেরি অঙ্গ মিলাই একই অঙ্গ
সঙ্গ ছাড়া হব না কখনও হে প্রাণধন।
তুমি আমার জীবনের জীবন
ভব পিতা কহে, রাধা, তুমি যে শ্যামের আধা
অভেদ মুরতি দুজীবন।
হে প্রাণধন, তুমি আমার জীবনের জীবন ॥ —ঐ

তুমি না করিলে দয়া কে করিবে দয়া, হরি হে,
ও কৃপা করুণা হে ও কৃপা গো,
ও কৃপা মোহিনী গো ও কৃপা করুণা হে ॥
একবার কৃপা করে হরি আমার এস হে,
ও কৃপা করুণা হে, কৃপা করে একবার এস গৌর হে ॥ —ঐ

৪

ওহে কি রঙ্গ শ্যাম, ত্রিভঙ্গ তোমার বংশীতে ডেকে আনে,
তুমি আবার বল ফিরে যেতে প্রাণ থাকতে বাঁচতে প্রাণে।
যখন শুনেছি বাঁশী প্রাণ সঁপেছি, কালশশী,
এলাম জাতিকুল নাশি তোমার কুল-নাশা বাঁশীর গানে।
ধরম করম সকল ত্যাগী, এসেছি, শ্যাম, তোমার লাগি,
তুমি নাথ হল্যে বিবাগী অভাগীর স্থান কোনখানে।
এত যদি ছিল মনে বাঁশী ঐ নাম ধর‍্যে বাজাই কেনে।
সহজে তুমায় ছাড়ছিনে পড়েছ পাগলীর ফাঁদে ॥ —বাঁকুড়া

৫

শুন হে, শ্যামধন, আর যদি না দিয়েছ মন,
সেদিন হতে প্রেমের হাট গেছি, বঁধু হে।
তোমাতে কি আর আমি আছি ॥
কিংবা যারে দিয়ে মন পেয়েছি পিরীত ধন, কুলমান সকল সঁপেছি ॥
সেদিন হইতে মন তিলেক না হয় আপন,
দীনু কয় কি দায়ে পড়েছি বঁধু হে।
তোমাতে কি আর আমি আছি ॥ —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

জীবন যৌবন ধন সব করিলাম সমর্পণ।
রইল মন পড়ে সেই পদ-কমলে॥ —ঐ

৭

দেখ বুঝে দেখ মিছা নাই বলি,
আমি তোর তরে পাগল হলি।
তোর কারণে আজ এখানে এসেছি আমি বলি,
তোর কারণে দেশান্তরী হবো না, কুসুম-কলি।
তোর কারণে বনে বনে ঘুরেছি অলি গলি।
তোর কারণে রাত্রি দিনে উঠেছি প্রাণ আকুলি।
তোর কারণে আপন মনে দিয়েছি জলাঞ্জলি,
বিপিন ভণে, তোর কারণে দিয়েছি পরাণ ঢালি॥ —ঐ

ঝুমুর—রামলীলা

কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের কাহিনী লইয়াই যে ঝুমুর গান রচিত হইয়াছে, তাহা নহে, কালক্রমে রামায়ণের বিবিধ প্রসঙ্গও এই অঞ্চলের ঝুমুর গানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনীর মধ্যে প্রেমভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু রামায়ণ-প্রসঙ্গের মধ্যে পারিবারিক জীবনের সম্পর্ক, যেমন সীতাহরণে রামের বেদনা, শক্তিশেলে লক্ষ্মণের পতন এবং ভ্রাতা রামের বিলাপ, সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র ইত্যাদিই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে যে সকল অনুভূতির অভাব ছিল, রামায়ণ-প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। রামচন্দ্র বিষ্ণুর ঐশ্বর্যরূপের অবতার, সেই সূত্রে রামচন্দ্রের যুদ্ধ-বৃত্তান্তও ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

সঙ্গীতের দিক দিয়া প্রেম-মূলক রাধাকৃষ্ণের গান যেমন সুগভীর ভাবমুলক, তাহার পরিবর্তে রামায়ণ বিষয়ক ঝুমুর বর্ণনাত্মক। পাঁচালীর আকারে ইহার সুদীর্ঘ অংশ মধ্যে মধ্যে গীত হয়। রামায়ণ-বিষয়ক ঝুমুর সাধারণতঃ রামলীলা ঝুমুর বলিয়া পরিচিত।

২—১৪

আমার কাঁদিতে ভাবিতে গো জনম গেল।
পলাশের পত্র যেন যুগল না হল ॥
সত্য যুগের লক্ষ্মীরূপে ছিলাম আমি বৈকুণ্ঠেতে গো।
হেনকালে প্রভু আমারে কি ভাব হইল ॥
প্রভাতে স্বামীর সাথে গিয়েছিলাম বনবাসে গো।
ভাগ্যদোষে রাক্ষস এসে আমারে হরিল ॥
দ্বাপরে বাঁশরীর স্বরে মন আমার নিল হরে গো।
অবশেষে অক্রুর এসে আমার বঁধুরে হরিল ॥
কলিকালে নীলাচলে ছিলাম প্রভুর চরণতলে গো।
সুখের দিনে প্রভু আমার সন্ন্যাসী সাজিল ॥
চারি যুগে ঘুরি তবু দয়া কেন না হয় তারি গো।
রাঙ্গা চরণ পুজিব বলে বিনার আশা ছিল ॥

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

নারী না হয় আপন কত করি গো যতন।
নারীর জন্যে মরে গেছে লঙ্কার রাবণ,
ঐ নারীর জন্য লঙ্কাপুরে হল মহারণ,
নারী না হয় আপন যত করি গো যতন।
দুষ্টমতি লঙ্কেশ্বরে হরে সীতা পঞ্চবটী বনে,
সীতার জন্যে মরে গেল লঙ্কারই রাবণ। —বাঁশপাহাড়ী

তবে বিশ্বামিত্র মুনি লয়ে লক্ষ্য ধন রঘুমণি
চলিলেন মিথিলার পথে ॥
হায়, কি হইল অযোধ্যাতে ॥
দ্বাদশ বৎসরে রাম যায় রাক্ষস মারিতে ॥
তাড়কা মরিল বনে শ্রীরামের ব্রহ্মবাণে
রাক্ষসী মারিলা রঘুনাথে ॥

গোতম মুনির শাপেতে অহল্যা ছিল পাথরেতে
পাষাণ মানব হয় চরণ ধূলিতে।
তাড়কার কোঙর মারীচ নাম ধরে
বাণ খেয়ে পালায় লঙ্কাতে।
সীতার বিবাহ তরে হর ধনু ভঙ্গ করে
শিব ধনু ভাঙ্গিল হেলাতে।
শ্রীরামের ভ্রমণ রচিলেন নিধিরাম প্রণমিয়া ও পদ পূজে॥

—হাতিবাড়ী (ঐ)

৪

যবে দশরথ রাম সীতা লয়ে করিল গমন
পথ মাঝে পরশুরাম দিলা দরশন
রাজা ভাবে কি হবে উপায়।
রামলক্ষ্মণে নিয়ে মুনির কাছে যায়
রাজা বড় ভয় পায়॥
পরশুরামের ঘূর্ণিত লোচন হরধনু মিথিলায় ভাঙ্গিল কোন্ জন
আমায় বলহ ত্বরায়॥
তিন সপ্তবার নিক্ষত্রিয় করেছি বসুন্ধরা
আমার গুরুর ধনুক ভাঙ্গিলিরে ত্বরা
কেবা জীবন বাঁচায়॥
শ্রীরামের ধনুর্বাণ করিলা অর্পণ
পরশুরামের ক্রোধান্বিত মন
নিধিরাম পড়ে তব পায়।
রং— ক্রোধ ভরে দিলা ধনুক লবকুশের বাপে।
মরতে মরুক রাম ঐ ধনুকের চাপে॥ —ঐ

৫

ভার্গবের ধনুক ধরিলা শ্রীরাম
লক্ষ্মণ কহিছে, শুন, পরশুরাম।
তখন ছিল না ভবে শ্রীরামলক্ষ্মণ, শুন, গাধির নন্দন।
তোমারি ধনুকে গুণ দিব বল কিসেরি কারণ॥

যবে পৃথিবীরে নিঃক্ষত্রিয় করিলে
শ্রীরামলক্ষ্মণ নাহি জনমিয়ে ছিলে,
শ্রীরাম লক্ষ্মণের কাছে দর্প রবে কতক্ষণ ॥
তবে শ্রীরাম ধনুকে জুড়িলা শর
পরশুরামের বন্ধ করে স্বর্গদ্বার।
যেতে না পারিবে তুমি পাতাল ভুবন ॥
চিনিলেন পরশুরাম পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান,
প্রণমিয়া করে কৈলাস গমন।
নিধিরাম বলে তোর দর্প অতি,
পূর্ণ ব্রহ্মে না চিনিস্ হইয়ে ছন্নমতি।
গোলোকের অধিপতি রাম নারায়ণ ॥ —ঐ

৬

শ্রীরাম গেলেন বনে দুঃখ রইল মনে।
রামের নিত্য বদন দেখি ঝুরত,
এ বাছার কাজ নাই, মা, কাজ নাই পীরিতে।
কত দুঃখ রইল মনে।
রাম বলে কতই পিতার কথা
চারি শাস্ত্র শিখেছি, মা, পড়েছি মা পুরাণে। —বাঁশপাহাড়ী

৭

রামকে না দেখি কাঁদে পশুপক্ষী,
কোথা গেল গো রাম ছাড়িয়ে,
ভবপিতা ভণে, শ্রীরাম কাঁদে রাজার সুতা,
ও রাম হইও না বনচারী,
নয়নে কাঁদিবেন অযোধ্যায়। —ঐ

৮

কেকয়ের মন্ত্রণা ভরতে জানে না,
নয়লে মারিতাম বেতেরি বাড়ি,
রাম যাবে বন ভরত না জানে,
নয়লে ঘরে হইতে দিত তাড়িয়ে।

ও রাম, হইও না বনচারী রে,
ও রাম, হইও না ফলাহারী রে,
নইলে কাঁদবে অযোধ্যাপুরী রে।
রাম যদি যাবি বন সঙ্গে নেরে,
কোথায় পাবি ও চাল বাড়ি রে,
কোথা বনস্থল, কোথা পাবি জল। —ঐ

৯

রাম নাকিরে বনে যাবি হাতে নেরে গণ্ডীবান,
চৌদ্দ বৎসর বনে যাবি চেয়ে নেরে মায়ের প্রাণ,
রাম কাঁদে সীতা হরে নিল রাবণে ॥ —বাঁশপাহাড়ী

১০

পঞ্চবটীর বনে রাম থাকে সীতার সনে
লক্ষ্মণ সহিত সহোদর রে।
লক্ষ্মণ বলে, বন মিরগ ধর ধর,
আজ মায়া মিরগর কে রোধে পরাণ রে।
ওরে, শুন ভাই, লক্ষ্মণ, পরাণ-ধন,
আজ আমাদের জন্ম অকারণ রে,
হাতে হাতে ভিক্ষা দিতে তা নিয়ে চাপালেন রথে,
আজ রথ উড়িল শূন্যপথে, শুন ভাই, লক্ষ্মণ, প্রাণের ধন।
আজ আমাদের জন্ম অকারণ। —ঐ

১১

হের রে, লক্ষ্মণ ভাই, কুটীরেতে সীতা নাই,
রাক্ষসে গিলিল বুঝি, ভাই হে।
হা হা, ধনি, গুণমণি, কুথা গেল সীতামণি,
ব্যাকুলিত মণিহারা ফণি হে।
কুথা গেল সুচম্পবদনী, হের চন্দ্র বিনে আঁধার রজনী।
হে তরু বৃক্ষগণ, তুমায় করি নিবেদন,
এই পথে দেখেছ সীতা যেতে হে।

দুগুণ নয়ন ধনী কোকিল বয়ান জিনি
যেন ভুজঙ্গিনী মণিহারা ফণি হে।
পদ্মলতা পদ্মমুখী সীতা কি হ'য়েছে সুখী
লুকিয়ে রাখেছ বুঝি তাই হে।
এখন বলে বাঁচাও তাপিত পরাণ হে।
হায়রে দারুণ বিধি, হরে নিলি গুণনিধি
বড় দুঃখ দিলে ভাই আমারে।
রামরাজ্য বনবাস এই বিচ্ছেদে সর্বনাশ
যেন ভুজঙ্গিনী মণিহারা ফণি হে। —ঐ

১২

ভরতকে রাজ্য দিয়ে রামকে পাঠালেন বনে
সীতাকে করেছি হারা গো।
তারা দু'ভাই পাগলের পারা গো।
সীতাকে করেছি হারা গো॥
সীতা আমার নয়নের তারা গো।
সীতাকে করেছি হারা গো॥ —পচাপানি, ঐ

১৩

কেন রে লক্ষ্মণ ভাই, কুটীরেতে সীতা নাই,
আজ রাক্ষসেতে ভক্ষণ সীতায় রে॥
হায়, প্রিয়ে সুবদনী, তোমায় বিনে রঘুমণি,
যেমন মণিহারা ব্যাকুলিত ফণি রে।
আমার কোথায় সীতা চন্দ্রবদনী॥
চন্দ্র বিনে যেমন আঁধার রজনী রে,
ওরে বৃক্ষলতাগণ, শুন মোর নিবেদন—
এই পথে কি নেগেছে সীতায় রে।
মৃগাক্ষ নয়ান ধনি, কোকিল বয়ান জিনি
মত্ত মাতঙ্গিনী গুণমণি রে॥
পদ্মলতা পদ্মমুখী সীতায় পাইয়ে সুখী,
আজ লুকায়ে রয়েছে কিনারে রে।

হে পৃথিবী, তুমি ধন্যা, কোথায় গেল তব কন্যা,
বলে জুড়াও তাপিত পরাণী ॥
হায় রে, দারুণ বিধি, আমার হরে নিল গুণনিধি,
কি বাদ সাধিলি কপাল রে।
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রীবিচ্ছেদে সর্বনাশ
ভাগ্যে আর কি ঘটে না জানি রে ॥
দীন গোবিন্দদাস কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
সীতারে হরিল দশানন।
সমুদ্র লঙ্ঘন করি, লয়ে গেলেন লঙ্কাপুরী
মাতৃভাবে পালেন গুণমণি। —ঐ

১৪

শ্রীরাম বলিলেন বাণী, শুন ওহে মহামুনি,
আমরা বটি দশরথের নন্দন, শুন তপোধন,
গ্রাম মোদের অযোধ্যা ভবন।
কি দুঃখ ঘটাল বিধি ঘরে হল বিমাতা বাদী,
সে কারণে আমরা দু'ভাই এলাম বন ॥
নামটি বটে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, আমরা আছি পঞ্চবটী বন,
আমাদের সীতা চুরি করিল রাবণ,—
কোথায় সীতা, চন্দ্রমুখী, না দেখিলে ঝুরে আঁখি,
চাহু কাঁদে শুনে না বারণ। —ঐ

১৫

শালুক ফুলে বলে, রে ভাই,
আগম দরিয়ায় ভাসে রে মন বাঁধব কিসে?
কণ্ঠার উপর কুঠরি দরজার উপর আয়না রে,
সেই দেখে দেখে পর সিন্দু হয়ে দিশা হারায় রে,
মন বাঁধব কিসে, পিয়া পর দেশে গো ॥
রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই, নয়নেরি তারা রে,
বনে বনে ঘুরে বেড়ায় হয়ে সীতাহারা রে। —ঐ

১৬

অযোধ্যা নগরে ঘর, নামটি বটে রঘুবর,
বিশ্বাস করিবে মন পাইবে রতন ধন।
অবিশ্বাসে পাথারে ভাসিবে, পাথারে পাতিয়ে জাল,
জাল হলো মহাকাল।
আজ কাল-ভুজঙ্গিনী কি আদরে রে ॥
ও মায়া ঘোর অন্ধকারে সাধু সঙ্গ বিনে
এ মহিমা কে বুঝিতে পারে রে।
ও মায়া ঘোর অন্ধকারে ॥ —ঐ

১৭

অযোধ্যা নগরে ঘর মোর নাম রঘুবর
সঙ্গে সীতা লক্ষ্মণ সহোদর।
ভরতেরে রাজ্য দিয়ে, মোরে বনে পাঠাইয়ে
আনন্দিত হইয়া আছেন গো তারা।
সীতারে করেছি হারা ॥
কৌশল্যা মোদের মাতা দশরথ মোদের পিতা
আঙ্গুল বেড়ি করল সমর্পণ।
যেদিন হতে সীতাহারা, ছুই ভাইয়ের নাই দিশা
ফল জল কিছুই খাই না মোরা ॥
সীতা মোদের প্রাণের বেণু, দহিছে দু-ভায়ের তনু,
যে দেখাইবে সীতা তাহারে করিব রাজা।
শুন শুন বিবরণ অধম দিশে হারা গো,
সীতারে করিছে হারা ॥ —ঐ

১৮

সীতার উদ্দেশ্যে যায়ে হনুমান আলে ফিরে।
পার হলে অগাধ জলেতে আর বাছা হনুরে
কহ শুনি কুশল সংবাদ ॥

গাঁয়েতে হারালি পিতা, বনেতে হারালে সীতা
পার হয়ে জলে যেয়ো অগাধ বাছা হনুরে।
কহ শুনি কুশল সংবাদ ॥
তবে জানকী কেমন আছে দেখিলে পরাণ বাঁচে
বিনোদ্দিয়া খুঁজে আসে অগাধ বাছা হনুরে।
কহ শুনি কুশল সংবাদ ॥
মরি হায় হায় রে ॥ — অযোধ্যা, পুরুলিয়া

১৯

আগে হোয়ে হনুমান বলে, শুন, ভগবান,
আমি ভবসাগর কিসে হব পার।
দারুণ তো দিলে ভারাভার
আর নল নীল স্বগ্রীব যুবরাজ অঙ্গদ বীর
মন্তি হোল জম্বুবান তোমার হে,
আমি বনের পশু জাতি
সেই লঙ্কার অধিপতি আমি কি জানিব সমাচার তাহার,
সগ্‌গে জিনে ইন্দ্র জিতা, রাবণে ধরাইয়ে ছাতা
পবন বীর রাখে যার দ্বারে।
আমি লক্ষ্মীকান্ত বলে পড়ে গুরুর চরণ তলে,
প্রভু, একবার এ ভব কর পারাপার ॥ — হাতিবাড়ী (মেদিনীপুর

২০

চৌকোণে চৌকই বসে কী রূপে চলে আসে।
সকালে পালঙ্ক দেখি কী রূপে নিয়ে গেল রামকে রাজা মহীরাবণে ॥
বেল পুষ্পে করে সেবা ঘাসিরাম তো দেখে মজা,
রাজা কা পুত্র বটে দণ্ডবৎ নাহি জানে।
দণ্ডবৎ দেহ দেখাই রাজা মহীরাবণে ॥
ওঠ, হনু, দেহ বলিদান রাবণকে,
নিজ দশরথের ব্যাটা রামলক্ষ্মণ দুয়ো ভাই
কোন্ মুখে করিবে ভক্ষণ।
কেমন কালী দেখিব এখন ॥

দু' বুড়ী দু' কলসী লয়ে যায় যমুনার পথে জল আনিবারে।
এক বুড়ী বলে, ভাই, ই ইটি কে বটে—
না জানি দেবতা দুটি ভাই।
যেন পদ্মপাতে জল, তেমনি দু'ভায়ের আঁখি ছল ছল,
কোথারে তোর মাতাপিতা কোথারে তোর বাড়ী।
হেঁট মাথা হয়েছে রে হেথা,
শ্বেত মাছি হয়ে খোঁজ রামকে রাজা মহীরাবণকে ॥
আছাড়ে মারিব সেই ত এখন,
দেখিব সে বীর বনে কেমন।
ধূলাতে ধূসর যখন ॥ —ঐ

২১

শ্রীরামে বেড়িল লঙ্কা লয়ে বানরগণ,
জোড় হস্তে বিভীষণ লইল স্মরণ,
শুন, বলি রাজা দশানন,
রামে সীতা সঙ্গে লয়ে দাও, ভাই, এখন। —ঐ

২২

যে যন্ত্রণা কর যার বংশের নিপাতন,
রক্ষ হে সোনার লঙ্কা, রক্ষ বন্ধুগণ। —ঐ

২৩

শ্রীরাম যদি হইত নর সাগর কি সহিত বন্ধন,
কেন হে তাঁহার সীতা করিলে হরণ,
শুন, বলি, রাজা দশানন। —ঐ

২৪

নররূপ অবতার উদই যে শ্রীচরণ,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজন তারা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শুন বলি রাজা দশানন,
রামের সীতা সঙ্গে লয়ে দেও, ভাই, এখন। —ঐ

২৫

যখন লক্ষ্মণ পড়িল শক্তিশেল বাণে
শ্রীরাম ভাসেন আঁখি নীরে,
আজ ভাই লক্ষ্মণ ধূলায় শয়ন,
দশশির বধিবারে উঠ উঠ, বীর, হাতে ধনুক ধর।
যদি এবার যায় অযোধ্যাবাসী,
সুমিত্রা মাতারে কি বলিব আমি ?
ওরে, রাম বাপ, তুই এলি একা,
লক্ষ্মণ বাপো তুই ছেড়ে এলি কোথা,
আমি কি বারতা দিব তারে,
ওঠ ওঠ বীর হাতে ধনু তীর।
ভবপিতা ভণে ভজ নারায়ণে রণ স্থলে হরি পারাপার,
ওঠ ওঠ, বীর, ধর ধনুতীর ॥ —বাঁশপাহাড়ী

২৬

বনে হারালাম সীতা, অযোধ্যায় হারালাম পিতা,
আজ আমরা দু'জন ক্ষেপা বাউলের পারা হে,
সীতাকে করেছি হারা।
রামলক্ষ্মণ দুই ভাই একটি রমণী তার,
আজ আমরা দু'জন সীতাকে করেছি হারা। —ঐ

২৭

ওঠ ওঠ, বীর, ধর ধনুঃশর দশশির বধিবারে, দশশির বধিবারে।
তুই যে লঙ্কার প্রতি বিরাগিণী, রঘুরক্ত কুলে কালি মাখাইলি,
ওরে ভাই, অবোধ, কি দিব প্রবোধ জিজ্ঞাসিলে বিধাতারে রে,
শক্তিশেলে পড়িল লক্ষ্মণ কাঁদি সে রাম কমললোচন।
ঘরে ফিরে এলে, রাম, লক্ষ্মণ রহিল কোথা,
জিজ্ঞাসিবেন বিমাতা যে রে দশশির বধি। —ঐ

২৮

কিস্‌কিন্ধ্যা অযোধ্যা লঙ্কা জীবনে হইল শঙ্কা।
পতিহীন হলো নারী গন্ধমাদন পর্বত আনি ॥

কুম্ভকর্ণ রিনিঝিনি,
আজ শিশুর বান খেয়ে লোটায় রে।
মরি কিংবা মারি রণে বীর শিশুর প্রাণে আজ দেখিব। —ঐ

২৯

শক্তি শেলে যবে পড়িল লক্ষ্মণ,
কাঁদেন শ্রীরাম রাজীবলোচন।
ভাসেন নয়ান নীরে রে,
হায়রে, লক্ষ্মণ, কেনরে শয়ন ।
মধ্যরণ পারাপারে রে,
ওঠ ওঠ, বীর, ধর ধনুক তীর,
দশশিরায় বারে বারে রে,
আজি ফিরে লঙ্কাপতি বিনাশিবে
রিপু-রক্তে কুল-কালিমা ধোয়াবি
উদ্ধারিবি কি সীতায় রে।
তুই ধরা পরে ঘুমাইলি ফিরে
রণশ্রম জুড়াবারে রে।
ওঠ ওঠ, বীর, ধর ধনুক তীর।
দশ শিরায় বারে বারে রে ॥
দেশে গেলে মাতা জিজ্ঞাসিবেন কথা,
রাম এলি, লক্ষ্মণ রাখি এলি কোথা,
কি কবো বারতা তারে রে,
হায়রে অবোধ দিয়ে কি প্রবোধ,
প্রবোধিব বিমাতায় রে,
ওঠ ওঠ, বীর, ধর ধনুক-তীর।
রঘুকুল পাল আজি বৃথা যায়।
বিভীষণ রাজা না হইল লঙ্কায়।
ভবপিতা ভণে শ্রীরাম-স্মরণে
শমনে এড়াতে পার রে। —বাঁশপাহাড়ী

গৃহেতে হারালো পিতা, কাননে হারালো সীতা,
দেবী পুজা হইল বিলম্বন সংকল্প পূরণ হা রে।
নীলপদ্ম পুজার তরে বিলম্ব হয়েছে কি কারণ গো,
আমার পুর্ণ তুণ-শরাসন নয়ন তুলিয়ে মায়ের পূজব চরণ ॥
দেবীপুজা হলে ভঙ্গ নরকে ডুবিবেক অঙ্গ,
না হইবে বৈরী নিপাতন হে।
ইহ-পরকাল যাবে, বল কি উপায় হবে,
আজ কলঙ্ক ঘোষিবে ত্রিভুবনে।
বলে মোরে ত্রি-সংসারে কমলাক্ষ
বলেন সর্বজনে, একটুকু দিব মায়ে রে ॥
ধেনুক বাণ ধরি করে নিয়ে সন্ধান
নিজপরি যে অস্ত্র তুলিব এখনি।
হেনকালে মহারাণী, আসিয়া ধরিল পাণি
ভবপিতাই নিল শ্রীচরণে হে ॥
আনরে পুর্ণ তুণ শরাসন নয়ন তুলিয়ে, মায়ের পুজব চরণ ॥ —ঐ

৩১

রাবণের করে ধরি কহেন রাণী মন্দোদরী
প্রাণনাথ, নিবেদি চরণে,
অতুল ঐশ্বর্য তব, হায় বীর্য তব নাশব
আজি সর্বনাশ কিসের কারণ হে।
শুন শুন, শ্রীমধুসূদন।
কালীর ঘটে নিধন, মরিলা খরদুঃশাসন
আজ যাহার খাইয়া তীব্র বান হে।
আইজ সর্বনাশ কিসের কারণ হে ॥
বইব ভার তার সনে, আজ কর কেন অকারণে,
রাঘব নয় সামান্য নর হে, শুন শুন শ্রীমধুসূদন।
আমার এ ছার রাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
আজ কর লঙ্কা বিনাশ বিধান হে। —বেলপাহাড়ী

ঝুমুর—ভারত পালা

মহাভারতের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়াও ঝুমুর গান রচিত হইয়াছে তাহা প্রধানত: অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ লইয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া তাহা অর্জুন পালা নামে পরিচিত। ইহাও ভাবমূলক গীতির পরিবর্তে আখ্যানমূলক পাঁচালীর আকারে রচিত এবং গীত হইত।

১

শ্রীকৃষ্ণ বলিছেন বাণী, শুন শুন, রাধারাণী, বলিহে হে তোমায়।
ও যে যাজ্ঞসেনীর কেশ ধরি আনিল সভায়,
সখা, বল, ভাই, সেদিন ভাব ছিল গো কোথায় ?
দুষ্ট দুঃশাশন বসনে ধরিয়া টানে, তখন বড্ড নজ্জা পায়,
তোরা সেদিন ছিলে হে সবাই সখাই বলো ভাই,
সেদিন ভাব ছিল বা কোথায় ?
জতুগৃহ নির্মায়ে তাহাতে আশ্রয় দিলে, অনলময় জ্বালা।
পঞ্চজন সেদিন তোরা ছিলে হে সবাই ॥
আর নানা ছলে বিক্ষদলে, বিষ খাওয়ালে পানে,
হা রে সে তো জলে তো ভাসালে,
আমি ধর্ম বলে রক্ষা পেলেন আমি অধম তারা গাই ॥
যাজ্ঞসেনীর অপমান সহিতে চাহে না মন,
কেশ ধরে টানিল দুঃশাসন, বস্ত্র করে আকর্ষণ ;
আর কত অপমান সভামাঝে করিল ॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

থাকৃতে স্বামী পঞ্চজনে বস্ত্র টানে দুঃশাসনে, উলুঙ্গ করিতে।
কেমন করে দুঃশাসনে টানিবে বসন দয়া কর, নারায়ণ!
সত্যভামা রুক্মিণীর পাশে হরি বসেছিলেন এক আসনে
জানিতে পারিল,
কত অপরাধ করে সভার ভিতর দয়া কর, নারায়ণ।
গরুড়েরি পিঠে চড়ে হস্তিনাতে চলেন হরি তরাতে দ্রৌপদী।
তাই ধর্ম রক্ষা লাগি আলেন ঈশ্বর, দয়া কর, নারায়ণ। —ঐ

কাঁদেন দ্রুপদ-সুন্দরী বারবার দুনয়নে বহে বারি,
ধিক্ নকুল সহদেব ধিক্ পঞ্চ-পাণ্ডব।
জীয়ন্ত আছেন গেছেন মরি কাদেন দ্রুপদ-সুন্দরী।
পঞ্চ স্বামী বর্তমানে বস্ত্র টানে দুঃশাসনে
নিবস্ত্র করিতে বাঞ্ছা—কহি কাঁদেন দ্রুপদ-সুন্দরী।
ধিক্ ধিক্ ভীম বীর, ধিক্ ধর্ম যুধিষ্ঠির
জীয়ন্ত আছেন গেছেন মরি, কাঁদেন দ্রুপদ-সুন্দরী।
হেম দুলালে কয়, এত অভাগিনী তোদের নারী,
কাঁদেন দ্রুপদ সুন্দরী ॥ —বেলপাহাড়ী

৪

দ্রুপদ বলেন বাণী, এই চিন্তা করি আমি,
মনে মনে করি হে বিচার সবার মাঝারে যার,
সৈরিন্ধ্রী নাম দিও দাসী হব রাণী যুধিষ্ঠির।
করেছে কঠিন পণ না বুঝিয়ে দুর্যোধন
আউল বাউল কেশ বদন মলিন বেশ,
যতনে বাঁধিব মাথার কেশ।
না খাইব উচ্ছিষ্ট ভাত না দিব চরণে হাত
এই মাত্র নিয়ম আমার ॥
হেম দুলালে কয় দয়া কয়, দয়াময়,
তুমি বিনা গতি নাহি আমার ॥ —ঐ

৫

দ্রৌপদী কহেন বাণী ঐ চিন্তা করি আমি,
মনে মনে করি নিবেদন।
সবারই মাঝারে যাব সৈরিন্ধ্রীর নাম নেব
আমি রাণী হব সুদেষ্ণার।
গেঁথেছি ফুলের হার, না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত,
না দিব চরণে হাত এইমাত্র নিয়ম আমার।

উত্তরকে বৃহন্নলা জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

সৈরিন্ধ্রীর মুখে শুনি জ্ঞাত হইলাম আমি,
পাণ্ডবের সারথি ছিলে তুমি,
খাণ্ডব দাহনকালে অর্জুন সারথি ছিলে,
অবহেলে মেঘে বাজি নিলা,
আমার গোধন সব কৌরবে বেড়িলা ॥
লহ রথ সজ্জা কর, রথের পাঁচনি ধর
ধনু অস্ত্র তুল রথের উপর।
দেখাইব যমপথ না রাখিব গজরথ
বাহুবলে আজ উড়াইব ধূলা হে।

৬

পার্থ বলে, আমি পার্থ, শুন বিরাট-সুত,
শিগ্‌গ পাড়ি আন শরাসন,
প্রবেশ করিব রণে বিনাশিব কুরুগণে
গাভী আগে করিব মোচন।
উত্তর বলেন দেব কি শুনালে অসম্ভব
করি নিবেদন,
তুমি যাদ ইন্দ্র-সুত কুন্তীর নন্দন
শিগ্‌গ কহ বিবরণ।
দশ নাম কি প্রকারে দিল কোন জন
শি্‌গগ কহ বিবরণ ॥
ফাল্গুনি নক্ষত্রে জন্ম ফাল্গুনি বলিয়ে মম
কিরীটী দিলেন শচীনাথ,
শ্বেত চারি অশ্ব বয় শ্বেতবাহিনী কয়
বিভুৎসু বলয়ে জগন্নাথ।
দুই হাতে সম বাণ করিতে পারি সন্ধান
সব্যসাচী নাম তেঁই বলে সর্বজন,
ধনপতি জিনি নাম ধঞ্জনয় অনুপাম
দিলেন নাম দেবপশুপতি।

কৃষ্ণকান্ত দেখি কায় কৃষ্ণ নাম রাখে তায়
পার্থ নাম রাখেন মারুতি।
একদিন দারাপুরে বধিলাম গো সিংহাসুরে
শুন বিবরণ ;
অর্জুন বলিয়া নাম দিল মুনিগণ।
শিগ্‌গ কহ বিবরণ ॥
দশ নাম কি প্রকারে দিল কোন জন,
শুনি তব দশনাম পূর্ণ হৈল মনস্কাম।
সন্দেহ জন্মিল এক মনে—
ভণে তারা দারাপুরে যজ্ঞ আরম্ভন করে
শিগ্‌গ কহ বিবরণ।
দশ নাম কি প্রকারে দিল কোন জন।
তুমি যদি ইন্দ্রসুত কুন্তীর নন্দন ॥

৭

আরে, ধনুক বাণো ত্যজ্য করি বসিলেন রথোপরি
হে মুরারি, করি নিবেদন।
আর না করিব রণ পুনঃ ফিরে যাব বন,
আমার এ ছার রাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
শুন, সখা শ্রীমধুসূদন ॥
আরে, এক লক্ষ রাজাগণ শত ভ্রাতা দুর্যোধন,
কেমনে করিব বিনাশন।
আরে, শোকেতে গান্ধারী মাতা, ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ পিতা
আর কাঁদিবে শত বধূগণ ॥
দ্রোণগুরু অশ্বত্থামা কৃপাচার্য শকুনি মামা
পিতামহী গঙ্গারো নন্দন।
কেমনে করিব হত বল সখা জগন্নাথো
অনাথ হয়েছে পঞ্চজন ॥
টানো হে মুখেরি দড়া ফিরাও হে রথেরি ঘোড়া
হরি যদি না যাইবে তারাই জড়ো হতে বলো

আজ পদব্রজে করিব গমন রে
শুন, সখা শ্রীমধুসূদন ॥ ২ ॥

৮

কৃষ্ণ অর্জুন দুইজন, রথে করি আরোহণ
উপনীত সমর মাঝারে হে,
শুনিয়া ফাল্গুনী কয়, কহ, প্রভু, দয়াময়
আমার একার রাজ্যে নাহি প্রয়োজন হে ॥
(রং) শুন সখা শ্রীমধুসূদন ॥
আমি তোমায় বলি মধুর বচন হে ॥
ধনুর্বাণ ত্যজ্য করি বসিলেন রথোপরি
হে মুরারি করি নিবেদন হে,
আর না করিব রণ পুনঃ ফিরে যাব বন
(রং) এই সুখের রাজ্য করুক দুর্যোধন হে ॥
এক লক্ষ রাজাগণ, শত ভ্রাতা দুর্যোধন
কেমনে করিব বিনাশন হে,
শোকতে গান্ধারী মাতা, ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ পিতা
কাঁদিবেন শত বধূগণ হে ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে অভিমন্যুর কাতর আর্তনাদ—

৯

কোথা, পিতা, পার্থ বীর, কোথা ধর্ম যুধিষ্ঠির
কোথা ওহে ভীম বলবান।
কোথা মাদ্রী দুই সুত, রণে হইতে হইলাম হত
আজ বিপদ সময়ে নাই বন্ধুজন,
কোথা রইলে, হে মামা, শ্রীমধুসূদন।
বিপদ সময়ে, হরি, দাও দরশন।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের শোক—

১০

নারায়ণি সেনা জিনি, শিবিরে আসেন ফাল্গুনী
দেখি সবার মলিন বদন,

সবে এলো বৃকোদর
কোথা অভিমন্যু মোর, শোক করি বলিলেন তখন,
ভ্রাতামুখে কথা শুনি, কাতরে কাঁদেন ফাল্গুনী
আজ বিধি কি দশা ঘটালি রে,
অভিমন্যু, গৃহ শূন্য করিও বাপ কোথা গেলিরে।

ভীমের প্রতিজ্ঞা—

১১

অন্ধনৃপ-সুত জনে না রাখিব একজনে
আমি জীবিত যখন সকল যাব সমরে
করিব নিধন তবে জুড়াব জীবন।

ঝুমুর—লৌকিক

রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ কিংবা রামায়ণ মহাভারত কাহিনী নিরপেক্ষ লৌকিক প্রেমের ভাব অবলম্বন করিয়াও ঝুমুর গান রচিত হইয়াছে, তাহাকে প্রধানতঃ লৌকিক ঝুমুর বলা যাইতে পারে। ইহাদের সংখ্যা করা যায় না। রাধাকৃষ্ণের নাম প্রেমভাবকে যে স্বর্গীয় মর্যাদা দিয়াছে, লৌকিক ঝুমুর সাধারণতঃ তাহা হইতে বঞ্চিত। কোন কোন সময় তাহাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম থাকিলেও ভক্তির প্রগাঢ়তা থাকে না, সেইজন্য তাহা কোন সময় নিতান্ত গ্রাম্য স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যেও স্থানে স্থানে বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা যায় না।

১

হেদে গো, রস দেখলে হাস কাজে কামে কিছু হয় না
নবীন প্রেমে তনু জর জর, মিছা কথা গায়ে সয় না॥
এ কাটি প্যাকাটি মলমলি চাদর, কোথা গেছলে হে নাগর,
দখিনা হাওয়াতে কোকিল ডাকছে অকালে,
ছোকরা বঁধুর মন ভুলাব তিনটি সন্দেশে। —বাঁশপাহাড়ী

২

যখন হৈল পীরিতি বাগলা পাতা বিজন করি
দুইজন শুয়েছি!

এখন অতি ভাবে মনস্তাপে সন্ধ হয় মান পাতে,
আর যাব না পীরিতির পথে। —ঐ

৩

পরাইলে নীল শাড়ি চাপাইলে রেল গাড়ী—
দেখাইলে, বঁধু, চায়েরি বাগান।
ঐ রাণী দিল ফুলেরি বাগান, রাজা দিল—
ফুলেরি বাসর, কালিয়া শ্যাম। —ঐ

৪

চাটি চুটি দিয়ে সঙ্গ করলে হে ঘরে,
ফাঁকি দিয়ে পালালে আসাম, হে লম্পট শ্যাম।
আসাম গেলে প্রাণের কামরে, কালিয়া শ্যাম,
ঐ রাণী দিল ফুলেরি বাগান।
রাজা দিল ফুলেরি বাসর, কালিয়া শ্যাম॥ —ঐ

ওরে, রাতিয়া রহিলে জাতি যায়, দিদি গো বলেছে—
কেমনে নদীয়া হব পার। ২।
হাটে যদি বেলা ডুবে কেমনে ফিরিব একা গো,
আজ রাতিয়া রহিলে জাতি যায়॥
নাচনীরা নাচ করে গায়ে লাগে ঘাম, ও পণ্ডিত ভাই,
বাসনীর হাটে কিনিবরে মিঠাই,
যমুনা কিনারে বাঁশী, কাঁদিছেন গো রাই রূপসী,
ওরে, মথুরা যাওয়া হলো দায়।
আজ রাতিয়া রহিলে জাতি যায়॥ —ঐ

আরে, সরল দেখে প্রেম করিলে
আরে এত দিনে নিঠুর হলে,
দেখা পালে মুখেও তো সুধাও না।
ওগো, তোমার তরে আমি মরি তুমি ফিরে আলে না।

অবলারে দুখ দিলে কখনো ভালো হয় না,
অবলারে প্রাণ কাঁদা কখনো ভালো হয় না ॥
হাসিয়া হাসিয়া কহিবে কথা বসিবে এসে আমার এথা,
দিবানিশি করবে আনাগোনা।
ওগো, তোমার তরে আমি মরি তুমি ফিরে আলে না।
সারদার মুখে খই আরও ফুলে মধু রয়,
ডাল ভাঙ্গিলে মধু শুকালে ফিরে ভ্রমর বসে না ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গান দুইটিকে কৃষ্ণলীলা ঝুমুরও বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাতে যমুনার চিত্র এবং ননদিনীর চরিত্র উভয়ই আছে। তারপর শ্যাম এবং তাঁহার বাঁশীও শুনিতে পাওয়া যায়।

যমুনার জল বড় কালা হে, তোর গায়ের বরণ বড় কালা হে,
ও কালা, যমুনায় ডুবিয়ে আমি পরাণ বধিব ॥
সখিগণ বলে, ও কালা জল জাতিকুল নাশিবে,
ননদিনী বাক্য বড় জালারে।
ও কালা, যমুনায় জলে ডুবিয়ে আমি পরাণ বধিব ॥ —ঐ

সব সখি সঙ্গে করি, ওগো, আনিব যমুনার বারি,
সদাই রতন বিরস বেদন
আমি না হেরিব শ্যামকে বাঁশীর গানকে।
বাঁশী বাজে মধুর স্বরে, হৃদয়ে আমার বিন্দু ঝরে,
নয়ন বাঁকা ভুরু বাঁকা ঐ তো ঐ হরে মন কে।
(আমি) ভয় রাখি না কুলকে ;
আমি না হেরিব বাঁশীর গানকে ॥ —ঐ

আইল বসন্ত, কাছে নাই মোর প্রাণকান্ত,
আমার জীবন জালা বাড়িল হে আশা ছিল গো মনে,
ভাব করব তোমার সনে, আশা ছিল গো মনে। —বেলপাহাড়ী

১০

বলব বলব মনে করি খুলে কথা বলতে নারি,
স্বামি-স্ত্রী নাইতে গেলাম যার সঙ্গে ভাব করিলাম।
সেই আমার পর হ'ল, আশা ছিল গো মনে,
বলি ও হরে কালীয়ায় এ বিনে
কত না বুঝাল মন তো মানে না। —ঐ

১১

যখন শ্যামের বাঁশী বাজে তখন আমি গৃহকাজে,
ভালবাসা ছিল গো মনে আশা পূরণ করব হে তোর সনে।
বেলা অবসানে দাঁড়িয়ে কথা কইব তোমার সনে, বেলা অবসানে। —ঐ

১২

তুমি যে চলিয়া গেলে, বঁধু, গেলে দেশান্তরে···এ···এ
হে শ্যাম, কি বলিব তোরে।
আমার এ'হেন যৌবন পথে, বঁধু, তুমি কাঁটা দিলে
কি বলিব তোরে।
অহে তুমি যে চলিয়া গেলে এলে না আর ফিরে।
তোমার পিরীতে, বঁধু, আমি না পারি থাকিতে···এ···
ও শেল রইল যুগে যুগে। —ঐ

১৩

ঐ বাঁশী বাজে ঐ বন মাঝে,
আমি যেতে নারি লোক-লাজে।
ঘরের পতি বাদী ননদী কুটিলা।
কলঙ্কিনী বলে জগতে রটিলা
আরে বলে সদা বাঘিনী কুটিলা কলঙ্কিনী মরে লাজেরে।
গেল গেল কুল গেল —ঐ

১৪

বাঁকুড়াতে দেখে এলাম শাল গাছেতে বেল ধরেছে,
আমার দেশের কারবারীরা লাউ ফুলে মন মজেছে।
এক বঁকে ফুটেছে দুটি ফুল মেলানি বেচে তোল। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত পদটিকে বাসর-সজ্জিকার পদ বলিয়াও উল্লেখ করা যায়।

১৫

ফুল তুলি সারি সারি,
আমি ফুলের বালিশ করি গো,
আমি ফুলমালা দিব শ্যামের গলেতে,
ও ভাই নলিতে!
চল যাব, সখী, ফুল তুলিতে,
আলিস ভাঙ্গিব ধনির গলেতে
ও ভাই নলিতে—
চল যাব, সখী, ফুল তুলিতে। —বাঁশপাহাড়ী

১৬

কাশ ফুলে কমল ফুলে তুমায় আমায় কি অমনি মিলে,
হে প্রাণনাথ, সত্য কর এই সরোবরে।
মোর প্রাণ থির নাহি, ধনি, তোমারই তরে।
যদি শ্যামকে ভুলাবি তা হলে,
মাথায় লে তিলক ফোঁটা দাঁতে নিশি গাবা।
মোর প্রাণ থির নাই তুমা লাগি।
শ্যামের প্রাণধন পাই কিসে।
শ্যামের বিরহ বিনে প্রাণ বাঁচে না গো আর,
আমায় বলে, দাও রাধা,
শ্যামের প্রেমধন পাই কিসে?
ভবদাস পীতাম্বরে বলে শুন পর্ব শ্রীচরণে। —ঐ

১৭

বহুত পুণ্যের ফলে তাইত নরকুলে জন্ম মিলে,
বুঝিলে জমিদারী।
না বুঝিলে যমালয় পুরী
হরি বিনে বিন্দাবনে
আর কি গো সুখ আছে। —ঐ

চণ্ডীদাসের একটি সুপরিচিত পদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার ফলে কি ভাবে বিকৃত হইযাছে, তাহার নিদর্শন নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে পাওয়া যাইবে—

১৮

বহুত যতনে বাঁধিলাম সাগর
আর সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগিনীর কর্মদোষে গো।
সাগর বিনে সাগর শ্যাম এলো না।
অভাগিনীর বাড়ী-এ বেলেরই গাছ,
বেল পাকিল তবু নাগর সাগর শ্যাম এলো না।
ও হো অভাগিনীর কর্ম দোষে।
বঁধুয়ার বাড়ী এ নারিকোলেরই গাছ
নারকোল পাকিল তবু নাগর সাগর শ্যাম এল না।
অভাগিনীর কর্ম দোষে।
অভাগিনীর কর্ম দোষে নাগর সাগর শ্যাম এল না।
নাগর সাগর শ্যাম এল না॥ —ঐ

১৯

শুনগো, রাই, বলি তোরে, তোর সঙ্গে পীরিতি করে
আমার এই হ'ল ঘটনা।
পরাইয়ে ফুলের মালা, সখী, আমায় যাতনা দিও না,
আগে সে বলিলে ধনি শেষে না ছাড়িব তোরে আমি
সেও নবীন প্রেমের ঘটনা।
সেও নবীন প্রেমের ছলনা।
পরাইয়ে ফুলের মালা সখী আমায় যাতনা দিওনা,
মনে রেখ, চাঁদবদনী, যেন আমায় ভুল না।
নব নব তরু ভাসে. হেন ধান তোমার দোষে
আমার যাওয়া হোল না।
রাধা শ্যাম দরশন শুন, চাঁদ-বদনী,
যেন আমায় ভুল না। —ঐ

২০

অতি পরভাত কালে গিয়েছিলাম যমুনার জলে,
শিমুল ফুলে তেজ্য দিয়ে কুসুম ফুলে মন মজাইলে।
বুঝ বুঝ গুরুজনা, বুঝ বুঝ সাধু জনা,
বুঝ বুঝ রসিক জনা কোন ফুলে কেমন মধু,
ভ্রমর ভাবও জান না।
মধু লোভে, হে ভ্রমর, বনে গুঞ্জরে,
বৃথা কি পলাশের মধু ভ্রমর চুষিয়ে বেড়ায়,
কোন ফুলে কেমন মধু ভ্রমর ভাবও জান না। —ঐ

২১

ধন্য, দূতি, তোমার অন্য মতি দেখা পেলে মুখ নাহি দাও,
ধন্য, দূতি, তোমার প্রেম-চাতুরী কাঁসা ভাঙ্গিলে কাঁসা জোড়া যায়।
নবীন কটাক্ষ বাণী, নাই গ ময়ূরী ধ্বনি,
নাই গ বংশীর ধ্বনি শুকসারী গগনে উঠে।
আর কি ধনি মিলনের সময় আছে।
হরি বিনে বিন্দাবনে আর কি, দূতি, সুখ আছে।
শ্রীনাথ সিংহের বাণী শুনগো মহামুনি
আর, দূতি, সুখ আছে। —ঐ

২২

শীতল বাতাস যেন গো বিছের কামড় জ্বালা বাড়িল আমার,
নাহি সূর্য আকাশে গো, নাহি সূর্য, পুরবে আগুন দিলা সে লাগাই।
আমার পাঁজরায় ঘুণ, নাহি রক্ষা হরিহর, নাহি চন্দ দিবাকর
মন-আগুন পবন বহিল। —ঐ

২৩

বহুত যতনে বেন্ধেছিলো সাগর মাণিক পাইবার আশে,
সাগর শুকাইল মাণিক লুকাইল অভাগিনীর করম দোষে।
বঁধূর ওই বাড়িতে নারিকেল গাছ অভাগিনীর বাড়ি বেল রে,
বেল পাকিল বন্ধু না আইল অভাগিনীর বইয়া গেল কাল রে।
সাগর বিনে সাগর শুকায় বহুত যতনে রয়ে ছিল চাঁপা,

ও তার চিরতা চিরতা পাতা হে ফুল তুলিবারে জল ভাসি পড়ে।
হলুদ বাটিতে বসিল গোরী হলুদ-বরণ যে শ্যামের চরণ,
পইড়ে গেল মনেরে। —ঐ

২৪

কাল ফুলে কমল ফুলে তুমায় আমায় কি অমনি মিলে
হে প্রাণ, বল সত্য করে এই সরোবরে
মোর প্রাণ থির নাহি ধৈনি তোমারই তরে।
যদি শ্যামকে ভুলাবি তাইলে মাথায় লে তিলক ফোঁটা
দাঁতে মিশি গাবা।
মোর প্রাণ স্থির নাই তুমা লাগি শ্যামের প্রাণধন পাই কিসে,
শ্যামের বিরহ চিনে প্রাণ বাঁচে না গো আর,
আমায় বলে দাও, রাধা, শ্যামের প্রাণধন পাই কিসে। —ঐ

২৫

আর আমি যাব না, ভাই, নদীর জলকে॥
যুগল চুড়ি হাতে আছে ঝলকে॥
ঐ দেখো জোড়া শিয়াল ডাকে। —ঐ

২৬

মথুরারি পথে যেতে কদম সারি সারি,
আর ঘোমটা নয়ন বাঁকা কোমর ব্যথায় মরি।
হেঁদে হেঁ গো গোপনারী।
জলে যাস্‌না যাস্‌সা বারণ করি॥ —ঐ

২৭

যাইতে যমুনার জলে গেছিলাম মাধবী তলে,
ও ফুল তুলিবারে যাইতে কৃষ্ণ কাল-ভুজঙ্গিনী
আমার দংশিল হিয়ায় গো, কালো বিষে জরো জরো,
আমার পাছে প্রাণ যায় গো।
যে সাপে দংশন করে সেই শাপে শাসন করে,
হলাহল মিটে যায় গো, অধম সতু দাসে ভণে
প্রাণে বাঁচা হলো দায় গো। —ঐ

২৮

অগ্রে বাঁশী মধ্যে বেণু ধন্তরে জনমে বেণু, মুলেতে জন্মিলে কুমণ্ডল।
ও বাঁশী, মহিমা বুঝিতে নারি চোর তুমি বাঁশী বাঁধরে মনচোর॥
পুর্বে পশুপতির হাতে ত্রেতা যুগের রঘুনাথে॥
সবংশে বধিলেন লঙ্কেশ্বর, বাঁশী মহিমা বুঝিতে নারি তোর॥
হেন সতু দাসে ভণে ঐ কথা ভাবিতাম মনে,
তুমি বাঁশী রাধার মনচোর।
ও বাঁশী, মহিমা বুঝিতে নারি তোর॥ —ঐ

২৯

যেমনি গাছে আমড়া দোলে তেমনি তোকে ঝুলাগে,
স্বর্গের চাঁদ তোর হাতে দিয়ে রাস্তায় বসায়ে কাঁদাগে,
কে কিনেছে নকদি শাড়ী নইলে যাব না শ্বশুর বাড়ী। —ঐ

৩০

শুন গো রাই সুবদনী।
বিগত রজনী, ধনি,
ঘোমায় ছিনু অচেতনে
হেরিনু কিবা পুরুষ রতন।
দাঁড়িয়ে পালঙ্ক পাশে।
কথা বলে মৃদু হেসে॥
সুচারু বদন কেশ বাঁকা সে নয়ান
নারী সমান বরণ॥
বসিয়ে পালঙ্ক পরে।
দু বাহু জোড় করে॥
কত করে নিবেদন চোখে চোখে মুখে মুখে
মধুর মিলন॥
ভবপিতার এই মিনতি,
শুনো গো রাই শ্রীমতী করি নিবেদন॥
অন্তিম কালে পাই যেন ভাই,
এ রাঙা চরণ॥ —ঐ

৩১

ঝাঁপ দিব আমি কালো পাথারে
ওগো বায়েন, দাইড়া খাল ভরাক্যে ধবল বাঁদরে। —ঐ

৩২

সকালে ঘুমালে শিশু উঠবে বৈকালে
শুযে ভালো করে নাচবে শিশু
আসরের মাঝে। —ঐ

৩৩

এটি তোমার কদিন ধরে বল,
ও তুই বল গো ও ধনি ধনি।
নীলাম্বর শাড়ী পরা তোর তো ধনি গো গোরা গো,
কপালে সিন্দুরের ফোঁটাটা নয়নে কাজল গো।
সীমন্তে সিন্দুরের লাল মাথা বাঁধা কাঁটা-জাল গো,
টুস্থলি টুস্থলি চাল আর পাতা মন গো।
গলে দলে মোহরা নাকেতে ঝুলুক পরা গো,
খুঁটেতে খুঁট খাড়ি দ'লে কানে দ'লে দুল গো।
কলি যুগের এমনি ধারা অধম বিনা দিশাহারা গো,
ভেবে গুণে দেখে শুনে চখে ঝরে জল গো॥ —ঐ

৩৪

হরে কৃষ্ণ হরে রাম ও কাল শশী
কদম গাছে হেলা দিয়ে কে বাজায় বাঁশী। —ঐ

৩৫

ঘোড়া ধরার হাট যাব কাল কাল শাড়ী নিব।
(আমি) কালো শাড়ী ছিঁড়িয়ে ফেলিব গো,
শ্যাম বঁধুর মনকে ভুলাব। —ঐ

৩৬

ঝিঙ্গা ফুল বলেরে, ভাই. ঝাঁটি ধারে বাসা,
মাইয়্যা ছ্যাল্যা তুলতে গেলে লাগে বড় আশা।
ভাই হে বিদেশী বন্ধু।

ঝিঙ্গা ফুল ছুঁইও না ছুঁইও না, ভাই হে, বিদেশী বন্ধু।
সজনা ফুল বলেরে, ভাই, টানাটানির বেলা—
হে বিদেশী বন্ধু। —পুরুলিয়া

ঝুমুর গানের প্রকৃত এলাকা হইতে দূরবর্তী অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবেও কয়েকটি লৌকিক ঝুমুরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রথম দুইটি গান মুর্শিদাবাদ জিলার গোলোক ডোমের নিকট হইতে সংগৃহীত। এই অঞ্চলে ইহাকে ঝুমরা গানও বলে--

৩৭

লম্ফ কিন্‌গা গো মায়ের মাসী
তেল পুরবে না বেশী।
লম্ফ ধরাবি গো একাশি তেল পুরবে না বেশী। —মুর্শিদাবাদ

৩৮

আমি কি এমনি ছিলাম গো, খেলে পোড়া জ্বরে জ্বরে,
যখন ছিলাম মোটা সোটা, হাতে বাজু বালা কাটা,
কুড়িয়ে নিতাম সব ধরে, খেলে পোড়া জ্বরে জ্বরে ॥
প্রেমের দোকান খুলে বসেছি রে,
এস তোমরা আমার দোকানে দৌড়ে,
খেলে পোড়া জ্বরে জ্বরে ॥ —ঐ

৩৯

লোকেরা বলে, ভুলো ভুলো, কেমনে ভুলা যায় হে,
সারা নিশি জাগিছে হিয়া। —বেলপাহাড়ী

৪০

বারে বারে বারণ করি কচি বাদামের ডালি ছুঁয়োনা, লালমোহন।
পাকলে কদম সবাই খাবে পাবে আলাধন। —ঐ

৪১

সিল্কের শাড়ী পিঞ্জল, কাপড় কিনে দে আমারে, বঁধু,
আমি তোমায় ভালবাসিব, বঁধু, শাখা দিলি শাড়ি দিলি জামা দিলি না,
আমি তোমায় ভালবাসিব, বঁধু। —ঐ

৪২

তেঁতুল তলে আলগা মাটি ঘনে ঘনে শিকি পড়ে।
পেঁপুলরানী দিনে দিনে সিদামকে ভুলালে। —ঐ

৪৩

নন্দীয়ে নন্দীয়ে খাতে ছিলি শত ধূলায় পুড়ে মরি,
কি করবি, ভাই, মালী ফুল, ঘণ্টকে ছোঁড়ায় নিল জাতি ফুল। —ঐ

৪৪

উপজিল লব ঘন থিতি হইল না কোনকালে,
ও মরি হরি ভাই যুগল খোঁসা হেলেকে
ল ল কারি কে কে আছে ভাই ধারে ধারে যাবে কি। —ঐ

৪৫

শিশু ডালে ফুল ফুটেছে দেখতে কত আশারে॥
সতর হয়ে বসবে ভ্রমর, যেন না জানে চিকন কালা।
বুক বেঁদেছি বুক বেঁদেছি বুক বেঁদেছি ও ভাই পাষাণে॥
সে সব খেলা নাই হে মনে।
যেদিন ছিলাম এক পরাণে॥
শিমুল ফুলটি ঝরে পড়ে, বঁধু, মিলন হল না হল না।
তুমার বন্ধু আমি হলাম, তুমি আমার হলে না। —ঐ

৪৬

ওগো, কেমন করে মন তোমাদের কেমন করে মন,
ওগো, চুরি করেছে যারা গো কার বা কত ধন। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি একটি ছড়া, ঝুমুর গানের সংগ্রহের মধ্যে কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছে : প্রকৃতপক্ষে ঝুমুর গানই, ঝুমুরের ছড়া বলিয়া কিছু নাই।

৪৭

আঞ্চন কাঞ্চন দুধের সর কাল যাব মা পরের ঘর।
পরের বেটা মারল চড় কাঁদতে কাঁদতে খুড়োর ঘর।
খুড়া দিল বুড়া বর, এ বুড়া, তো জলে ডুবে মর।
অরগু কাঁদে মাসী পিসী তবু কাঁদে পর।
পদ্ম পাতায় লিখ্যে দেব যাবি পরের ঘর।

থাকরে, ভাই, সরাটি পদ্মপাতান ঘড়াটি,
পদ্মপাতা ফুটিল, যত ছানা জুটিল। —ঐ

৪৮

পুব দিকের কলা গাছটি উত্তর দিকের মোচা,
ঐ যে আমার বঁধূ আসছে সরু সুতার খাঁচা।
আহা মরি মরি কি সেজেছে পোড়ামুখে মোচ রেখেছে।
আসুক চৈতালী ফাগুন মোচে লাগাব আগুন,
লোকের স্বামী আসে যায়, আমার দেখে যে কত কান্না পায়।
বলে দিবি সে গালভরাকে, মাসে যেন একবার আসে,
চার বেনানে চ্যাপ্টা ঝুঁটি নথ পরা নাকে,
কোঠার ওপর শুটকে ছোঁড়া চোখ ঠ্যারা ডাকে,
কিসের কারণে আমি ধরি চরণে। —ঐ

৪৯

আদানে পুকুর বাঁধান ঘাট চারিধারে চার ডালিম গাছ,
কোন ডালিমে চিনি মোণ্ডা কোন ডালিমে রস।
বঁধূ, একটি খেলে বশ।
পান দিলাম বিড়ি দিলাম দিশলাই কই ?
এত রাতে এলে, বন্ধু ! —ঐ

৫০

আহা, বাড়ি পিছু পিছু লিচু বাগানে,
একটি লিচু খেলে, বন্ধু, যাবে চালানে।
কাশকাশের কাশ পিয়ারা বাম্বাইয়া শাড়ী,
তোমার বোনের লাইগ্যা সিল্কের শাড়ি।
পোস্ত বাটি হড়র হড়র বিড় কলাইয়ের ডাল।
বঁধু, গেছিলে কোথায় ?
তোমায় তেমনি গাল দিচ্ছে, দেখ তেমনি গাল,
ডেমনিকে বশ করব কাল।

কপাটে টিকটিকি না যায় ঠেলা,
ওঠ, শ্যাম, মজার বেলা,
ওঠ, শ্যাম, ধড় ফড়ায়ে, চাল ভাজা খাও কড় কড়ায়ে।

—বাঁশপাহাড়ী, মেদিনীপুর

৫১

মাগো মা, বাজার যাব পাছা পেড়ে শাড়ী লিব,
আর লিব গলারও মাদুলি, আহা কেমন সাজালি,
আগু দিকে আয়না গুঞ্জু বেলকলি,
কলিকালের বউ বেটী উলটে বাঁধলো ঝুঁটি।
পায় আলতা পর, ধনি, চাপাইব রেল গাড়ি
নিয়ে যাব আসাম কাছাড়ে,
আজ আমাদের কি আছে কপালে।
হাতে হাতে চুণ দিতে দেখেছিল হাটের মাঝে,
পান দিতে দেখেছে ভাসুরে।
সখিরে, আজ আমাদের কি আছে কপালে। —ঐ

৫২

বারেক জাতি ছাড়া যায়, পীরিতি ছাড়া দায়,
এখন পীরিতি ল্যাঠা লাগিল হিয়ায়,
এমন যৌবন যদি চিরদিন থাকিত,
কি সুখ হইত, সখী, কি সুখ হইত। —ঐ

৫৩

ওহে, আমার তাল পাতা, আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়,
আমি তোমার গুণ ধরি পাখা দাও হে বাতাস করি। —ঐ

৫৪

পানটি খেয়ে ঠোঁটটি লাল চুণ খাতে মন খায়লো,
মরি হায়লো, মরি হায়লো, কতক্ষণ রাত হয়লো,
বঁধুর গায়ের সরু চাদর কতক্ষণে মেশামেশি হয়গো।

৫৫

বহুদিন পরে, বন্ধু, এলে ঘরে, কি এনেছ, বন্ধু, আমার তরে,
এনেছি টিকুলি, রেখেছি ঘরে সোনার টিকুলি তোমারি তরে। —ঐ

৫৬

লোকে বলে, ভুল ভুল, কেমনে ভুলিব, বল।
ভুলিলে কি ভোলা যায়, সাথ, দিবানিশি জাগিছে হিয়ায়॥ —ঐ

৫৭

বাদার কোণে ওলের বাগান, ওলের করব ওল ছেঁচকি,
পাত্‌তোর করব ঝোল গো। —ঐ

৫৮

যেমনি হলুদ রং গো তেমনি বিদেশীর সঙ্গ গো,
ও, ভাব করবে সাবধানে ও বিদেশীর সনে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি দেহতত্ত্বের গান। ইহার সঙ্গে পূর্ববঙ্গে সংগৃহীত একটি দেহতত্ত্বের গানের তুলনা করা যাইতে পারে ; তাহা এই, 'উইড়া গেল রাজহংস পাইড়া রইল ছায়া।'

৫৯

উপর ডালে কারিকুরি নামা ডালে বাসা রে,
উইড়ে গেল শুকপাখী পড়ে রইল বাসারে। —ঐ

৬০

শাড়ি লিব শাখা লিব বিশ্বেশ্বরের দোকানে,
আয়না বসা চুড়ি লিব ও জুগিদার দোকানে
ভুলি না লো চাঁচা চুল দেখে,
আমরা ভুইলে ছিল রূপ দেখে। —ঐ

৬১

এত রাতে তোমার বুল না, আমায় পেয়েছে ঢুলনা,
এত রাতে যদি কইবে কথা,
সরা লিয়ে তোমার ভাঙ্গব মাথা। —ঐ

৬২

পাজ চিড়ি চিড়ি সুপারি গোল,
তেলি পাড়াতে কিসের গোল।
ডাকরে কোকিল বাঁশ গাছে
আমার বঁধু আছে যেয়ে কার কাছে। —ঐ

৬৩

বাহিরার বাজারের লোক চোর সামাইল ঘরে,
চোরের গলায় তুলসী মালা বাজার আলো করে,
চুড়া বামে হেলেছে হে কালিয়া নাগর হে। —ঐ

৬৪

পায়েতে জরীর জুতা
হাতে মুরলী বাঁশি বাজারে যায় রে ও বংশীধারী। —ঐ

এখানে বংশীধারীকে পায়ে জরির জুতা পরিহিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে ; সুতরাং ইনি আর যিনিই হোন, কালিন্দীচারী শ্রীকৃষ্ণ নহে।

৬৫

যখন চন্দ্রা পরে শাড়ী ধামসাই পড়িল ঘারী,
চন্দ্রাকে লিল লোকে ঘেরি নাচেন চন্দ্রা বাজায় কোশরী। —ঐ

৬৬

হাতেতে সরু শাঁখা বাইরে বন্ধু, ঝপা, (গয়না),
এখনি দেখেছিলি কোথা গেল রাধা বিনোদিনী।
—বাঁশপাহাড়ী

৬৭

যুগের নাহিক বিচার গো এ যুগ বড় চমৎকার।
বৌয়ের লেগে মিষ্টি বাটি, তবু বলে আর কি খাবি গো।
মায়ের লাগি মাড়-কুঁড়া জুটে না আহার গো॥
বৌয়ের বেলায় শাড়ী কাঁঠী গলে সোনার হার গো,
মায়ের লাগি শিকল গড়ি, গলে খেবে থেকে কি বাহার গো॥
কহিব কি আর কলির ব্যবহার গো,
এ সব দেখে শুনে আমি ভাবছি বিস্তর গো॥ —ঐ

৬৮

মা গো মা, বাজার যাবো, আর,
পাছা পেড়ে শাড়ী নিব, বঁধু হে,
আর নিব গলার হাঁসুলী ওগো, কে সং সাজালি,
রূপে চমকে বিজলী কলিকালের বহু বিটি,
উলটু বাঁধলো ঝুটি, বঁধূ হে,
পেছু দিকে আয়না রাখি গুঁজে বেলকুঁড়ি। —ঐ

৬৯

এ কুলিতে সে কুলিতে টানাবো বনমালা,
বনমালা শুকাই গেলে মালা হবে কোন বেলা।
নয়ন জলে ভিজিল বিছানা, তোকে কে দিল গো বেদনা,
নয়ন জলে ভিজিল বিছনা। —ঐ

৭০

ওগো ভাবী ওগো ভাবী ভাবনা ধরালি,
ভাবনা ফুলের মালা গাঁথি পরি যে দুজনে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ঝুমুর গানটিতে একটি সাধারণ দাম্পত্য কলহের চিত্র বর্ণিত হইয়াছে—

৭১

আমি ঝাঁপ দিব গাঙে, গড় করি মীনার বাপের সঙ্গে।
ঘি যোগায়ে খাই ঘোল তবু করে গণ্ডগোল,
ঠেঙায় মোকে পিড়ি ঠেঙ্গা ভাঙ্গে
গড় করি মীনার বাপের সঙ্গে।
অধীন লগনে কয়, ধন্য তুমি, দয়াময়, তিলেক দয়া নাই হেমরে
গড় করি মীনার বাপের সঙ্গে॥

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগের ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

৭২

বল্ ভাই, সুবল, ওকে বটে বল্।
যমুনায় কে আনতে যাচ্ছে জল॥

কাঁখে কুম্ভ বাহু তুলে যাইছে যমুনার জলে গো।
কপালে সিঁদুরের ফোঁটা করে ঝল্‌মল্‌॥
গৌরাঙ্গেতে নীল বসন, কেমন সেজেছে ভূষণ গো,
পায়ে আলতা, চোখে কাজল ধনি ধনি ভাবে টলমল,
শ্যাম-পীরিতির এমনি লেঠা ছাড়িলেও না ছাড়ে সেটা গো
সিঁয়াকুলের কাঁটা যেন লেগেছে হিয়ায়॥

৭৩

যাবো আমি শ্বশুরবাড়ী বাঁধে দেহ চিড়া মুড়ি গো,
বাস ভাড়া মোটর ভাড়া দিও, দিদিগো, কাঁদিতে জনম গেল।
ঝিলিমিলি দিয়ে যাবো, রাইপুরে মিঠাই লিব,
পান বিড়ি গটাই ম্যাচিস দিও, দিদিগো, কাঁদিতে জনম গেল।
—বেলপাহাড়ী

৭৪

বিধির বিধানে যদি থাকিত এ রীতি,
আমি যারে ভালবাসে সে যদি বাসিত ভালো
তবে কি সুখ হইত।
কিংসুক কদম্ব যদি কত সুগন্ধ হইত,
সরসিজ হয়ে পদ্ম স্থলেতে ফুটিত,
তবে কি সুখ হইত।
প্রতিদিন পূর্ণ শশী যদি হইত উদিত
বিচ্ছেদ বিরহানল যদি না থাকিত
তবে কি সুখ হইত। —ঐ

উপরি-উদ্ধৃত সঙ্গীতটির উপর নিধুবাবুর একটি প্রসিদ্ধ টপ্‌পা গানের প্রভাব আছে।

৭৫

শাড়ী দিলাম ফিট্‌ফাইন আবার বউটা করে আইন গো,
বলে, আমি না পরিব শাড়ী, শায়া না দিলে।
বউয়ের কি মজা চলে, দেখ এই কলিকালে॥

যদি দিলাম শায়া কিনে মুখ-ফুলালো ব্লাউজ বিনে গো।
নাকেতে নাক চাবি কানে কানপাশা দোলে।
বউয়ের কি মজা চলে, দেখ এই কলিকালে॥
লয়ে আয়না চিরুণী শোভনে বান্ধিল বেণী গো,
সাজাল বেল কুঁড়ি দিয়ে বউয়ে ঢাকিল জালে।
বউয়ের কি মজা চলে, দেখ এই কলিকালে।
বলে হীন কিশোর নায়েকে দিন মোর ভেবে ভেবে গো,
কলি যুগের রীতি দেখে বউয়ে ছায়াটি ভালে,
বউয়ের কি মজা চলে, দেখ এই কলিকালে॥ —ঐ

৭৫

আম পাকা লালে লাল জাম পাকা কালো।
আতা পাকা সাদা লো বীজ কেন কালো॥ —ঐ

৭৬

চল্, সজনী, জল্‌কে যাব দু'জনাতে প্রেম করিব,
গামছায় বেঁধে এনে দেব চিনি আর চিঁড়া,
ও তুই ভাবিস্ নাকো, ধনি, আমার কিরা।
যখন বন্ধু যায় হে চলে, আড় নয়নে ফিরে ভালে,
তিলে না দেখিলে আমি হই পাগল পারা,
ধনি আমার কিরা। —ঐ

৭৭

ওরে, লালমোহন, কাঁচি কদম তুলো না এখন,
কাঁচি কদমের কলি আর কেন কর ভাল ভালি গো।
পাকলে কদম খাবো দুজনে, পাওয়া আশাধন করব না বারণ।
ওরে লালমোহন, কাঁচি কদম তুলো না এখন,
সারা বন ঘুরিয়া আর নানা ফুল তুলিয়া ফুলের হার
গাঁথিব, সখী, মালা দিব কৃষ্ণের গলে। —ঐ

কচি কদম বা কাঁচি-কদম শব্দটি এখানে রূপকচ্ছলে ব্যবহৃত হইয়াছে। হইয়াছে। ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর 'অলপ বয়সী ধনী', অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭৮

বার বৎসর বয়সেতে প্রেম করিতে ডর লাগে,
বন্ধু মানা শুনো না, বন্ধু, মানা শুনো না,
নবীন বয়সে আমায় হাত দিও না।
কচি কদমের কলি ফুটে না হে আছে দেরী,
বন্ধু, মানা শুনো না,
কচি কদমের কলি তুলে দিলে আর হবে না।
ও বন্ধু, মানা শুনো না,
নবীন বয়সে আমায় হাত দিও না।

৭৯

এমন সুন্দর যৌবন ধরে কেনা রাখ মদন গো,
কি হবে তোর ফুল রতন, সে ফুল গন্ধ না বিলায়।
অভাব কইরে নে গো, প্রাণসখী, দেখ না যৌবন বয়ে যায়,
তোর যৌবনে মধুরানন্দ, যে না পায় তার ভাগ্য মন্দ,
বিপিন বলে তোর রূপ রস গন্ধ দেনা তোর বিলয়
ও ভাব কইরে নে, প্রাণসখী, দেখনা সখী যৌবন বয়ে যায়। —ঐ

৮০

হাটের মাঝে দেখেছিলাম তোমায় ছিট,
কিনিতে আমার মনকে ভুলালি গো তুই কত ছলেতে।
চেয়েছিলাম একটি সে ফুল দিলে না,
কিছু হোল গো কার কারণে
বল প্রাণে অঙ্গ কার কর বলে। —ঐ

৮১

ওই কদম তলায় কালা সুখে করে খেলা,
বাজায় বাঁশি দিবানিশি হাসি ও তার শ্যামল বরণ,
হরে নিল মন ঐ পুরুষ-রতন ভালবাসি,
হায় লো, সজনী, হেরি নীলমণি পরেছি গলেতে প্রেম-ফাঁসি।—

৮৩

আর আমি যাব না স্বামীর ঘর,
তোমার লাগিয়ে, যমুনা আসিয়ে, ত্যজেছি স্বামীর ঘর ॥
শাশুড়ী ননদ কুকথা বলিছে
তাতে আমি আর ডরিব না, বঁধু।
আর আমি যাব না স্বামীর ঘর ॥ —ঐ

৮৪

লাল শালুকের ফুল ফুটে আধারাতি
বন্ধু, ফুটে আধারাতি।
যার সনে যার ভাব থাকে মরিলে কি টুটে, বন্ধু,
এত রাতে এলে, বন্ধু, বস পালঙ্কে, বন্ধু,
পা ধুয়াইব নয়ন জলে।
মুছাইব কেশে বন্ধু ॥ —ঐ

৮৫

ঝালদা শহরে বাস, ওগো, কত না বেপারী দেখি,
বাটে বইসল, মুখ হেরি গো, ওগো লাজে মরি।
কেউ বলে কালী কেউ বলে গোরী,
ওগো, গোঠের মধ্যে মধ্যে দেখে এলাম লবান সুন্দরী গো।
কালিয়ার কালো রূপ, ওগো তেমনি তার বাঁশরির সুর
বাটে বসল মুখ হেরি ॥ —ঐ

৮৬

ভাই বল বন্ধু বল কেহ কারু নাই,
মরিবার বেলা, ভাই, গোবিন্দ সারথি, ভাই,
গোবিন্দ সারথি হেরে মন দিন গেল,
এত জনমের পারা মন দিন গেল। —ঐ

৮৭

পুরুষ এমন জাতি কাজে কাজে কপট কুটিলা গতি।
নারীর সঙ্গে চলিতে হলে আনন্দিত মন।
প্রভু নারায়ণ, মরিলে কি হবেরে মিলন।

পুরুষ এমন জাতি, কোন কাজে নাহি মতি,
নারীর সঙ্গে চলিতে হলে আনন্দিত মন
প্রভু নারায়ণ, মরিলে কি হবেরে মিলন। —ঐ

৮৮

যখন ফুলটি কলি ছিল
তখন ভ্রমরা একবার না এলো গো—
কলির যুগের বউ বিটি বাঁধিছে ঝুটি গো
কানপাশা কানে ঝুলালি। —ঐ

৮৯

বাড়ীর পথে জলকে গেলাম দেখা হলে বলবি কথা,
বহুত দিনের ভালবাসা আশা ভাঙ্গ না।
ও আমার মালা গাঁথা রহিল, কি কারণে তোমার মন ভাঙ্গিল।
দিলি চিনি দিলি বঁধু, দুধ তো দিলি না।
জল দিতে, বঁধু, ভুলে গেলে আমার চিন্তা হল না।
আমার মাথা রইল কি কারণে তোমার মন ভাঙ্গিল। —ঐ

৯০

আজি তুমাকে না দেখিলে অন্ধকার হে,
শুন শুন, শ্রীমধুসূদন।
আজি রাতে পায়ো পঞ্চজন হে ॥ —ঐ

৯১

এই মেয়ে এমনি ধারা মাথা, বাঁধা শিকলি, ধনি কি,
একি শোভা পায়, এতমত গো তার কুল হারায়ে। —ঐ

৯২

গায়ে স্থতির জামা তায় কদমের ফুল তুলে,
নাকে নোলক দিচ্ছে ঝলক—তাইতো দাদার মন ভুলে।
আলো করে গলার হার, সিঁথাতে সিঁদুর সবার,
মাঝখানে তার সোনার চিরুণ তায় বেড়া বোজের কলি,
নবীন মুখের মধুর হাসি যেন পুর্ণ শশধর
পুরুষ হয়ে নিরখিবে কেন হ'লে জরজর। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে প্রেমের বিশেষতঃ পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইতেছে।

৯৩

হোকনা কেন চোপনা মুখি নেকড়া খোঁড়া রাতকানা,
খাঁদা চাপা বাদ পড়ে না এমনি প্রেমের কারখানা,
পীরিতি যে করেছে সে পেয়েছে গঞ্জনা,
পড়া প্রেমের কি মহিমা ঘরেতে মন থাকে না,
আজ বেদ-বিধানের বিধান ছাড়া অমনতে আনাগোনা। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত ঝুমুর গানগুলিকে প্রকৃত লৌকিক ঝুমুর বলা যায় না, ইহাদিগকে কৃষ্ণলীলা ঝুমুরেরই অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যায়। তবে ইহাদের মধ্যে কোন মৌলিকতা নাই। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা এবং ভাবগত অজ্ঞতা হইতে তাহাদেরই অনুসরণের ফলে ইহারা রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। ইহারা মেদিনীপুর পুরুলিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম হইতে মৌখিক সংগৃহীত। অনেক ভুল সংশোধন করা হইয়াছে।

৯৪

কে জানে কারি বালা রূপে জিনি চপলা
দন্ত রাজি মুক্তা পাতি ভাইরে,
ঘেরে নব মেঘ যেন সৌদামিনীরে
হের সখা কার কামিনী,
দেখ, মনমোহিনী রমণী রে। —ঐ

৯৫

রাম রম্ভা জিনি উরু বেণী যেন ভুজঙ্গিনী
স্বর্ণ ঝাঁপা পৃষ্ঠেতে দুলায়রে,
পরি চন্দ্রহার সেজেছে কতই তার
ধীরে ধীরে হীরার গাঁথনি। —ঐ

৯৬

সিন্দুরের বিন্দু ভালে যেন সৌদামিনী,
নাসিকা সাজে যেন তিল ফুল জিনি,
তারা চাহে ঐ পদ দুখানি রে॥ —ঐ

৯৭

এমন সুখের রাতি অকারণে গেল, সখি,
তবু শ্যাম কুঞ্জে না আইল,
নানাজাতি সুমালতী মালা গাঁথিলাম,
সখি, আমার শ্যাম বিনে মালা রহিল বাসি গো,
এল না লম্পট কালা ॥ —ঐ

৯৮

মাথায় কাটে বাঁকা টেরি হেসে হেসে যায় সে পথে,
বল কার পর নারী।
ওরে মন, কেন জন্ম নিলি এই কলিকালে।
ষোল আনা কহেন মিথ্যা গোপন করে সত্য কথা,
ধন্য রে তোর কলির মাতা মরা গাছে ফুল ফুটালি,
ধন্য কলির বাহাতুরি খাটবে না আর জারিজুরি,
ঢেঁকি বলে কেঁদে মরি ধান ভানা হয় ইঞ্জিন কলে।
ওরে, মন, কেন জন্ম নিলি এই কলিকালে ॥ —ঐ

উপরি-উদ্ধৃত লৌকিক ঝুমুরগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, এমন কোন বিষয়—গার্হস্থ্য, কিংবা আধ্যাত্মিক নাই যাহা ঝুমুর গানের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তবে এ' কথা সত্য গুরুগাম্ভীর্য পূর্ণ আধ্যাত্মিক কিংবা বৈরাগ্যমূলক কোন বিষয় ইহার অঙ্গীভূত সাধারণতঃ হইতে দেখা যায় না। কারণ, ঝুমুরের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই একক নৃত্যও সংযুক্ত থাকে। সেইজন্যই ঝুমুর তাল-প্রধান গান, তাল ইহাতে প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া নৃত্য ইহার ভাব প্রকাশের সহায়ক হইয়াছে। বৈরাগ্যমূলক কিংবা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে নৃত্য সাধারণতঃ উপযোগী নহে বলিয়াই তাহা দ্বারা ঝুমুর গান সাধারণতঃ রচিত হয় না।

উদ্ধৃত গানগুলির অনেক ক্ষেত্রেই ভাষা দুর্বোধ্য। গানের সুরের প্রতি গায়ক এবং শ্রোতার লক্ষ্য স্থির থাকে বলিয়াই সঙ্গীতের ভাষায় এবং ভাবে অনেক সময় শৈথিল্য দেখা যায়। এখানেও তাহাই হইয়াছে। বিশেষতঃ বাংলার এক প্রান্তিক অঞ্চলের ভাষা বলিয়া ইহার মধ্যে ইহার সুপরিণত কোন রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ঝুমুর—কাঠিনাচের

কাঠিনাচ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার একটি অধঃপতিত যুদ্ধ নৃত্য। এই নৃত্যের অনুষ্ঠান কালে যে ঝুমুর গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই কাঠিনাচের ঝুমুর নামে পরিচিত। 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর', প্রথম খণ্ড, (পৃঃ ২১৪—২১৮) দেখ।

১

হেরে এলাম তারে, সাকী, হেরে এলাম তারে।
এক অঙ্গে কত রূপ নয়নে না ধরে॥
এক সে কালিয়া চাঁদ চন্দনেতে মাখা।
আমা হতে জাতি-কুল নাহি গেল রাখা॥
কালিয়া চঞ্চল আঁখি যার পানে চায়।
সাপিনী দংশিলে যেন বিষ ভরে গায়।
সাপিনী দংশিলে যেন ঝাড়ে গুণী জনে।
কালিয়া দংশনে মন্ত্রতন্ত্র না মানে॥
নটবর বেশ ধরে আছে দাঁড়াহিয়া।
যদুনাথ দাস বলে, চল দেখি গিয়া॥ —বাঁশপাহাড়ী

২

মরমে নাগল গোরা না যায় পাসরা।
নয়ন অঞ্জন হরে নেগে বেল পারা॥
জলে যদি ডুবে থাকি সেথাও দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হ'লো পারা॥
কে জানে সে গোরারূপ অমিয় পাথার।
ডুবিল তরণীর মাঝি না জানি সাঁতার॥
যদুনাথ দাস বলে গোরা অনুরাগে।
সোনার মতন গৌর আমার হৃদয় মাঝে জাগে॥ —ঐ

৩

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খেলিবার প্রবন্ধে কৈলেন॥

গড়াগড়ি যান প্রভু নিজস্ব কীর্তনে।
ঘরে ঘরে হরি নাম দেন সর্বজনে॥
চেতন করেন জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া।
ছল ছল আঁখি যাঁর নয়নের জলে॥
জগৎ পবিত্র কৈলেন গোউর কলেবর।
ঝলমল মুখ যার পূর্ণ শশধর॥ —ঐ

ঝুমুর—টাঁড়

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আর এক শ্রেণীর ঝুমুর গানের নাম টাঁড় ঝুমুর। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে ক্ষেতে খামারে আদিবাসী কৃষক-রমণীরা সমবেত ভাবে যে ঝুমুর গান গাহিয়া থাকে, তাহাই টাঁড় ঝুমুর। সাধারণতঃ কোন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে ইহারা এই গীত গায় না। ইহাদের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ প্রেম।

১

শিশিরে কি ধান ফলে বিনা বরিষণে হে,
বচনে কি মন মিলে বিনা দরশনে হে॥ —বাঁকুড়া

২

তুমি তরু আমি লতা বেড়িয়ে রাখিব হে,
যাও দেখি কোথা যাবে আমারে ছাড়িয়া হে॥ —ঐ

৩

আঁধারী জ্যোছনা আঁধার ক'রে দিস্ না,
তুই আমার চোখের কাজল ছেড়ে চ'লে যাস্ না॥ —পুরুলিয়া

৪

আসিতে আশ্বিন গেল দেখিতে ভাদর গেল,
অলিরে দেখা পাল্যে বলবি আসিতে। —ঐ

৫

আগে দিকে মেঘ ঘনাল পেছন দিকে জ্যোছনা,
ভিজেছে কিনা ভিজেছে মাথায় বাঁধা ফুদনা।

ঝুমুর—দাঁড়শালিয়া

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এক শ্রেণীর আদিবাসী নৃত্যের নাম দাঁড়শালিয়া নাচ। ইহা পুরুষের নৃত্য, এই নৃত্যে যে ঝুমুর গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে দাঁড় ঝুমুর বা দাঁড়শালিয়া ঝুমুর বলে। মাদল এবং ধামসা ইহার বাদ্যযন্ত্র, ধামসার উচ্চ শব্দে গানের কথা ডুবিয়া যায়।

নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি পচাপনি গ্রামনিবাসী হনুমুড়া নামক একজন অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। হনু জাতিতে মুণ্ডা বা মুড়া।

১

আইল রাবণ রাজা যোগী বেশ হয়ে রে।
দুয়ারে দুয়ারে রাবণ ভিক্ষা মাগিছে।
দুয়ারে দুয়ারে রাবণ ভিক্ষা করিছে।
হাতে হাতে ভিখ্ দিতে হাত ধরিল রে।
হাতে ধরি রাবণ রথে চড়াইল রে।
কোথা ছিল জটা পাখী রথ ঠেকাইল রে।
পাও ভাঙ্গিল জটার ডানাও ভাঙ্গিল রে।
পড়িল জটার দেহ পর্বত সমান রে।
হেন হনুয়া বলে, ই কথা মিথ্যা লয়
পড়িল জটা পর্বত সমান রে॥ —পচাপানিতে (ঐ)

কেউ কান্দে হাটে বাটে।
কেউ কান্দে পুকুর ঘাটে, দিল নাই বাঁধে।
কেউ কান্দে কদম্বের তলে, গো রাধে॥
লক্ষ্মণ কান্দে হাটে বাটে।
রাম কান্দে পুকুর ঘাটে, দিল নাই বাঁধে।
সীতা কান্দে কদম্বের তলে গো রাধে।
হনু কান্দে কদম্বের ডালে গো রাধে।
দিল নাই বাঁধে॥ —ঐ

মুণ্ডা ও বাংলা শব্দের সংমিশ্রণে নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচিত হইবার ফলে ইহার অর্থ বোধগম্য নহে।

৩

জাতি জাতক মেনা সাহেব জাতিক মারাণ্ডা
ওলো এক পাড়া ওকা চেতনা ও নাকা।
ওলে সহ জাতি সান্তাড়া লাড়াকামুণ্ডা
ধাঁদারেক এনে মেয়ে ওণ্ডে এক চালা॥ —ঐ

মাছ ধরি হালা হালা পলাশ পাতের থালা হে,
নদী নালা শুকাই গেলে তরকারী জালা হে,
তরকারী জালা।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ছেলিয়ার হাতে ঘুগিরে,
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদে দাঁড়কন্যা পুঁটি।
আমার বঁধু ভাত খায় না গগ্‌লি বেসাতি হে,
দাঁড়া দেখি দুটা দাঁড়কন্যা ধরি হে, দাঁড়া দেখি,
তারে নারে নারে নারে নারে গো তারে তারে। -ঐ

বাড়ী নাম বিটা মাটী ননদ পড়েছে,
তিতা কাল্লা কাল্লারে হড়কে যাই মড়কে ধরেছে। -ঐ

৬

বার হাতের কাপড়খানি তের হাতের দসি,
পিছুলে পিছুলে পড়ে কাঁখের কলসী।
সীতা ধান ভাণে লো কদমের তলে।
খালেতে উঠিল মরা গজমতী হীরা
কপালে মাণিক ফোঁটা দামিনীর পারা
সাথে সাজিল রে দধি পসরা।

৭

বাঁশলা বাঁশির লয় ও ল সই. তরল বাঁশের ধ্বজা
বিনা ফুঁকে বাজে বাঁশি বলে, রাধা রাধা॥ —ঐ

মথুরারই পথে যেতে কদম সারি সারি,
আড়খেমটা নয়ন বাঁকা কাঁকাল ব্যথায় মরি।
হ্যাদে হ্যাঁ গো আমরা গোপ নারী,
ও জলে যাস না যাস না বারণ করি॥

৯

শাগ তুলতে গেছিলি মীনা, তুললি লতা পাতা,
কি শাগ তুলিলি মীনা বুড়ার সঙ্গে দেখা।
ও মীনা মরে যা মরে যা লো,
এখন সুন্দর মীনার বর হইল বুড়া। —ঐ

১০

ভাঙ্গা ঘরে দিনের আলো রোদ মুখে শুইসনা,
তুই আমার নয়ানের কাজল জলে ধুয়া দিস না।
যমুনাকে জলকে গেলাম রাস্তা বহুদূর গো,
পায়ে বেঁজল, শ্বশুর, যেমন বড় মাছ গো।
ঝাল দিয়ে রাঁধিলাম, ঝাল দিয়ে বাঁটিলাম,
চাখি দেখি শ্বশুর কতই না সোয়াগ গো।
শ্বশুর কতই না সোয়াগ গো॥

১১

বাগমুড়ির পাহাড়ে হলুদ বর বসে
চাঁপামণি হলুদ বাটে নাগর কেনে হাসে॥ —ঐ

১২

বাগমুড়ির পাহাড়ে পাখী বসে চাতালে
অনাহারে জীবন ঘুচালে। —ঐ

১৩

আম খেলুম জাম খেলুম হাত ধুলুম কুথা
কুঁদরি লতায় মাথা বাঁধলাম সিঁদুর পালাম কুথায়। —ঐ

১৪

বাড়ী বাড়ী ফুটে হরগৌরী গ্যাঁদার ফুল,
মালাদহে ফুটে লাল শালুকের ফুল॥

ঝুমুর—নাচনী নাচের

পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া অঞ্চলের ব্যবসায়ী নর্তকী সম্প্রদায় একক নৃত্যকালে যে ঝুমুর গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে নাচ্‌নী নাচের ঝুমুর বা খেমটি নাচের ঝুমুর বলা হয়। খেম্‌টি (খেম্‌টি দেখ) গানের নিদর্শন রূপে এই শ্রেণীর গান অসংখ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, ('বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৩—৩৩৫ দেখ)।

১

মুখের হাসি মুখে রাখিবি
আড় নয়ানে বলিবি হে কথা,
তুমার ছলনে কেঁদে মরি
বন্ধু, ধৈর্য ধরা দায়।
লাল রঙের শাড়ী লিব।
যে করিছে পীরিতি সে ছাইড়ো না পীরিতি।
পীরিতি করিলে দেখা পাবে না,
পীরিতি ভাই কেউ কইরো না ॥ —পচাপানি (মেদিনীপুর)

৩

লোকে বলে ভুল হলো, কেমনে ভুলিবে বলো,
হায় সে কি, বন্ধু, ভুলা যায়,
দিবানিশি আমার জাগিছে হিয়ায় ॥ —ঐ

৪

লাল শালুকের ফুল, বঁধু, ফুটে আঁধার রাতে,
যার সাথে যার মন মজে মরিলে না ছুটে, বন্ধু,
এত রাত কিসে।
এত রাত কিসে, বন্ধু, এত রাত কিসে,
পা ধুয়াব নয়ন জলে মুছাইব কেশে,
এত রাত কিসে?
এ সংকট গণিয়া তে আইল কি মতে?
ভাবও না তোমার, বন্ধু, কাজও নাই তোমারে,
এত রাত কিসে, বন্ধু, আইলে নিশির শেষে ॥ —ঐ

আয়না লিব চিরুণী লিব নারকোলোর তিলকা লিব,
পিং দিয়ে মাথা বাঁধব, কারো বারণ শুনব না।
দেশে উঠেছে গয়না, আমি কুলেতে রইব না॥ —ঐ

ঝুমুর—পাতানাচের

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আদিবাসীর স্ত্রীপুরুষের মিলিত নৃত্যের নাম পাতা নাচ। এই নাচ বৎসরের যে কোন সময়ই অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তবে ভাদ্র মাসের করম উৎসব উপলক্ষেই ইহার সমারোহ দেখা যায়। এই নৃত্য উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই পাতা নাচের ঝুমুর।

১

উপর পাড়ায় তাঁতিঘর মাঝ পাড়ায় মড়ল ঘর।
ও মড়ল, সবুর কর বাসি কাদা র‍্যাখে দিব তর॥
উপর পাড়ায় তাঁতিঘর কাপড়বুনে ছর ছর।
আর ম্যায় তাঁতাম বলে দিবি তাঁতিকে
আঁচলে কদম ফুল দিতে॥ —বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

বাগমৌড়ির পাহাড়ে নানা রঙের ফুল ফুটে
দিদি গো দাঁড়ায়ে তুলিতেই মন করে॥
খঁপা ভরি পরিব অঁচল ভরি তুলিব
দিদি গো আর গুচ্চাক ডাল ভাঙ্গিব॥ —ঐ

বাগমোড়ির পাহাড়ে কিসের ধূলা উড়ে রে,
রাজার বেটা ভাবরি কাটা ঘড়া ছুটাছে রে॥ —ঐ

৪

বাগমৌড়ির পাহাড়ে লম্বা লম্বা বেল রে,
খাইনি বেলা মিলায় যায় বুকে লাগে শেল্‌রে

৫

ধলভুঁইয়ের ধল রাজা খায়েঁলে মহুলের ভাজা,
আজ রাজা বিপদে পড়িয়াছে গামছা বন্ধক দিয়াছে। —ঐ

৬

টিকটিকি বাবই আঁটি, টাকায় বিকায় তের আঁটি।
কুথা যাছিস লো দিদি সোনার মন্দির ঘর শূন্য করি॥ —ঐ

৭

খাঁদা খাঁদি হাট যায় কিনে আনল পান,
খাঁদার মুখে পান দেখে খাঁদি করে মান,
খাঁদি মরে যা লো নিলাম বাজারে॥ —ঐ

৮

বুড়াবুড়ি হাট যায় তিন প্রহরের বাট রে,
শিয়ালডাঙ্গায় বুড়া ঢুলকাঁইছে নাচ রে॥ —ঐ

৯

আগদোলি পান খাওনি গাল হিলায়,
সে যে ভয় নাচের বেলায় হ্যাড়ে পালায়॥ —ঐ

১০

শাল গাছে শাল পংড়া কদম গাছে কলি রে,
ভঁদার গাছে লাল গামছা চটক দেখে মরি রে॥ —ঐ

১১

কাঁধে নিব কোদালটি হাতে নিব বুঁদিটি,
মনের মত খায়েঁ নিব চঁটাটি,
সজনি, লহকে ধরিব অ্যাড় ঢুটি॥ —ঐ

১২

সাঁঝে ফুটে ঝিঙা ফুল সকালে মলিন গো,
মরদ গুলার চাওনি দেখে জলে উঠে গা গো॥ —ঐ

১৩

মহল পড়ে টৈকা টৈকা কুড়াতে পারি নাই একা,
টিকটিকি দেখে সতীন পালাল থঁচের মহল থঁচেই শুকাল॥ —ঐ

১৪

আঁক বনের শিয়াল রাজা বনের রাজা বাগ,
আর বিহা ঘরের মায়্যা রাজা সমান খুঁজে ভাগ ॥ —ঐ

১৫

ভাদর মাসের গাদর জুনার তোরাইতো ফুরালি লো,
অ্যাসে যাইয়ে আমার নাগরকে ভুলালি লো। —ঐ

১৬

মাদাল গাছে ধনি বাসা করেছে,
একটা মাদাল খাইয়ে ধনি মনের কথা বলেছে।
চারকুণ্যা পুকুরটি লবং লতায় ঘেরা রে,
ডাল ভাঙ্গে ফুল তুলে বিদেশী ভমরা। —ঐ

১৭

আমগাছে আম নাই গাছ তলে কেন চপারে,
ক বলব, ভাই, প্রিয় সখা রাতচরার কথা রে ॥
আমগাছে আম নাই ফাবড় কেন মার রে,
তুমার দেশে আমি নাই আঁখি কেন ঠার হে ॥ —ঐ

১৮

বাড়ী নাময় হত্তোকির গাছ গো, মিশি বিনে
ও দাঁত রইল উপাস। —ঐ

১৯

আগে আগে মালগাড়ী তারপরে ডাকগাড়ী
আর তারও পেছুই জড়া পেসেঞ্জার,
দিদি লাগে ডর কলকাতা কঠিন সহর ॥ —ঐ

২০

হাতে হাতে পান দিতে দেখেছে কুলির লোকে,
চুণ দিতে দেখেছে ভাসুর
বঁধূ হে আজ বুঝি কি আছে কপালে ॥ —ঐ

২১

চৌদ্দশিকার মাদল কাঁধে নাচতে বাইরালম সাঁঝে।
ও জ্যোৎস্না, মলা কাপড় মরণ সমান ॥ —ঐ

২২

পড়িহাটির হাট যাতে চলনে চিনেছি তকে
আর হাতে বাজু নাকে নোলক দুলালি,
আকালে সকল ঘুচালি ॥ —ঐ

২৩

পান খাঁয়ে মুখ রাঙ্গা মনে করি হবেক সাঙ্গা।
আর সাঙ্গা হবার বড়াই রে মন ছিল,
বুড়ালা পুরুষেই দেখা দিল ॥ —ঐ

২৪

বাটের খৈ বাতাসে উড়িল
নাচে লো দিদিরা সময় বহে গেল ॥
বঁধু আসিবেন বলে কপাট না দিলাম ঘরে,
বঁধু হে সরবস নিয়ে গেল চোরে ॥ —বাঁশপাহাড়ী

২৫

জলকে যে গেলি, দিদি, ফুল কুথায় পালি গো,
ভাঁসে অ্যাল চাঁপার কলি খোঁপায় গুঁজে নিলি গো ॥ —ঐ

২৬

পাতালেতে ছিলেন কালী
সীরাম লক্ষ্মণ দুইজন বলে, মাগো।
হনুমানে যুক্তি করি মা দিলেন মহাবলি
নমো নমো নমো মা কালী ॥ —ঐ

ঝুমুর—ভাদরিয়া

কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, ভারত লীলা এবং লৌকিক ঝুমুরের পরও আর কয়েক শ্রেণীর ঝুমুর আছে, তবে তাহাদের প্রচলন সীমাবদ্ধ। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ঝুমুরের নাম ভাদরিয়া ঝুমুর। অবশ্য ভাদ্রমাসের কোন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রধানতঃ করম নামক নৃত্যগীতোৎসব উপলক্ষে এই ঝুমুরের অনুষ্ঠান হইত বলিয়াই তাহাকে ভাদরিয়া ঝুমুর বলিত। এখন ইহা অন্য উপলক্ষেও শুনা যায়। বিষয়-বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোনই পার্থক্য থাকে না, তবে ভাদ্র মাসের বর্ষা প্রকৃতির বর্ণনা ইহাতে মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।

১

হাতে হাতে পান দিতে দেখিল কুলের লোক
চুণ দিতে দেখিল দেওরে—
সখি গো—কি আছে আমার কপালে।

—অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

২

শাল বনে শুঁয়া পোকা
ওটাই বটে বাবুর কাকা,
শুন বাবু বলে দিবি পিয়াকে,
কি দোষে ছাড়িল আমাকে। —ঐ

৩

লোকে বলে ছি ছি
কিবা দোষ করেছি,
হাতে শাঁখা টানা নথ গড়েছি।
কি দোষে ছাড়িল আমাকে। —ঐ

বাইদে বুনিলাম ধান
ধান হইল মানুষ পরমাণ,
আষাঢ় শাওন মাসে না গেল কাড়ান,
দাদা, কেমনে বাঁচিয়ে পরাণ॥ —পুরুলিয়া

ঝুমুর—রঙ

নিতান্ত লঘু বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া হাল্‌কা প্রকৃতির ব্যঙ্গ এবং কৌতুক রসাত্মক যে সকল ঝুমুর গান রচিত হয়, তাহাকে রং ঝুমুর বলে। লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রত্যেক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অনুরূপ প্রকৃতির নিতান্ত লঘু ভাবমুলক সঙ্গীতও প্রচলিত হয়। ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে সঙ্গেই যে চট্‌কা গান প্রচলিত আছে, তাহাও ইহারই নিদর্শন। ঝুমুর প্রধানতঃ গুরুত্বপুর্ণ ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীত, তাহাই সমাজ-মানসে ক্রমে অবনমিত (deteriorated) হইয়া লঘু বিষয়কেও অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই রঙ ঝুমুর বলিয়া পরিচিত। সাধারণতঃ প্রেম-সঙ্গীত রাধাকৃষ্ণের নাম অবলম্বন করিবার জন্য ক্রমোন্নয়নের পথে স্বর্গীয়তা লাভ করে এবং লৌকিক ভাব অবলম্বন করিবার ফলে তাহা ক্রমাবনতির পথে রং ঝুমুরেব রূপ লাভ করে। নিম্নোদ্ধৃত গান কয়টিই তাহার প্রমাণ।

১

বায়না ছিল ডুরিয়া শাড়ী ফুল কাটা জাকিট আর শাড়ী,
কই দিলি তুই মাথার জালি পাউডার আর হিমানী।
বধূ, মিছা তোর ফুটনী, মিছারে তোর ভালবাসা ;
পকেটে নাই একটি পয়সা,
কই দিলি কানে কানপাশা।
নাকের নোলকখানি বঁধূ সাধ ছিল বাজারে যাব,
দুই জনে বাজার বেড়াব।
পকেটে নাই তোর পইসা, নাগর ; জানি তোমায় জানি ; বঁধূ,
শিশিরে কি চিড়া ভিজে ফাঁকা কথায় মন কি মজে,
বিপিন বলে দাগাবাজে চিনি আমি চিনি, বঁধূ।

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

নিম্নোদ্ধৃত গানটি একটি দ্বৈত রঙ ঝুমুর। সাধারণতঃ নাচনী এবং রসিক দুইজনে মিলিয়া নৃত্য সহযোগে এই গান গাহিয়া থাকে।

২

প্রশ্ন :— বিয়ে হব বিয়ে হব পাত্র খুঁজেছি,
বিয়ে যদি করবে আমায় জাতের খবর কি ?
উত্তর :— আগে ছিলাম মইষা মুচি এবার বামুন হয়েছি।

প্রশ্ন : বিয়ে হব বিয়ে হব পাত্র খুঁজেছি,
বিয়ে যদি করবে আমায় জমিজমা কি ?
উত্তর : জমিজমা সব বিকেছি আছে কেবল মোষ জোড়াটি।
প্রশ্ন : বিয়ে হব বিয়ে হব পাত্র খুঁজেছি,
বিয়ে যদি করবে আমায় লেখাপড়া কি ?
উত্তর : লেখাপড়া সব ভুলেছি আছে কেবল দোয়াত কলমটি।
প্রশ্ন : বিয়ে হব বিয়ে হব পাত্র খুঁজেছি,
বিয়ে যদি করবে আমায় খাবার দাবার কি ?
উত্তর : ঢেঁকিশালের পাটরা কুড়া সিদ্ধ করে তাতে দিয়েছি ঘি ॥
প্রশ্ন : বিয়ে হব বিয়ে হব পাত্র খুঁজেছি,
বিয়ে যদি করবে আমায় গহনা দিবে কি ?
উত্তর : কুড়ার বাকা দা বটিন গড়তে দিয়েছি।
প্রশ্ন : বিয়ে হব বিয়ে হব পাত্র খুঁজেছি,
বিয়ে যদি করবে আমায় পরতে দেবে কি ?
উত্তর : পরার জন্যে চট ছিঁড়া কিনে এনেছি ॥ —ঐ

ঝুমুর—সাঁওতালি

মুণ্ডাভাষী সাঁওতাল জাতি বাংলা ভাষাভাষী সমাজের প্রতিবেশী রূপে দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিবার ফলে বাঙ্গালী এবং সাঁওতাল জাতির মধ্যে যে সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান প্রদান হইয়াছে, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঝুমুর গান। ঝুমুর গানের আদি সুর এবং আদি রূপ বাঙ্গালী জাতি সাঁওতাল জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, সাঁওতাল জাতিও ক্রমে বাংলা ভাষা শিখিয়া বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে প্রচলিত ঝুমুর গান রচনা করিতেছে। ইহাদিগকেই সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে সাঁওতালি ঝুমুর, সাঁওতালি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই রচিত হইয়া থাকে। বিবাহাচার কিংবা ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত গানগুলি সাঁওতাল সমাজে এখনও তাহার নিজস্ব আদিবাসী ভাষা বা মুণ্ডা ভাষায় রচিত হয়, কিন্তু ধর্ম কিংবা আচার নিঃসম্পর্কিত প্রেম-সঙ্গীতগুলি বাংলা ভাষায় রচিত হয়।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অর্জুন-ভীম, ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। ইহাদের গীত-রীতি যেমন আদিবাসী রীতি-সম্মত, বিষয়-বস্তুও তাহাই। ইহাদের গঠন-পদ্ধতির মধ্যেও বাঙ্গালীর ঝুমুর গানের জটিলতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবে ইহাদের ভাষা অস্পষ্ট। বাংলা ভাষার সুপরিণত রূপ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সাঁওতালি ঝুমুরকে মাঝিগানও বলে।

নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি ১৯৬৪ সনে মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া জিলার সীমান্তবর্তী গ্রাম পচাপানির অধিবাসী হুনু মুড়া নামক একজন অশীতিপর বৃদ্ধ মুণ্ডা জাতীয় লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার কথা পূর্বেও একবার উল্লেখিত হইয়াছে।

১

সহরেতে সরকার বাজারেতে বাজকার,
রুনু ঝনু গাড়ি সাজিল,
সরু চিঁড়া ঝুমুরে গেল,
চলিতে চলিতে রেলগাড়ী লিয়া ভাঙ্গিল।
বলিতে বলিতে ভূঁ দিল।
রুনু ঝনু গাড়ি সাজিল॥ —পচাপানি (ঝাড়গ্রাম)

২

সরু মাদল বাজাতে ভাই যে বালা ভাঙ্গিল,
ও ভায়া না কান্দো, ও ভায়া না ভাবো,
কিনে দেব রূপকের বালা॥ —ঐ

৩

লতুন ঘর বনাইলাম লতুন ঘর ছাইলুম রে।
গিরা বান্ধা জল যদি পড়েত ই ঘরে নাই রবই রে॥ —ঐ

৪

কোলকাতার কোলেকা বিষ্টুপুরের অম্বরী তামুক।
মিঠার গুণে আঠা তোমার খাইগো, হে প্রভু, তুমি জান॥ —ঐ

কুলি কুলি যাছে গো যুগী বিটী যাছে গো।
যুগী বিটী বলে—লেগো মালা লে গো মাদুলী।
আমার ব্যাটাপুতা নাই গো,
কী করিব মালা মাদুলী ॥ —ঐ

৬

কিনিলাম সরু সুতা কিনিলাম সরু বেলমালা।
গাঁথিতে সুতা নাই পরিতে লোক নাই,
নদী জলে ভাসাইয়া দিব ॥ —ঐ

৭

একটা যে ব্যাটা ছিল পরের বিটী সিঁদুর দিল,
বাবার হোল দগধন,
বাঁকুড়া আনাগোনা পুরুলিয়া জেলা
বাবার হোল দগধন ॥ —ঐ

৮

বার পাই চাল নিলাম বড়পাতা দেখিতে যাব।
টাটাক নদীর ধারে রসুই করিব।
বড়পাতা দেখিতে যাব ॥
শাঁখা দিলি শাড়ি দিলি হাতে বাজুও দিলি।
বড়পাতা নাচিতে না দিলিস্ রে ॥ —ঐ

৯

একটি যে বেটা ছিল, ছালিয়া জোয়ান
বাছা মরিয়া গেল,
মাস ত খায়ে গেল গিধনী, হাড় ত গেল দামোদরে ॥ —ঐ

একটি মুণ্ডা ভাষায় রচিত সাঁওতালি ঝুমুর গান অনুবাদ সহ নিম্নে প্রকাশিত হইল—

১০

রাশি আতু কুড়ি গিথ্‌রা, দিন কিক্রং তুমদা রুরু।
বহিঞ বাড়ায়া মেন্‌তে একলা গিয়াঞ মেন্‌তে।

কুস্ত পতামরা লেকাঞ রুকে
হারমুনি বানাম গেকাঞ সেরেঞ কিরাঞ॥ —ঐ

ভাবার্থঃ

পাড়াগাঁয়ের ছোট মেয়ে প্রতিদিন আমাকে গান গাহিতে এবং ধাম্‌সা মাদল বাজাইতে বলে। আমি একা বটি। জানি না বলিয়া গান গাহিতে পারিতেছি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে ঘুঘু পাখীর মত ধামসা মাদল বাজাইতাম এবং হারমোনিয়ামের মত গান গাহিতাম।

নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ঝুমুর গান বাঙ্গালী গায়কের নিকট হইতে সংগৃহীত বলিয়া ইহাদের ভাষা কতকটা স্পষ্ট হইয়াছে।

১১

পাহাড়ে বর্ষিল জল নদীকে নামিল গো,
এবার, নেয়ে, মরণ হইল নৌকা ডুবিল গো।
বিয়াই, ঘুর ঘুর গো, এমনি কেন যাও,
ভাঁড়ে আছে লঙ্কা গুঁড়া লও খেয়ে লও। —বাঁশপাহাড়ী

১২

সোনার বরণ শোন ফুলটি কানে কে বা পরে লো,
সোনার বরণ গৌর আমার হিয়ার আগে জাগে লো। —ঐ

১৩

পুরব পছিম তরে বলে সোনার মাদুলী,
অমৃতি বলে খাওয়ালি কোন ধন মজালে রাগিণী।
কেন, ধনি, তুমি বিষ খাওয়ালে,
প্রেমেতে বিষ ভরালে কেন বিষ খাওয়ালে।
তবে চাঁদের চুলে এমনি দেড়ি
বেণী সাথে সেই গো মামী, চরণের রুপা মোর,
ঝিমিতে বিষ দিলে তুমি কিসে বিষ খাওয়াইলে,
তবে মনের জোরে বেণী গায়ে,
এবে পুদনা দোলাইলে॥ —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

১৪

দাদারে] ডাল কাটি লাগি
দাদারে] এক কোদাল মাটি...
দাদারে] চামরাঙা দেহি
দাদারে] ব্রহ্মা লাগি। —ঐ

মূল অর্থ :—রোদ্দুরে গা পুড়িয়ে এই যে ডাল কাটছি, এই যে মাটি কাটছি, —সবই তো ব্যর্থতার আগুনে নষ্ট হয়ে যাবে।

১৫

আমার ভগবান কোলে লিবার সখ ;
তুমি ভগবান উপরে, আমি ভগবান তলে,
কোলে লিবার সাধ হে
কোলে লিবার সাধ ॥ —সাহেবডিহি (পুরুলিয়া)

১৬

পুঁথি পাঁজি পাঁজ হইল বিষ্ণুপুরে জমি বাড়ী হইল,
(হায় হায়) দু'হাতে কলম ধরি কাঁদিতে অন্তরে।
দয়া কর, রাজা দশরথ ॥ —ঐ

১৭

বাড়ী আছে রে গুঞ্জ ফুল কোচায় আছে রে
কদমের ফুল,
কদমের ফুল রে বড় রে মোহ।
আধা পৃথিবী মোহে যায় ॥ —ঐ

১৮

মায় যদি মরে গো লদীর ধারে ফেলায়ে দিব,
বাব যদি মরে গো চন্দন কাঠি
মারাব না গো। —ঐ

১৯

বাড়ী আছে লীল গাছ লীলে শুঁটি ধরে না,
ঘরে আছে ছোট দেওর লীল পাড়্যা ধুতি পরে না —ঐ

ইহার সঙ্গে বাঁকুড়া জিলা হইতে সংগৃহীত একটি ভাদুগানের তুলনা করা যাইতে পারে :

বাড়ীময় নীল বুনেছি নীলের শুঁটি ধরে না।
ঘরে আছেন লক্ষ্মণ দেওর নীল কাপড় বই পরে না॥

বাঙ্গালী সমাজ হইতে সাঁওতাল সমাজে ইহা বিস্তার লাভ করিয়া ইহার নিজস্ব তাৎপর্য হইতে ইহা ভ্রষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য অর্থটি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

২০

দুপহর বেলা অইল শহর বালি তাতা বইল
চলো যাবো।
ধনি, ছাঁহিরে (ছায়া) ছাঁহিরে করিব গো,
চলো যাবো।
ডাল ভাঙ্গিয়া, ধনি, ছাঁহিরে করিব গো,
চলো যাবো॥

—ঐ

টপ্‌কা

মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা হইতে একশ্রেণীর গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে টপ্‌কা গান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সুর প্রায় ঝুমুরেরই মত। বাংলা টপ্‌পার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহাকে কেন যে টপ্‌কা বলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

১

পুকুর কাটালে বন্ধু,
　　না বাঁধিলে ঘাট হে।
ডালিম লাগিয়ে বন্ধু,
　　গেলেক পরবাস হে॥
পাকিল ফুটিল ডালিম,
　　পরে তুলে খায় হে।
ভরা যৌবনকালে বন্ধু ঘরে নাই রে॥

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

টপ্‌পা

বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ কলিকাতা সহরে যে টপ্পা গানের ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল, তাহাও লোক-সঙ্গীত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া সকলেই স্বীকার করিলেও বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোন রূপ বা রীতি হইতে ইহার উদ্ভব হয় নাই; বরং অনেকেরই বিশ্বাস, পাঞ্জাবের রাখালিয়া গান হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলা দেশেও ইহা যে ভাবে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা পূর্ণমাত্রাতেই রাগ-সঙ্গীতেরই লক্ষণাক্রান্ত; পাঞ্জাবেরই হউক, কিংবা বাংলারই হোক লোক-সঙ্গীতের কোন প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে ইহার মধ্যে অনুভব করা যায় না। তবে পরোক্ষ ভাবে ভাটিয়ালীর প্রভাব কেহ কেহ অনুভব করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

'এদিকে গানের মধ্যে কথার পরিবেশনের নিয়ম আলোচনা করলে দেখা যাবে, শিল্প-সঙ্গীতের টপ্‌পা নামক গীতরীতির সঙ্গে এ বিষয়ে ভাটিয়ালির বেশ মিল রয়েছে। এখানে হিন্দুস্থানী টপ্‌পা নয়, বাংলা টপ্‌পার কথাই বলা হচ্ছে। টপ্‌পা গোড়ায় হিন্দুস্থানী রীতিতে গীত হ'লেও বাংলা দেশে এসে সে নবরূপ ধারণ করেছে, তার মধ্যে বাংলার নিজস্ব রুচিও মেজাজের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দুস্থানী টপ্‌পায় অত্যন্ত দ্রুত তালের যে তাড়া আছে, বাংলা টপ্‌পায় তা' নেই—এখানে তালগুলির গতি মন্থর। কেবল তাই নয়, এই সব তালে মোটামুটি ভাবে তালের হিসেব থাকলেও মাত্রা গুণ্‌তির হিসেব নেই, অর্থাৎ সুর মাত্রার সঙ্গে লাফালাফি ক'রে অগ্রসর হয় না—ছন্দ এখানে গা ঢাকা দিয়ে পিছনে স'রে আছে। ভাটিয়ালীর মত এর কথাগুলোও এক এক গোছা ক'রে গায়কের মুখে উচ্চারিত হয়, আবার তার পরেই কথার হাল থেকে ছাড়ান পেয়ে সুর 'জমজমা' নামক তালের মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে। তফাৎ দাঁড়াল এই, ভাটিয়ালিতে একটানা সুরের যা কাজ, টপ্‌পার বেলায় 'জমজমা' তালের কাজও তাই। যদি বলা যায়, বাংলা টপ্‌পায় ভাটিয়ালীর প্রভাব আছে, তা' হ'লে বোধ হয় খুব মিথ্যা কথা বলা হবে না। বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত-চেতনা সর্বত্র সঞ্চারিত হ'য়ে রয়েছে ব'লেই টপ্‌পার মধ্যে এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গেছে ব'লে মনে করতে পারি। এই টপ্‌পা বাংলার কেবল পল্লী-সঙ্গীতের নয়, গত শতকের নানা প্রকারের গীত থেকে আরম্ভ ক'রে এ' যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীত পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তার করেছে।' (বাংলার লোক-সাহিত্য : ১ম খণ্ড, পরিশিষ্ট ক)

তবে বাংলার টপ্‌পা কথাটি লৌকিক অর্থে আরও শিথিল ভাবে ব্যবহৃত হয়। কবি গানের দলে যে দুই দলের সরকারের মধ্যে ছড়া কাটাকাটি হয়, তাহাকে কবির টপ্‌পা বলে, ইহাকে কবির লড়াই বা কবির ছড়াও বলে। ইহার কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

নদনদীতে কোন কালে সমান হবে না,
তালের ডিঙ্গা কোন কালে সমুদ্রে চলবে না।
হরীতকী বৃক্ষে হয় না মধু, নরকগামী হ য় ন স
না জানিয়া অন্যায় শুধু আমায় বলো না।

ছাগে যদি বাগ মারিত, জগতে কি বাগ থাকিত,
ইঁদুরে বেড়াল খেত দেখতো দশজনে।
মুরগী কি আর ময়ুর হবে শৃগাল কি আর সিংহ হবে,
বুনো শূকরে হাওদা চাপালে তাকে কেও হাতী বলবে না।
হীরার দরে জীরা বিকায়, বিক্রয় কে করেছে,
কোথায় গাভী ছেড়ে বলদ দুহায় দুগ্ধ মিলবে না।
সমান হয় না শাল কম্বলে দুগ্ধে কি আর অম্বল চলে,
তেমনি তোমার আমার সভ্য স্থলে ভাবে ঘটবে না।
কয়লা পাথর দুধে দিলে ময়লা যাবে না,
জলে ভাসলে ব্যাঙ পোহানা কুমীর বলবে না।
বাবুল গাছে হয়না লিচু, চালে কি ধরাবি কচু,
তুই কোথাকার জংলা ফেঁচু ফ্যাঁচু বলবে না।
দাবা খেলছে উচ ফরিঙা, খাটাসে বাজাছে শিঙা,
ঢাকের আগে বাজছে যেন টুনটুনির বাজনা।
কোন কালে শুনেছ কভু আমড়া কি হবে লিচু,
আতপের খুদ হয়না সাবু আতা হয় না বেদানা।
চোখের কাজল গালে পড়লে, সবাই তারে কালি বলে,
জলের পিপাসা কেবল ঘোলে যাবে না।
অন্ধের হাতে আয়না দিলে, দেখতে পায় না কোন কালে,
তেমনি কালীর শিমুল ফুলে পূজা হবে না।
চিনির গাড়ী বলদ টানে, সে কি চিনির মর্ম জানে,
তেমনি তুমি আমার সনে ধরেছ পাল্লার ঘটনা।
দূর কোথাকার লগনা চাঁদা, ঢেলিয়ে গগন করছে ছেঁদা
গোপাল বলে পর কাঁদলে কাঁদা হবে না। —মুর্শিদাবাদ

৩

দ্বিগুন আগুন জ্বলে গো দ্বিগুন আগুন জ্বলে।
হায়রে দারুণ বিধি, আমার এই ছিল কপালে গো॥
সম্মুখেতে ধনা সনা হয় না তাদের বিবেচনা,
আমারে করে বাসনা, ভার্যা হতে বলে গো॥

শুন, ধনা, কই তোমারে, আমার বাসনা নাই ধনা রাজ্যের
আমি কার ধনে ধনী এসংসারে সে আমায়, ফেলে গেছে গো ॥
সে ধন যে ফিরাইতে পারে, কাঁদব তার চরণ ধরে।
চির দিন রাখিব অন্তরে, যাবনা তা ভুলে গো ॥
পুনঃ ধনা কয় তারে, পতি তোমার গেছে মরে,
আর তো পাবেনা তারে, ভজ আমায় পতি বলেগো ॥
এ বিঘ্ন বিপদ কাটি, উঠিল বাল্মীক মাটি
পদ্মাবতী ধরল আটি, অস্থি উপদেশ বলেগো। —ঐ

৪

বিদ্যাহীনের কাছে থাকেনা পুস্তকের যতন,
অসতী করেনা যত্ন পতিরত্ন ধন।
ইঁদুর চিনে না গো ভাগবত পুঁথি,
কেটে করে কুটি কুটি এতে হয় ধর্মের ক্ষতি বললে কুবচন।
এ বাজারে রাঙ কি সোনা, আগে করতে হয় বিবেচনা,
সোনার মত দর পাবে না পিতলের করিলে যতন।
গুগলি কি আর শঙ্খ হবে, ইহার কি লিঙ্গ হবে!
বিসত বনে পুজো হবে তুলসী কয়লা কোন সন।
বানরের গায় গরদের চাদর রয়না কখন।
স্বভাব যাদের পশু জাতীয়, স্বভাব যায় না কভু শাস্ত্রেতে লিখন ॥
মধু থাকে পদ্মবনে ভোমরা তার তত্ত্ব জানে,
গোবর পোকায় জানবে কেন, গোবর গাদায় বাস যখন।
জহুরি হলে জহর চিনে, এই দুনিয়ার মাঝখানে।
যার বেদনা সেই জানে, জানেনা অন্য জনে॥ —মুর্শিদাবাদ

ইহা প্রায় অনেকটা গাম্ভীরা গানের মতই। সমাজের নিন্দা ও কুৎসা রচনামুলক গান। ছড়া গান বা ইহাকে টপ্পা গান বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোলক মন্দিরা হইলেই চলে। ইহা শ্রোতাদের হাস্য কৌতুকের মধ্য দিয়া আনন্দ দান করিয়া থাকে। নিম্নে এই শ্রেণীর আরও একটি টপ্পা গান উদ্ধৃত করা হইল। ইহা মিশ্রভাষায় রচিত, অর্থ পরিগ্রহও দুর্ঘট। ইহা মুর্শিদাবাদ জিলা হইতে টপ্‌পা বলিয়াই সংগৃহীত হইয়াছে।

৬

লগ্ন দিনসে শ্বশুর বাড়ীমে হইল ভেতই ভারুয়া ॥
বিহানি খিনি শুতি উঠি গারইল হতই মারুয়া ॥
তেকর বিহালি বহুত বিধি,
মাখইল ভেতই কাজল হলদি,
যখনি বেলা মারকই ভাটি
তেখনি ঢোলমে পড়লই চাটীজী,
লকনিয়াকে বহু পাক্কা মাথামে
উঠালকি চুকা, ঝমাঝম লেলকিছ
গিধারী, হম্ম পাছুমে অটপহরীজী,
জলে সাধিকে আমু যেখনি
গালি দেতুহুন যৌগীসনি, আর
পাকে পাকে ঘুরি, মুখমে ঠসতহুন
দালচৌরী। খাপটি ভাণ্ডাইয়ে
লকনিয়াকে পাথে খপটিকে
গুরুগুহুন খোবা ॥ —মুর্শিদাবাদ

টাঁড় ঝুমুর

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আদিবাসী কৃষাণ রমণীদিগের এক শ্রেণীর সমবেত সঙ্গীতের নাম টাঁড় ঝুমুর। ইহার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে (ঝুমুর —টাঁড় দেখ)। ইহা কোন উৎসব কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীত হয় না, কর্মরত কৃষক রমণীরা কর্মের শ্রম লাঘব করিবার জন্য ইহা গাহিয়া থাকে। ইহা মাঠে ঘাটের গান, প্রেমই প্রধানতঃ ইহার বিষয়।

১

শিশিরে কি ধান ফলে বিনা বরিষণে রে।
বচনে কি মন মানে বিনা দরশনে রে ॥ —পুরুলিয়া

২

তুমি তরু আমি লতা বেড়িয়া রাখিব রে
যাও দেখি কোথা যাবে আমারে ছাড়িয়ে হে ॥ —ঐ

টাকার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া দুই একটি ছড়া বা পাঁচালী জাতীয় গান রচিত হইতে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত গানটি অত্যন্ত সুপরিচিত।

টাকার গান

আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কেবল টাকা—
টাকা পয়সা, পয়সা টাকা কেবল টাকা।
টাকা ধন্য, টাকা গণ্যমান্য, টাকায় করে গণ্যমান্য।
টাকা হাতে না থাকিলে কত বুদ্ধিমান হয় বোকা।
আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কেবল টাকা।
টাকা পয়সা, পয়সা টাকা কেবল টাকা।
টাকা নিয়ে ঘরে গেলে, কত রমণী সব যত্ন করে,
স্ত্রীপুত্র টাকা না দেখিলে তারা মুখ করে বাঁকা।
আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কেবল টাকা।
কলিকাতা সহর দিল্লী সহর আর বগুড়া।
মুর্শিদাবাদ জেলা আমি ভ্রমণ করি একা॥
এবার ছাড়িয়ে জীবনের আশা।
আমি পাড়ি দিলাম কীর্তিনাশা॥
গহনার নৌকায় চড়ে গেলাম ঢাকা।
আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কেবল টাকা॥ —মুর্শিদাবাদ

টুসু গান

টুসু রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক শস্যোৎসব (harvest festival)। যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ধান্য পাকিয়া উঠে ও প্রতি গৃহ নূতন শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখনই এই উৎসব আরম্ভ হয়। পশ্চিম বাংলায় ইহা মেয়েলী তুষ-তুষলী ব্রত নামে পরিচিত। এই ব্রত কুমারী সধবা বিধবা সকলেই করিতে পারে। পৌষের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘের প্রথম দিন পর্যন্ত এই উৎসবের সময়। আবার কোনও কোনও অঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসের সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশ এবং পুরুলিয়া জেলায় এই উৎসবকে বলা হয় টুসু।

কোন কোন জায়গায় এইভাবে টুসুর পূজা করা হয়: ছোট মাটির সরায় তুঁষ ভরা থাকে। তাহার গায়ে একটি নারীর মুখ অঙ্কিত থাকে। মাটির সরাটি ফুল দিয়া সাজানো হয়, তাহাতে টুসুকে নানা মিষ্ট দ্রব্যের নৈবেদ্য সাজাইয়া দেওয়া হয়। তিন দিন মাটির সরাটি পুজা করিবার পর মকর সংক্রান্তির দিন তাহা নদী কিংবা বাঁধের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মেয়েরা মাটির সরাটি মাথায় করিয়া নদী কিংবা বাঁধের তীর পর্যন্ত লইয়া যায়। টুসু পুজার কতকগুলি নিয়ম ও আচার আছে। বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জিলায় এই পুজা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোনও কোনও স্থানে টুসু পুজার নিয়ম এইরূপ:

প্রথম দিনে স্ত্রীলোকেরা মলিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া থাকে ও পুরুষেরা মাছের সন্ধানে বাহির হয়। মাছ খাওয়া সেই দিনের একটি অবশ্য করণীয় নিয়ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তারপর স্ত্রীলোকেরা চাউল দিয়া পুলি প্রস্তুত করিতে থাকে। একটি নূতন মাটির সরা কিনিয়া তাহার বহির্ভাগে চাউলের গুঁড়া জল দ্বারা মাখিয়া তাহার প্রলেপ লাগান হয়। তারপর তাহা দ্বারা উনুনে জল গরম করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'বাউরি বাঁধা'। 'বাউরি বাঁধা' না হইলে কোনও স্ত্রীলোক পুলি প্রস্তুতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা ছড়া বলিয়া থাকে। যথা—

লবান্নর ধান ভানল্যাম দিনখেন কর্যে,
তার গুচ্ছেক কুড়া রাখল্যাম তুষাল মায়ের তরে।
তুষাল গো রাই,
আমরা ছবড়ি পিঠা খাই লো।
ছবড়ি লো শোবড়ি তুষু পুজতে যাই
আলো তিল ছাঁই,
বাটিতে কর্যে সাজাই দিব খাও টুসালু মাই।

কোন কোন অঞ্চলে টুসু উৎসবের পুর্বে মেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। এই অর্থ দ্বারা টুসুর উৎসবের ব্যয় নির্বাহ হয়। কোনও অঞ্চলে সরার পরিবর্তে একটি মৃৎপুত্তলিকাকে থালির উপর সাজাইয়া তাহার পুজা করা হয়। এই পুত্তলিকাটিকেই টুসু বলিয়া অভিহিত করা হয়। উৎসবের তিনদিন পরে এই পুত্তলিকাটিকে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

কোথাও আবার পুজার প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ,—গোবরের সঙ্গে তুষ

মিশাইয়া কতকগুলি নাড়ু পাকাইতে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাড়ু দূর্বা দিয়া পূজা করিবার পর তাহা একটি মাটির মালসায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তারপর মকর সংক্রান্তির দিন নাড়ু শুদ্ধ মালসাগুলি মেয়েরা হাতে বা মাথায় লইয়া গিয়া কোনও পুকুর কিংবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। ইহার সহিত গান করিতে থাকে।

বিভিন্ন অঞ্চলে টুসুর বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়া জিলার সংলগ্ন বাঁকুড়া জিলায় তাহার নাম তুষু এবং সেখানে তাহার এই রূপ দেখা যায়: দগ্ধ মৃত্তিকার সরার উপর চতুর্দিকে মৃৎ প্রদীপ সজ্জিত থাকে। সরার গর্ভে ধান্যের তুষ দেওয়া হয়। তদুপরি নানাবিধ পুষ্পের মাল্য, কড়ি ও গুঞ্জার হার দিয়া সরাটি সজ্জিত হয়। পুজার সময় প্রদীপগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। পুরুলিয়া জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে টুসুর এই বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন— ১। ছোট কুণ্ডলাকার একটি গর্ত ২। একটি মাত্র সরা ৩। প্রদীপ বসানো একটি সরা, প্রদীপের সংখ্যা বিজোড়। ৪। একটি বাঁশের ছোট ডালা ৫। মাটির প্রতিমা ৬। চৌলে। প্রথম চারটির ভিতরে সর্বদা বিজোড় সংখ্যক গোবরের ও পিটুলির গুটি রাখা হয়। রঙ্গিন কাগজ ও শোলা কঞ্চি ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত দুই ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটি মন্দিরাকৃতি বস্তুর নাম চৌলে।

কোনও কোনও অঞ্চলে প্রতিমা-নির্মাণের প্রথা প্রচলিত আছে। মূর্তিটি বাহনহীনা সাভরণা, গভীর হলুদ রং, উচ্চতা অনধিক এক হাত। ইহার উপর ভাদু প্রতিমার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

পুরুলিয়া জিলার টুসুগানের সুর প্রায় ভাদু গানেরই অনুরূপ। পুজার প্রক্রিয়ার মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও ভাদুগান ও টুসুগানে বাহিরের দিক হইতে বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায় না। ভাদু গানের অবলম্বন কুমারী-হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু টুসুগানে সমগ্র সমাজেরই চিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলনের সময় সমসাময়িক বহু রাজনৈতিক সমস্যার কথা টুসুগানের সুরে প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা—

জাগলো সাড়া ভারতের মনে
(টুসুর) জয় হবে সবাই জানে।
টুসুর বাণী উঠছে ধ্বনি
শুনগো তোরা স্বকানে।

বাংলা ভাষায় রাজ্য গঠন
তাঁহারি বিজয় গানে।
দিয়েছি মা ন্যায়ের লড়াই তোমার অভয় ভাষণে,
মিলন-রাখী বেঁধে দে, মা, ভারতের জনগণে।
নানা জাতি বনফুলে পুজবো, মা, তোর চরণে।
সোনার বাংলা শস্যে ভরা
(আমরা) রইব কি, মা, পিছনে।
সবার সমান হবো মোরা
তুমি ভুলো না অভাজনে।

বাংলাদেশের টুসু উৎসবের ন্যায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ উৎসব প্রচলিত আছে। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী, পেপসু এবং পাঞ্জাবের কোন কোন জেলায় টেসু নামক একপ্রকার লোক-সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত টুসুগানের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু উভয়ের নামের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা লক্ষণীয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসী ওঁরাও জাতির ভিতর টুসুর ন্যায় একটি উৎসব প্রচলিত আছে। টুসুর সহিত তাহার কিছু কিছু মিল দেখা যায়। ওঁরাওদের বৎসর আরম্ভ হয় ইংরাজী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে। এই সময় ফসল কাটার উৎসব হয়। এই সময় হইতে সুরু করিয়া ইংরাজী মার্চ মাসের ফাগু উৎসব ওঁরাওদের আনন্দের দিন। এই সময় শস্যে গোলা পূর্ণ হয় এবং সেই সময় ওঁরাওদের একটি উৎসব হয় তাহার নাম 'কোহা বেঞ্জা'। এই উৎসব পৃথিবীর সহিত সূর্যদেবের বিবাহ, অন্যদিকে মৃতের সহিত জীবিতের বিবাহ রূপ একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত সমাজের কোন বিবাহানুষ্ঠান হইতে পারে না। যতদিন না ফসল কাটা শেষ হয় ততদিন গ্রামের মৃতদেহগুলি দাহ করা হয় না। তাহা গ্রামস্থ মশানে প্রোথিত থাকে। সমস্ত ধান গোলাজাত হইবার পর সেই মৃতদেহগুলি মশান হইতে তুলিয়া দাহ করা হয়, তাহার পর অস্থি সংগ্রহ করা হয়। স্ত্রী ও পুরুষেরা তৈল মাখিয়া গান গাহিতে গাহিতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নদীতে অস্থিগুলি বিসর্জন দেয়। টুসুর সহিত এই অনুষ্ঠানগুলির মিল নাই। ইহার পরের অনুষ্ঠানগুলির মিল আছে। যেমন টুসুর ন্যায় ওঁরাও উৎসবেও চাউল সিদ্ধ করিয়া মৃতের আহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। 'কোহা বেঞ্জা'

অনুষ্ঠানের পর 'হরবরি' বা অস্থিগুলি প্রোথিত করিবার অনুষ্ঠান হয়। তাহার পর সমাজের বিবাহানুষ্ঠান হয়। ইহার সহিত যে নৃত্যানুষ্ঠান হয় তাহার নাম 'যাদুর' নাচ। স্ত্রীলোকেরা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে থাকে; তাহাদের সহিত যুবকেরা মাদল বাজাইয়া ঐ নৃত্যে যোগ দেয়। যুবক ও যুবতীরা একসঙ্গে গানে যোগ দেয়। ছোটনাগপুরের বীরহোড় জাতির মধ্যে টুসুর ন্যায় উৎসব প্রচলিত আছে। তাহার নাম 'নয়াজোম'। নূতন ধান্য ভক্ষণকে বলা হয় 'নয়াজোম'। উৎসবের নামও 'নয়াজোম'। উৎসবের আর এক নাম 'সোসোবোঙ্গা'। সোসোগাছের ডাল পুঁতিয়া পুরুষেরা মাঠ হইতে ফিরিয়া আসে। স্ত্রীলোকেরা গোময়জল দ্বারা অঙ্গন পরিষ্কার করে। তাহার পর সেখানে ধান্য দ্বারা চাউল প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা চিঁড়া প্রস্তুত করে। একটি পাত্রে দুধ, চিঁড়া, সোসো গাছের পাতা, গুড়, ঘি লইয়া পাতার পাত্রে রাখা হয়। তাহার পর একজন পুরুষ চিঁড়া ও সোসোপত্রের উপর দুগ্ধ অর্পণ করে, তাহার সহিত প্রার্থনা করে—'সিঙ্গবোঙ্গা, তুমি এই দুগ্ধ চিঁড়া প্রভৃতি লইয়া আমাকে ও আমার সংসারকে নীরোগ রাখ।' তার পর সকলে চিঁড়া ভক্ষণ করে ও সুরা পান করে। একটি পর্দা টাঙ্গাইয়া তাহার নীচে উৎসর্গীকৃত বস্তুগুলি রাখা হয়। অপরাহ্নে অন্ন প্রস্তুত ও কুক্কুট মাংস রান্না করা হয়; তার পর তাহা বিতরণ করা হয়।

মুণ্ডা জাতির ভিতর টুসুর সমতুল্য একটি উৎসব প্রচলিত আছে, তাহার নাম 'মাগে পরব'। ইহা পৌষ মাসের পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয়। টুসুর ন্যায় ইহাতেও গৃহস্থ সকলে উপবাস করিয়া থাকে এবং গৃহদেবতার নিকট প্রার্থনা করে, যাহাতে গৃহের সুখ শান্তি বজায় থাকে। তার পর গৃহস্থ নিজে ও তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে চিঁড়া ও চাউলের অন্ন এবং গুড় আহার করে। সম্পন্ন গৃহস্থ হইলে তাহার সহিত দধি ও দুগ্ধ পরিবেষিত হয়। গৃহভৃত্যদিগকে কার্য হইতে ছুটি দেওয়া হয় এবং নূতন ভৃত্য নিয়োজিত হয়। গৃহের কর্তা অথবা গৃহিণী এক ফোঁটা তৈল ভৃত্যের মাথায় দেওয়ার পর গৃহকর্তা অথবা কর্ত্রী নিজ অঙ্গে তৈল মর্দন করেন। ইহার পর একপাত্র চাউল ও চারিটি পয়সা ভৃত্য (ধনগর)-কে দেওয়া হয়। এই ভাবে ভৃত্য নিয়োগ কার্য সমাধা হয়। টুসু উৎসবে ইহাদেরই একটি রূপ প্রকাশ পায়।

টুসু গান একটি উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইলেও টুসুর ভিতর দিয়া

জীবনের সুখদুঃখ, দৈনন্দিন জীবন-সমস্যা সমস্তই প্রকাশ পায়। প্রতি দিন যাহা ঘটিতেছে তাহাও টুসুকে নিবেদন করা হয়, যেমন—

চল টুসু চল জল আনিগা হীরা কচার জোড় ধারে,
শাল পাতে আর ভাত খাব না সতীন বড় গাল মারে।

অথবা সাধের টুসু এসো
আলস আঘন মাস ফুরায়ে গেল।
টুসুর আগমন শুনে
আনন্দে সব মাতিল
ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে পুজিতে বসিল।

অথবা এই মনের বাসনা
টুসু মাকে জলে দিব না
দেখতে লেগবো টাটার কারখানা॥
আয় কে যাবি আয়
আমার কোলের টুসু জলে যায়।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া হইতে সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে টুসুকে একটি মানবী রূপে পাওয়া যায়। তাহার নানারূপ। সাধারণভাবে তাহার রূপ একটি গৃহস্থ বধূর রূপ। টুসুগানে তাহার রূপই প্রতিফলিত হইয়াছে।

মাটি জম্যে পাটি পাড়ল্যাম বাপের ঘর যাব বল্যে,
গুণের দেবর কাঁদতে বসল করবী ডাল ধর্যে।
কাঁন্দ না কাঁন্দ না, দেবর, আষাঢ় মাসের তিন দিনে,
তোমার ভাইকে বলে দিব ইংরেজী সড়প দিতে।

ইহা একটি প্রতিদিনের গার্হস্থ্য চিত্র। ইহার সহিত টুসুর দেবী-মহিমার কোনও সম্পর্ক নাই। আবার কখনও বলা হইয়াছে—

নডিহাটি সখের গাঁটি দিনে রাতে খোল বাজে,
শ্বশুরঘর যাবার বেলা দিনে রাতে মনে পড়ে।

প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ হাসিকান্নায় ভরা এই টুসুগানের মধ্যে গ্রাম্য অনাড়ম্বর জীবনের সরলতা এমনভাবে মাখানো আছে যে, তাহা যে কোন দরদী পাঠকের হৃদয় স্পর্শ না করিয়া পারে না।

গানগুলিকে বিষয় অনুযায়ী সাজান যাইতে পারে। প্রথমই টুসুর আগমনী।

আগমনী

১

এসো টুসুধন ডাকি ঘন ঘন,
পুজিব তোমার রাঙা চরণ। —পুরুলিয়া

২

আমরা যে টুসু মাপি আসন সাঁকরাইতে গো,
তেল দিলাম, সলিতা দিলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি গো। —ঐ

৩

সন্ধ্যা দিও বৌগো তোরা সন্ধ্যা কেনে নাই দিও গো,
যত দেবতা সন্ধ্যা পায় মা টুসু সরস্বতী গো॥ —ঐ

৪

টুসু ঢুল ঢুল গো ভাল তুলসীর মূলে গো,
আগু যায় মা, হাসাঘোড়া,
পাছু যায় মা ঝারি
ঝারির চলনে আমরা চল্‌তে লারি। —ঐ

ইহার পর টুসুর রূপ-বর্ণনা উল্লেখযোগ্য।

রূপ-বর্ণনা

১

আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝন্‌ঝন্ করে।
ওদের টুসু ছচ্‌রা মেয়ে আঁচল পেতে মাগে।
ও পাড়াতে দেখে এলুম জমি বিকে বাঁক লিছে,
আর কি লো তোর খিলান বাকে দুধের সর জমে যাচ্ছে॥ —ঐ

২

তিনটি টুসু জলকে যায় কোন টুসুটি ভালো।
বাঁয়ের টুসু ছলক্‌দার জলে আঁখি ঠারে গেলো॥ —ঐ

৩

আয়না নেলো চিরুণ নেলো মাথা বাঁধ গো রূপসী,
তোর রূপসী কে দেখিবে কোলের পুরুষ বিদেশী।

চাকুরী দিলাম কলকাতার ধারে,
তোরা নারলি গানে জোড় দিতে,
শুধায় আলি কলংকালিতে ॥ —ঐ

৪

গাড়ী এল তুম তুমায়ে দে গো টুসুর বেড়াইয়ে,
আইল গাড়ী বাইলে গেল জোড়া বেঙ্গুল বাজায়ে ;
আয়না বসা রেল চলে গেল,
আমার ভাই চড়ার বড় সাধ ছিল ॥ —ঐ

৫

এক পাই চালের খির ঘেঁটেছি তাই দিয়েছি কর্পূরা,
এস টুসু ভোজন কর যেতে হবে মথুরা ।
খোল টুসু গায়ের গামছা বেঁধে দিব ঘিয়ের মিষ্টি ।
সোজা রাস্তা চলে যাবে কারও পানে চেয়ো না ॥ —ঐ

৬

কুল গাছে কুলকুলিনীর বাসা ডালিম গাছে কেরকেটা ।
আমার টুসু ফাঁদ পেতেছে, তায় পড়েছে রাজার বেটা ॥ —ঐ

৭

টুসু দেখতে আলি তোরা, বস্‌লি তোরা ঢেঁকশালে,
যাবার সময় খেয়ে যাবে ঢেঁকশালার কুড়া পেট ভরে ।
তোরা পালা পালা, তোদের পেছু যাচ্ছেলো ছেইল্যা ধরা ॥ —ঐ

গার্হস্থ্য জীবনের বিভিন্ন সমস্যাই টুসু গানে প্রাধান্য লাভ করে ।

গার্হস্থ্য জীবন

১

আসছে সতীন ঘোসয়োলিয়া আগুন,
যেন বিষ্ণুপুরের বেগুন । —ঐ

২

আমার রামের জ্বর এসেছে চারধারে ডাক্তারবাবু।
ছাড় ছাড় ডাক্তারবাবু, আমার রামে আজ ভাত খাবে।
কি কি করব তরকারী ?
মুগমুসুরি পটলভাজা মাগুর মাছের ঝোল করি ॥ —ঐ

৩

ওপরে পাটা তলে পাটা তার ভেতরে দারোগা।
ও দারোগা, পথছেড়ে দাও, টুসু যাবে কল্‌কাতা ॥ —ঐ

৪

পায়ে আলতা কুলিকাদা, তাই এসেছে লিতে লো, টুসুমণি মা গো,
আলতা পরা গা, সোনার খাটে হেলান দিয়ে রূপার খাটে পা গো ॥ —ঐ

৫

আমার টুসুর একটি ছেলে, ফুলতোলা বই খেলে না,
কোন বিড়ালী ধূলা দিল, গায়ের বরণ ফিরল না।
আমার টুসুর একটি ছেলে, নাম রেখেছি যামিনী।
জামাই আলে খাইতে দিব পান্তাভাতের হিমানী ॥ —ঐ

৬

বাড়ী নামই কুয়া তাড়লো, ঘটী বলে জল খালাম,
এমনি কুয়ার মেটুর হলো পদ্ম ফুল ফুটিয়ে গেল।
বাড়ী বাড়ী বেইর‍্যা যাব গেইড়ার ঘাটে মুখ ধুব
ইস্‌পাতের পানের খিলি খোঁপাতে গুঁজে লিব ॥ —ঐ

৭

এক পা বিড়ি দুপা বিড়ি তিন পায় বিড়ি এককোণা,
শ্বশুর ঘরে থাকবি বাঘা, অদগদ রাতকানা।
সাঁঝরাতে ককিল ডাকে টুসুর মন ভোরাতি,
ভুলনা ভুলনা, টুসু, শুধা পালকি বটে গো
আয়স বইস্যা পাল্‌কি দিব, মুখ দেখিয়া যাবে ॥ —ঐ

৮

আধারাতি কোকিল ডাকে টুসুর মন ভুলাতে।
আর ডাইক না, প্রাণের কোঁকিল, টুসু আমার অচেতন ॥ —ঐ

৯

নারকেল তেলে মাথা বাঁধা, পাছে লো চুল গুমিয়েছে।
ঝিঙ্গা ফুলের চিডকা রোদ দিছে, তোকে মাথা খুলতে বলেছে ॥ —ঐ

১০

চল সারদা, চল বরদা কুলিতে বাঁধ বাঁধাব,
কুলির জলে সিনান করব গরজে চুল শুকাব।
বেঙ্কিলতায় বেঁধেছি মাথা, চুলের মহক ছুটে কলকাতা। —ঐ

টুসু পুজায় প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা হয়। একজন প্রতিবেশী তাহার প্রতিবেশীর টুসু প্রতিমার নিন্দা করে; গানের ভিতর দিয়া তাহার জবাব পাওয়া যায়।

১১

তোমরা যে গো গান বলিলে আমার মনে ধরে না,
আমরা যদি ফিরাই বলি তোদের মুখ আর রাখব না;
ও ঝিঙে ফুল গাল দিও কেনে,
আমি শুনেছি কপাট কোণে। —ঐ

১২

টুসু সিনাছের গা তুলাছেন হাতে তেলের বাটি গো,
নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছেন গলায় সোনার কাঠি গো।
তুষালী গো রাই। —ঐ

১৩

টুসুর তুয়ারে, ফুলের বাগান চিরদা চিরদা পাতা।
ফুল তুলিব ফল খাইব টুসুরে না দিব দেখা।
টুসু কমলিনী, রাই বিনোদিনী,
লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে ॥ —ঐ

১৪

বাঁকুড়ার আয়না-চিরুণ ক'লকাতার ফিতা,
অতি যত্ন ক'রে বেঁধেছি মাথা,
তাও যে বাঁকা সিঁথা ॥ —ঐ

১৫

কুইল্যাপালে লৈতন সড়ক দু'পাশ সারি লোক চলে,
আমার টুসুর এমনি চলন বিন্‌বাতাসে গা দোলে।
যা চলে যা হাওয়ার গাড়ীতে।
ঢোকে লাগলি বলে হাওয়াতে ॥ —ঐ

১৬

কইল্যার হাট যাব হাতে লিব শিশিটি,
সব সওদা বাদ দিয়ে আগে লিব মিশিটি।
শানবাঁধা ঘাটে, মিশি গাবাব সরু দাঁতে ॥ —ঐ

১৭

আমার টুসু চানে এলো কি পরিতে দিব লো,
বাক্সে আছে পাটের শাড়ি সেই পরিতে দিব লো।
উহার টুসু চানে এলো কি পরিতে দিব লো
খাঁচায় আছে ছাঁচের লতা সেই পরিতে দিব লো।
ঢেঁকিশালের পাটরা কুড়া সেই খাইতে দিবো লো। —ঐ

১৮

টুসুর মাগো, টুসুর মাগো, টুসুর বিয়া দিবে না,
আইবুড়োতে ছেলে হবে লাতি কোলে লিবে না।
লাতি বলে, হাঁতি লিবো হাঁতি কোথায় পাব গো,
বদ্ধমানের হাঁসা ঘোড়া সেইটে এনে দিবো গো। —ঐ

১৯

আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝন্ ঝন্ করে গো,
উহার টুসু ছ্যাঁচড়া মাগী আঁচল পেতে মাগে লো।
ছি ছি লাজে মরি, আমরা হলে লিতেম গলায় দড়ি লো। —ঐ

২০

ঝিঙা ফুলে টুসু তুমি মাথাতে বকুল কড়া,
ভাল করে চলবে টুসু তোমার পুরুষ দোজ বইর‍্যা।
দোজ বইর‍্যা গুণের না হলে, টুসু ঘর করে খায় কেমন করে। —ঐ

২১

আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝলমল করে,
ওদের টুসু ভাই ভাতারী আচল পাইতা মাগে। —ঐ

২২

আগদুয়ারের কদম গাছটি
মুলেতে ডাল ফেকেছে।
শিশু ডালে ফুল ফুটেছে
দুনিয়ার ভ্রমর জুটেছে॥ —ঐ

২৩

যমুনা নদীর ঝিলঝিলা পাথর
তোরা নাচে লেলো বডর॥ —ঐ

২৪

আমার সঙ্গে লাগিস না কভু,
তোকে করব ভাইয়ের বধূ॥ —ঐ

২৫

হাতীশালে হাতী ঘুরে ঘোড়া ঘুরে চাবুকে,
হালের হাইলা পাহানায় ঘুরে
নাচ্‌নী ঘুরে রসিকে।
রসিক নাইলো রসিক নাইলো নাচনি ঘুরছে ধারে ধারে॥ —ঐ

২৬

চল, সারদা দেখি আসি পুরুলিয়ার বাঁধ ধারে।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে লোক দেখিছে ভীড় করে॥
পয়সা দিয়ে টিকিট কাটাবো।
গাড়ী দাঁড় করাবে সরকারে॥ —ঐ

২৭

সড়ক ধারে ঘর তুলেছি কাম-খুঁটাটি লয় বাঁকা।
পীরিতি পড়েছি, সখা, এ পীরিতের দাম দু'টাকা॥
ভাবিস নারে চোখ ফুটে যাবে,
তখন চোখের ওষুধ কে দিবে। —ঐ

২৮

উ কুলিতে দেখে আইলাম চড়কির কারখানা,
আমাদের কুলি এসে দেখলাম কলিকা ফুলের বিছানা।
তোদের হাত লাড়াটি নাই সাজে ।
তোদের খোটা 'হারমনি' বাজে॥ —ঐ

২৯

গাঁকে আইলাম গেড়ি সাহেব খাজনা হইল খড়বড়ি,
খাজনা সুদে গাঁয়ের মোড়ল বাড়ি বাড়ি খরবড়ি।
দেখে এলাম কালির কলমে।
তোর নামে আমার নামে॥ —ঐ

৩৯

নিমতলাতে কালো গাড়ী তেঁতুল তলায় কাছারি,
ফুরাল তোমার সব ফুটনি, উঠে গেল কাছরি।
বেগুন গুন্ গুন্ বেগুন গাড়ীতে,
তোমাকে চাপায় লিব মোটরে। —ঐ

৩১

মা মরেছে মাসী আছে তার কি বেদন জানে না।
সৎ মায়ে কি বেদন জানে এঁগো বলে ডাকে না।
সরুসুতা বেলফুলের মালা, বঁধুর গলায় দিলে হয় আলা॥ —ঐ

৩২

বাঁশগাছে কি সাপ আইলে তাকি টুসু জান গো,
যদি সাপা গায়ে পড়ে মালিশ বই আর করবো না।
আমরা খেলেছি ছেলের বেলা,
ফুলির ধুলো বাঁশগাছের ফুলে। —ঐ

৩৩

তিনটি চুলের ফুরকা ঝুটি ঝাঁট দিব বরকা জলে।
ডেসে ডেসে ঠোক খাঁয়ে দৌড় দিয়ে কদম তলায়॥
ঝাড় গাঁদা ফুল আঁচলে তুলা, ফুল পরবো গো বিকাল বেলা॥ —ঐ

৩৪

রাখে এলাম কালো ছাতা ধারে ধারে ফুল কাটা,
আজ ফিরে কালো শাল, কাল বলব মনের কথা।
তেলের বাটি সাবুন কই আইল,
বেলা বারটা বেজে গেল। —ঐ

৩৫

বাড়ী বাড়ী আইলাম ঘুরে আনলাম লো ঢাকাই শাড়ী
ঐ শাড়ীতে লেখা আছে ঝিঁঝির কাটা প্রাণ দিলে।
কুচি করে পোর না শাড়ী, গাল দিবেক নাল শাড়ী। -ঐ

৩৬

বাড়ী আমার বাঁকি খেতে ছটা ভুল করেছে।
দিন গেল ভাই রাত গেল ভাই ভুলুক মুছাতে॥ —ঐ

৩৭

বাড়ীর নাময় নারিকেল গাছটি নারকেল তেলের অভাব কি
সরু করে কাটছি ফিতে সিঁদুর কিনে রেখেছি॥
বাঁধবি মাতা নিরি জালঢাকা, আর কুঈলাপালের চুলচিপা —ঐ

৩৮

কুলি কুলি হাতী চলে হাতীর পিঠে সং যাচ্ছে।
চাদরে মালুম করি পথের ধুলা উড়ছে বাতাসে॥ —ঐ

৩৯

যাব নারী ধীরে ধীরে সরুদুধি বন।
আনিব দুধি বুনবো যুথি মাছ ধরব দু'জনে॥ —ঐ

৪০

আস্তা পাড়ের কাস্তা পাড়ের সকল পাড়ই পড়েছি,
কাপড়ের লাগি ডাকে চিঠি ছেড়েছি।

সং করে দে রাণীবাঁদ যাব, ডুটি হাঁস পেড়ে কাপড় লিব,
সং করে দে রাণীবাঁদ যাব। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটির মধ্যে যে কাছাড় পলাইয়া যাইবার কথা আছে, তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রেমিক-প্রেমিকা অসামাজিক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে সমাজে আশ্রয় পায় না। তখন আসামের চা-বাগানে উভয়েই কাজ করিতে চলিয়া যায়।

৪১

বাড়ীর পথে বাইরান যাব গড়ের ঘাটে মুখ ধুব,
সর্তের পাতে পানের খিলি খোঁপাতে গুজে দিব।
চল, সজনি, কাছাড় পালাবো॥ —ঐ

৪২

অশোক বনের পাতার কুঁড়ি সীতা পাশা খেলেছে।
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতাকে ধরে নিয়েছে॥ —ঐ

বলাই বাহুল্য, অশোক বনে সীতাহরণ হয় নাই, দণ্ডকারণ্যে সীতাহরণ হইয়াছিল। গ্রাম্য বালিকার কল্পনায় উভয়ই মিশিয়া গিয়াছে।

৪৩

কুলির মুড়া বাবলা তলা তেঁতুল তলায় ঘর,
তাইতো আমি ডরাই তোরে : —ঐ

পুরুলিয়ার কথা বহু টুসু গানেই উল্লেখ পাওয়া যায়।

পুরুলিয়া

১

পুরুলিয়াতে দেখে এলাম ব্যাঙের হাটে কাছারি,
সাপ দেখে ব্যাঙ পালায় গেল পড়ে রইল কাছারি। —ঐ

২

পুরুলিয়াতে দেখে এলাম শাল গাছে বেল ধরেছে,
চলরে বেল তুলতে যাব যার কোমড়ে জোর আছে —ঐ

পুরুলিয়াতে দেখে এলাম ভালায় ভালায় দুধবালা।
আমার টুসুর ছেলে নাইরে কাকে দিব দুধবালা॥ —ঐ

পুরুলিয়া যাই পুরুলিয়া, পুরুলিয়ায় তোমার কে আছে,
পুরুলিয়ার বাংলা ঘরে পানু নাচের ভাই আছে। —ঐ

৫

পুরুলিয়ায় দেখে এলাম তিনটি সোনার বেহুলা,
কোন বেহুলা নেবে টুসু যেন গলে চাঁদমালা। —ঐ

৬

তালগাছে তাল বকুল দেখে চলে গেলাম পুরুলিয়া।
তাল পেকে তাল ফুরায় গেল তবু মেশিন ভাঙ্গে না॥ —ঐ

৭

আয়, হে কাকা, দে হে টাকা, টুসু কিনবো ছ'টাকা।
এমনি আমরা টুসু কিনবো কুইলাপালের নাম লেখা॥ —ঐ

কুইলাপাল পুরুলিয়া জিলার একটি স্থান।

৮

পুরুলিয়াতে দেখে এলাম কাওয়াতে গান জুড়েছে,
বাঁদরে খঞ্জনি বাজায় ঘুঘু প্যাঁচায় নাচ করে।
টানা টানা টানা লতা বিনে, সাজলো না লো মুখপানে॥ —ঐ

৯

এক পায় চেলের ক্ষীর ঘেঁটেচি তায় দিয়েছি কপুরা,
এসো, টুসু, ভোজন কর যেতে হবে মথুরা।
ঘিয়ের মিঠাই খাবে, টুসু, গরম ডাল বই খেও না।
সোজা রাস্তা চলে যাবে কারো পানে চেওনা॥ —ঐ

১০

বাপের ঘরে এমনি সুখ, মা, কাঁখে ঘুইরা চাল ভাজা—
শ্বশুর ঘরের এমনি দুখ, মা, লোক বুঝাতে যায়, মা॥

নানা সমস্যা

১

মাথা বেঁধে রইলাম বসে বাপের ঘরে যাব বলে—
সাধের ননদ কান্তে লাগলো বাসক ফুলের ডাল ধরে ॥
ভাবের গ্যান্দা ফুল, তোরা রাখতে নারলি জাতিকুল ॥ ২ ॥ —ঐ

২

গাঁকে এল সরু শাঁখা বড় বৌএর মুখ বাঁকা।
হালের হেলে বিকরে, দাদা, বড় বৌকে দে শাঁখা ॥ —ঐ

৩

আলগা লটে শালগা লটে খোলা ভর্তি রানবো,
বড় বৌ খুঁজতে গেলে মু' মেচকে দিব।
বড় দাদা খুঁজতে গেলে বাটি ভর্তি দিব ॥ —ঐ

৪

বাড়ী আমার কুয়া কাটলাম ঘটি ভরে জল খাব,
অমনি কুঁয়ায় নিঠুর হলো পদ্ম ফুল ফুটে গেল ॥
কি ফুল ফুটেছে বাগানে, ফুলের সোহাগ ছুটে বাগানে ॥ —ঐ

৫

নদীর ধারে নীলমণি লো নীলের শুঁটি ধরে না,
ঘরে আছে ছোট দেওর নীল কাপড় বই পরে না। —ঐ

৬

বাড়ে না আমার নারিকেল গাছটি বারে বারে জল দিব,
একটি নারকেল পড়ে গেলে ডাকে চিঠি পাঠাবো।
চিঠি পাঠাই ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না,
জামাই আদর বড় আদর দুদিন বই আর থাকে না ॥ —ঐ

এ বছর পুজোতে হইবে হেরিতে নূতন আদরের গহনা
হাতেরি আনিলে হাত চুড়ি তাগা নাম' হাতে কিছু দিলে না।
কানেরি আনিলে কানপাশা মাকড়ি নাম' কানে কিছু দিলে না।

বন্ধু, বেলখানি দিয়ে ঠকাইয়ো না,
গলেরি আনিবে মণিমুক্তা হার,
হারের কথা কি বলিব আর।
পায়েরি আনিবে আজন বাজন মাথারি ছোট ফুল।
বন্ধু, সে না হইলে বাঁধিব না চুল॥ —ঐ

আনদানো পুকুরে বান্‌ধানো ঘাটে
তাই সারি সারি ডালিম গাছ।
এক ডালিমে লুচি মণ্ডা আর ডালিমে রস,
বঁধু, একই পানে বশ॥ —ঐ

কন্যার বিবাহ দেওয়া যে কেমন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাই নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

১০

বেটি বিকা হলো দায় বরকে গাড়ী সাইকেল চায়,
পণের চলন ছিল আগে কুলীন বামুন মধ্যে, ভাই,
এখন কিন্তু পণের চলন জাতিভেদে চলছে নাই।
যতই ধনে হোক্ না মেয়ে বরকে কিছু কবুল চাই।
পাত্র এসে পাত্রী দেখবে ফলে ওল্টা ফল সবাই।
বর্তমানে শিক্ষা ধারায় এ প্রগতি চল্‌ছে ভাই,
আই. এ. কিংবা বি. এ. বরে অগ্রিম মোটর সাইকেল চাই,
সমাজ নাবছে অধঃপাতে নায়কদেরও দৃষ্টি নাই।
যুগের কোন নাইরে দোষ দোষী সমাজ ব্যবস্থাই॥ —ঐ

১১

তিতি সাপে উল্‌কি লেখা
ঢ্যাম্‌না সাপের কুড়েঁলি।
তোর সঙ্গে ভাই জল্‌কে যাব না,
গোণ্ডোগোল লাগাতে, ভাই, আর পারব না। —ঐ

১২

বনের নামলে গাড়োয়াল।
গেঁটঠে বাঁধা কেদ পাকা॥
ছেলিয়া সময়ে মেইয়া নয়রে।
কাক দিবেক কেঁদ পাতা॥
হালের গরু রইল বসিয়ে।
তোরে খাইমরে তিতি সাপে॥ —ঐ

১৩

নদী নালার জল শুকালো,
পাথর কেটে জল খাবো।
বড় দাদার ছেইলা হোলে
ঘর ভাঙ্গে দালান দিব।
খেলব পাশা জিতব আট আনি।
সে তো খবর ধারের চাতালি॥ —ঐ

১৪

গ্যাড়া হেন মানুষটি জরার কলসি।
ও হে মারিবে বাঁশীর কাবড়।
ভাঙিব কলসী ও কি লাজে মরি।
রাস্তার মাঝে কাঁদছে বিদেশী॥ —ঐ

১৫

এই মিনতি পরম পতি
রেখো আমার মান।
আপনারা ভাই সহরবাসী
গান জানেন ভাই রাশি-রাশি
আমরা মাঠে কাটি ধান।
আপনারা গাইতে জানেন গান॥ —ঐ

কোন সহরবাসিনী বান্ধবীকে লক্ষ্য করিয়া এই গানটি গাওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

১৬

মেঘ করেছে মেগ্‌ঘ মেগঘা
চুল শুকানো দায় হোল।
টানা পাংখা ঝরো খায় বসিয়ে
নারকেল তেলে ভোগ মেলেছে। —ঐ

১৭

এক পয়সা বিরি কলা কলকাতাতে ছড়াবো।
কলকাতার বাবুগুলা টেরি বাগা ছাড়াবো।
সে কি এমনি যাবো,
খালভরাদের হাড় ফুটে দালান ডুবো॥ —ঐ

১৮

আপনাদের বাড়ী বসতে গেলাম
বস্ বলে আর বললে না।
হণ্টু নীচু কায়দা মেলা,
গরবে পা পাতলে না। —ঐ

১৯

চল্‌ত সুদন খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বড়্‌তলা।
ফিরবার বেলা দেখায়ে আনব কয়লা খাদের জল তোলা।
কয়লা খাদের জলে মাগো মাথা ব্যাদনা ঝিম ঝিমা॥
কাকুঁড় খেয়ে কফ্ ফেলে, মা, ডাক্তার এনে হাত গ্যাখা।
ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, আর খায় না জল সাবু।
পিলিতে মাথা ধরেছে এনে দাও কবলা লেবু॥ —ঐ

২০

দখিন নাকি যাবে, টুসু, খিদা পেলে খাবে কি।
আনো, টুসু, গাইয়ের গামছা ঘিয়ের মিঠাই বেঁধে দি॥
ঘিয়ের মিঠাই খাবে টুসু গরম জল বই খেয়ো না॥
পাকা রাস্তায় চলে যাবে প্রাণ গেলে রা করো না॥ —ঐ

২১

চাক্‌রী কাটি চাক্‌রী কাটি চালের গদিতে,
হাজার হাজার চিঠি পাঠাই ডালিম পেকেছে।
পাকুক পাকুক পাকুক ডালিম ঝড় বাতাসে হেলবে না,
আশ্বিন মাসের পুজায় ডালিম ধর্‌লে ডালিম ছাড়বো না।
বঁধু তো কাঁচায় খেলে না,
পাক্‌লে ডালিম ছেলেয় খাবে তুমি খেতে পাবে না। —ঐ

২২

সরপে সরপে যাব কেঁদ পাকা কুড়ায়ে খাব,
বেঁকা সতীন দাঁড়ায়ে আছে গোড়ায়ে ছাড়ায়ে যা'ব,
তুই না ডবল ছিনারী,
তোকে গোড়ায় সাবাস করি। —ঐ

২৩

পেট ভরে খাইতে দিস নাই দিনে রাতে আমারে,
চল গাঁদা ফুল, সাগাই যাব, থাক্‌ব টাটানগরে। —ঐ

যে স্বামী পত্নীকে পেট ভরিয়া দিনে কিংবা রাত্রিতে কোনদিন খাইতে দেয় নাই, তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া পত্নী সাগাই যাবে অর্থাৎ অন্যকে বিবাহ (সাঙ্গা) করিবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বিশেষতঃ যাহাকে সাঙ্গা করিবার অভিলাষ করিয়াছে, তাহার নিবাস যখন টাটানগরে, তখন ত বলিবার আর কিছুই নাই।

২৪

একখিলি পান দু-আনা দাম আমি তাও কিনে খাব।
সোনার বরণ টুসুধনকে আমার ইস্কুলে দিব। —ঐ

২৫

চাল উড়াব রসে রসে মুড়ি ভাজব রগড়ে।
তোদের টুসু মরলে পরে কাঠ চালাব সাগরে॥ —ঐ

২৬

বাড়ে না আমার নারকেল গাছটি বারে বারে জল দিব।
একটি নারকেল পড়ে গেলে, চিঠি ডাকে পাঠাব।

চিঠি পাঠাই, ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না,
জামাই ছেলের বড়ো আদর তিন দিন বই থাকে না।
আর তিন দিন থাকো জামাই, বসতে দিব শীতল পাটি,
খেতে দিব ঝুরা পানটি ॥ —ঐ

২৭

দূরে বিহা দিলি, মাই, কেন,
ঝাঁপ দিব লদীর বানে। —পুরুলিয়া

২৮

মাথা বাঁধব বাক্স ভারী, নাবব নদীর কিনারে,
ভাবে ভাবে উঠ্‌ব গিয়ে জুয়াচোরের বাজারে। —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটি পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলনের সময় রচিত হইয়াছিল। আন্দোলনের ফলে মানভুম জিলার বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও এই গানগুলি এখনও টুসু পুজা উপলক্ষে গীত হয়। হয়ত আর কিছুদিনের ব্যবধানেই তাহা লুপ্ত হইবে। এই শ্রেণীর টুসু গানকে সমসাময়িক বিষয়মূলক টুসু গান বলা হয়।

২৯

বুঝিই যদি বুঝলি না, ওরে, তোরে দুখ বুঝাব কি করে,
সদর হ'তে হাকিম এলে রইলে দাঁড়াই হাঁ করে।
আমার ভাষা জানো না, দুখ বুঝবে কি গো ভাণ করে।
দুখ জানাই কি করে ॥
দুখের জালায় আমরা মরি সরকারে যাই বুঝাতে,
আমার ভাষা বুঝে না সে, কইব কথা কার সাথে।
চোরে আমার চুরি করে থানায় গিয়ে জানান দিই,
অন্য ভাষার দারোগা হে নালিশ আমার বুঝবে কি।
নিজের ভাষায় কইলে কথা হাকিম হুকুম সব চটে।
এমন রাজ্যের পাল্লাতে গো জীবন রাখা দায় বটে ॥
সময় বুঝে দেশবাসী সব চলোরে ভাই সন্ধানে,
রাজ্যের ভাষায় হাকিম হুকুম পাবার উপায় কোন খানে —ঐ

৩০

বাঁশপাহাড়ীটা ভাল ছিল বন কেটে খারাপ হল,
ভীম অর্জুনের খাল ভরায়া টাকায় সিকি লাভ নিল।
ঝর্ণা শাড়ী সামিজ না হলে, আমরা কি পরে যাই পর কুলে॥
—বাঁশপাহাড়ী

এখানে ভীমার্জুন বাঁশপাহাড়ীর সংলগ্ন একটি গ্রাম।

৩১

পরকুল হয় ফুল ফুটেছে ফুটেছে কলি কলি।
হাত বাড়ায়ে তুলতে গেলে দেয় গো জোড়া পানখিলি॥ —ঐ

৩২

কৃষ্ণকালী ভুজঙ্গিনী দংশিল হিয়ায়,
কালো বিনে জর জর আমার পাছে প্রাণ যায় —বাঁশপাহাড়ী

৩৩

কলাতলে সরু বালি টুস্থ খেলা করে গো,
টুস্থর মাকে বলে দাও গা টুস্থর বিয়া দিতে গো।
টুস্থর বিয়া যেমন তেমন হাজার টাকা খরচ গো। —বাঁকুড়া

এখানে টুস্থর বিবাহ দিবার জন্য গৃহস্থ-কন্যার দুশ্চিন্তা দেখা দিয়াছে। কিন্তু টুস্থর বিবাহ দেওয়াও যে সহজ সাধ্য নহে, তাহাও পল্লীবালিকার উক্তি হইতে জানিতে পারা যাইতেছে। কারণ, টুস্থর বিবাহে হাজার টাকা ব্যয় হইবে। টুস্থ গানের ভিতর দিয়া কুমারী কন্যাগণ নিজেদের মনের অভিলাসই ব্যক্ত করিয়া থাকে, টুস্থ উপলক্ষ মাত্র। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য অনেক ক্ষেত্রেই যে পল্লীবালিকাদিগের বিবাহে বিলম্ব হয়, তাহাই ইঙ্গিতে ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

৩৪

বাড়ী আমার জোড়া নারকোল সিকায় করে পাঠাব,
দেখে শুনে মন মানে না একটি ভেবে পাঠাব। —বেলপাহাড়ী

৩৫

বাড়ীন্ আমার তালাগাছ বাড়ীন্ তাল পাকিছে,
খালভরাদের রাইত রাজা, একগাছি চুল ফরকা ঝুঁটি
ভেসে ভেসে যাব বদ্ধমানের কিনারে। —ঐ

৩৬

ভাদ্দমাসের ওলাচ বাগানে,
একধারে সাপ একধারে বাঘ ভালুকদলে। —ঐ

৩৭

কুল খাবি তো বলবি আমাকে,
কুল হিলায় দিব লইকে,
কুল খাবি তো বলবি আমাকে। —ঐ

টুসু গান গাহিতে বসিয়া পল্লীর বালিকারা তাহাদের নিজেদের গানের ভাষায় চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া যায়। স্বপ্নের মধ্যে যেমন চিত্রের কোন সংলগ্নতা থাকে না, তেমনই টুসু গানেও চিত্রগুলি অসংলগ্ন। গানের স্থরে ইহারা ছড়া ব্যতীত আর কিছুই নেই।

৩৮

কাঁচা বাঁশেতে লাগিল ঘুণ,
পিরিতি করা জলন্ত আগুন। —ঐ

৩৯

আমার টুসু মুড়ি ভাজে শাঁখা ঝলমল করে,
তোদের টুসু লোভী টুসু হাত বাড়ায়ে মাগে লো।
ছি ছি লাজ লাগে না, ছোট মুখে বড় কথা সাজে না। —ঐ

৪০

ডেমরা মড়া কাড়া চরাচ্ছে,
কাড়া চরে না ভ্যালে আছে। —ঐ

৪১

ছাবকা ছাবকা মেঘ ধরেছে চুল শুকানো দায় হলো।
ফুলাম তেলে টগমগ চুল শুকানো দায় হলো।
চুল বসে না চিরুণীর দোষে, চিরুণী ফেরত দেব আর হাটে। —ঐ

৪২

আমার টুসুর একটি ছেলে গো ফুল তোলে বই খেলেনা,
কোন ছিনারী ধুলা দিল ধুলার দাগ তো গেল না।
ছি ছি লাজ লাগে না। —ঐ

৪৩

মাগো মাগো ফুল পাতাব ফুলকে আমার কি দিবো,
ফুলকে আমার ফুলাম তৈল দিব। —ঐ

৪৪

হলুদ বনে টুসু তুমি হলুদ কেন মাখনা।
ওই যে শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না —ঐ

ভাদু গানেও (পরে দেখ) এই গানটি শুনিতে পাওয়া যায়।

৪৫

জোড়া শাল তলাতে,
অশ্বিন বাবু লাভ করেছে বহাল ক্ষেতে। —ঐ

বহির্জগতের সমসাময়িক কোন ঘটনা টুসু গান রচয়িত্রীদিগের মনে যে খুব গভীর দাগ কাটিতে পারে, তাহা নহে ; কারণ, এই গান কদাচ পুরুষের রচনা নহে, সর্বদাই নারীর রচনা। সুতরাং অন্তঃপুর জীবনের নানা সমস্যার কথাই ইহাদের মধ্য দিয়া যেমন প্রকাশ পায়, তেমনই নারীর ব্যক্তিগত জীবন সমস্যার বিষয়ও ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। তবে কদাচিৎ গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত কোন ব্যক্তি কিংবা বহির্মুখী ঘটনার কথাও ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে। এখানে অশিনবাবু বা অশ্বিনীবাবু নামক যে চরিত্রটির উল্লেখ আছে, তিনি গ্রামেরই কোন ব্যক্তি।

৪৬

এক ছেদামের মাদাল পাকা কোন বাজারে বিকাব,
দেখে শুনে মন মানে না আন গো ভাণ্ডে জল খাব। —ঐ

৪৭

পুরুল্যাতে দেখে এলম দালানে ধান পাকেছে,
কোন চাষাতে চাষ করেছে শেয়ালে ধান কাটেছে। —ঐ

৪৮

রাত পোহাল সকাল হোলো মাথা বাঁধ, মা জননী,
কাঁদিস না, মা, আমার কিরা না বিদায় দিব আমি।
টুস্থর চালে লাউ ধরেছে লাউ তুলেছে বাগালে,
এবার বাগাল ধরা যাবি বড়বাজার মহলে। —ঐ

৪৯

আগ বাড়ীতে ঢাক বাজিছে আনছে নাকি টুসুধন,
দেখ ভালে দেখ, বেজের বালা, টুসুধন আর কতদূর ?
টুসুধনকে আনতে যাব চন্দন কাঠের চৌদলায়,
এবার যদি দয়া কর রাখি সোনার মন্দিরে। —ঐ

৫০

কলকাতা যে গেছলে, টুসু, কি কি সন্দেশ উঠেছে,
এঁকা বেঁকা জিলপি খাজা নারকল তেলে ভাজেছে।
আয় লো আয়, সজনী,
বাস্কা ফুল বাস্কা ভরা দিব এখনি।
পান বানালো পান, ও সখী, পানের ভিতর আধুলি,
আগাম জলে ফেলে ডুব কালাচাঁদের মাদুলী। —ঐ

৫১

ইটৃকি, মিটৃকি, সিটৃকি প্যাড়া টুসুর কাপড় বুনাব,
চার দিকে চার মশাল জ্বেলে বামুন ফলার করাব। —ঐ

৫২

যাহ যাহ যাহ টুসু ঘুরে ডাঁড়াও আগনাতে,
সোম বছরের মনের কথা বলি তোমার সাক্ষাতে।

৫৩

লাচকে বেরালে টুসু লাচে কদম পাকে নাই,
পাকুক পাকুক আরও পাকুক আরও খাওয়ার দিন আছে।
মকর গঙ্গাজল, টুসু কোন ঘাটে সিনাবি,
মকর গঙ্গাজল। —ঐ

৫৪

ওহে কাকা, দেহ টাকা আমরা সড়প বাঁধাব,
নিচে দিব গুটি পাথর উপর টাকা ছড়াব।
সরু চাদর বনফুলের মালা, আমার গা করে আলা ঝালা॥

—এড়গাদা (ঝাড়গ্রাম)

৫৫

আমার টুসু দক্ষিণ যাবে হাতে দিব দশ টাকা,
মনে করে আনবে, টুসু, হাতি দাঁতের দুধ শাখা।
অনেক দিনের পরে, দেখা হবে কুলিমুড়ার জৈড়তলে।

৫৬

গায়ের জখা বডিস লিব গো,
মাড়োয়ারিদের দকানে, মাথা বাঁধা ফিতা লিব।
মনোহরের দকানে মাথা বাঁধনি বটে,
মাথা বাঁধা ফিতা রইল গিধনাতে ॥ —ঐ

৫৭

সড়পে সড়পে যাব মল্লিক ঘরে ধান লিব,
এমন সখের চাল করিব টাকায় সিকি লাভ নিব।
সেকি অমনি যাব, ঐ নাড়ীদের হাট কুটে চালান দিব ॥ —ঐ

৫৮

সৈল দিলম সলিতা দিলম স্বগ্যে দিলম বাতি গো,
যত দেবতা সন্ধ্যা লও মা, ঘরে কুলবতী গো।
ছি ছি লাজ লাগে না, বড় মুখে ছোট কথা সাজে না ॥ —ঐ

৫৯

পরকুল ধারের লোক আসেছে, বৈঠক ঘরে বসেছে,
যাওনা, টুসু, জিজ্ঞাস করবে কোন কারণে আসেছে।
ছি ছি লাজে মরি, আমরা হলে নিতাম গো গলায় দড়ি ॥
মাথা বাঁধলি ভানির পারা সিঁদুর পরলি মাঝখানে,
সিঁদুর পরা সাজল না ধুয়ে আয় পুকুর ঘাটে।
আলবেট কাটলি বটে,
আলবেট কাটা সাজল না তোর বাঁ বাঁটে ॥ —ঐ

৬০

মাথা বাঁধলি ডালির পারা গো তাই গুঁজেছি বেলকুঁড়ি,
বোম্বাই হতে পারসেল আসে আনায় যুগল চুড়ি।
মনবাধা দিয়ে, ও প্রেয়সী, আমি যাই বিদায় হয়ে ॥

৬১

রেল হয়ে সব গোল হয়েছে গো গিরস্থের মনভারী।
এই যে চারকুণো বেড়েছে দামে, আরও কি হয় তাই ভাবি,
জিনিষ সাক্কা ভারী নুন তামুক কলাইএর দামে মরি॥ —ঐ

৬২

হাতে শাঁকা মিশি দাঁত গো পান খায়ে সবাই চলে,
এই যে দুলছে পাছা কলম কাছা আঁচল খাড় আঁচলে।
ও সই হোল জাল সখীরা সব যাচ্ছে যমুনার জলে॥
আমড়া আটি দাঁতন কাটি মাজা পাতখানি।
আমরা মায়ের কুলকামিনী ভিক্ষা দিবার কি জানি।
যাও হে মানে মানে মানের কালা হেরব না দু নয়নে॥
হাতির কাঁধে শ্যাম চলেছে গো গলে তিনটি মাদুলি,
দূরের থাকে চিনতে নারি চাদার মালুম করি।
টুসু, যাও, মা, জলে আসছে বছর আনব গো আরবার॥ —ঐ

৬৩

এড়াগাদাটি সখের গাঁটি সাঁঝ সকালে খোল বাজে,
শ্বশুর ঘরকে যাবার সময় সেই সকল মনে পড়ে।
শ্বশুর ঘর যাব না, শ্বশুর ঘরে গঞ্জনায় প্রাণ বাঁচে না॥ —ঐ

৬৪

ই সেকুলি দাসী কোন কুলিকে যাস বেশী,
তিন লি এ তিনটি দাসী হে কোন কুলিকে যাস বেশী।
বঁধুর আদর বেশী, বঁধুর গায়ে কপি পাত চাদর দেখি॥ —ঐ

মধ্যে মধ্যে টুসু গানে রাধাকৃষ্ণ প্রেম-প্রসঙ্গও স্মরণ করা হয়।

৬৫

যেখানে পোহালে নিশি সেখানে করি গমন,
লম্পটক শঠ, বঁধু, জানা গেল তোমার মন।
ওহে, বঁধু, কালিয়া বরণ, কপট বোঝা গেল তোমার মন।
পোষ পরবে বাপ ঘরে যাব,
শ্বশুর ঘরের মোটা কাপড় না নিব।

একলা ঘরে জঞ্জাল ভারি, করতে ধরতে না পারি,

পোষ পরবে যেতে দিব না, মিনার মা, দিব শাড়ী, ভাবিস না। —ঐ

পৌষ পরবই কৃষি-বাংলার জাতীয় উৎসব। এই পর্ব উপলক্ষে পিত্রালয়ে যাইবার কামনা গ্রাম্য রমণীদিগের মধ্যে দুর্বার হইয়া উঠে। স্বামীর নানা অনুরোধ এগং প্রতিশ্রুতিতেও পত্নীর মন হইতে পিতৃগৃহাসক্তি দূর করা যায় না।

৬৬

সড়পে সড়পে যাব আমরা সড়প বাঁধাব,
নীচে দিব হাঁসা পাথর উপরে সিকি ছড়াব।
কানে কুণ্ডল নাকে নাকছবি দুলে,
যেন টুসুর গলায় হার দুলে। —ঐ

দুর্গোৎসব পল্লী বাংলার জাতীয় উৎসব নহে, টুসু উৎসব সীমান্ত বাংলার জাতীয় উৎসব।

৬৭

টুসুর পরব এসেছে ঘরে,
শাঁখাশাড়ী কোমরবেড়ী কানে দুল দাও এইবারে।
টুসুর পরব এসেছে ঘরে।
আলতা ফিতা মাথার কাঁটা পা সাজাব নূপুরে।
টুসুর পরব এসেছে ঘরে।

৬৮

আয়, সজনী, ডুব দিব জলে, টুসুর পরবে হরিবোল বলে,
আয়, সজনী, ডুব দিব জলে।
ডুবে যদি যাও, সজনী, হাত ধরে নিব তুলে।
টুসুর পরবে হরিবোল বলে। —ঐ

৬৯

আমার টুসু চাষ করেছে ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু,
বেছে বেছে কামিন করবে দাঁত কালো কাঁকাল সরু। —ঐ

৭০

বাড়ীর নামই কলাগাছটি কেটে করবো কলগাড়ী,
কলগাড়ীতে চেপে যাব ডাক্তার বাবুর ঘরবাড়ী।

এসো ডাক্তার, বসো খাটে টুসুর হাত দেখ ঘড়ি ঘড়ি,
আমার টুসু ভাল হলে হাতে দেব চ্যান ঘড়ি। —ঐ

৭১

যখন আমি গৃহকোণে গো তখন ও বাজায় বাঁশী,
ওরে বাঁশী বিনয় করি, বাজ না দিবানিশি।
রাধা নামে বাজ না দিবানিশি তোমায় বিনয় করি —ঐ

৭২

আস না তোরা বস না কাছে গো, আর আমাদের কে আছে,
আবাল কালে মা মরেছে, প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
আদরের মানুষ গেছে যমের দুয়ার। —বেলপাহাড়ী

৭৩

কাশীপুরের বাসি কাপড় রাখলি, মা, যতন করে।
আমরা দু বোন মরে গেলে কাঁদবি, মা, গলায় ধরে॥
বিজলি পোকা মাছের ভিতর. মাছ বিকায় না লো বাজারে —ঐ

৭৪

বনে ফুটে তিলা ফুল, মা, বনকে করে আলা।
ঘরের সাফা ঝিউরি ছেলে ঘরকে করে আলা॥
বিদায় দে, মা, তোর জামাই যাছে॥ —ঐ

৭৫

মাথা গুঁজে রইলাম বসে আর আমাদের কে আছে,
দূরদেশে মা বাপ আছে, প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
ধিকি ধিকি প্রাণ কাইন্দ্যা উঠে, আমি প্রাণ জুড়াব কার কাছে॥—ঐ

৭৬

বিহা যে দিলি, মা গো, বড় নদীর সে ধারে।
এত বড় পোষ পরবে রাখলি, মা, পরের ঘরে॥
মা গো, আমার মন কেমন করে।
যেমন শৈল মাছে উফাল মারে॥ —ঐ

৭৭

জরিতলাতে শ্যামের বাড়ি শ্যাম দিল সিলক শাড়ি ॥
শিশিরে ভিজিল শাড়ি এই মতে ছাড়াছাড়ি ॥ —ঐ

৭৮

আমার টুসুর একটি ছেলে মানবাজারে শ্বশুর ঘর,
পালকির উপর কলকি রেখে পালাই আসিল বাপের ঘর
পালাই আইলি ভাল করলি আর ত বিদায় দিব না,
জামাই এলে ঝগড়া করব লাজের বালাই রাখব না। —ঐ

৭৯

যুগ স্বাধীন এবার,
মেয়েরা সব করছে স্যাণ্ডেল ব্যবহার।
কলির মেয়ে স্বাধীন হলো গো সতীত্ব আর রাখল না,
নিজপতি ত্যাজ্য করি উপপতি ছাড়লো না।
যুগ স্বাধীন এবার,
হাল ফ্যাসানের নর-নারী গো দেখি অতি চমৎকার।
ঘোমটা খুলে চশমা চোখে হিমানী করে ব্যবহার।
সামনে সিঁথি উলটে দিয়ে গো বামে টেরি ঘেরা সবার,
দয়াল এখন ভাবছে বসে সংসার হল অসার। —বেলপাহাড়ী

আধুনিকা বিলাসিনী নারীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া গানটি রচিত হইয়াছে।

৮০

মাগো, আমি ফুল পাতাবো ফুলকে আমার কি দিবো
বাজার যাব পইসা পাব ফুলকে ফুলাম তেল দিবো।
ভালবাসা রাখতে পার কৈ।
যেমন চটকে গেল জুনার খৈ ॥ —ঐ

৮১

মেঘলি আন্ধার জ্যোছনা রাতি দেয়র আমার যায় কোথা,
খয়রা চাদর মালুম নাই করি, দেওর বিনে ঘরে নাই রহি। —ঐ

৮২

ভালবাসায় বলেছিল পৌষ মাসে কাপড় দিব।
পৌষ ফুরালো মাঘ ফুরালো তবু কাপড় দিল না॥
ভালবাসার আশা করব না।
কাপড় দিলেও কাপড় পরব না॥
মুচকি হাসি ছাড়ব কেমনে।
দেওর, বলে দে, ভাই, আমারে॥ —ঐ

৮৩

বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার।
তরা নামিস না লো খবরদার॥
কত রঙ্গ করে শ্যামরায়।
শ্যাম দেখিলে হাসি পায়॥ —ঐ

৮৪

বাঁশি বাজছে বাঁধের আড়ালে
তার কিনারায় যাব কি করে।
শুনলে বাঁশি মন কেমন করে॥
বাঁশি রাধা রাধা রাও করে।
শুনলে বাঁশি মন কেমন করে॥ —ঐ

৮৫

ঝুনঝুনি শাক তুলতে গেলে খাইলো তিতি সাপে।
ডাকি দে লো শ্যাম কোথায় আছে।
ওষুধ খাব না তোর হাতে॥ —ঐ

৮৬

বিয়া যে দিলি, ভাইরে, বড়ো নদীর ওধারে।
এত বড় পোষ পরবে রাখলি ভাই রে পরের ঘরে॥
এখন মন কেমন করে।
উড়ে গিয়ে বসব, ভাই, মাইঝা ঘরে,
এখন মন কেমন করে। —ঐ

৮৭

সর্ষা ফুলটি থুপি থুপি হলুদ বলে বেঁটেছি।
ও শাশুড়ী, গাল দিও না, পাশা খেলতে বসেছি।
পয়সা দাও, শাশুড়ী, তোমার ব্যাটা বেছেছে যশম চুড়ি॥ —ঐ

৮৮

ছেল্যা ছেল্যা কর, টুস্থ, তোমার ছেল্যা হবে না॥
পরের ছেল্যা ধরে মারো ছেল্যার বেদন জান না॥
ও লো রাইকেশরী, ঘোড়ায় চেপে আসছে লো আদায়কারী,
ওগো রাইকেশরী। —ঐ

৮৯

এক গাড়ী কাঠ দু-গাড়ী কাঠ তিন গাড়ী কাঠ চালাবো,
যখন আগুন পয়গল হবে তোদের টুস্থকে ঠেলে দেব।
জোড়া পানের খিলি গত নিশি মুখে ভরা ছিল। —ঐ

৯০

উচিত কথা বলব গো তোমারে, ও তুই রাগ করিস না আমারে,
দুনিয়ায় বল কে কাহার গো করলে তুমি আমারে॥
কত করি বলি তোরে যেও না বাপের ঘরে,
বলা কথা ভুলে গিয়ে ভাবলি না তুই আমারে—
সকল কথা ভুলে গিয়ে আসবিরে তুই মকরে।
টুস্থর গানে মনভোর ভোলে, হবে দেখা মটরে॥ —ঐ

৯১

ই বছরের নামি বরষা চাষী দুখী চাষ করে,
এই লে গাঁয়ের খালভরারা আড় কাঠে খুঁগি আড়ে।
মকর পরবে—
তোরা রা কাড়িস্ না গরবে, টুস্থর পরবে॥

৯২

বাতাবনে কে গো সতী আছে গো, এনেদে এক ঘটি জল,
ঐ সে জলে বাঁচাব রাধার পতির পরাণ,
ঔষধ বাটি বাঁচাব রাধার পরাণ পতি,

করো মালা বদল, করো মালা বদল
কেন বিয়ে হবে না খুলে বল,
এনে দে এক ঘটি জল।
রাম গেছেন মৃগ শিকারে
বলত কখন দেখি,
নববৃন্দাবনে কিসের মজা লুটেছে
যুগল মিলনে, কর মালা বদল,
এনে দে এক ঘটি জল। —ঐ

রামায়ণ-বিষয়ক

রামায়ণের বিষয়ও নানাভাবে টুসু গানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পল্লী বালিকাদিগের উপর রামায়ণের কাহিনী কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাদের মধ্য হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

১

রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া তপোবনের কাননে।
লবকুশে ধরেছে ঘোড়া সীতা বলেন দাও ছেড়ে।
সোনার বরণ সীতা রইবেন কেমনে ?
রাম কি যাবেন বনে ?
এসো এসো, লক্ষ্মণ দেওর, রামের খোঁজে যাও দেখি,
রামলক্ষ্মণ দুই ভাই তারা বনফুল খায়,
সীতা দিলেন বালির পিণ্ড দশরথে।
সোনার লঙ্কা পোড়াল হনুমানে সীতার অন্বেষণে। —বাঁশপাহাড়ী

রামায়ণের কাহিনী পল্লী বালিকার কল্পনায় কেমন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে।

রাসমেলা দুগ্‌গা ধুলা সে সকল মনে পড়ে,
পোষ মাসেতে টুসুর গানে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে,
ও সই, কলি যুগে অন্য পুজা কি আছে টুসুর আগে? —ঐ

রান্নাঘরে যখন থাকি শ্যাম ডাকে বাঁশীর স্বরে,
যমুনায় জল আনতে গেলে আঁচল ধরে টানে।
শুনলে বাঁশী মন কেমন করে,
বাঁশী রাধা রাধা রব করে ॥ —ঐ

৪

একটা চুলে খেঁজুর ঝুঁটি নামল নদীর মাঝখানে,
সাঁতার দিয়ে উঠে যাব ঘাগরা নদীর মাঝখানে।
দেগো, তোরা ঘাগরা পার করে
আমার বনকে দেব পার করে ॥ —ঐ

রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড়া তপোবনের কাননে,
লবকুশে ধরেছে ঘোড়া সীতা বলে দাও ছেড়ে,
বিনা যুদ্ধ বিনে ॥
রামলক্ষ্মণ হেরে গেল দুজনে, বিনা যুদ্ধ বিনে ॥ —ঐ

৬

কাশীপুরের মেলা যাবো সেই করে টুসুর পুজো,
থালায় সাজা সিদ্ধি খেজা হাতেতে ফুল বাতাসা। —ঐ

৭

রাম রাজা হবার সাধ গো পরজা পালিবারে গো,
কৈকই রাণীর সতাই বন্দী রাম বনবাসে গো। —ঐ

৮

ও রাম, যাও হে বনে, আর বসিতে হবে না সিংহাসনে,
ও রামের মা, রামের মা, দেখ গো রামের দুর্দশা,
ওগো, বস্ত্র বিনে গাছের বাকল, তেল বিনু মাথা জটা,
ও রাম, যাও হে বনে।

৯

উপরে রবির তাপ, মা গো, তলে তাতা বালি গো,
চলিতে না পারে সীতা করিছে বিজলী গো।

বিধি এই করিলে মোর কপালে নিবাস লিখি দিলে।
ভাঙ্গিয়ে তরুর ডাল, মা গো, লক্ষ্মণ ধরে ছিলে গো,
ওগো, তাহার ছায়াতে সীতা চলেন ধীরি ধীরি গো,
বিধি এই করিলে। —ঐ

১০

মালা দিব মালা দিব লিব লো চান্দের মালা,
একা চাঁদে জগৎ আলো কি হবে চান্দের মালা,
মধুসূদন, চান কোথায় পাব, গাছের ফল নয় যে তুলে দিব। —ঐ

১১

ষোল ঘড়ি রাত্রে, টুসু, ষোল পুজা থালে গো,
এক পুজো লাইগে, টুসু মা, দরিয়ায় ঝাঁপ দিলে গো। —ঐ

১২

নাম ধইর‍্যা বাজায় গো বাঁশী বইলে দিব রাধাকে,
বারণ করে দিব শ্যামের বাঁশী বাজাতে, ওগো ললিতে। —ঐ

১৩

অশোক বনে পাতার কুইড়্যা সীতা পাশা খেইল্যাছে,
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতাকে হইরে নিয়াছে।
ও রাম জটাধারী,
বনে গেলে কেমনে ধৈর্য ধরি।
ও রাম জটাধারী! —ঐ

১৪

চাঁদকে যেন তারায় ঘেরে এমনি ঘেরেন গোপীগণ,
এমনি কইরে ঘিরে রাখবে টুসু ধনের শ্রীচরণ, বাঁকা মদনমোহন,
মকর দিনে হয় যেন যুগল মিলন। —ঐ

১৫

অশোকবনে পাতের কুঁড়ে সীতা পাশা খেলেছে।
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরে নিয়েছে।
রাম নাকি রে বনে যাবি, হাতে নেরে গণ্ডীবাণ,
চোদ্দ বছর বনে যাবি চেয়ে নেরে মায়ের প্রাণ।

রাম ছেড়েছে যজ্ঞোর ঘোড়া তপোবনের কিনারে,
লব-কুশে ধরেছে ঘোড়া সীতা বলে দাও ছেড়ে ॥ —ঐ

১৬

বড় বান যেওনা, টুস্থ, চারি কূল ভরেছে গো,
চার নয়নে চেয়ে দেখো কত যাত্রী যাইছে গো।
যাত্রী দিগকে পরে করিলে নিব আনা আনা।
টুস্থর মাকে পার করিলে নিব কানের সোনা ॥ —ঐ

১৭

রাম গেছেন মা মিরগ্ মারতে পথে পেলেন জোড়া বেল,
কোথায় ছিলেন দুষ্টু রাবণ রামের বুকে মারলো শেল।
ও রামের মা, ও রামের মা, রাম কেনে ধূলায় পড়ে,
রামের মা যে অভাগিনী ধূলা ঝেড়ে নে কোলে। —ঐ

১৮

অশোক বনে পাতের কুঁড়ে সীতা পাশা খেলেছে,
মুনির বেশে রাবণ এসে সীতা হরণ করেছে।
হরণ করলে ভালই করলে রাখবে সীতায় যতনে।
সোনার লঙ্কা ছারখার করবে একাই হনুমানে। —ঐ

১৯

অশোক বনে কানছ সীতা অশোকেরই ডাল ধরে,
কাইন্দ না, কাইন্দ না, সীতা, তোমার রাম আসবে ফিরে ॥ —ঐ

২০

গাছের ওপর ছিলে বসি তুই কি হনুমান।
হনুমান নই আমরা বোঠি ভগবান ॥ —ঐ

২১

পোড়া কাঠের রাবণ লেখা, রাম শুইধাছেন সীতাকে,
এখনো ভুইল না, সীতা, দশমুণ্ডু রাবণকে ॥ —ঐ

২২

উঁচু পিঁড়া খড়ম পায়ে উঠতে লারে রামধন,
উছল না কেমন করে চৌদ্দ বছর যাবে বনে ॥ —ঐ

২৩

রাম ছাড়িছে যজ্ঞের ঘোড়া সীতা বলে দাও ছেড়ে,
ছাইড়ে দেরে যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়ি দে আপন মনে।
অভাগিনীর ছেইলে তোরা মরবি রামের বাণে। —ঐ

২৪

রাম যাইছে গো রাজ্য লিতে তপোবনের কাননে,
লড়াই দিতে লারল রামে তোমায় দিল বনবাসে।
বনবাসে লিল রাবণ বনে রাইখ্য যতন কইরে।
দু'দিকে দুটো মুড় (মুণ্ডু) পড়েছে রক্তধারা বইছে॥ —ঐ

২৫

রাম যাইছেন গো মৃগ মারতে তপোবনের কাননে,
বার বছরে রামেরে চোদ্দ বছর বনবাস।
ওরে রাম, ওরে কেবা রামের মুখে মারলি বাণ,
বুকেতে বঁড়শীগাড়া মুখে যাচ্ছে রক্তবান॥ —ঐ

২৬

আয় মা জলদি, আয় মা জলদি, রাজদরশন পায় যদি,
চল রামের দেখা করি, ও রাম সাজিছে বনে॥ —ঐ

২৭

রাম পুড়িলে লঙ্কাতে গো রাম পুড়ি ডাহান হাল।
নাড়ে না চাড়ে না রামকে লালচরণ উইঠে গেল॥ —ঐ

২৮

কে গো সংসারে সতী কে আছে সীতাপতি।
সতী বসে অশোক বনে রামের মুখের স্বপ্ন দেখে॥ -ঐ

২৯

দশমাস গর্ভ যখন গা হইল অঙ্গ ভারি,
কি করি কি করি, রামেরে কহ না আমায় শুনি॥ —ঐ

৩০

একশ' পুত্র রাবণের চুয়াল্লিশটি লাতি।
সেও পুত্র না রহিল স্বর্গে দিতে বাতি॥ —ঐ

৩১

এ মিনতি করি আমি একটি পুত্র না দেখি,
আর জল খাবার আশ করি না মুখে যেন অগ্নি পাই। —ঐ

৩২

এ মিনতি করি আমি কাঁদিতে জনম গেল,
রামের সঙ্গে বিহা দিয়ে জমন দুঃখে দিন গেল।
লঙ্কাতে পার হইল রাবণ সে তো মাঝির বেশে।
এ জীবন না ঘুচিলে এ দম ঘুচাবো কি সে?

৩৩

কেন মরবি রাবণ,
রামের নারী সীতারে ক'রে হরণ।
মানুষ নয় রাম রঘুমণির পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।
ভাব অবতার তার রূপে করিতে দুষ্টের দমন॥

৩৪

পিতৃসত্য পালিবারে যে বনে রামের আগমন,
সঙ্গে সীতা জনক সুতা শ্রীরাম নন্দন ভাই দু'জন॥ —ঐ

৩৫

ছিন্নভিন্ন লঙ্কা শূন্যরে হলি ও তোর ঐ কারণ।
বাটল বলে, বাঁচবি যদি করিস না সীতা হরণ।
কেন মরবি রাবণ॥ —ঐ

পাঁচালী

বাঁকুড়া জিলার তিলুড়ি গ্রামের এক কৈবর্ত বালিকার নিকট হইতে নিম্নোদ্ধৃত সুদীর্ঘ টুসু গানটি সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রকার দীর্ঘ টুসু গান টুসু গানের সাধারণ নিয়মের একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। ইহা টুসুর পাঁচালী।

১

টুসু যায় মা হেলে হেলে আমরা যাই মা জলে,
টুসুর সঙ্গে করব দেখা, খেল্ কদমের তলে।

যখনি জন্মিলে গোপাল দৈবকীর উদরে গো
হেনকালে শ্রীরাধিকা পড়্যে গেল মনে।
না কর জঞ্জাল কৃষ্ণ, যারে অতি দূরে,
এখনি মথিয়ে ননী আগে দিব তোরে,
না শূন্যে না শূন্যে কানাই মায়েরি বচন,
হামাগুড়ি দিয়ে ধরে মায়ের চরণ।
কৃষ্ণের কথা শুনে রাণী পসরা নামাল্য
মথনিতে কর্যে ননী মথিতে বসিল।
মা যশোদা ঘোল মইছে, কৃষ্ণ ননী তুলে খায়,
কি কর্যে ফিরাব আঁখি পাছে কৃষ্ণ পায়।
শিকার উপর ভাণ্ড রেখ্যে রাণী বলেন তায়ে।।
যে উপায়ে কৃষ্ণচন্দ্র নাগাল না পায়ো।
কৃষ্ণরে না ননী দিয়ে রাণী গেলেন জলে,
শূন্য ঘর পাইয়্যে কৃষ্ণ ননী চুরি করে।
কতক্ষণ বাদে দেখতে পান কুটিলারাণী,
তাড়াতাড়ি যেয়েং বলে, কুথায় নন্দরাণী।
ও তোর গোপালের দৌরাত্মিতে বাস করিতে পারিনা আমি॥
কুথায় ছিল কালো ছোঁড়া প্রবেশিল ঘরে,
শিকার উপর ননীর ছাবা খাইল চুরি কর্যে।
শিকার উপর ননীর ছাবা সে কি কর্যে নাগাল পায়,
দেখ্ আস্তে, মা নন্দরাণী, আবার ননী পেড়্যে খায়।
সেই কথাটি শুনে রাণী প্রবেশিল ঘরে,
তাড়াতাড়ি আস্তে বলে, কুথায় নন্দরাণী।
আমারি বেজেতে কানাই কি অভাবে আছ।
পরের ননী চুরি করে খেত্যে বা শিখ্যেছ।
আজিকারি ননীচোরা ঘুচাব সত্বরে,
যুথায় যাবে তুথায় যাব বাঁধিব তোমারে।
সেই কথাটি শুনে কৃষ্ণ পালাল্য দূরেতে।
এবারেতে নাগাল পেলে প্রাণে বধ্যে দিব।

সেই কথাটি শুন্যে কৃষ্ণ কদম্বেরি ডালে,
নন্দরাণী বলে, কি যে বাছা পাছে পড়ে,
নাবাবি তো নামরে কৃষ্ণ দিবরে ফুল পেড়্যে,
তিলমাত্র না দেখিলে গোকুল আঁধারে,
লুলুপুতু কর্যে কৃষ্ণ নামালেন তাহারেং।
হাতে ছিল ছাঁদন দড়ি বাঁধিলেন কৃষ্ণরে,
ছাঁদনা বাঁধনা মাগো বন্ধনাতে মরি,
নগরেতে ভিক্ষে কর্যে শুধব ননীর কড়ি।
হাতে আছে তাড বালা নিয়ে যা মা ঘরে,
পরের মাকে মা বলিব নবনীরই তরে।
ঘরে হচ্যে ননী, কৃষ্ণ, তুই হলি পরে,
পরের মাকে মা বলিবি নবনীরই তরে।
কৃষ্ণ যেছেন ঠেকা রথে শ্রীদামেরই সনে,
হেনকালে শ্রীরাধিকা পড়ে গেল মনে।
সখীও নাই দূতীও নাই, কি নিয়ে বা যাব,
শ্রীরাধিকার কুঞ্জে যেয়ে নাপিতানী হব।
বাঁ হাতে দুবুড়ির ঠেকা হস্তেতে নরুণী,
ধীরে ধীরে যান প্রভু যথায় বিনোদিনী।
কে আছো গো ঘরে তোমরা বিনোদিনী রাই,
আলতা দিবার জন্য নাপিতানী যাই।
কুথা হত্যে এলে নাপতান কুথায় তোমার বাড়ী,
এমন নাপিতানী কুথা দেখি নাই বলি।
কত কড়ি লিবি নাপতান, কত কড়ি লিবি,
ছ' বড়ি, ন' বড়ি কড়ি আগগ্যে গুণে দিবি।
যেজনে পরিবেন আলতা, তাহারে পরাব,
অষ্ট সব সখিরা বলে, কেউ না পরিব।
কুঞ্জে আছেন শ্রীরাধিকা, তাহারে পরাব,
বৈস গো কমলিনী, রাই, কমলারি সনে,
আলতা পরাবেন কৃষ্ণ বসগো তার সনে।

দক্ষিণেতে বাড়াই দাও, রাই, পা অঙ্গখানি,
আলতা পরায়্যে দিবে, ওগো নাপিতানী।
ধীরে ধীরে চাঁছেন প্রভু বাঁ অঙ্গখানি,
ভাবেন মনে মনে আপনার নামটি তখন লেখিলেন চরণে।
ওগো ওগো নাপিতানী, কী কার্য করিলি,
আমাদের বঁধুয়ারি নামটি খুঁজে কুথায় পেলি।
ওগো ওগো, নাপিতানী, খালি আমার মাথা,
আমাদের বঁধুয়ার নামটি খুঁজে পালি কুথা।
ওলো ওলো, নাপিতানী, কি কার্য করিলি
আমাদের বঁধুয়ার নামটি চরণে লিখিলি।
জল এনে দে গো সখি, আলতা ধুয়্যে দিব,
আমাদের বঁধুয়ার নামটি চরণে না রাখিব।
আলতা ধুয়া গেল সখি, নামও না ঘুচিল,
কী কার্য করিলি নাপতান, কি কার্য করিলি।
আমাদের বঁধুয়ার নামটি বুকেতে লিখিলি।
জনম জনম যেমন তুমার সখা হই,
এই কলঙ্ক নামটি আমার ঘুচাই দাও, ভাই। —তিলুড়ি (বাঁকুড়া)

টাটানগর

আসন বনি আনাগোনা মুসাবনের কারখানা,
বিবি সাহেব মরে গেলে কে চালাবে কারখানা।
বিনা তেলে জ্বলবে সারা রাতি,
টাটার বিজিলি বাতি। —ঐ

২

টাটা বড় লোহার কোম্পানী।
বিদেশে যাচ্ছে লোহা চালানি॥
বাদাম পাহাড় গুরমাইসিনির মাল হচ্ছে, ভাই, আমদানী।
টাটা কোম্পানী গোলাই করছে লোহার আমদানী॥

লোহার পরে লোহা করে, ইস্পাত লোহা চালানী।
এত বড় লোহার খনি, ভারতে কোথাও না জানি ॥
বোম্বাই বাস আছে তার কোম্পানীর নাম তাই জানি,
টাটা জামসেজী নাম ছিল ভাই, ভূগোল লেখে বিজ্ঞানী।
কত 'লেবার' করছে কাম যে তায় আছে কত বিজ্ঞানী,
পাড়াগাঁয়ের মনোবোধ কবির নূতন গানের আমদানী ॥ —ঐ

৩

টাটানগর বারি ময়দানে।
প্রতিমা দেখলি কত নয়নে ॥
বিজয়া দশমী দিনে প্রতিমা আছে লাইনে।
ছত্রিশ নম্বর প্রতিমাটি দেখলি বড় 'ফাইনে' ॥
বন্ধুর সঙ্গে গিয়া মোরা পড়েছিলাম পেমবানে।
ভরা নদীর বানের মত, ঠেলে মোদের দুইজনে।
সাকচি হাতে আশা দাও হে, টাটানগর স্টেসানে।
নারীগণের হাতে ধরা, দেখলি কত লাইনে।
মনোবোধ কবি গাইছে মোদের গেঁয়ো ভাষা টুসুর গানে ॥

—বাঁশপাহাড়ী

৪

টেলকো টাটার লোহার কোম্পানী।
কত নূতন জিনিষ আমদানী ॥
নূতন জিনিষ তৈরী হবে, আসছে কত বিজ্ঞানী।
হাজার ফিটের ঘর করি তাই, চার ধারে দেয় ছাহনী ॥
কালে কামে শুনছি আমি, আমেরিকার বিজ্ঞানী।
খাঁটি লোহার জিনিষ করে, বিদেশে দেয় চালানি ॥ —ঐ

ঝিঙাফুল, সাঙাই যাব এইবারে,
আর থাকব না পুরুষের ঘরে।
সাঙাই হয়ে চলে যাব টাটানগরে ॥

ত্রৈলোক্য বলে সাঙার দিনে খাওয়াবে রে আমারে,
পেট ভরে দেয় না খাতে দিনে ঠুকে আমারে,
থাকব না আর পুরুষের ঘরে ॥ —ঐ

টাটা কোম্পানীতে স্ত্রীলোকেরাও কাজ করে, তাহাদের স্বাধীন উপার্জনের ক্ষমতা হইয়াছে বলিয়া এখন আর তাহারা দাম্পত্য জীবনের দাসত্ব বন্ধনকে স্বীকার করিতে চাহে না, স্বাধীন জীবিকা অর্জন করিয়া ইচ্ছামত থাকিতে চায়।

৬

থাকব না আর পুরুষের ঘরে,
ঝিঙ্গাফুল, সাঙ্গাই হব এবারে।
সাঙ্গাই হয়ে চলে যাব থাকব টাটানগরে।
পেট ভরে দেয় না খেতে নিতিই টুকে আমারে,
তেলক বলে সাঙ্গাই দিনে খাওয়াবি রে আমারে
ছোটই বিয়ে দিলি, মা, কেনে।
(আমি) ঝাঁপ দিব জোঁড়ের বানে। —ঐ

৭

টাটার বাজার [illegible]না ধূপে শাড়ী সান বাঁধা,
দুধারে দুজনা সিপাই মধ্যে কলের ঘোড়া।
আর যাব না টাটার বাজার।
গাড়ী আসছে হাজার হাজার।
আর যাব না টাটার বাজার ॥ —ঐ

প্রেম

কতকগুলিকে টুসুগানকে প্রেমবিষয়ক টুসু গান বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। লৌকিক প্রেমের অনুভূতিই ইহাদের মধ্য দিয়া প্রধানতঃ ব্যক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলের ঝুমুর গানের ব্যাপক প্রচারের জন্য রাধাকৃষ্ণের নামের উল্লেখ ইহাদের মধ্যে থাকিলেও ভাগবতের চিত্র অনুসরণ করা হয় নাই। রাধাকৃষ্ণ সাধারণ নায়ক-নায়িকা মাত্র। অনেক সময় ইহাদের ভাবের গভীরতা বিস্ময়কর।

১

শুন, ওহে শ্যামধন, আর যদি না দিয়াছ মন,
যেদিন হতে প্রেমের হাটে গেছি,
বঁধু হে, আমাতে কি আর আমি আছি।
কিবা যারে দিয়ে মন পেয়েছি পিরিতি ধন,
কুলমান সকলি সঁপেছি।
বঁধু হে, আমাতে কি আর আমি আছি।
যেদিন হৈতে মন হইল আপন
দিনু কয় দায়ে পড়েছি,
বঁধু হে, তোমাতে কি আর আমি আছি। —ঐ

২

এত রেতে তাড়াতাড়ি যাবি হিমাম্ কার বাড়ী,
ভেঙ্গে যাবে তোমার বাঁকা টেরী।
পেড়ে রেখেছি মাহুরীখান, ভেঙ্গে রেখেছি বাটারি পান,
বন্ধু আসিবে যাইবে [illegible] াসিবে,
খেয়ে যাবে শ্যাম বাটারি [illegible] কত —ঐ

৩

ওহে ও বিদেশী, এবার আমার করতে হবে মন খুসী।
টুসু পুজার আসছে বাজার মনে আনন্দে ভাসি।
আমায় দিতে হবে জোড়া তাবিজ,
শেমিজ আর তেলের শিশি।
গত বৎসর পাই না কিছু তারে দুঃখ প্রকাশি।
আমার কেঁদে কেঁদে দিন গিয়েছে,
জানে সব দেখন হাসি, ওহে, ও বিদেশী। —ঐ

৪

আজিকার স্বপনের কথা শুন গো, দিদি রোহিণী,
কদম তলে অগম জলে ডুব্‌ল গো লীলমণি।
আজের মত তোরা যা, ভাই, চলে ঘর মুখী।
আমার খুয়ান গেছে লীলরতন॥ —ঐ

নিশির শেষে আইলে, হে বন্ধু,
চোখে কিসে ধরল।
ঘুমে আঁখি ঢুলু ঢুলু নয়নে নয়ন হেরি।
ও বাঁকা বংশীধারী,
কালা, তোমার সকল কথাই চাতুরী॥ —ঐ

নাম ফটক কুঞ্জির ধারী,
কে তুমি দাঁড়ায়ে আছ পরবেশে।
যে পথে এসেছে তুমি সে পথ ধরি চইলে যাও
নইলে তোমায় রাখব না পরাণে,
তোমায় ডুবাব গঙ্গার নীরে।
ও বাঁকা বংশীধারী,
কালা, তোমার সকল কথাই চাতুরী॥ —ঐ

ভেবো না গো, ও রাই কিশোরী,
ফিরাই আনব গো বংশীধারী।
যদি না আনিতে পারি কেনে বৃন্দের নাম ধরি,
তোমার রাধার নামের জারি আমি গো তারে ধরি।
তিলক বলে চরণতলে রেখো আমায় কিশোরী,
ভেবো না গো, ও রাই কিশোরী। —ঐ

কে বাঁশী বাজায় গো বিপিনে
আমায় মন প্রাণ নিল টেনে।
অন্তরে জর জর ধৈর্য ধরি কেমনে।
চেয়ে রইতে নারি ভুবন. সখী কর গো মানা,
কে বাঁশী বাজায় গো বিপিনে,
আমার মন প্রাণ নিল টেনে॥ —ঐ

করেছিলাম মানা,
বলি টুসু প্রেমের শশা খেয়ো না।
সামান্ত আস্বাদ পেয়ে আমার নিষেধ শুনলে না।
এখন নাকে মুখে ঝরছে বারি পাচ্ছ কেমন যন্ত্রণা ?
প্রেমের জোড়ের বড় কষ্ট বড় টুসু লাঞ্ছনা,
এতে বিরহ বিকার ঘটিলে আর ত প্রাণে বাঁচবে না,
কোরেছিলাম মানা। —ঐ

১০

যমুনার জল আনিতে যেয়ে,
বড় ভয় লাগে বন্ধু—বড় ভয় লাগে।
কি জানি কেউ আছে ঘাটে,
চমকি লাগিল আমার যৌবন বয়সে।
যৌবন বয়সে আমার যৌবন বয়সে।
কি জানি তোর কুল গো যাবে আমি যাই।
জানি ও তোর অল্প বয়সে—অল্প বয়সে।
আমার অল্প বয়সে কি জানি কেউ আছে ঘাটে।
চমক লাগলি আমার যৌবন বয়সে॥ —ঐ

১১

যমুনার জল আনিতে যায়ে শ্যামের সনে,
দেখা, বন্ধু, শ্যামের সনে দেখা।
আজ বলিব কাল বলিব পরশু দিব কথা. বন্ধু,
আজ কেন মন গঁসা, বন্ধু, আজ কেন মন গঁসা।
রাস্তার মাঝে দাঁড়াই একা বলিব,
দুঃখের কথা বন্ধু বলিব দুঃখের কথা।
সরোবরয় জল শুকাইল পদ্মপাতের ছায়া,
রাস্তার মাঝে দাঁড়াই একা বলিব দুঃখের কথা, বন্ধু,
আজ কেন্ মন গঁসা।

হেন জয়চাঁদ বাউলে বলে কেন এমন দশা,
বন্ধু, কেন এমন দশা।
রাস্তার মাঝে দাঁড়াই একা বলিব দুঃখের কথা —ঐ

রাজনীতি

সমসাময়িক নানা রাজনৈতিক ঘটনাও টুসু গায়িকাদের উপর নানা প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গানের মধ্য দিয়া তাহার অভিব্যক্তি দেখা যায়। তবে নিজেদের গ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যাহা জড়িত, তাহার প্রতিই তাহাদের কৌতুহল, কোন আন্তর্জাতিক কিংবা জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনা বিষয়ে তাহাদের কোন কৌতুহল নাই। অনেক সময় কলিকালের দোষ-কীর্তনও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

১

গোকুল ঘোষ ফরেষ্টার ছিল, শিশির বিনয় 'গাড়' (গার্ড) হল,
সবাই মিলে যুক্তি করে ঘরগুলান ভেঙ্গে দিল।
করব মামলা করো না মানা,
আমরা ডরাই নাকো জেলখানা॥ —ঐ

এখানে একজন সরকারী বন-বিভাগের কর্মচারী এবং তাহার সহকারীর বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২

গ্রামেতে পঞ্চায়িৎ রাজ হলো।
কত টাকা মোদের বাঁধলো॥
আদালতে যাব না আর,
সেও কি নয় আমাদের ভালো।
গাড়ী ভাড়া, মটর ভাড়া,
খাই খরচা সব বাঁচিল॥ —ঐ

৩

উকিলবাবু, পেসকারবাবুর, কত টাকা কমিল,
হাকিমবাবুর বড়ই মজা, কোর্টে বসতে না হলো,
কেবল মাত্র পাঁচসিকা দিলে, পঞ্চায়িতে 'কেস' নিলো॥

সরপঞ্চ সুখিরায় খাঁটি বিচার করে, আমাদের রাই দিনে,
পাড়া গাঁয়ের মনবোধ কবি টুসু গানে লিখিলো।
টুসুর গানে প্রাণ মাধুরী, দ্বিতীয়ায় সে ছাপালো ॥ —ঐ

৪

কলি কালের বৌ বিটি, সকাল হলে পরিপাটী,
আরশীটি দেখে তারা জলে মুখ দেয়।
দেশের রীতিনীতি বুঝা দায়, গো সখি,
নারী দেখে পরাণ ফেটে যায়।
ছো-ছড়া সকল ভুলি, সকাল হলে চায়ের কেটলি,
তাদের খাওয়া-ই আর পরা-ই,
এমনি চায়েরি নেশা, তারা মুখ ধুয় না, সখী,
নারী দেখে পরাণ ফেটে যায়,
সিলিক শাড়ী আর ফর্দি শাড়ী পড়ল কুচ করি।
তাদের সায়াটি দেখায়, নারী দেখে পরাণ ফেটে যায়।
খাওয়ায়রে পাগলের গোড়া, পতিকে করেছে ভেড়া,
শ্বশুর ভাসুর মানে না তারা, উদাম হৈয়া বেড়ায়,
ভোরের বেলা যাইয়া দেখ জলের ভিতর শুকতারা।
ধরব ধরব মনে করি, অধর দাকে দেই ধরা,
মনের মন চোরাধন, এত করে পেলাম না হে, তোমার মন। —ঐ

ঘোর কলিকাল হয়েছে রে, ভাই,
ঝিঙ্গা ফুল কারে বা বলে জানাই।
মদ মুরগী সবাই খাচ্ছে জাতের বিচার করছে না।
জুতা পায়ে লুঙ্গি পরে চেয়ারে বসে খাচ্ছে ভাত।
ঘোর কলিকাল হয়েছে, রে ভাই।
এত টাকা লিলি, বাবা, দিলি বুড়া বরে,
বুড়ার সঙ্গে চলতে নারি কোলকাতার শহরে ॥ —ঐ

আয় তোরা চ লো তোরা,
চ লো ভোট দিতে স্বাধীন ভারতে।
আমরা ভোট দিব লো কংগ্রেসে।
আয় লো তোরা, চ লো তোরা,
চ লো ভোট দিতে স্বাধীন ভারতে॥ —ঐ

মন এলো মন্‌তিরি এলো ঝিলিমিলির বোডিংকে,
বারটাতে মিটিং বসলো ছেড়ে গেল তিনটাতে লো—
ট্যাকসী মোটরে।
মন্‌তিরা সব চলে গেল তিনটাতে লো,
টেরাক মোটরে॥ —ঐ

বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পুরুলিয়া যখন বিহারের অধীন ছিল তখন ইহার অধিবাসিগণ ইহার বঙ্গভুক্তির জন্য যে আন্দোলন করিয়াছিল, তাহাতে টুসু গানের সুরে গান রচনা করিয়া গীত হইত। কিন্তু গানগুলি টুসু গানের মত সংক্ষিপ্ত হইত না। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পরও গানগুলি কোন কোন অঞ্চলে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

আমার বাংলা ভাষা রে,
মোদের গরব মোদের আশা রে॥
(আমার) বাংলা ভাষা রে॥
কি যাদু আছে আমার বাংলা ভাষার গানে রে,
গানের সুরে ধান রুয়ে যাই জোয়ার জাগে প্রাণেতে
(বাংলা ভাষা রে)॥
এই ভাষাতেই গান গেয়ে ধান কাটে দেশের চাষারে।
এই ভাষারই রসে মিটে পরাণের তিয়াসা রে॥
এই ভাষাতেই দেশের বাউল মধুর সুরে গান বাঁধে,
এই ভাষাতেই গান গেয়ে লো ঘরের বধূ ভাত রাঁধে।

এই ভাষাতেই মরম ভরি জানাই ভালবাসা রে।
এই ভাষাতেই জুড়ায় হিয়া সকলি দুখ-নাশা রে ॥
চণ্ডীদাসের গান ছিল ভাই বাংলা বাণীর মন্তরে,
নবীন-মধু গান বেঁধেছে বাংলা বীণার যন্তরে।
হেম-বঙ্কিম-বিদ্যাপতি গোবিন দিল বাংলা গান,
দেশের কবি বাংলা গানে আন্‌ল কিনে বিশ্বখান।
এই ভাষাতেই মা বলেছি নয়ন আমার মেলে রে,
এই ভাষাতেই কাটল আমার জীবন হেসে খেলে রে ॥
(আমার) চিরজনম বাংলা ভাষার হিয়ায় মাঝে বাসা রে।
(আবার) এই ভাষাতেই শেষের দিনে মিটবে কাঁদা হাসা রে ॥ —ঐ

বলাবাহুল্য ইহা অতুলপ্রসাদের একটি গান অবলম্বনে রচিত।

৯

মোদের বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষাতে
(মোরা) বেঁচে আছি আশাতে ॥
পঞ্চায়েতের শাসন হ'লে মানভূমি বাংলাভাষী,
গাঁয়ের ভাষায় রাজ চালাবে মাথা হবে গাঁ বাসী।
বাংলাভাষায় চললে শাসন চালকেরা পালাবে,
গাঁয়ে ঘরে গরীব দুখী ঘরের শাসন চালাবে।
এই ভাষাতে কাজ চলে তো চোখ খুলিবে সহজে।
ফন্দী এঁটে হিন্দি লিখে ঠকাবে না কাগজে ॥
বাংলা ভাষাতে।
এই ভাষাতেই শক্তি মোদের পঞ্চায়েতি শাসনে।
বাংলা জ্ঞানে জিনবো মোরা সবার সমান আসনে ॥
বাংলা ভাষাতে। —ঐ

১০

ও দিদি, সব নিল গো সব নিল সকল ঘুচিল,
বাংলাতে সব পরচা ছিল, হিন্দীতে তা রূপ নিল ॥
সকল ঘুচিল ॥

রেজিষ্টারীর দলিল পাটায় হিন্দীতে আখর দিল,
রাহেড় টিপের বদলেতে রইড়াহিড় লেখাই নিল।
সকল ঘুচিল।
ঘরের লোকে জানে না গো হিন্দি আখর কি বটে,
তাই, হিন্দি দিয়ে ভাঁড়বে তারা বুদ্ধি কিলো নাই ঘটে।
আদালতে বাংলা ছিল হিন্দি করে আমদানী,
কলম দিয়ে মগজ মেরে মারবে তারা ভাত-পানী ॥
বাংলা গেলে হবেই যে লো চেক দাখিলে কারসাজী,
তাই তো মোরা সকল কাজে বাংলা ছাড়া নই রাজী। —ঐ

১১

আইনসভার হুকুম কি বাহার,
হল, বাংলা ভাষার বহিষ্কার।
হুকুম কি বাহার ॥
আইনসভার হুকুম জারি চল্‌বে না বাংলা ভাষা।
বিহার দেশের আইন কানুন দেখ লো কি সর্বনাশা
হুকুম কি বাহার ॥
মানভূমী সব গরীব দুখীর দাবী দাওয়া জানাতে,
দেশের মাথা পাটনা গেল গেল আইন বানাতে ॥
বাংলা মুলুক মানভূমেরি প্রতিনিধি যে জনা,
তাদের টুঁটি ধরতে টিপে সরম তাদের হ'ল না?
দেশের মাথা পাটনা গেল ভোট দিল লক্ষ জনা,
এত জনার শুনতে কথা বিচার তাদের হোল না।
আমরা হ'তে চেয়েছিলাম অধিকারের ভাগীদার,
হিন্দি আইন ঘুচালো সব করলো ব্যাপার চমৎকার ॥
মানভুমিরা দেখ্ বুঝে, ভাই, পড়্যেছে কি মরণে।
বাংলা ভাষার আইন সভায় দাবী যে সেই কারণে ॥ —ঐ

১২

আমার মনের মাধুরী,
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি।

আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে মেঠো স্থরের কোন চুয়া,
বাংলা গানের ছড়া কেটে আষাঢ় মাসে ধান রুয়া।

(মনের মাধুরী)

মনসা গীতি বাংলা গানে শ্রাবণে জাতমঙ্গলে,
চাঁদ বেহুলার কাহিনী গাই চোখের জলে গান বলে।
বাংলা গানে করি লো, সই, ভাদু পরব ভাদরে,
গরবিনীর দোলা সাজাই ফুলে পাতায় আদরে।
বাংলা গানে টুস্থ আমার মকর দিনে সাঁকরাতে।
টুস্থ ভাসান পরব টাড়ে টুস্থর গানে মন মাতে॥ —ঐ

১৩

বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে,
বাংলা ভাষা রে।
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে সাত পুরুষের আমলে,
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে মুখ ফুটেছে মা বলে।
এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড এই ভাষাতেই চেক্ কাটা,
এই ভাষাতেই দলিল নথি সাত পুরুষের হক্ পাটা।
এই ভাষাতেই বাবু আমার লেখা শিখে পাঠশালে,
এই ভাষাতেই বড় হবে মানুষ হবে এককালে।
দেশের মানুষ এই ভাষাকে ছাড়িস্ যদি ভয়-ডরে,
ঘরের ছেলে গরু হবে দেশ মরিবে বেঘোরে। —ঐ

বিজয়া

টুস্থর আগমনী দিয়া যেমন টুস্থ গানের আরম্ভ, তেমনই টুস্থর বিজয়া বা বিদায় দিয়া টুস্থ গানের সমাপ্তি। একমাস উৎসবের পর মকর সংক্রান্তির দিন দল বাঁধিয়া গ্রামের মেয়েরা টুস্থর প্রতীক বা প্রতিমাগুলি মাথায় করিয়া বাঁধের তীরে আসিয়া সমবেত হয়। তারপর করুণ সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ইহাদিগকে জলে বিসর্জন দিয়া অশ্রু-সজল বিদায়ের সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শূন্য ঘরে ফিরিয়া আসে। টুস্থ উৎসবের এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা করুণ।

এত দিন রাখিলাম মাকে ঝিঙ্গাফুলের আড়ালে,
আর রাখিতে লারলাম মাকে মকর আইল বাদী গো। —ঐ

বল ভাই আমার মা কোথায় আছে,
আমি পয়সা লিব কার কাছে।
বল্ ভাই আমার মা কোথায় আছে। —ঐ

তিনটি টুসু জল্‌কে গেল কোন টুসুটি ভাল গো,
মধ্যের টুসু ছলনদারী জলে আঁখি ঠারে গো।
জলে হেলা জলে খেলা জলে তোমার কে আছে
আপন মনে বুঝে দেখো, জলে শ্বশুর ঘর আছে। —ঐ

এই মনের বাসনা,
টুসু মাকে জলে দিব না,
দেখতে লেগবো টাটার কারখানা।

৫

তিরিশটি দিন ছিলে, টুসু, তিরিশটি ফুল নিয়ে গো।
আর রাখিতে লারি মাকে মকর হৈল বাদী গো॥
এতদিন যে ছিলে, টুসু, মা বলে কভু ডাকলে না।
যাবার বেলা রগড় হৈল মাকে ছাড়া যাব না॥

আয়, কে যাবি আয়
আমার কোলের টুসু জলে যায় —ঐ

টীকা পাবনের গীত

পশ্চিমবাংলার প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের পূজা নামে যে লৌকিক উৎসব প্রচলিত আছে, তাহাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ললাটে চন্দনের টীকা ধারণ একটি আচার। এই আচার পালন উপলক্ষে যে একটি গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; ইহা আচার-সঙ্গীতের অন্তর্গত বলিয়া ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীন ভাষা রক্ষিত হইয়াছে। ধর্মপূজার বিশেষ অনুষ্ঠানেই এই আচার পালন করা হয়। রামাই পণ্ডিত নামক একজন প্রাচীন ধর্মপুরোহিতের নামে এই ছড়া জাতীয় আচার-সঙ্গীতগুলি প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত রামাই পণ্ডিত কে, তাঁহার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না।

১

ঘুরি ঘুরি চন্দন লহ সরিয়া লইব টীকা।
একমনে পূজা কর শ্রীরামের পাদুকা॥
তিন ঘুরি বিশকর্মা নিমাইল যে পীড়ি।
যোল শ আমিনী মেলি এহি চন্দন ঘুরি॥[১]
মলয়ার পর্বত যেথা আছিল চন্দন।
বায়ুর বেগে আনিয়া দিল পবন-নন্দন॥
তিন ঘুরেত চারি যুগে পীড়ির বন্ধন।
সরগে বিশাই পীড়ির করিল নিরমাণ॥
চন্দনের কাইঠ যদি আনিল আপুনি হনুমান।
চন্দন ঘষিব ধর্ম দেবতার বিদ্যমান॥
খালি ঘুরি ডাবরে পুরিয়া লহি চন্দন।
সেইত চন্দনেতে পূজিব রে নিরঞ্জন।
চন্দনের গন্ধেত যতেক দূরে যায়।
চন্দনের গন্ধেত মোহিত দেব রায়॥
গঙ্গার মিত্তিকা আন সাগরের পানি।
চন্দনের ঘুরিত দেহে জয় জয় ধ্বনি॥ —শূন্যপুরাণ (বাঁকুড়া)

১ ঘুরি—ঘসি।

টীকা প্রতিষ্ঠার গান

পশ্চিমবাংলার প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজানুষ্ঠানে টীকা-প্রতিষ্ঠা একটি বিশেষ আচার। সেই সম্পর্কে যে আচার-সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে টীকা প্রতিষ্ঠার গান বলা হয়। ইহার মধ্যেও ভাষার প্রাচীনত্ব লক্ষণীয়।

১

নাটগীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে।
বেদ-মন্ত্র-আহ্বান কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
বসিয়া যে শ্রীধর্ম দুয়ারে॥
পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত সেতাই সে
চারিশত গতি লঅ আসি।
চন্দ্র কোটালে বলে কন্যা আছে পাটশালে,
আমিনী বসুআ ঘটদাসী॥ —শূন্যপুরাণ (বাঁকুড়া)

টাঁড় গান

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এক শ্রেণীর মাঠের গানকে টাঁড় গান বলে। ইহাকে টাঁড় গানও বলা হয় (টাঁড় গান দেখ)।

তোর মনে আমার মনে হে
লিখে দিব কালি কলম হে।
হেরি নাই যারে নয়নে হে,
সে করে মন নিয়ে টানাটানি হে —পুরুলিয়া

তোর মনে আমার মনে রে।
লেখে দিব কালি কলম রে॥ —ঐ

জোড় গাছে চিলের বাসা হে,
উড়াই দে, শ্যাম, দেখবো তামাসা, হে —ঐ

লাল লাল টুপা লিব ননী ভুলাতে,
তান ভেড়কা হুঁকা লিব দেওরা ভুলাতে,
একটি ঝিগাঁ লত বাড়ী বাড়ী যায়,
নৌতম বহু নেসনি ঝিঁগা নাহি খায় ॥ —ঐ

কাঁদিস না কানা হবি লো।
কাঁদলে কি শ্যামচাঁদে পাবি লো ॥ —ঐ

জোড় ধারে চিলের বাসা হে।
ধড়াই দাও, শ্যাম, দেখবো তামাসা ॥ —ঐ

হেইরে ডাংগা বহড়া রে।
এমনি ছিল শ্যামের মহড়ারে --ঐ

ঠাউর গান

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল হইতে এক শ্রেণীর সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগকে ঠাউর গান বলে। এখানে ঠাউর শব্দের অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। ঠাকুর শব্দ হইতে যদি ঠাউর শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে তাহা দেব-মাহাত্ম্যসূচক গান বুঝাইবার কথা। কিন্তু গানের ভাষা এবং ভাবে দেবমাহাত্ম্য প্রচারের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিয়াই গানগুলি রচিত হইয়াছে। ঝুমুর গানের সুরই ইহাদেরও সুর, ইহাদের সঙ্গে নৃত্যও সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। তবে ইহা মেয়েলী সঙ্গীত, পুরুষ কর্তৃক গীত হইবার সঙ্গীত নহে।

১

দুপুহর বেলা হইল, পথের বালু তাতিল
ঘরের মানুষ ঘরে ঘুরি আইল।
দুপুর কোলাহল, সময় হয়ে গেল,
তুমি কাজ ছেড়ে চলে এসো।

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

শুকনা কাঠের বাঁশী বাজে বাঙ্গলায়,
ঘরে না টহরে মন কি হইল দায়। —ঐ

আমগাছের টিকলি, বিটি ছানার বিকলি,
বিটি ছিলার মিছাই জনম, কাঁদে গো শ্বশুর ঘরে। —ঐ

আলড়াই দোল দোল কেন, ধনি, দাঁড়াইয়া আছ গো,
লাচি লিয় গো, কেলি লিয় এ জীবন, ধনি,
আধাদিন লাগি॥ —ঐ

ঠাট গান

জলপাইগুড়ির বাহে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একশ্রেণীর গানকে ঠাট গান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তব জীবনের সুখদুঃখের কথাই ইহাদের ভিতর দিয়া কীর্তিত হয়, কিন্তু ইহাদিগকে যে কেন ঠাট গান বলে, তাহার কোন কারণ জানা যায় না। রাগসঙ্গীতে ঠাট বলিতে যাহা বুঝায় তাহার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অবশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল কর্তৃক রচিত '*The Rajbansis of North Bengal*' নামক গ্রন্থে রাজবংশী জাতির যে গানের সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই শ্রেণীর গানের কোন উল্লেখ নাই। নিম্নোদ্ধৃত গানটির ভাষা ও জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ভাষা নহে।

১

নিকড়িয়ার কড়ি নাইরে পন্থে বাজায় বেনা,
তার চাইতেও দুঃখ ও যার বাপে বেটায় চেনা॥
একেতো দুঃখীর দুঃখ ও যার বালুতে করে চাষ,
তার চাইতেও দুঃখ ও যার পরার করে আশ,
একেতো দুঃখীর দুঃখ ও যার অধো মুখে হাঁটে,
তার চাইতেও দুঃখ ও যার পরার বাড়ি খাটে।
একে তো দুঃখীর দুঃখ যার অতিত না আসে,
তার চাইতেও দুঃখ ও যার হাসিয়া না হাসে॥
একে তো দুঃখীর দুঃখ অধিক চিন্তা যার,
তার চাইতেও দুঃখ হচ্ছে ঘরে বেশী মাইয়া যার,
একে তো দুঃখীর দুঃখ যার পরবাসে ভাঙ্গে হাঁড়ী,
তার চাইতেও দুঃখ হচ্ছে চিতন বয়সের আড়ী॥
মরি হায়রে, একে তো দুঃখীর দুঃখ কভু না নেয় জোড়া,
হয়া পুত্র মরিয়া যায় বাপ মার কপাল পোড়া॥ —জলপাইগুড়ি

ঠারে গান

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের মুণ্ডাভাষী উপজাতিদিগের মধ্যে যাহারা বাংলা ভাষাও গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর বাংলা সঙ্গীত

প্রচলিত আছে, তাহাকে ঠারে গান বলে। করম উৎসব উপলক্ষে নৃত্যসহযোগে এই গান গাওয়া হয়, রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গই অধিকাংশ ঠারে গানের বিষয়-বস্তু। মুণ্ডাভাষী জাতির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ যে কি ভাবে প্রবেশ করিয়া নিজের অধিকার স্থাপন করিতেছে, এই গান তাহার নিদর্শন। তবে মুণ্ডা এবং বাংলা শব্দ মিশ্রিত করিবার ফলে এই গানের ভাষা বাঙ্গালী পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া উঠে।

১

মর্ম—ষোল শত গোপিনীর সঙ্গে লীলাকালে বাঁশী হারাইয়া কৃষ্ণ তাহার কাকীর কাছে বাঁশী চাইতে যায়। কাকী বলে কাকার কাছে চাইতে যা।

হড়দক করম তামা দিকুদক সেবা তামারে
ষোলশো গোপিনী সুষম তানা
দেহি দে কাকীরু তুই দা
ইদু চা বাবু কাকা আম গে। —বাঁশপাহাড়ী

৪৭

হেন্দে হেন্দে কোড়া কেন্দে উড়িই গাইকো গুপীতানা।
সেরেল বেড়েল নরম জুরতানা।
রন বন বিজু বনে গাইকো গুপীতানা
দাইগণ পাতিয়াছেন কাকে
হেন্দে কড়া পিতল দড়া সুটুই নরম তান।
দাইগণ পাতিয়াছেন কাকে।
হেন্দে হেন্দে ধুতিয়ানা দাইগণ পাতিয়াছেন কাকে॥ —ঐ

ঠেস পাঁচালী

কাহিনীমূলক বা বর্ণনাত্মক সঙ্গীত অর্থাৎ পাঁচালীর মত এক শ্রেণীর সঙ্গীতাংশকে ঠেস পাচালী বলে। ঠেস শব্দের অর্থ এখানে ইঙ্গিত, ঠেস পাঁচালী অর্থে কাহাকেও ঠেস দিয়া অর্থাৎ ইঙ্গিতে লক্ষ্য করিয়া যে পাঁচালী রচিত হইয়া থাকে, তাহাই বুঝায়। ইহারা ব্যঙ্গ বা শ্লেষাত্মক রচনা। সাধারণ পাঁচালীর ভঙ্গিতেই অঙ্গভঙ্গি সহকারে ইহারা গীত হয়।

১

এসে এক শ্বেত শকুনে, বসতে চায় জ্বলন্ত আগুনে।
ভাগাড়ে রাখালগণে, নাচাবে পাঁচনে ॥
হয়ে এক তিঁত পুঁটির ছা, খেতে চায় কৈয়ের মাথা,
ললাটে ঢুকবে কাঁটা, মরবি রে জ্বলনে ॥
পড়েছ কালের হাতে তোমায় দিব না যেতে,
কে তোমায় আসবে নিতে, ভাব এখন মনে ॥
জাননা কোন খবর, হতে চাও ওস্তাদ জবর,
কুকুরের ভেক ভেক খাটবে না এখানে ॥
মশার ডাক শুনে কাণে এরোপ্লেন বলবে 'কেনে',
ফিরে যা মানে মানে, মরবিরে চাপনে ॥
মাথার উকুনে বলে, গোটা মানুষ খাব গিলে,
করব তোকে আঁধার কিলে, মরবিরে টিপুনে ॥
শুনরে কানি কুঁড়ে একটু লে পানি পড়ে,
তবে হবি ধড়ফাড়, পারবিরে ঝাঁপানে ॥
শুনরে জগতে কি করবি ঔষধ ঘেঁটে,
সব বিদ্যে যাবে কেটে দেখবিরে এইখানে ॥
আসতে হল ভেবে গুণে ছড়াদার আসবে শুনে,
এখন সব নিলাম চিনে, চুণ জোটে না পানে ॥
শুনে এদের কথার ছাঁট মনে হয় রামপ্রসাদ,
জানা গেল কুড়ায় পাত এরা কয়েকজনে ॥
ফের যদি বলি উঠে পালাবি বগল এঁটে,
পুঁজি নাই এদের পেটে, গান করবে কেমনে ॥
ভেবে বলে নুরমুজ আলী ফুরাল আমার গানের কলি,
ওস্তাদ আমার গোলাপ আলী বলি সভাস্থানে ॥ —মুর্শিদাবাদ

ডরাই বিষরির গান

শৈশবে কোন শিশু যদি ডর বা ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে কিংবা অন্যভাবে ভয় পাইবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন তাঁহার জননী কিংবা মাতামহী-পিতামহী স্থানীয় যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি তাহার ভয় কাটাইয়া দিবার জন্য এক দেবীর পূজা মানসিক করিয়া থাকেন, তাহার নাম ডরাই বিষরি বা ডরাই-বিষহরী। তাঁহার নাম ডরাই বিষহরী হইলেও বিষহরী বা মনসার সঙ্গে তাহার প্রকৃত কোন সম্পর্ক নাই ; তিনি প্রকৃতপক্ষে ভয় ডরের দেবতা। ডরাই বিষরির মানসিক পূজা উপলক্ষে হিজরার গান হয়। হিজরার গানই ইহার মূল বিষয়। ডরাই বিষরির নামে হিজরা যখন দুই পা ছড়াইয়া মাথার চুল আলুলায়িত করিয়া ঘাড় একবার এক দিক হইতে আর একদিকে নাড়াইয়া ছড়া বা গান গাহিতে থাকে, তখন তাহার উপর দেবতার 'ভর' হয়। এই অবস্থায় অনেক সময় সে কোন কোন দুরারোগ্য রোগের অসুখ বিসুখের কথাও বলিয়া থাকে। হিজরা 'ভর' কালীন যে সকল গান গাহিয়া থাকে, তাহা যেমন অশ্লীল, তেমনই সঙ্গীতের সকল গুণ বিবর্জিত। একান্ত অশ্লীল বলিয়া এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার যোগ্য নহে। একটি গানের একটি মাত্র পদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, ইহার দ্বিতীয় পদটি আর উদ্ধৃত করা যায় না—

ডুব দিয়া আইছুইন পুরুত ঠাকুর জলপান করবাইন কি ?

দ্বিতীয় পদটি অনুচার্য। পূর্ব মৈমনসিংহ এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলেই এই গান ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকে।

ডাঙ্গালে গান

বীরভূম জিলা হইতে একশ্রেণীর গান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাকে ডাঙ্গালে গান বলে। ডাঙ্গালে গান শব্দের অর্থ রাখালিয়া গান বা মাঠের গান। ডাঙ্গা শব্দ হইতে ডাঙ্গালিয়া শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। গানের মধ্যে কোন বিশেষত্ব অনুভব করা যায় না। তবে সাধারণভাবে ইহারা প্রেম-সঙ্গীতেরই অন্তর্গত।

আমি যে গরুর রাখাল মাঠে মাঠে থাকি,
বাঁশরি বাজাইয়া পালের গরু বাছুর ডাকি।
কাঁদে বাঁশি কার লাগি রে……
আমি যে গরুর রাখাল না করিয়ো ভুল।
ফোটা ফুলের গন্ধ ভালো ছিঁড়ো না মুকুল ॥
আমি যে রাজার ঝিয়ারি না করিয়ো ভুল,
বারণ করলে এ বাগানে তুলবো না ফুল।
কাঁদে বাঁশি কার লাগি রে, আমি যে গরুর রাখাল ॥ -বীরভূম

ডাঁড়শালিয়া

ইহাকে দাঁড়শালিয়াও বলা হয় (দাঁড়শালিয়া দেখ)। দাঁড়শাল বা ডাঁড়শাল এক প্রকার নাচ, ইহা মূলত পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ অঞ্চলের আদিবাসীরই নাচ ছিল, ক্রমে সেই অঞ্চলের হিন্দুভাবাপন্ন জাতি তাহা গ্রহণ করিয়াছে। করম এবং অন্যান্য উৎসবে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। ইহা বর্তমানে প্রধানতঃ পুরুষদেরই নাচ। বিশেষ কোন উৎসবের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। মাদল এবং ধামসা বাদ্যের সঙ্গে যে কোনদিন অবসর সময়ে এই নৃত্য হয়, ইহার গানগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আদিবাসী সঙ্গীতের মৌলিক রূপ ইহাতে বিসর্জিত হয় নাই। নিদর্শনগুলিই তাহার প্রমাণ।

১

সাঁতার দিছ ভবজলে,
দেখ দহের মাছ না পড়ে ডাঙ্গালে। —পুরুলিয়া

নিম্নের গানটিতে নদীয়া শব্দের অর্থ নদী, নবদ্বীপ নহে। গানগুলির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের কোন প্রভাব নাই।

২

সখিরে, কেমনে নদীয়ায় পার হব, ঝাঁপ দিয়ে ডুবিয়ে মরিব।
নদীতে পড়িল বান, পার কর, ভগবান, ভবনদী নামে পার হব।
যে করিবে নদী পার—তারে দিব গলার হার,
আধা প্রাণ তাহারে সঁপিব; —ঐ

বাড়ার নামোয় যাত্যে যাত্যে টুরী বেঙ্গে টেকল,
ভাগ ছিল বলে ধনী ধর্মটুকু বাচল। —ঐ

তল পাইয়া নাট খেল উপর পাইয়া লোক যে নাইরে—
ঝুমুর ঝুমুর যায় ভারনি ঘাট রে, হে নাইরে—
নৌকা যো যায় ভারানি ঘাট ॥ —সাহেবডিহি (অযোধ্যা)

৫

(ই) মু ধুইতে যাঁয়েছিলি পাথর বুইলে (ভুলে) বুইসেছিলি,
(ই) কারছিম সামাইলো রামলক্ষ্মণ ডুবিলো ॥ —ঐ

রাম-লক্ষ্মণ মুখ ধুইতে গিয়া পাথর মনে করিয়া কচ্ছপের উপর বসিল। কিন্তু কচ্ছপ ডুবিয়া গেল, রাম-লক্ষ্মণও ডুবিয়া গেল।

অন্য পাঠ, মু ধুইতে যাইয়াছিলি, পাথর বলে বসেছিলি,
কাচ্ছিম ছিল রামে লক্ষ্মণে ডুবিল ॥ —ঐ

৬

মাঝকুলিয়া কড়া চট, ভাই, একা যাইও না।
হাতে পুঁটি কানে কলম (ছোট ভাই) একা যাইও না ॥
—মাতকুণ্ডি (পুরুলিয়া)

৭

ছোট মোটে ডুবিন বিটি, মোটে আইসে ন দাঁড়া, ভাবি হে মন জুড়ে ;
ঘরে ঘরে লুগা আগে বুনি দে।
ভাবি হে মন জুড়ে ॥ —সাহেবডিহি (পুরুলিয়া)

৮

ভাই ভাই ছোট ভাই ভাই, ভাই বড় ভাই।
ভাই, আমার মিছারে নদীতে পড়িল সর্বনাশ ॥ —ঐ

ঢ

ঢপ কীর্তন

কীর্তন গানের একটি লৌকিক রূপ ঢপ কীর্তন (ঢপ দেখ)। ইহার ব্যবসায়ী দল থাকিত, ব্যবসায়ী গানের দলে নারী গায়িকাও থাকিত। উচ্চ ভক্তিভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া সাধারণ লোকরুচি অনুযায়ী প্রেম, মিলন ও বিরহের বিষয় লইয়া ইহাতে গান রচিত হইত। একজন মূল গায়েনের অধীনে নারী ও পুরুষ দোহার এবং গায়কের সহায়তায় এই গান আসরে পরিবেষণ করা হইত। দলের যাহারা অধিকারী থাকিত, তাহারা নিজেরা পালা বাঁধিতেন কিংবা অন্যের বাঁধা পালাও গাহিতেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরে সমাজের সাধারণ স্তরে কীর্তন যে নানা রূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহা তাহাদেরই অন্যতম। গানে ভাঙ্গা কীর্তনের সুর ব্যবহৃত হইত। তবে কোন সময় রাগসঙ্গীতের সুরও শোনা যাইত।

১

তখন বেরুলো রাই কমলিনী।
চারিদিকে চায়রে আলুথালু পাগলিনী ॥
উঠে পড়ে যার ধায়, কেঁদে বলে বলগো আমায়,
ফুরালো বল বল গো আমায়,
আমার মদনমোহন কোথায় গেল ॥
প্যারীর দুই নয়নে শত ধারা,
করে ডুবু নয়নতারা যেমন।
মণিহারা ভুজঙ্গিনী দাবদগ্ধ কুরঙ্গিনী ॥
তখন উন্মত্তা গোপী ধায়, বসন নাহিক গায়,
ধায় রাধা যেন পাগলিনী।
আলুথালু কেশে যায়. আর কাঁদি কাঁদি কয়,
কোথা গেলে পাব গুণমণি ॥

(আহা) নিতম্বে চরণ ভারি,
সত্বর চলিতে নারি, ব্রজনারীগণ করে ধরি,
কভু রাই যায় ধীরে, কভু ধায় ত্বরা করে,
হেরিতে পরাণ বঁধু হরি ॥
(আহা) একে ব্রজের কঠিন মাটি,
তাহে কমল কোমল পদ দুটি,
কমলিনীর চরণে তৃণটি ফুটে,
কৃষ্ণ উহু উহু করে উঠে। —যশোহর

ঢপ গান

ঢপ গান একপ্রকার কীর্তনাঙ্গের গান। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পূর্ববর্তী কাল হইতেই ইহা বহুল প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে সকল প্রাচীন সঙ্গীত এবং সঙ্গীত রচয়িতাদিগের জীবনী সংগ্রহ করিবার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ঢপ গানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার সংগ্রহে কোন ঢপ গান কিংবা তাহার কোন রচয়িতার সন্ধান দিতে পারেন নাই। কীর্তন গান লৌকিক স্তরে নামিয়া আসিবার ফলে যে সকল রূপ লাভ করিয়াছিল, ঢপ তাহাদের অন্যতম। ইহারা বৈষ্ণব পদাবলীর দিব্য ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত গণরুচির অনুগামী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই ফলে ক্রমে ইহার ধারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লোক-সঙ্গীতের স্তর হইতে যখন ইহা কোন কোন সময় উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইত, তখন মধ্যে মধ্যে ইহার মধ্যেও দিব্যভাবের বিকাশ দেখা দিত। মধুকান বা মধুসূদন কিন্নর প্রায় দেড়শত বৎসর পুর্বে (১২২৫ বঙ্গাব্দ) যশোহর জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উক্ত জেলার বাড়খাদিয়া গ্রাম নিবাসী রাধামোহন বাউলের নিকট যে ঢপ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া নিজে এই শ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা লৌকিক ভাব হইতে মুক্ত। ঢপ সঙ্গীত রচনা করিয়াই তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি 'মান, মাথুর, অক্রুর সংবাদ ও কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতি পালা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলিতে ভক্তিরসের স্পর্শ অনুভব করা যায়।

নীলমণি নীলমণি যেদিন।
আমার মনে হইল সেদিন
ফিরে কি আর হবে আমার সুদিন ॥
যে থাকে না তিলেক ছেড়ে,
সে আমায় গিয়াছে ছেড়ে,
জান্‌লে কিরে দিতেম ছেড়ে
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সেদিন ॥
ও মা, যাই যাই, বলে কারে বা সুধায় গো,
নেবে খাবে ক্ষীর ননী কে তাঁরে বা কয় গো।
কারে বা বলে জননী, কে বা দেয় ক্ষীর নবনী,
খায় কিরে ক্ষীর ননী,
দুখিনীরে মনে হয় কি একদিন। -যশোহর

ঢপ যাত্রার গান

বাংলার কৃষ্ণ বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত লোক-নাট্যের একটি বিশেষ রূপ ঢপ যাত্রা। বর্তমানে ইহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে ঢপ যাত্রার পার্থক্য আছে। কৃষ্ণযাত্রা ভক্তিমূলক রচনা, কিন্তু ঢপ যাত্রা তাহা নহে, ইহার মধ্যে ভক্তির লেশমাত্র প্রকাশ পায় না ; ভাঙ্গা কীর্তন সুরের সহায়তায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কোন পালাকে ইহাতে নটনটীর সামান্য সাজসজ্জা এবং অঙ্গভঙ্গি সহকারে প্রকাশ করা হয়। গানে কথনও কথনও রাগসঙ্গীতের স্পর্শ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তাহা কোন উচ্চ গুণ লাভ করিতে পারে না।

ঢাক পাটের গান

চৈত্র সংক্রান্তির সময় যে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে ঢাকের বাদ্য সহযোগে শিব সম্পর্কিত নানা লৌকিক ছড়া ও গান গাহিতে গাহিতে সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ‘পাট’ বা কাষ্ঠনির্মিত দেবতার আসন মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া যায়। গৃহস্থের আঙ্গিনায় তাহা নামাইয়া রাখিয়া ঢাকের বাদ্যের তালে তালে তাহা ঘিরিয়া নৃত্যগীত করে। তাহা

পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ পূর্ব মৈমনসিংহ, উত্তর ত্রিপুরা, পশ্চিম শ্রীহট্ট এবং ঢাকা মহেশ্বরদি পরগণা অঞ্চলে ঢাক পাটের গান বলিয়া পরিচিত। শিবেরই নানা মাহাত্ম্যের কথা ইহার মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।

১

উঠ উঠ, সদাশিব, নিদ্রা কর ভঙ্গ,
তোমারে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ।
খোল, চন্দন কাঠের কপাট, দেই দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ পরনাম॥ —মৈমনসিংহ

২

তুলসী তুলসী গগনে বিহার।
আস্থার তুলসী নম গো তোমার॥ —ঐ

৩

কৈ গেলা বিশাই মেস্তরী মোর বচন ধর।
নিম গাছ কাট্যা আন্যা পাট স্বজন কর॥
চাহিয়া ছিইল্যা পাট করলাম ভাল।
তার উপর তুইল্যা দিলাম লোহার ত্রিশূল॥
লোহার ত্রিশূল নারে কাঁটা সারি সারি।
ঢল পত্র ঢাকা দিলাম পাটের নিশারি॥
পাটবর মুনি সিনান করে দূর্বা লইয়া হাতে।
জীবন সন্ন্যাস পাট তুল্যা লইলাম মাথে॥ —ঐ

ঢালী নৃত্যের গান

বীরভূম জিলার প্রাচীন যুদ্ধ নৃত্যের অবশেষ ঢালী নৃত্য। লাঠি এবং ঢাল হাতে করিয়া এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহা ঢালী নৃত্য বলিয়া পরিচিত। তালযুক্ত দ্রুত নৃত্যকালীন ইহার মধ্যে সঙ্গীতের খুব বেশি অবকাশ থাকে না। তথাপি নৃত্যের ফাঁকে ফাঁকে সংক্ষিপ্ত গানের পদ কখনও কখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

১

খাব না খাব না বঁধু হে, কালো মুরগীর মাস।
আমার জন্যে আন্যে দিবে দহের মাগুর মাছ॥

২

আষাঢ় শাওন মাসে কাঁচা অহিরে ভ্রমর বসে,
চমকে চমকে হিয়া জাগে,
হৃদয়ের আনন্দ ওগো ভাঙ্গিব ভামরে।

অনেক সময় কাঠি নাচের গানের সঙ্গে ইহাদের কোন পার্থক্য থাকে না।
(কাঠি নাচের গান দেখ, পৃ. ২১৪-২১৮)

ঢুয়া গান

পশ্চিম বাংলা বিশষতঃ পুরুলিয়া বীরভূম, বাঁকুড়া, উত্তর পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলে এক শ্রেণীর বৈরাগ্যমূলক সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাকে সাধারণভাবে ঢুয়া গান বলা হয়। পূর্ব বাংলা বিশেষতঃ রাজসাহী, পাবনা জিলা অঞ্চলে ইহাকেই সাধারণভাবে ধূয়াগান বলে। তুসু শব্দ যেমন পুরুলিয়ায় টুসু উচ্চারিত হয়, ধুয়া শব্দও রাঢ়ের উচ্চারণে ঢুয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহা বৈরাগ্যমূলক গান হইলেও প্রকৃত বাউল গানের সঙ্গে ইহাদের ভাবগত পার্থক্য আছে। বাউল গান বৈরাগ্যের গান নহে; বরং প্রকৃত বাউল গান ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মভাব অনুভূতিতে বৈরাগ্য ও বিষাদের ভাব হইতে মুক্ত। ঢুয়া গান বৈরাগ্যেরই গান, ইহার মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি কিংবা মনের মানুষের সন্ধান লাভের কোন কথাই নাই। সংসারের অসারতা এবং মৃত্যু দ্বারা জীবনের বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধিই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করে।

পশ্চিম বাংলার ঢুয়া গানকে প্রধানতঃ চারি ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, বৈরাগ্যমূলক, দেহতত্ত্বমূলক, কৃষ্ণপ্রসঙ্গমূলক এবং লৌকিক।

বৈরাগ্যমূলক

কতকগুলি ঢুয়া গানের মধ্যে সাধারণভাবে বৈরাগ্য কিংবা জীবনের নশ্বরতার কথা উল্লেখ করিয়া পরকালের চিন্তা করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ঢুয়া গানের ইহাই মৌলিক বিষয়। ইহার আধ্যাত্মিক কিংবা দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গান হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, অধ্যাত্ম কোন বাণী কিংবা তত্ত্বকথা ইহাদের মধ্যে কিছু নাই, ইহারা সাধারণতঃ উদাসী বৈরাগীর গান। একতারা ইহাদের বাদ্যযন্ত্র।

এই তো ভবের মানবলীলা ফুরিয়ে গেল ভাবলি না।
দেহ রত্নধন পড়ে রবে, মন, মনের খরচ কিছু করলি না।
দেহের ভালোবাসা চটে যাবে,
নেশা নিশির স্বপন,—তাও কি জান না॥
নিজ বাড়িতে চমকিত চিতে নিজে কেন মন বুঝ না।
আপন হতে যদি ভয়ে নিরবধি, কেউ তো কারও সঙ্গে যাবে না।
হেলায় বেলা গেল নিদান সময় হল, পথের সম্বল কিছু বাঁধলি না।
অভয় পদ ধর চমক যাবে দূর ভয়ের কারণ কিছু রবে না॥
ওহে লগনের ইবার হবে কি উপায, ভুলে রইলি ভয় ভঞ্জনা।
—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

মানুষের বুঝা রে ভুল সে জানে না কুল
আশী জনম ভ্রমণ তবে মানুষ জন্ম পেলে।
ভূমিষ্ঠ হইবার পরে ভুলে গেল আপন কুল॥
কেহ রাজা কেহ প্রজা কেহ অসত্ কামে মজা
কেহ দেশে দেশান্তরি বজায় করে আপন কুল॥
রাস্তাতে মানুষ চলে কাঁথা বিনে কেবা চলে
এখন সিয়ঁা কোলে পরে রাস্তা করে আছে ভুল॥
অধম লক্ষ্মী কাল্‌ত বলে কত শত পার করিলে
আমি সে অধম বলে আমারে করিছ ভুল॥
—বেলপাহাড়ী (ঐ)

৩

আশানদীর তীরে এসে কেন বসে আছ মন।
তরঙ্গ হয়েছে ভারী, পার করিবে কখন॥
একি রে তোর দুষ্ট মতি, হলো নারে কৃষ্ণ মতি,
কর কৃষ্ণে রতি, কৃষ্ণে মতি, কর রে সাধন॥
আসা যাওয়া ভাবনা কি রে, আসা যাওয়া ঘুরে ফিরে
এবার বুঝি কর্ম কোরে, হারাবে জীবন॥

যে আশাতে ভবে আসা, মিট্‌ল না মনের আশা,

খেপা বলে করবে আশা ঐ যুগল চরণ ॥ — পুরুলিয়া

৪

মন, ভরা নদীর কিনারে তোরা কে যাবি-আয় পারে,

মন, ভরা নদীর কিনারে ॥

তার পিছল ঘাটে নামলে পরে পা পিছলে যায় ভেসে।

মন, ভরা নদীর কিনারে ॥

নদীর আছে একটি ঘাট, কোন ঘাটের কি মহিমা, বুঝে উঠা ভার।

ওটা যারা বুঝতে পারে মহৎ তারা সাধুজনে পায়,

মন, ভরা নদীর কিনারে ॥ —পচাপানি (মেদিনীপুর)

৫

রে মন, পেল এতদিনে শত ছিদ্র ছেঁড়া কাপড়,

আর পারবো কেমনে রে, মন, পেল এতদিনে।

গাঁকে আইল ম'টা কাপড় তায় মেয়ে ছেলে অনাদর

মুখ বাঁকা করে বসে থাকে।

এ কাপড় নিব না বলেরে, মন, পেল এতদিনে।

হেন বর্জুরামে বলে মোটা সরু দুয়েই পরতে হ'বে।

সুজ্জুবাবু বসে আছে কাপড়ের দোকানে,

রে, মন, পেল এতদিনে ॥ —ঐ

৬

ওরে মন, ভাবিলে আর কি হবে।

ওরে যা আছে কপালে ফলবে কালে কালে।

কর্ম সূত্রের ফল আপনি ফলে

ওরে, মন, ভাবিলে বল আর কি হবে।

ওরে বিধি যা লিখেছেন কপালের উপরে,

কার সাধ্য তা খণ্ডাইতে পারে।

বল বুদ্ধি বিদ্যা কখন পারে !

যখন যা ঘটিবার তখন তা ঘটিবে,

ওরে মন, ভাবিলে আর কি হবে ॥

ওরে আদ্যাশক্তি দুর্গা জগতের ধাত্রী,
কটাক্ষে যার হয় সৃষ্টি স্থিতি,
ও তার পুত্রের হলো শুণ্ড পিতার রুণ্ডমুণ্ড
পাগল পতি কয় সবে।
ওরে ভাবিলে বল আর কি হবে।
ওরে পাণ্ডুকুলোদ্ভব যুধিষ্ঠির প্রভৃতি
যাদের রথের সদা শ্রীকৃষ্ণ সারথি
তারা কর্মদুঃখের দুঃখী, হলেন বনবাসী,
রাখতে নারে কেশবে।
ওরে মন, ভাবিলে কি আর হবে।
দেবাসুর মিলে সমুদ্র মথিলে,
যার যেমন ভাগ্য সে তেমন পেলে,
ওই দেখ তার সাক্ষী হরি পেলেন লক্ষ্মী,
শিবের ভাগ্যে বল কি বা হল দেখরে।
ওরে মন, ভাবিলে বল আর কি হবে।
ওরে কণ্ঠ কয় মন ভাবরে অদৃষ্ট,
অদৃষ্টের ফল মিলাবেন শ্রীকৃষ্ণ,
ওরে, কর ইষ্ট নিত্য এ পদ শ্রেষ্ঠ
এ ঘোর যন্ত্রণা যাবে
ওরে মন, ভাবিলে বল আর কি হবে। —ঐ

৭

এই ত ভবের লীলা খেলা
ফুরিয়ে গেল ভাবলি যা।
কোন খেলাতে দিন ঘুচালি,
হরির খেলা খেলাবি না।
আমার দেহরত্নধন পড়ে মন,
মনের গরব কিছু রবে না।
দেহের ভালবাসা বটে যাবে মেলা,
নিশির স্বপন তাও কি জানলে না।

হেলায় বেলা গেল, নিদান সময় গেল
পারের সম্বল কিছু বাঁধলি না।
অভয় পদ ধর চমক যাবে দূরে
ভয়ের কারণ কিছু রবে না।
লগন কহে এবার উপায় কি হবে
ভুলে রইলি ভবের ভজনা। —ঐ

৮

হরি বল রসনা পুরাও মনের বাসনা।
ও মন-রসনা, এমন জনম গেলে
আর ফিরে হবে না ॥
অসৎ সঙ্গে বসো না অসৎ ক্রিয়া করো না,
কামিনী কাঞ্চনের ফেরে আর যেন ভুলো না।
করি বারণ শুনো না শেষে পাবি যাতনা,
লগনদাসে আর জ্বালা দিও না। —বাঁশপাহাড়ী (ঐ)

ওরে, ভরা ভাদরে ডুবলো তরী অকূল পাথারে।
আয়রে মাঝি ছুটে আয়—তরী যে রে ডুবে যায়,
ঈশানে ধরেছে মেঘ, ডাকে গম্ভীরে।
যাব আমি অনেক দূর, মধুভরা মধুপুর,
প্রাণ কাঁপে দুরু দুরু,
দেখে প্রাণ শিহরে ভরা ভাদরে। —বেলপাহাড়ী (ঐ)

১০

মিছে কেন ভবঘোরে ঘুরে মর দিবানিশি,
ভবের খেলা সাঙ্গ হলে ফুরাবে তোর হাসিখুশি।
এই যে ভবের বাজারে—আসা যাওয়া কেবল সার,
এ ভবেতে কেউ কারো নয়—মিছে ভালবাসাবাসি।
যারে ভাব আপন আপন, কেউ সঙ্গে যাবে না তখন,
যেদিনেতে মুদবে নয়ন শমন দিবে গলে ফাঁসি।

এই যে অনিত্য দেহ, এ দেহের সদাই সন্দেহ,
এ দেহ পতন হলে পুড়ায়ে করবে ভস্মরাশি। —ঐ

১৪

যেদিন তুমি মরবেক সেদিন তুমি,
ছুবেক না সেদিন গো, ডরাবে সে দিন মড়া বলে। —ঐ

দেহতত্ত্বমূলক

দেহতত্ত্ব বিষয়ক কতকগুলি গানও টুয়া গান বলিয়া পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে পুরুলিয়া, উত্তর পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া অঞ্চলে দেহতত্ত্বের গান বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু নাই, দেহতত্ত্বের গানকে এই অঞ্চলে সাধারণতঃ টুয়া গান বলা হয়। অথচ দেহতত্ত্বের গান মাত্রই টুয়া গান নহে। দেহতত্ত্বের গানের মধ্যেও এক শ্রেণীর গানে বৈরাগ্যের যে সুর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই টুয়া গান। বৈরাগ্যের ভাবমূলক বলিয়াই ধীর লয়ের সুরে ইহারা গীত হয়। ভাটিয়ালির সঙ্গে সুরের দিক দিয়া অনেক সময়ই ইহাদের যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে ভাটিয়ালী যেমন সহসা চড়া সুরের দিকে ধাবিত হইয়া যায়, টুয়া গানে তাহা হয় না, সুরের সমতা রক্ষাই ইহার বিশেষত্ব। দেহতত্ত্বের গানে প্রায় সর্বত্রই রূপক অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। দেহতত্ত্বের গান চিনিবার ইহা একটি প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণ এই গানগুলির মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে।

১

কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে,
আমার মন যাবি কি ভ্রমণে।
কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে।
সেথা মন্দে মন্দে প্রাণ জুড়াবি আনন্দ সমীরণে।
সে বাগানের এমনি তাই ধারা, বাগান আসমানে খাড়া,
কত শিবব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন প্রবেশ করি কর সন্ধানে।
সে বাগানের দু'জনা মালী,
তাদের মধ্যে একজন উড়ে একজন বাঙ্গালী।
তারা ছেঁড়ে খুঁড়ে নেড়ে চেড়ে গাছ বাড়ায় দিনে দিনে॥

সেই বাগানে ফলে মেওয়া ফল,
তার কাছে তুচ্ছ চারি ফল।
সে ফল যে খেয়েছে সেই মজেছে হয়েছে পাগল।
আর তার জন্ম সফল, কর্ম সফল
সে ফলের নাম সেই জানে।
সেই বাগানের মধ্যে সরসী, সুধা তুল্য জলরাশি।
আবার মৎস্য জলে খেলা করে হংস আর হংসী।
ওরে, কোটি জলের তৃষ্ণা হরে এক বিন্দু জলপানে,
সেথায় যেতে নারবি, সকাম নদী পার হবি তুই কেমনে,
কৃষ্ণ-অনুরাগের বাগানে॥

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৩

কালে কালায়ে এমন ঘরে থাকা হইল জ্বালা,
ভেঙ্গে গেছে ন'দরজা অসংখ্যাটা নালা।
এমন ঘরে থাকা হইল জ্বালা।
ইঁদুরে কুড়িছে মাটি, বাতাসে উড়ায় গো ঝাঁটি,
সময় পেয়ে মারে লাথি চামচিকা শালারা।
এমন ঘরে থাকা অইল জ্বালা।
পচে গেছে দড়ি দড়া, শেষ হইল না জল পড়া,
উইচিংড়া কেঁচুয়া কেন্নই মেজেয় করে খেলা,
এমন ঘরে থাকা হইল জ্বালা।
এই ঘরের তিনটি খুঁটি, লড়িয়া গেছে মধ্যমটী,
সব খুঁটিতেই লেগেছে ঘুণ পড়িবে কোন বেলা,
এমন ঘরে থাকা হইল জ্বালা।

—বাঁশপাহাড়ী (ঐ)

৪

ওরে, ডুবে দেখরে আজব কারখানা,
দিল দরিয়ার মাঝে।

ওরে, যে ডুবেছে সেই মজেছে আর মজেছে রসনা,
দিল দরিয়ার মাঝে।
ওরে, এই না দেহে নদী আছে,
মাঝে মাঝে জাহাজ গেছে—ছ'জনা তার মাঝি আছে।
তার ধারে কালো সোনা, বাঁকা হাল ধরে কালো সোনা,
দিল দরিয়ার মাঝে।
উঠে দেখরে দিল দরিয়ার মাঝে।
এই না দেহে বাগান আছে,
নানা রঙের নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
ওরে সৌরভে জগত মেতেছে, এমন সৌরভে জগত মেতেছে,
আমার ক্ষ্যাপা কেন মাতলো নারে, দিল মাতালো নারে। —ঐ

৫

কেমনে নদীয়া পার হবো, কিবা নাম কি বলে ডাকিব,
কেমনে নদীয়া পার হবো।
যে করিবে নদী পার, তাকে দিব গলার হার,
আধা প্রাণ তাহারে সঁপিব, কেমনে নদীয়া পার হ'ব।
গাঁথিয়া ফুলের মালা,
বাসর সাজাব, আসিবেন বনমালী গলাতে পরাব।
কেমনে নদীয়া পার হব॥
—পচাপানি (মেদিনীপুর)

৬

কোন ঢেঁকি সুরকি কুটিল, কেমনে মন্দির বনাইল,
কোথা তার কারিকর বানাইল মন্দির ঘর।
সে মন্দির কেমনে গাঁথিল, সখিরে, কেমনে মন্দির বানাইল॥
হেন যতিদাস বলে, সুরকি চুণ দিল ঘরে,
কি রং এসে ভিয়ান করিল, কেমনে মন্দির বানাইল॥ —ঐ

৭

ও মা ভবানী, আমি কেমন করে গাঁথিব বলো ঘরখানি,
আমার দক্ষিণ ঝড়ে উড়ে গেল,

পুব দিকের ছাওনি, ও মা ভবানী,
আমি কেমন করে রাখব ঘরখানি।
আমার ঘরে ন'টা দরজা।
কপাট দেওয়া নাই—তাতে চোরের হয় মজা।
চৌকিদারের চৌকি দিয়ায়
আমার ভাঙ্গে না মোর ঘরখানি, ও মা ভবানী।
আমি কেমন করে রাখব বলো ঘরখানি।
আমার ঘরে একটি আছে কালবাঘিনী।
আপন ইচ্ছায় খেলা করে দুরন্ত ফণী।
ঘর মেরামত করতে গেলে দংশে ফেলে ও মরি,
ও মা ভবানী, আমি কেমন করে রাখব বলো ঘরখানি।
আর একটি আমার মা কোথায়,
কোন বিদেশী করল ঘর বল মা তারা॥
ঐ জ্ঞানে আছেন তিনি জ্ঞান দিবে সেই রঙ্কিনী,
ও মা ভবানী, আমি কেমন করে রাখব বল ঘরখানি।
বাণেশ্বর কহে, মাতা, আমার বাবা আছে কোথা,
আমার বাবার কেমন বর্ণ বাবায় কভু দেখিনি,
ও মা ভবানী, আমি কেমন করে রাখব বলো ঘরখানি, ও মা ভবানী॥

—পচাপানি (মেদিনীপুর)

৮

ভাবি কথা হে।
এই ভেদো অর্থ ভাবে পণ্ডিত ভ্রাতা হে,
ভাবি কথা হে॥
বলে যাও পিতামাতা পিতামহর কোলে নাতি উদয়,
ভাবি কথা হে।
ভাবি বিরহিণী নাহি গরবিণী বাছুরেতে খাচ্ছে পাতা হে॥
ভাবি কথা হে।
এই ভেদো অর্থ ভাব পণ্ডিত ভাবি কথা হে॥

ভয়ে কাঁপে সিংহ শশক মুখ হেরে।
উই পোকা হয়ে ভল্লুক সংহারে।
ভুল নয়, শাস্ত্রের ফল হে, ভাবি ফল হে,
এই ভেদো অর্থ ভাব পণ্ডিত ভ্রাতা হে।
ভ্রমর রহিল পদ্মমধু ভুলে,
ভেক ফণিকে গিলে কোথা হে।
ভাবি কথা হে ॥
এই ভেদো অর্থ ভাব পণ্ডিত ভ্রাতা হে,
ভাবি কথা হে ॥ —ঐ

গুরু, জনম দুঃখীর কপাল মন্দ আমি এক জনা,
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল,
আমার দুঃখ বিনে সুখ হলো না।
আমার শিশুকালে মরে গেল মা,
গর্ভে রেখে মরল পিতা চোখেও দেখলাম না।
আমায় কে করিবে লালন পালন কে দিবে আমায় সান্ত্বনা।
ও যে ভবের বাজারে ছ'জন চোরে চুরি করে বেঁধলো আমারে,
তারা বিচারেতে খালাস পেল,
আমার হলো জেলখানা, আমি এক জনা।
মনের খেদে দাগা পান,
অন্তিমেতে রেখো, গুরু, যেন না হয় নিধন।
আমি ঐ চরণে শরণ নিব, গুরু, চরণ ছাড়া করবো না।
আমায় চরণ ছাড়া কারো না।
ভকতলাল গোঁসাইয়ের সাজা উচিত বিচার করবেন রাজা।
—বাঁশপাহাড়ী

১০

এমন ঘরে থাকা হলো জ্বালা জ্বালা, জ্বালা হে, এমন ঘরে।
ভেঙে গেছে নদরজা অসংখ্যটা নালা।

ইঁদুরে কুড়িছে মাটি, বাতাসে উড়ায় গো মাটি,
আবার সময় পেলে মারে লাথি চামচিকা শালা।
পচে গেছে দড়ি দড়া শেষ হইল না জল পড়া
আবার উঁই চিংড়া কেঁচে কেওড়া মেঝেয় করে খেলা।
এই ঘরের তিনটি খুঁটি লড়িয়াছে মুধুন্যাটি,
তায় মুধুন্যে ঘুন ধরেছে পড়ছে অকণ বেলা। —ঐ

১১

হরি সাধন বড় ন্যাটা, হরি সাধন করবি যদি,
ডাঙ্গার জল গাঙ্গেতে উঠা।
ওরে জামের ভিতর আমের গাছটি একটি বৃক্ষে আঁটা,
পাঁচ রকমের ফুল ফুটেছে এক রকমের মিঠা।
দু'জন চোরে করছে চুরি রে দুয়ারে চাবি আঁটা।
সে চোর কে যে ধরতে পারে সেই তো বাপের বেটা।
মালখানাতে দিচ্ছে হানা লুঠছে মণি কোটা।
গোঁসাই হরিপদ বলে জন্ম নিলে ঠ্যাঠা।
হরি সাধন করতে এসে গায়ে লাগল আঠা। —বাঁশপাহাড়ী

১২

জমিনে চাষ কর যতনে, নইলে সে আবাদ হবে কেমনে।
ও তুই সামাল তেউর চাষ, জমিয়ে যেন না হয় ঘাস,
ঘাস আবাদ হবে কেমনে।
বাঁধটি বাঁইধেছে বেশ, জল যেন না হয় শেষ,
শেষ হলে আবাদ হবে কেমনে।
বাঁধের উপরে বাঁধ, তার উপরে আছে ছাদ,
সার ছইড়াঞ জল চালাও ও কালে।
ছয়টি বলদ—জোড় তারে, জোড় প্রেমডোরে,
ওই ছয়টি বলদ চালাও সমানে, জমিনে চাষ কর যতনে,
নইলে জীবন বাঁচবে কেমনে।
কোটিতে একজন চাষা, লক্ষ্মণদাসের মিছাই আশা,
নাড়া কুড়াইল ঠিক ঠিক পরাণে। —ঐ

১৩

ওরে মন-জেলে, কেন মর মিছে জাল ঠেলে,
কৃষ্ণপ্রেমের মীন বড় সুকঠিন, হঠাৎ পড়ে না জলে।
জীর্ণ অনুরাগের সূতা ছিঁড়ে যায় টানতে গেলে,
ওরে, মন-জেলে।
মাছ ধরতে বাসনা, জাল ফেলতে শিখলি না,
ওরে, জল দেখে জাল জড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ে না।
শেষে নাড়া ছাড়া গাঁগ্লি কাড়া সার হোল তোর কপালে।
ওরে, মন-জেলে, কেন মর মিছে জাল ঠেলে।
ওরে, তোর একে ছেঁড়া জাল, তাতে ঘটালি জঞ্জাল,
কুবাতাস কুয়াসা লেগে আরও হ'ল কাল।
ও খানেই লইয়ে চাবি ফিরেরে,
তুই জবাব দিবি কি বলে, ওরে মন-জেলে।
ও গোঁসাই শুনতে পেয়ে কয়, জাল ফেলা তোর কর্ম নয়,
ওরে, জল দেখে মাছ জানতে পারে জেলে যারা হয়,
নইলে তুই বা কুথায় সে বা কুথায়—হবে কি বলে,
ওরে, মন-জেলে। —ঐ

মন-ফকিরা, মনের কথা আমাদের গুরুজি তায় জানে ॥
আম পাড়তে মারলাম পাবড় আমাদের পা রইল গাছে,
বাসি ভাতে দাঁত ভেঙেছে সিঁদুর পরবি কিসে ?
চিল বিয়ায় গাছে, বিড়াল বিয়ায় লাছে,
যত ছেলেকে ধরে খাবে দাঁড়কিনা মাছে ॥
হাল জোয়াল মাঠে রে-এ-এ বলদ গাভীর পেটে,
চাষারে, তোর জনম নাই জল খাবার খায় মাঠে রে-এ-এ ॥
চাষারে, তোর জনম গেল মাঠে মাঠে বুইলে,
সমুদ্দুরে জল নাইরে, বাজারে মারে ঢেউ,
বাবারে তোর জন্ম নাই বেটার কোলে বউ ॥

পশ্চিমদিকে মেঘ ধরেছে রে উড়ছে হাঁসা ঘোড়া,
পিয়াদা মুনিষ পাগ (পাগড়ী) বেঁধেছে সরু ধানের চিঁড়া ॥
কুমার ঘরে ছেলে হ'ল কামারিণ খেল ঝাল,
বামুন ঘরে মড়া ম'ল চাষী কামায় হাল রে ॥
রাজার ঘরে চুরি হ'লো পুকুরের পাড়ে সিঁদ,
জলের উপর গামছা বিছান চোরে মারে নিদরে ॥
শাল গাছে শোল পোনা শিয়াল ধরে খায়,
শুকলালবাবু এমনি লোভী পলই নিয়ে ধায় রে ॥ —ঐ

ইহাকে উল্টা বাউল বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্বে 'উল্টা বাউল' দেখ।

:৫

ঘরে বাস করি তবু ঘরে বাস এ লয়,
ঘরের মধ্যে ঘর সে ঘরের চালা নাই ॥
উপর নীচ সমান ঘরের মধ্যে ঘর।
এ ঘরেতে মন-ফকিরা কেঁদে মরে রে,
এ ঘরেতে মন-ফকিরা হেসে মরে রে।
ঘরের উপর-নীচ সমান ॥ —ঐ

কৃষ্ণ বিষয়ক

বাংলা গানের প্রায় সকল বিষয়ের মধ্যেই কোন না কোন ভাবে, এমন কি, রূপকচ্ছলে হইলেও কৃষ্ণ প্রসঙ্গ গিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে। টুস্না গানেরও একটি প্রধান অংশ কৃষ্ণ-বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত। রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গের মধ্যে যেখানে বৈরাগ্য এবং বেদনার ভাব প্রকাশ পায়, প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণবিষয়ক টুস্না গান রচিত হয়।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বহু কৃষ্ণলীলা ঝুমুরও কৃষ্ণবিষয়ক টুস্না গানের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, টুস্না বিচ্ছেদ ও বৈরাগ্যের গান। সুতরাং কৃষ্ণপ্রসঙ্গের মধ্যে যেখানে বেদনা ও বিচ্ছেদের কথা আছে, তাহাই টুস্না, নতুবা অন্যান্য বিষয় কৃষ্ণলীলা ঝুমুরের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিতে

হয়। তথাপি স্থানীয় গায়কগণ কৃষ্ণলীলা ঝুমুরের অনেক গানকেই ঢুয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। সেইজন্য তাহাদের কিছু এখানে উদ্ধৃত হইল, প্রকৃত-পক্ষে তাহা কৃষ্ণলীলা ঝুমুরের অন্তর্গত হওয়াই সঙ্গত।

১

কুহু কুহু স্বরে কোকিলা কুহরে আইল, না ফিরে দিন,
বঁধুর যাওয়া হোল বহু দিন গো, বঁধুর যাওয়া হোল বহু দিন।
এই না, সজনী, বসন্ত কাল, প্রাণকান্ত বিনে একি রে কাল।
গেল বহুকাল, এল না রে কাল, যাওয়া হোল বহুদিন।
কাল কাল করে তনু মলিন, শ্যামসুখ জলে হইল ক্ষীণ।
ডুবেছিল তাতে কিশোরী মীন।
তোরা বল গো, সজনী, বাঁচিব কতদিন।
হয়ে থাকে যদি বারিবিহীন।
কাল বলে কালা গেল এতদিন।
সে অবধি রাতে চোখে নাহি নিদ, কোন অপরাধে বাঁধাল দুদিন।
গুণে গুণে যতির ফুরালো দিন।
যাওয়া হলো অনেক দিন।　　　　　　　—বেলপাহাড়ী (ঐ)

২

বধু, দাগা দিলে বড় সুখের দিনে,
আমার আশায় নিরাশা নিশি জাগরণে।
বঁধু আসবার আশা ছিল।
আমার সে আশা নিরাশা হোল।
সুখের মালা শুখাইল বিচ্ছেদ আগুনে।
প্রাণ-বঁধুয়া আসবে বলে,
আমি সেজ বিছালাম চাঁপার ফুলে।
সেজ বিছালাম বকুল ফুলে।
বঁধু, আমায় ডুবাইলে অকুল তুফানে।
নাই নাই আর নাইরে রাতি,
আমার মলিন হোল মোমের বাতি,
দেখরে, উদয় হোল যতির নিরাশ জীবনে বড় সুখের দিনে।　—ঐ

নয়নে নয়ন দিও না, বঁধু,
তোমার সনে গোপন প্রেম রবে না,
শুন, হে প্রাণনাথ, তোমারে বুঝাব কত,
বুঝালে বারণ তুমি শুন না।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে প্রভাতে জ্বালাতে এলে,
দিতে এলে মনে বেদনা।
চন্দ্রাবলীর ছারকপালী এখন দেখি তুধে বালি।
চিটা গুড়ে বাসনা, নয়নে নয়ন দিও না। —ঐ

৪

তুমি যে লম্পটের গোড়া
তুমি না থাক পিরিত ছাড়া,
পিরিত করা স্বভাব তোমার গেল না।
ওহে বঁধু, ভাল ভুলাতে জান ললনা।
ছলে বলে পিরিত কর—শেষে অবলায় কাঁদায়ে মার।
অবলা কাঁদানো স্বভাব গেল না, ওহে বঁধু;—
বঁড়শি কাঁটায় লাগাইয়া থাক স্থতি ধরিয়া।
জলে মীন পায় কত যাতনা।
যে রূপ তোমার কর্ম, তুমি না জান পিরিতির মর্ম,
দাগা দিয়ে কোথায় রহলে বল না।
তাই বলি গো বিনয় করি বারেক ডাকি, ওহে হরি,
এ দাসের পুরাও মন-বাসনা, ভাল ভুলাতে জান ললনা॥ —ঐ

৫

আজ ফিরে যাও নাগর,
বঁধু হে, তোর অঙ্গ হেরে
আমার গায়ে ভরে জ্বর।
আজকে ফিরে যাও, আসবো বলে আশা দিলি,
কার কুঞ্জেতে রাত পোহালি,
বিহানেতে কেন এলি আমায় বাসলি পর।

মধু ভরা কমল ফেলি নিম রসেতে মন মজালি,
লাল শিমুলে নয়ন ভুলে—তোর এমনি নয়ন।
ছি ছি, বঁধু, লাজ লাগে না,
চিন্‌লি না রং, পিতল, সোনা।
বারে বারে করি মানা, তুই ঢুকিস না হে ঘর।
দেখে দাস যতি বলে নিয়ে তাকে, বঁধু, সুখে কর ঘর। —ঐ

৬

এ যে দিনের বেলা কি করে জানব রে কালা,
সে যে কুলবালা, ধনী বাদী কুটিলা।
বন্দী থাকে সাত মহলে, ফন্দী করে যাই কি বলে,
যদি দৈবে সন্ধি মেলে বাদী কুটিলা।
এমন চাঁপারই ফুলে, কে দিল, ভাই, তোমারই গলে।
তুই আজ ফেললি আমায় মহাগোলে—
এ যে গোপন লীলা।
রাই বলে বাজাবে বাঁশী শান্তি হবে, কালশশী।
নামেতে স্বরূপ প্রকাশি প্রেমেতে মিলা।
আজ রজনী হৈলে পরে, পরে নিলাম সখীদের ধারে
দাস যদি আশা করে যুগল লীলা—এ যে দিনের বেলা। —ঐ

৭

কই গো মাধবী, মাধব এল, ঐ দেখ গো মাধবী ফুটিল গো—
মদন-মোহন না হেরি মদন মদন-বাণে বিঁধিল গো।
মাধবের আশায় ছিল গো সাধ, সে-সাধে বিষাদ বাড়িল গো।
কুঞ্জে না এল বিনোদ, বাড়িল প্রমাদ সাধ-দোষে নিশি পোহাল গো।
হের শুকাইল সুকোমল মাল, সে নীলকমল না এল গো।
বিনে প্রাণকান্ত প্রাণ বুঝি অন্ত,
অন্তে নিশাকান্ত চলিল গো।
হেরলো সজনী, রজনী ঘোর ঘন, ঘন ঘুঘু ঘুবত ঘোর,
সুমধুর স্বরে ডাকে সুখ রবে, ঐ শুকতারা উদিল গো।
মৃদুল বাতাসে মালতী বিকাশে তারারা আকাশে লুকাল গো।

কমল সকাশে পরিমল আসে আশে-পাশে অলি ধাইল গো।
সুখময় রাতি দুখে গেল দূতী নভে নব জ্যোতি উদিল গো।
যুগল সেবার আশায় রহিল দাস জ্যোতি,
তার আশা না পুরিল গো। —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

৮

কস্তুরী ঘষিয়া গায় গো পরি,
গায়েতে ভিজিল অঙ্গের শাড়ি।
এসো এসো ধন চন্দ্রবদন, বদন মলিন হেরি, গো হরি,
এসো, ভাই, প্রেমের বংশীধারী॥ —ঐ

৯

বেলা অবসান কালে যাইও না যমুনার জলে,
ঘরে পরে সবাই পড়শী তাও কি চেতন হয় না।
ঘর করি রাই পরবাসী গৃহছাড়া হইল না,
সঙ্গে যাবি জলে ডুববি, কার পানে চাস না,
নন্দের বেটা চিকন কালা তার পানে চাস না। —ঐ

১০

জয় জয় জয় গুরুদেবার চরণ বন্দন বিমল পায়,
পদ্মরেণু আমি মাখিব গায়, যাহারে দেখিলে শমন ডরায়,
ওরে, ভয়ে পালাইবে যমজ্বালা যাবে,
বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধরেছি পায়॥
নখের কিরণ তিমির বাস, কর, প্রভু, ওই নির্মলে বাস,
জনমে জনমে ভুলিব না ভুলিব না তায়॥
জয় জয়, গুরু, করুণার নিধি, কৃষ্ণ প্রভু মোদের জনমের বাদী,
লগন দাসে কয় কারে করি ভয় ধরেছি চরণে ডরাব কায়॥ —ঐ

১১

বাঁকা নীল যে নীলজ হেরিয়া
সদা প্রাণ তো ওঠে কাঁদিয়া।
জল ভরিবারে নামিলাম জলে
লম্পট এসে দাঁড়াল কূলে।

আমি লাজে লাজে বলি ফিরে যাও চলি,
শ্যামেরে দেখিয়া আমার মন যে গেল ভুলিয়া।
একাকিনী জলে গিয়ে রে, সখী,
বিনোদ কালায় কদম তলায় দেখি।
হেরিতে বিনোদ, শুনিতে বিনোদ বিনোদ সুরে বাঁশী বাজায়॥
বারে বারে বারণ করি বিনোদিনী,
একলা জলে যাসনে আহ্লাদিনী,
ওগো, যদি যাবি জলে যাসনে কদম তলে,
লগনে কয় পদ ধরিয়া॥ —ঐ

১১

আজ এসো হে নবগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ সঙ্গে করি,
আমি মনের আনন্দে তোমার সঙ্গে সংকীর্তনে নৃত্য করি॥
নদের চাঁদ নদে ছেড়ে এস হে হৃদয় মন্দিরে,
আমি তাই না ডাকি বারে বারে উদয় হও হে, উদয়গিরি।
ওহে ভুবনমোহন গোরা, তুমি মনোহর মনোচোরা,
ঐ রূপ না যায় পাশরা হিয়ায় জাগে নব মাধুরী॥
শ্রীচরণ পাইবার আশে আমি তাই ডাকি মনের উল্লাসে,
খেপা বলে অবশেষে দিও চরণ ভবে তরি॥ —ঐ

১২

বলি নিঠুর কালিয়া তুমার বুঝলাম এ কপট হিয়া,
সন্ধ্যা বেলা এসবে বলে ওগো নিশি ভোরে দেখা দিলে,
রাত্রি গেল জাগরণে অনল বাতি জ্বালিয়া, কি নিঠুর কালিয়া,
রাত্রি গেল জাগরণে মনের বাতি জ্বালিয়া। —ঐ

১৩

আমরা প্রেমের মর্ম জানতাম না গো, ওগো তোরা শিখালি,
প্রথম মিলনকালে, ওগো, চন্দন হাতে দিলে।
সুধা বলে গরল এনে আমায় কেনে খাওয়ালি,
প্রথম মিলনকালে, ওগো, কত না আদর করে,

সুধা বলে গরল কেনে আমায় খাওয়ালি,
গলেতে পাষাণ বেঁধে জলেতে ফেলিলি। —ঐ

১৪

ধর গান কৃষ্ণ বলে পইড়ে পরভুর পদতলে,
রাঙা পায়ে নেপুর ও বাজায় গো,
কি দিলে মিলিবে শ্যাম রায়, সখি, বল না আমায় গো,
কি দিলে মিলিবে শ্যামরায়। —ঐ

১৫

শুন গো রাই, বলি তোরে তোর সাথে পীরিত কইরে
আমার এই তো হইল ঘটনা, পইড়ে ফুলের মালা
ধনি, তুমি আর যাতনা দিও না।
আগে কে কি বলেছিলে শেষে না ছাড়বে তোরে,
সে ে ীন প্রেমের ঘটনা।
নব নব তরুয়াসে সব গেল চলি তোমার দোষে।
সে তো আমার যাওয়া হইল না,
মনে রেখ, চাঁদবদনী,'আমায় ভুলে থেক না। —ঐ

১৬

এই তো ভবের নদীতে সই রে ডুব তো দিলাম না।
আমি ডুবি ডুবি মনে করি মরণ ভয়ে ডুব তো দিলাম না॥
ও সে নিত্য গো সই স্নান করি, কুলে বসে ঐ রূপ তো হেরি,
আমি বেড়াই নদীর পারে পারে পাই না ঘাটের কিনারা॥
জলের মধ্যে স্থলপদ্ম তাই বা কত মধুর গো,
কাল ভোমরায় জানে মধুর মর্ম বড় পোকায় জানে না॥
খ্যাপা চাঁদ বা ভুলে বলে, ফুল ফোটে নিগম জলে,
সকলি ফুলে মধু দিলে শিমুল ফুলে দিলে না॥ —ঐ

এই গানের প্রথম চারিটি পদ স্বতন্ত্র কোন গান হইতে আসিয়াছে, শেষাংশের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

১৭

ও প্রাণ সজনী রে, এমন হইবে বলে না জানি রে।
পিরীতি হইল শূল, আর কি বহিবে কুল,
ও প্রাণ সজনী রে, তার লাগি প্রাণ কাঁদে দিবা রজনী রে
কি রোগ দিলে, তুমি ভুলিতে না পারি আমি,
নিশ্চয়ই সজনী রে, ত্যজিব প্রাণ এখুনি রে ॥
হীন নরোত্তমায় ভণে, আর কি বাঁচিব প্রাণে রে,
ও প্রাণ সজনী রে। —ঐ

১৮

সখি, আমার কই, গো ললিতে, নীলকমল।
সখি, কই এ নিকুঞ্জে আইল গো,
আমার সুখ নাই, সখী, বিনে কমল-আঁখি।
ঐ দেখ না শুক উদিল গো, আমার কই গো নীলকমল।
হের নভস্তল হইল নির্মল, সরসী সলিলে ফুটিল কমল,
পরিমল লোভে জুটে অলিকুল,
প্রভাতী পবনে ফুটিল কুন্দ, উপবনে আমার এল না গো বন্ধু,
শ্যামের বিচ্ছেদ খরতাপে শুকায় হৃদয়-সিন্ধু অস্তাচলে ইন্দু চলিল গো।
হের শুকাইল সুকমল মালা, সে নীল কমল এল না গো।
বিনে প্রাণকান্ত, প্রাণ বুঝি অন্ত,
অন্তে নিশাকান্ত চলিল গো ॥
বিভুগুণ গায় বিহঙ্গম কুল, বিভুর বিয়োগে হইলাম আকুল,
বিকশিত হইল মালতী বকুল, কুলচোরা অকুলে ডুবাইল গো।
জ্যোতির বিকাশে গগন তমসা, জয় সুনিচিতে ত্যজিল গো নিশা,
দাস জ্যোতি আশে যুগল দরশে,
চিরদিন আশা রইল গো, কই গো, ললিতে, নীলকমল আমার। —ঐ

১৯

আমার কই গো মাধবী মাধব আইল,
আমার দেখ গো মাধবী ফুটিল গো।

মাধবের আমার ছিল গো সাধ,
আমার সে সাধে বিষাদ বাড়িল গো।
কুঞ্জে এল না বিনোদ বাড়িল প্রমাদ, সন্থ সে নিশি পোহাইল গো॥
হের লো সজনি, রজনী ভোর ঘুঘু ঘন ঘন ঘুর ত ঘোর
সুমধুর স্বরে ডাকে শুক সারী শুকতারা দেখি উদিল গো॥
ঐ দেখ মাধবী ফুটিল গো, আমার হের শুকাইল সুকোমল মালা।
সে নীলকমল এলো না গো, মৃদুল বাতাসে মালতী বিকাশে,
তারকা আকাশে লুকাল গো।
কমল সকাশে পরিমল আসে, আশে পাশে অলি ধাইল গো॥
এ সুখময় রাতি দুখে যায় দূতী নভে নবজ্যোতি উদিল গো॥ —ঐ

২০

যাই গো মথুরায় যাই, আর ভেবো না গরবিণী রাই,
হেসে কথা কও না, রাধে, লোক শুধালে বলতে চাই,
গরবিণী রাই॥
প্রেমডোরি লাগানো হাতে, আনবো শ্যামকে ব্রজের পথে,
লোক শুধালে বলব তারে রাধার প্রেমের ঘাতক নিয়ে যাই।
আর ভেব না, গরবিণী রাই॥
অধম শ্রীপতি ভণে, বড় আশা রইল মনে,
শ্যামের বামে একাসনে যুগল মিলন দেখতে চাই।

২১

মনরে, এ জীবনে প্রণয় করো না,
ও প্রেম ভাঙতে কয়দিন গড়তে কয়দিন তাও কি তুমি জান না।
চণ্ডীদাসের বঁড়শী বাওয়া, আর রজক দিদির কাপড় কাচা,
ও প্রেমে ভুলি মাছ ধরা, তোর হল না—
মনরে, এ জীবনে প্রণয় কোর না। —ঐ

২২

নীলাম্বরী শাড়ী দূরেতে থাকুক।
গেরুয়া বসন, সখী, দাও পরায়ে,
কোন পথে আমার পরাণ বন্ধু গেছে গো, বলে দাও আমায়।

আমি কান্দি চলি ধীরে ধীরে,
কোন পথে মোর বন্ধু গেছে বলে দাও আমারে। —ঐ

২৩

আগুন নিবে না, সই, শ্যাম বিনে,
মন পুড়ে, সই, মনের আগুনে।
রান্না ঘরে রান্‌তে গেলে, কতেক যাই ভুলে,
যখন শ্যামকে মনে পড়ে।
কোন পথে মোর বন্ধু গেছে, বলে দাও আমারে। —ঐ

২৪

বোল বোল নাগর কেন দেরী হইলো,
যোগে যোগিনী বেশী আমায় ঘুরিয়েছিল।
সিন্দুরের ফোঁটা ছিল কাজলের চিহ্ন ছিল আমায় চেনা ছিল,
বোল বোল, নাগর, খুলে বোল কেন দেরী হইল। —ঐ

২৫

বন্ধু আসবে বলে মালা গেঁথেছি চাঁপার ফুলে,
মালা গেঁথেছি বকুল ফুলে, সেও মালা মলিন হইল শেষের রাতে
দাগা দিলে, বন্ধু, সুখের দিনে। —ঐ

২৬

পরথম পিরিতির বেলা নানা ছলে গো বুলাইলে,
গড় করি তোর প্রেমকে।
ঘরে আছে গুরুজনা ভয় করে না তোর মনকে,
গড় করি তোর প্রেমকে। —ঐ

২৭

ও, দয়াল গৌরনিতাই যেচে যেচে যায়,
নাম লবি কে আয় মিলে রে।
সে যে গোপনের ধন, হয় না বিতরণ,
কিশোরীর ভাণ্ডারে ছিল রে,
দয়াল গৌরনিতাই যেচে যেচে যায়।

জগাই মাধাই তারা, অশেষ পাপে ভরা,
কলসীর কানাতে মারে রে।
মেরেছিল হরি বলে কেবা,
সকল জ্বালা যাবে দূরে,
অভিমান শূন্য ফিরেন নগরে
দন্তে তৃণ ধরে রে,
নিতাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলেন, হরি,
তোদের লেগে নামছি রে,
গোরা ভাবে গদগদ পড়েন ঢলিয়া
তু'নয়নে বহে ধারা রে।
নিতাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে,
তোদের পাপের বোঝা আমায় দিয়ে যা।
বিনা মুল্যে নাম দিব রে ॥
তিনি এমন দয়াল—আর হবে না
কলি যুগে হরির লেগে রে,
দাস রাধাশ্যামের গান রচনা,
গোঁসাই গুরুচাঁদের চরণ ধূলি।
গৌরনিতাই যেচে যেচে যায়
নাম নিবি আয় মিলেরে
যে গোপনেরই ধন হয় না বিতরণ,
কিশোরীর ভাণ্ডারে দিল রে। —ঐ

২৮

ওরে, শ্যামের বাঁশী যদি আমি পেতাম
মোহন মুরলী সুরে সবার মন হরেরে—
কালাচাঁদেরও মন ভুলাইতাম।
শ্যামের বাঁশী যদি আমি পেতাম।
মোহন মুরলী সুরে সবার মন হরে।
উচ্চ বেণী বেঁধে দিতিস শিখীর পাখা,
বামে হেলায়ে দিয়ে করে দিতিস বাঁকা।

নীলাম্বর দিয়ে সর্ব অঙ্গ ঢাকা।
বাঁকা হয়ে না হয় দাঁড়াতাম,
শ্যামের বাঁশী যদি আমি পেতাম।
মোহন মুরলী সুরে সবার মন হরে।
কালাচাঁদেরও মন ভুলাতাম,
শ্যামের বাঁশী যদি আমি পেতাম।
ওই বনফুল মালা গেঁথে দিতিস বনে,
বনমালা হয়ে থাকতাম নিধু বনে,
বাঁশী বাজায় গোকুলে কালিন্দীর কূলে,
কালাচাঁদেরও কুলে কালি দিতাম,
শ্যামের বাঁশী যদি আমি পেতাম।
মোহন মুরলী সুরে সবার মন হরে।—পচাপানি (মেদিনীপুর)

২৯

হে মাধব, মরিলে কি ফিরে দেখা হবে।
দিবানিশি তোমার তরে, দু'নয়নে বারি ঝরে,
আমি কাঁদিয়া রাঁধি ঘরে বসে, হে নাগর।
ননদী বাঘিনী মোর নিতুই হানে বাক্যশর।
আমায় বেঁধে যেন পাঁজরে পাঁজরে, হে মাধব,
মরিলে কি ফিরে দেখা হবে।
ব্যাঘ্রের ঘরে মিরগের বাসা,
তার কি জীবনের আশা।
আমি উনমতেতে সদা থাকি ঘরে, হে মাধব,
গোপনে গোপনে আর প্রেম রাখা হল ভার।
খ্যাপা বলে এবারে প্রাণ যাবে, হে মাধব॥ —তিলবানি (ঐ)

৩০

মনে হলে ফাটে বুক মনে হলে ফাটে,
ভাইবন্ধু কে ভরাবে করমের আমার দোষ।
মনে হলে ফাটে বুক, মনে হলে ফাটে॥
এমনি আমার হল্য আশা, যেতে হবে হয়ে নিরাশা॥

ভবে বসে রইলাম খ্যাপাহৃদে জীবন বৈমুখ ॥
এমনি আমার কপাল মন্দ, কোন সত্যের সঙ্গে না হয় সন্দ,
পথ হারালে কপাল মন্দ হৃদে জীবন বৈমুখ।
যেদিনে হয় বিজয় হবে, আশা বিষয় সব ফুরাবে,
গুটি গুটি যেতে হবে সেদিন মরিবে সুখ ॥ —ঐ

৩১

শঠের সঙ্গে প্রেম করে মরিয়াই রয়েছি।
সুহৃদ জানিয়ে গো পিরিত করে ঠকেছি ॥
শুন শুন, ওগো দূতী, কি যাতনাই পেয়েছি।
না বুঝে সুঝে গো পাথার জলে ভেসেছি ॥
সুহৃদ জেনে গো পিরিত করে ঠকেছি।
জ্বালিয়া মোমের বাতি, বিনা সুতায় মালাগাঁথি,
নিঠুর কালায় দিয়েছি ॥
সুহৃদ জানিয়ে গো পিরিতি করে ঠকেছি।
হেন বজ্ররামে বলে কত ভুল করেছি ॥ —ঐ

৩২

পিরিতি পরম পীড়ারে পিরিতি পরম পীড়া,
পিরিতি সাগরে হেলিয়ে দুলিয়ে
পিরিতি করেছি ভ্যালারে ॥
পিরিতি হইল পিত্ত সন্নিপাতে চিন্তাতীত চিত্তে
ধরিয়াছি বাত কফ বল সখি কে দেখিবে হাত,
প্রাণবঁধু, দেহ ছাড়ায়ে, পিরিতি পরম পীড়া ॥ —ঐ

৩৩

সাঁতার দিচ্ছি ভব জলে নইলে জীব তরিবে কেমনে।
সাঁতার দিচ্ছি ভব জলে ॥
যদি হত চিংড়ি পুঁটি, যেতে হত গুটি গুটি,
ঘুরাই মারবে ঘুণ জালেতে, সাঁতার দিচ্ছি ভব জলে ॥
যদি হত গড়ই শোল তা'হলে তো বড় গোল।
পাশি আড়া আছে দলের তলে, সাঁতার দিচ্ছি ভব জলে ॥

হেন পরাণে বলে, গুরুপদ ধর ভবে,
তবে তিনি তুলে নিবে কোলে।
সাঁতার দিচ্ছি ভব জলে।

৩৪

হরি বল রসনা, পুরাও মনের বাসনা,
এমন জনম গেলে আর ফিরে হবে না।
অসৎ বলোনা রসনা অসৎ ক্রিয়া করো না।
কামিনী কাঞ্চন
কারো বারণ শুন না। শেষে পাবি যাতনা,
ও মন-রসনা, পুরাও মনের বাসনা,
এমন জনম গেলে আর ফিরে হবে না। -ঐ

৩৫

ঘরেতে ঘর করে যে জন ঘরেতে ঘর করে,
এমন কেউ আছে সুতার দেখি না সংসারে,
ঘরেতে ঘর করে যে জন ঘরেতে ঘর করে।
এমন কারিগরের অনুক্ষণ
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে
একটি জায়গা আছে ধরা,
তে আলার উপরে, রে মন,
ঘরেতে ঘর করে যে জন, ঘরেতে ঘর করে।
এমন কেউ আছে,
যে বলেছে সত্যকথা বিষয়কে রেখেছে আড়ে
ঝাঁপায়া দুয়ার,
ঘরে কুলুপ কোথাও নাই তার চোরে শূন্য করে যে,
ভাবি বিরুয়ায় ভণে এ ঘর দেখিয়া,
ঘরের পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ছাতটি দেখেছি,
পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ।
ঘরেতে ঘর করে যে জন, ঘরেতে ঘর করে যে
এমন কেউ আছে ছুতার। —ঐ

৩৬

পাষাণ মন্দিরে লোহার কড়ি দিয়ে।
তাও তো ঘুনে গ'লে যায় রে॥
কত লীলা কর এ সংসারে।
হরি দুঃখ দিয়েছ যে জনেরে
কত লীলা কর এ সংসারে॥
আওল জমি চইষে তবু শস্য নাশে।
পাকা ধান চোরে লেই কাটে॥
ওরে অভাগ্যের দোষে লাতি পুত্র নাশে।
হরি, দুখ দিয়েছ যে জনে,
কত লীলা কর এ সংসারে॥

৩৭

আমি প্রেমের মরম জানতাম্ নাগো প্রেম তোরাই শিখালি,
সাতে পাঁচে গোলমালে, গলে পাষাণ বেঁধে দিলি,
প্রেম তোরাই শিখালি।
যে ফিরে গো বনে বনে, সে প্রেমের মরম জানে,
নইলে কিগো গোষ্ঠ মাঝে করে কালায় রাখালি,
প্রেম তোরাই শিখালি।
আমি প্রেমের মরম জানতাম নাগো,
প্রথম পীরিতি কালে এনে চন্দ্র হাতে দিলে,
প্রভাকরে সুধা বইলে গরল কেনে খাওয়াইলি,
প্রেম তোরাই শিখালি।
অধম শ্রীপতি বলে শেষে আমায় কাঁদালি। —ঐ

লৌকিক

বাংলা লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে যদি কোন উচ্চ ভাবমূলক সঙ্গীত কোন অঞ্চলে প্রচার লাভ করে, তবে তাহার পার্শ্বেই ইহারই একটি অধঃপতিত রূপও প্রচার লাভ করিবে। উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়ার মত উচ্চ ভাবমূলক সঙ্গীতের পার্শ্বেই চট্‌কা নামক এক অতি লঘু ভাবমূলক

সঙ্গীত প্রচলিত আছে। সমাজ-মানসে এই শ্রেণীর গান এক একবার একটু লঘু অবকাশ (relief) সৃষ্টি করে। ঢুয়ার মত বৈরাগ্য এবং বেদনার গভীর ভাবমূলক সঙ্গীতের পার্শ্বে এক শ্রেণীর লঘু বিষয়ক গানও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে লৌকিক ঢুয়া বলা যায়। ইহার গানের তাল দ্রুত, সুর লঘু। তথাপি ঢুয়া গানেরই ইহা একটি রূপ। সাধারণ গায়কেরা ইহাকেও ঢুয়া বলিয়া নির্দেশ করে।

১

কলি কলি, বঁধু, নিমফুলের কলি,
মোকে সাজে না লো, মোকে শিমুল কুঁড়ি। —বাঁশপাহাড়ী

২

আধলি নিলি না কেন মাকুড়ী হাঁড়িতে ভরা—
এতদিনে, রে বন্ধু, শুনিলাম কথা।
নীলচাঁদের ধব জামা স্যুটকেশে ভরা,
এতদিনে, রে বন্ধু, শুনিলাম কথা॥
বাড়ী বাড়ী ফুটে হর-গৌরী গেঁদার ফুল,
মালাদহে ফুটে লাল শালুকের ফুল॥ —ঐ

৩

ডুবালি সতীন বাদে, ডুবালি আমায় গো সতীন বাদে।
অনেকক্ষণ উনানশালে রইলি বসে,
চাল ফেরাতে গেলি ভুলে।
ঐ ঝুঝরি কাঠগুলা দে না আসল গাঁই[১] গো,
সতীন বাদে ডুবালি আমায় গো সতীন বাদে।
কুখি ডালের ঝোল রেঁধে, দে না ফেলে হলুদ জলে,
ধনিয়া জলটা দে না মেশায় গো।
সতীন বাদে ডুবালি আমায়॥
শোন্‌লা শাকে ঢালা মাড়ে, বাঁধ ছোট্‌কী চাঁড়ে চাঁড়ে,
ঐ বাবুরা আসছেন সিনায় গো।
সতীন বাদে ডুবালি আমায়॥ —ঐ

১। জ্বাল।

ইতালীর একজন জ্যোতিষ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ১৯৬২ সনের ১৪ই জুলাই তারিখে সন্ধ্যা ৭টার সময় পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহা সংবাদপত্রে প্রচার লাভ করিয়া সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। নির্দিষ্ট সময় নিরাপদে অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পর নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচিত হইয়াছে।

৪

শুনেছিলাম ১৪ই জুলাই-এ পৃথিবী লয় হবে সন্ধ্যাকালে।
ইতালীরা করল প্রচার সৃষ্টিনাশের প্রলয়ে।
ফাটবে বোমা ফাটবে ভূমি ভাসবে বন্যার জলে,
সৃষ্টিনাশের আতঙ্কেতে আঁতকে উঠি সকলে।
কি রকমে থাকবে জীবন, প্রাণ থাকে কুথা গেলে।
ছাত্ররা সব দাবী চাহে বন্ধ রাখতে ইস্কুলে,
বিধান সভা বন্ধ রাখবে, বলেন একজন এম, এল, এ।
গন্‌তে গন্‌তে এলরে দিন আটটা বাজে ঘড়িতে,
প্রলয় থেকে মুক্তি পেয়ে নাচে লোক সকলে॥ —ঐ

৫

ঘরে নাই যার ছিঁড়া কাঁথা, হাট গেলে তার পায়ে জুতা,
হাতে নাই যার পয়সা কড়ি, আগে শুধায় পানের দর,
দিনে দিনে উঠেছে লহর গো এমনি কলির বিবেচনা,
চিনা যায় না বাংলা সাঁওতালে কান কাইটে দিল কায়স্থর। —ঐ

৬

বামুন হয়ে লুঙ্গি পরে বিষ্টু পুজার ফুল তুলে।
দিনের বেলায় হরেকৃষ্ণ রাত্রিতে যায় রাসমহলে।
কলি তোর আমলে।
কত রঙ্গ দেখালে কলিকালে, বাপকে বাপ বলে না রে,
ডাকতে হলে ডাকে মুরুব্বি বলে, কলি তোর আমলে।
জমি জায়গার ভাগ না দিলে, বাপ বেটাতে মামলা চলে।
মিছা কথা সাক্ষী কইরে দুটি টাকা ঘুষ পাইলে,
কলি, তোর আমলে কত রঙ্গ দেখালে কলিকালে। —ঐ

আমি পরব মীনা মাকড়ী সাধ গেছে ভারী,
পইরবো পইরবো মনে করি কিনে দেয় শাশুড়ী,
সাধ গেছে ভারী।
বড় ভাসুর ঘরের কর্তা, আমি বলব তারে মনের কথা,
ঘরের কর্তা বলে, মোদের নাইকো গো পয়সাকড়ি,
আমার সাধ গেছে পরতে মীনা মাকড়ী।
খোকার বাবা ঘরে এলে, মনের কথা বলব তারে,
আইস শ্রীপতি চলে যাও তবে বাপের বাড়ী,
সাধ গেছে ভারি, আমি পরব মীনা মাকড়ি। —ঐ

ঢেঁকির গান

ধান ভানার গানকে ঢেঁকির গান বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। ইহা কর্মসঙ্গীত (work-song)-এর অন্তর্গত। ইহা একক সঙ্গীত নহে, সমবেত সঙ্গীত। তালই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে।

নব ঢেঁকিয়ারে, সামায় ভানে ধান,
কুলাটি বলে ভাইরে—আমার ডোমেরি গড়ন,
নব ঢেঁকি ধান ভানে আমি করি ঝাড়ন।
নব ঢেঁকিয়ারে……
গড়টি বলে ভাইরে—আমি মাটির ভিতর,
নব ঢেঁকি ধান ভানে ছাতির উপর।
নব ঢেঁকিয়ারে……
ঢেঁকিটি বলে ভাইরে—আমি কুসুমের মোড়া,
নব ঢেঁকি ধান ভানে আমি করি গুঁড়া।
ঢেঁকিটি বলে ভাইরে, আমি নারদের হাতি।
সর্বাঙ্গ থাকিতে আমার নেজে মারে লাথি॥

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

২

হেলায় গুচাইলাম বেলা ঢেঁকিয়ে বান্দে ধান রে,
চলরে কল্‌সী যাবো ঢেঁকির কান্দে ধানরে। —বাঁশপাহাড়ী

৩

ও নব ঢেঁকিয়ারে, সামালে কুট ধান, কুট ধান।
ঢেঁকিটায় বলেরে, ভাই, আমি নারদেরই নাতি,
অষ্টাঙ্গ থাকিতে মোর ল্যাজে মারে লাথি।
ও নব ঢেঁকিয়ারে ··· ··· ··· ··· ॥
আঁকশোলোয়াটা বলে রে, ভাই, আমি এক রিত্যে কাঠ,
আমি না থাকিলে ঢেঁকি চিৎ পট্টাং কাত।
ও নব ঢেঁকিয়ারে ··· ··· ··· ··· ॥
চুস্‌লিটায় বলে রে, ভাই, আমার লোহার বাঁধা মুখ,
আমার এঁটো খেয়ে যত চাঁদ পারা মুখ।
ও নব ঢেঁকিয়ারে ··· ··· ·· ··· ॥
পায়া দু'টো বলে রে, ভাই, আমরা দু'টি ভাই,
নব ঢেঁকি ধান ভানে আমরা গীত গাই।
ও নব ঢেঁকিয়ারে ··· ··· ··· ··· ॥
আর ঝাঁটাটায় বলে রে, ভাই, আমার কোমরে বাঁধা দড়ি,
নব ঢেঁকি ধান ভানে ঝাঁটায় জড় করি।
ও নব ঢেঁকিয়ারে ··· ··· ··· ··· ॥
কুলাটায় বলে রে, ভাই, আমি বাঁশেরই পাতুলি,
নব ঢেঁকি ধান ভানে লিকায় আর পাছুড়ি।
ও নব ঢেঁকিয়ারে ··· ··· ··· ··· ॥ —বাঁশপাহাড়ী

ঢেঁকি মঙ্গল

পশ্চিম বাংলার প্রাধানতঃ রাঢ় অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের পুজার বিশেষ অনুষ্ঠানে এক শ্রেণীর আচার-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাকে ঢেঁকিমঙ্গলা গান বলে। ধর্মঠাকুর পুজার ধান ঢেঁকিতে ভানা হয় বলিয়া ঢেঁকিকে দেবাংশসম্ভূত এবং পবিত্র বলিয়া মনে করা হয়। সেইজন্য এই উপলক্ষে তাঁহার নামে মঙ্গলগান গীত হয়। এই বিষয়ে যে সঙ্গীতটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, তাহার ভাষা

হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। আচার-সঙ্গীত মাত্রেরই ভাষায় প্রাচীনত্ব সর্বদাই রক্ষা পায়।

১

কৌতুকেত দেবগণ করিতে মঙ্গলন
বসিলা বম্ভা, বিষ্টু, হর।
তেতিস কোটি দেব বসিলেন সব
গন্ধর্ব কিন্নর॥
পণ্ডিত চারিজনে আনন্দিত পুর মনে
দ্বাদশ ভকত আনি।
মুক্তাহার ধান্য আনি মুকুতা প্রবাল মানি
দুর্লভ জগতেত বাখানি॥
কোটাল চারিজনে আদেশে দেবগণে
নারদে আনাহ ত্বরাগতি।
চলিল ততঃপর মুনি বরাবর
কহিল দেবর ভারতী॥ —বাঁকুড়া

ঢেঁকি বরণের গান

মৈমনসিংহ জিলার হিন্দু বিবাহের আচার-সঙ্গীতে এক শ্রেণীর মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে ঢেঁকি বরণের গান বলে। যে ঢেঁকিতে বিবাহের মঙ্গল দ্রব্য, যথা হলুদ ইত্যাদি কোটা হয়, সেই ঢেঁকির প্রশস্তি কীর্তন করিয়া গান গাহিবার রীতি প্রচলিত আছে।

১

এ নারদ মুনি বরিবারে কি কি দ্রব্য লাগে।
তেল লাগে সিন্দুর লাগে লাগে গুয়া পান।
আর লাগে নারদ মুনির দূর্বা আর ধান॥ —সেরপুর (মৈমনসিংহ)

২

সুমন্ত্রের বাণী শুনে রাজরাণী।
বলিলেন তখনি, কৌশল্যা গো রাণী॥
আন এয়োগণ যত ছানার সন্দেশ তত।
তেল সিন্দুর দিয়ে ধান্য ভানে রাণী॥ —ঐ

তত্ত্বসঙ্গীত

এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতকে তত্ত্বসঙ্গীত বা তত্ত্বমূলক সঙ্গীত বলিয়া নির্দেশ করিলেও তাহার সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, তত্ত্বসঙ্গীত বলিতে দেহতত্ত্বের গান, গুরুবাদী গান, বৈরাগ্যের গান, এমন কি, সুফীতত্ত্বের গানও বুঝাইতে পারে ; অথচ ইহাদিগের প্রত্যেকটিকেই স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিবারও প্রয়োজন আছে ; প্রকৃতপক্ষে তাহাই করাও হইয়াছে। সুতরাং এখানে সাধারণভাবে তত্ত্বমূলক কয়েকটি সঙ্গীত উল্লেখ করা গেল। দেহতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর তত্ত্বসঙ্গীতেরই কিছু কিছু নিদর্শন এখানে পাওয়া যাইবে। বাউলও একটি তত্ত্ব, তবে তাহার কথা এবং গান স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। নিরক্ষর মানুষের মনেও জীবন এবং তাহার তত্ত্ব সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসার একদিন উদয় হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে তাহারই প্রকাশ দেখা যাইবে। কোন নিগূঢ় দার্শনিক চিন্তার কথা ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই সত্য, তথাপি ইহাদেরই পথ ধরিয়াই যে একদিন উচ্চতর দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ একদিন প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

১

পুরব পছিম উত্তর দক্ষিণ কোন দিকে তোর মাথারে—
মায়ের গর্ভে ছিলিস বাছা রাধে বলিস কোথায় রে।
যেদিন ছিলিস লতায় পাতায় সে ফলটি পালিস কোথায় রে—
মানুষ হয়ে ভাব জান না ই প্রেম তু পালিস কোথায় রে।

—অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

২

সব জীব জন্মিল জলে, সেই জল ছিল কোন্ পাতালে,
সেই জল কে আনিল হেথা হে।
সেই জলের কেবা মাতাপিতা,
জলে শিব জলে জীব, জলে নব খণ্ড দ্বীপ।
ব্যাসের কলম আছে যেথা হে॥

বেদ পুরাণ আদি যত পাতাল ভেদী অনাপ
অজপা আছে তথা হে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পশুপতি সেই জলে উৎপত্তি।
সেই জল প্রেম সুতায় গাঁথা হে ॥
সত্য ত্রেতায় আসি কলি যুগে প্রেম মিশি
সেই জলে ব্রজুর জন্ম হেথা হে ॥ —পুরুলিয়া

দেহের গুমর করিস্ না আর এ ভব সংসারে,
শুন বলি সবারে আছ এখন বাঙ্গলা ঘরে,
যত্ন কর পরিবারে ভেবে দেখ্ মন কেউ হবে না কারে।
কুটি কুটি ঢাকাই শাটি, মাটির সঙ্গে হবেক মাটি,
আলবেট কাটা মাথার কাঁটা সকল যাবেক দূরে।
পাগল গোঁসাই নাম, তিলুড়ী গাঁয়েতে ধাম,
বাঁকুড়া জেলাতে তার বাস।
ছোট সে পড়ে প্রেমের ফাঁদে কি বলিব প্রাণ কাঁদে
ফাঁকি দিয়াছে সে আমারে গো বারে বারে।
সেদিন ভাই-বঁধু আসবে দৌড়ি
সবাই যাবে গড়াগড়ি পাকাইয়ে শিয়ালীর দড়ি,
সবাই মিলে বাঁধবে এঁটে চারজনা উঠাবে খাটে
লয়ে যাবে তোরে ভবের বাজারে। —তিলুড়ি (বাঁকুড়া)

৪

নাই ব্রহ্মা হরিহর, নাই চন্দ্র দিবাকর,
নাই ক্ষমা পবন আগুণি
শুনাই প্রেম ধ্বনি উপজিল কিরূপে মেদিনী
জলরব খণ্ড মহী তাহাতে জন্মিল দেহী
তার গুরু কে ছিল তেমনি ওরাই প্রেম ধনে ধনী
উপজিল কিরূপে মেদিনী,
লাল কমল দল তার কত ফোটে ফুল,

তারি তলে কে ছিলো তেখনি, ওরাই প্রেম ধনে ধনী
হেন গোবিন্দের বাণী নাই ক্ষিতি নাই জানি
কহ, সাধু. শ্রীমুখেতে শুনি ॥ —বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

গোবাস গোফাঁদ কাটিব কেমনে।
সে সমস্তে জোড় হস্তে করছে ছেদন।
গোনা দিন ফুরাল রে মন, শ্রীহরি বলরে বদন ॥
কেবা কার কার বা তুমি কে করে তার পুণ্য।
আপন আপন খাতা সই কর জনে জনে ॥
ভবের হাট বড়লাট থেকো সাবধানে।
রাখো লভ্য দেখো পূর্ব লেই নাই যেন ছিনে।
গোনা দিন ফুরাল রে মন, শ্রীহরি হরি বলরে বদন ॥
কলিতে কি তাইতে হরি বিনে কে চিনে।
শ্রীহরি হরি বলিরে বদনে ॥ —ঐ

৬

ইহ জীবন আধাদিন লাগি,
নাচিয়ে লহ রে, মন, হাসিয়ে লহ রে মন,
ইহজীবন আধাদিন লাগি। —ঐ

৭

রতন লিয়ে কি হবে রে, গুরুর কথা শোন,
রতন যে তোর সঙ্গে নাহি যাবে, কেন তবে মিছা
রতনের লাগি ধাও হে ॥
গুরুর কথা শোন সে রতন তোর চোখে নাহি ভালে,
সে রতন তুমি ছুঁইতে লারিবে।
তবু সে রতন অমূল্য হে ॥ —ঐ

৮

কোনখানে গেছিলি রে মন—
যখন আমি তোর লাগি,
দুয়ারে বসিয়ে কাঁদি।

তখন তুই কেনে ডাকিলি না আমায়।
তোর লাগি প্রাণ কাঁদে, তুই তবু যাবি কাজে।
আমার কথা কেন ভাবনা রে মন। —ঐ

৯

ঠাকুর ঠাকুর কর রে, মন, ঠাকুর কোথায় পাবে,
দেখ দিল দরিয়ার কপাট খুলে দেখবে জগন্নাথে।
হেন নিধুর বনে সখীদের সনে খুব আলাপন॥ —ঐ

১০

দেহের বিচ্ছেদে রাজারই অন্ন, খায় গৃহে চারি বর্ণ
স্বর্গে দিলে খায় ব্রহ্মচারী, ক্ষুদা প্রমাণে আশা না মিটে ক্ষুদা
হরি নামটি যেন ত্রিপুরারি হে, আমায় দেখা দাও, বংশীধারী
-পুরুলিয়া

১১

হরি নাম কি বঝা বঝা, নাচনি নাচে পাবে মজা,
গিরগিটি টিকটিকি ছুঁচা ইঁদুর পর্যন্ত, নেশা লাগি গেলা চূড়ান্ত॥ —ঐ

১২

বন্দি প্রভু নারায়ণ আদি ব্রহ্ম সনাতন অনাদি পুরুষ ভগবান,
হরিহর এক দেহ ভিন্নভেদ নাহি কেহ এই চরণে বন্দি।
মহিমা না যায় বন্দন, এসো মা গো অসুর-নিধন,
মুনি ফণী নাহি জানি নিজগুণে করেছি কারণ,
এমনি মন্ত্র সূতা দিয়ে গাঁথ বেণী যেন না যায় পাসুরা।
আয় বীণাধারিণী, তুমায় ডাকি উচ্চস্বরে গো,
আয় বীণাধারিণী॥ —ঐ

১৩

নারীর সঙ্গে পথে যেতে, কত না আমোদ পথে॥
সাধুজন ও গুরুজন, মানব জীবন হয় মিলন॥
মরিলে মানুষ জীবন হয় কি মিলন॥ —পচাপানি (মেদিনীপুর)

১৪

জোড় করি দুটি হাত বন্দি গুরু জগন্নাথ ভদ্র সুভদ্র ভগিনী।
লীলা প্রকাশ শিবের ছলে, দক্ষিণ সমুদ্র কূলে ॥
লীলা প্রকাশিলে বৈদ্যরূপ ধরিয়ে, আমায় দেখা দাও, বংশীধারী।
দীনহীন কানাই বলে যেন চরণ দুখানি মিলে ॥
এখন কানাই লাজের ভিখারী হে।
আমায় দেখা দাও, বংশীধারী ॥

১৫

ছজন চোরে চুরি করে কিছু নাই রে আর,
ঘর হয়েছে অষ্টকাল, রইবি নারে কালে কাল।
মন হয়েছে ঘর চতুর্দিকে দশ দুয়ার।
দেখিতে সুন্দর অতি মধু যে দিয়েছ বাতি
ব্রহ্মাণ্ড করেছ আলো ঘরে অন্ধকার।
যবে হয়েছে উড়ি ছাওয়া, একটি নাই খুঁটি দাওয়া,
দেখি নাই এমন ঘর, বাস আছে দুয়ারে আর
পরের ঘরে বাইরে বাসা, লগন দাসের কি দুর্দশা,
ভাবনা জিনি ভাবতে হলো সারাসার।

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

১৬

যেদিন আসবে রে শমন।
সেদিন কি বলিবে মন ॥
দেখ হেলায় হারালে রতন।
চিরদিন সুখে যায় না জীবন ॥
ভালবাসা কাঁদে দু'দিন ও চারি।
দেখ মা জননী কাঁদে আজীবন ॥
পড়ে রইল বিষয় রত্ন ধন।
চারি জনে মিলে লিবে কাঁধে তুলে ॥
দেখ শ্মশানেতে গিয়ে করে গমন।
চিরদিন সুখে যায় না জীবন ॥

চিল ও শকুনি করে টানাটানি।
আনন্দে খাইবে শিবাগণ।
চিরদিন সুখে যায় না জীবন ॥
ফিরে আসবার বেলা পথে দিবে কাঁটা,
তখন ভুলে যাবে সকল বন্ধু জন।
(দেখ) পড়ে রইল বিষয় রতন ॥
ওমন কেইসে ভুলেছ ভুলারে।
যেন কফে ঘিরাছে গলা ॥
বলতে লারবে হরি।
সব যাবে পাসরি ॥
মানুষ জনম জলেরও ব্যাংগল।
কেইসে ভুলেছ ভোলারে ॥ —ঐ

১৭

এক তরুবর পঞ্চশাখা, পঞ্চ বক্ষে পত্র আছে অলেখা,
তিনপুর ছায়া ব্যাপিবে বিনা ফুলে দেখ দুই ফুল আছে।
বিনা স্বরে রস ভরায়ে, সাধুজন দেও নেহে বলিয়ে,
গুরুজন দেও হে চিনায়ে।

১৮

ফুলের মধ্যেতে সুখের বসতি তিথি নাই আসে বলি এ
সেরূপ স্বজাতি সাথে সে যুবতী পঞ্চডিম্ব গেছে পাড়ি এ। —ঐ

১৯

পঞ্চ ডিম্ব ছেলা একটি লেখা নিজে উড়ে বসে,
কিন্তু বাপেরা পাখী নাই জানে পিতা বলিয়া।
ছায়েরি গর্ভেতে মায়েরি জনম কে বা লেই স্বামী চিনি এ। —ঐ

২০

সার দৃষ্টি যে না পাইবে, গুরু চক্ষুদান দিলে সে চিনিবে,
জিজ্ঞাস গিয়ে গুরুকে দিএ কাষ্ঠের ভিতর আছে সে আগুন,
যতনে লেই খুঁলিএ, গুরুজন, দেও নাই হে বলিয়ে,
সাধুজন দেও নাই চিনায়ে।

২১

নারী কই আপন না হল আপন,
ধন কুল মান দিয়ে কত করি যতন।
নারীর দুরন্ত মতি মন মত পেয়ে পতি
তথাপি না যায় পুরতি থাকিতে জীবন। —বেলপাহাড়ী

২২

জান রে মন পঞ্চতত্ত্ব,
ব্রজগোপীর ভাব নিয়ে বসে থাক রে।
আমার মন গুরু ভজ রে॥
গুরুর জ্যোতে জ্যোতি মিশাইয়ে থাকরে মন ঐ রূপ ধইরে,
গুরুরূপে গৌর হরি দেখা দেবে রে।
আমার মন, গুরু ভজ রে॥
শোন মন, বাল তোরে, তীর্থে যাওয়ার কাজ কি ওরে,
সর্বতীর্থ আছে গুরুর চরণকমলে রে।
আমার মন গুরু ভজ রে॥ —ঢাকা (১৩২১)

তর্জা গান

বহু প্রাচীন কাল হইতেই বাংলার লোক-সঙ্গীতের বিশেষ একটি রূপ হিসাবে এদেশে তর্জা গানের প্রচলন আছে। আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত বৃন্দাবন দাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত নামক গ্রন্থে তর্জা গানের এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 'আর্যা তর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।' তর্জা শব্দ ছড়া অর্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দীর্ঘ কালের ব্যবধানেও ইহার অর্থের কোন পরিবর্তন হয় নাই। তর্জা শব্দে এখনও প্রধানতঃ ছড়াই বুঝায়। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিওয়ালার গানের মধ্যে তর্জা গান প্রবেশ লাভ করিবার ফলে ইহা দ্বারা দুই দলের ছড়াদারের মধ্যে প্রশ্নোত্তর বাচক ছড়াজাতীয় গান বুঝায়। বর্তমানে কবিওয়ালার গানের দল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াও তর্জা গান স্বাধীন ভাবে গীত হয়। তাহাতে একজন ছড়াদার ছড়ার ভিতর দিয়া একটি প্রশ্ন করিয়া

যায়, তাহার প্রতিপক্ষ তাহার জবাব দিয়া আর একটি চাপান বা নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যায়। নানা পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিক ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়াই তর্জা গান রচিত হয়। সমাজের মধ্যে ইহার জনপ্রিয়তা এখনও লোপ পায় নাই। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ ভাগীরথীর দুই তীরে ইহার প্রচলন সর্বাধিক।

তর্জা গানে প্রথমেই বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায়—

বন্দনা

বন্দি দেব নিরঞ্জনে, যাঁরে বন্দে সর্বজনে
এ ভুবনে মাহিমা যার অপার।
আর ইন্দ্রসভা-চন্দ্রসভা মনোহর মনোলোভা
প্রভা যার বিশ্বের মাঝার॥
নমঃ মাতা নারায়ণী, শিব-সীমন্তিনী,
কৈলাসবাসিনী গিরিসুতা।
তৎপরে মুষিক বাহনে, এক দন্ত গজাননে,
সর্বজনে যিনি হন সিদ্ধিদাতা॥
আর বন্দি সেই সদাশিবে, তরিবারে সবজীবে,
অবতীর্ণ এই ভবে, বিভূতি-ভূষিত যার কায়।
আর বন্দি ইন্দ্রে, সূর্য আর চন্দ্রে, এ বিশ্বমন্দিরে,
সর্ব কীর্তি যাঁদের দয়ায়॥
গরুড়বাহন নারায়ণ, ঢেঁকিতে ব্রহ্মার নন্দন
ছাগপৃষ্ঠে হুতাশন, সে সবারে।
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম সার, যাঁর কৃপায় হবো পার,
এ ভব সংসার, তাঁরে বন্দি বারে বারে॥
আর আমার পিতামাতা, যাঁরা মোর জন্মদাতা,
ত্রাণকর্তা তাঁদের চরণ বন্দি বারংবার।
দেব দ্বিজ শ্রীচরণ, জ্ঞানী, গুণী, সভাজন, কীর্তিমান মহাজন,
তাদের চরণে মোর নতি অনিবার॥

শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু, যাঁরা মোর কল্পতরু,
যাঁদের দয়ায় এ বিশ্বমরু সজল, সরস আকার ধারণ করে।
তাঁদের শ্রীচরণে, প্রণাম করি মনে প্রাণে,
তাঁদের কৃপা-বরিষণে আজ কোন রকমে যাবো তরে ॥
বন্দি মাতা বীণাপাণি, শ্বেতবরণী শ্বেতাঙ্গিনী,
বস মাগো বাগ্‌বাদিনী মম কণ্ঠ মাঝারে।
মাগো, তব দয়া হলে, তরে যাবো অবহেলে,
দেখিস, মাগো, ঠেলে ফেলে দিস না আজ আমারে ॥
এই পর্যন্ত হলাম ক্ষান্ত, বলবো না অত্যন্ত,
নাইকো এর আদি অন্ত অনন্ত আকার।
সর্বজনে বদন ভরি, বলুন একবার হরি হরি,
ও, সেই গোকুলবিহারী বিনা গতি নাহি আর ॥
বন্দনা পালা সাঙ্গ করি, তরজা গানের সূত্র ধরি,
কিছু কিছু হবে আলোচনা।
আপনারা সব ধৈর্য ধরে শুনবেন একটু দয়া করে
যা হবে আজ কল্পনায় আল্পনা ॥

চাপান

এইবারেতে তরজা গান আরম্ভ যে হবে।
দশ জনে সভাস্থানে বসে শুনতে পাবে ॥
তরজার বিষয় বিষয় আশয় এখানে হবে না।
সাদাসিদে করবো তরজা আমরা দুই জনা ॥
ও ভাই, ঢুলী, ঢোল খুলি বাজাও তো ভাই ঢোল।
তাক্ ডুবাডুব বাজাও তুমি ছাঁকা ছাঁকা বোল ॥
আমার হেথা বলবার কথা বেশী কিছু নাই।
পাল্লাদারের ঘাড়ে কিছু চাপান দিয়ে যাই ॥
চাপান করে চাপান কেটে চাপান দিতে হবে।
তরজা গানের তরজমা আজ এইখানেতে হবে ॥
শিবের নাম ত্রিপুরারি কেমন করে হলো।
ঠিক যথার্থ করে অর্থ আজকে হেথায় বলো ॥

আরও একটি নাম শিবের গঙ্গাধর হয়।
এ নামের কি কারণ—বসন ভূষণ ত্যজি মহাশয়।
হাড়ের মালা গলায় নিয়ে ভাং ধুত্‌রা খায়॥
থাঁটি থাঁটি পরিপাটি ঠিক বলে যাবে।
আঁখি ঘুরিয়ে ফাঁকি দিলে কানমলাটি খাবে॥
তোমার পাল্লা তুমি করো আমি বসি এবে।
হরি হরি মুখ ভরি বলুন দেখি সবে॥

দ্বিতীয় ব্যক্তির বন্দনা

কোথায়, মাগো, শ্বেতবরণী, বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণি,
আজি তব চরণখানি করে, মাগো, সার।
নেমেছি তরজার আসরে, ডাকি, মা, তায় বারে বারে,
মম কণ্ঠে বিরাজ হও, মাগো, করিতে উদ্ধার॥
মাগো, তব কৃপাবলে, কালিদাস এই বাংলার ছেলে,
আরও জানি বোপদেব মহাপণ্ডিত হয়।
আমার নাই, মা, কোনই বল, তুমিই, মাগো, সম্বল,
ছল-বল-কলা-কৌশল, সবই তব চরণেতে রয়॥
আমি অতি অভাজন, না জানি ভজন-পুজন,
আয়োজন অতি ক্ষুদ্র মোর।
আমি ভাবি বাণী সেবি, তাহাতে লাগানো চাবি,
ছ'জন প্রবল দৈত্য বড়ই নিঠুর॥
ভক্তি-চন্দন সার করি, অশ্রুজল গঙ্গা বারি,
হৃদ-সিংহাসনে বসায়ে আদরে॥
প্রেম রূপ পুণ্য দিয়ে, মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিয়ে,
হিংসা-পাঁঠা বলি দিয়ে, মাগো, পুজিব তোমারে॥
আর বন্দি দেব নিরঞ্জনে, আর সেই প্রভঞ্জনে
নর-নারায়ণ আদি বন্দি সবাকারে॥
বন্দি রাম গুণধাম, ভরত-লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন,
কীর্তি যাঁদের অফুরান্ এ বিশ্ব মাঝারে॥

বন্দি সেই কালোরতনে, লীলা যাঁর শ্রীবৃন্দাবনে,
গোপীগণ সনে, নিকুঞ্জ কানন মাঝারে।
নিয়ে ব্রজবাসিগণে, ছাড়িয়া গোলোক ধামে,
কত লীলা করলেন হরি কৃষ্ণ অবতারে॥
বন্দি দেব জগন্নাথ, করিয়া জোড়হাত,
যাঁহার সাক্ষাৎ ছত্রিশ জাতে অন্ন খায়।
নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান, প্রসাদ খায় সর্বজন,
একে দেয় অন্যে খায় উচ্ছিষ্ঠ না হয় তায়॥
বন্দিলাম জ্ঞানী গুণী, পাড়া পড়শী ধনী মানী,
আর যত সভাজন ঢুলী কাঁসী আদি।
বন্দনা গান সাঙ্গ করে দেখি একটু চেষ্টা করে
কোন রকমে, হরি স্মরি ত্রাণ পাই যদি॥

উত্তর

গোল করেন, বাবু মশাই, করি গো বিনয়।
তরজা গানের শুরু এবার আস্তে আস্তে হয়॥
পাল্লাদার আমার উপর চাপান দিয়ে গেছে।
ত্রিপুরারি নাম শিবের কেমনে হয়েছে॥
গুরুর জোড়ে ডঙ্কা মেরে সংক্ষেপে জানাই।
নামের কিবা তাৎপর্য শুনুন মহাশয়॥
ত্রিপুরাসুর নামে অসুর মহা ভয়ঙ্কর।
তার ভয়ে দেবগণ শঙ্কিত কলেবর॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ কেহ নাহি পারে।
স্বর্গ ভ্রষ্ট হলো সবে অসুরের ডরে॥
স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে সবে যুক্তি করে মনে।
কি প্রকারে দৈত্যবরে নাশিব এক্ষণে॥
দেবরাজ বলে, শোনো, আমার এক বাণী।
এক বাণে ত্রিভুবন ভেদিবে যেই গুণী॥
সেই জন পারে এই অসুর বধিবারে।
শূলপাণি বিনা হেন শক্তি কেবা ধরে॥

সবে মিলি শিব স্থানে করিল গমন।
বিনয়ে বলিল তারে সকল বচন॥
দেবাদিদেব মহাদেব তোমা ছাড়া গতি নাই।
অগতির গতি তুমি রক্ষ দেবতায়॥
তখন ব্রহ্মারে সারথি করি দেব দিগম্বর।
যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইল অতঃপর॥
মহাবাণ ছাড়িলেন দেব ভোলানাথ।
তিন পুর ভেদিয়া দৈত্য করিল নিপাত॥
ত্রিপুরারি নাম শিবের এই ভাবেতে হয়।
গঙ্গাধর নামের এবার দিব পরিচয়॥

বংশোদ্ধার তরে দেখুন রাজা ভগীরথ।
গঙ্গারে আনিতে রাজা করে মনোরথ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে গঙ্গা আসিবারে চায়।
কিন্তু কে ধরিবে মোর বেগ স্থির করহ তায়॥
তখন স্তবে তুষ্ট করি রাজা দেব মৃত্যুঞ্জয়।
গঙ্গা ধরিবারে তারে করে অনুনয়॥
ভগীরথ মনোরথ পুরাইবার তরে।
মস্তকে ধরেন গঙ্গা শিব দয়া করে॥
তায় গ শিব গঙ্গাধর শুনুন মহাশয়।
দু'টো জবাব দিলাম আমি মিথ্যা কিছু কয়॥
যত প্রশ্ন করেছ তায় জবাব দিতে হবে।
নইলে পরে আমায় নাকি কান মলাটি দেবে॥
আরে ফুচকে ছোঁড়া বাঁদর পোড়া সুমুখে কহ কথা।
কান মলাটি দিতে গেলে পাবে মনোব্যথা॥
কান মলাটি দিতে গেলে কোণে বিবি সাজতে হবে।
(তাই বলি) এমন কথা আর বলো না মেয়ে বনে যাবে
পুরুষ মানুষ পুরুষের মত পৌরুষ থাকা চাই।
মেয়ে মানুষের মিউ মিউয়ানি ভয় করি না ভাই॥

তোমার মত এমন গাধা এ'জগতে নাই।
পুরুষ হয়ে মেয়ের কর্ম করছো গো সভায়॥

দ্বিতীয় গায়েনের চাপান

এখন আসল কথায় আসি ফিরে সময় বয়ে যায়।
কি কারণে বিভূতি ভূষিত শিবের কায়॥
ইষ্ট নিষ্ট সদাশিব সদা রামগুণ গান।
ছাইভস্ম, কুসুম চন্দন সকলই সমান॥
লোকে যাহা অনাদরে শিব আদরেন তায়।
অগুরু চন্দন ছেড়ে বিভূতি তার গায়॥
বনমালা কৃষ্ণে দিয়ে নিজে নিলেন হাড়মালা।
বসন ভূষন ত্যাগ করিয়ে ফণী বাঘছাল পড়িলা॥
সংসার শ্মশানে যার হয় সমজ্ঞান।
সংসার ছাড়িয়া তায় শ্মশানে অধিষ্ঠান॥
মধুর সুস্বাদু দ্রব্য হরিষে অর্পিয়া।
ভাং ধুতরা খান শিব শ্মশানে বসিয়া॥
সুধা ও গরলে তার ভেদাভেদ নাই।
গরল খাইয়া তেঁই নীলকণ্ঠ হয়॥
বহিরঙ্গ ছাই-ভস্ম অন্তরে তায় বীজ হরিনাম।
শ্মশানে মশানে থাকি পঞ্চমুখে গান হরিনাম॥
এই তো মশাই প্রশ্নের বিষয় জবাব হয়ে গেলো।
কয়েকটি চাপান ওরে দিব এবার ভাল॥
কোন সমাজে মৃত্যুঞ্জয় ন্যাংটা হয়েছিল।
আর কার ভয়ে শিব ছুটে ত্রিভুবন ঘুরিল॥
কাহার মস্তকে শিয়াল চীৎকার বা করে।
ভেবে চিন্তে উত্তর আজ দিবে গো আমারে॥
তিনটি মাত্র চাপান তোমারে দিয়ে গেলাম।
যথাযথ উত্তরের আশাতে রহিলাম॥
ঠিকমত জবাব দিয়ে বাহবা কিনে নেবে।
বেঠিক হইলে পরে অর্ধচন্দ্র পাবে॥

এলো মেলো করলে পরে আমি তো ছাড়বো না।
আবোল তাবোল করা কিন্তু এখানে চলবে না॥
সুধীসমাজের আজি প্রয়োজন হয়েছে।
ছ্যাচড়ামি ভাঁড়ামি ছুঁড়ে ফেল পিছে॥
এই পর্যন্ত হলেম ক্ষান্ত সবে নমস্কারি।
সবাই মিলে বাহু তুলে বলুন হরি হরি॥
হরিনাম দ্বি-অক্ষর সদা করুন ধ্যান।
অনায়াসে পায়ে যাবেন বেদের ব্যাখ্যান॥
মজা লেগে গেলো গো বাবু মজা লেগে গেলো।
তরজা গাইতে এসে মেয়ে গাধা সাজতে হলো॥
কান মলা মহাজ্বালা মেয়ে মানুষ দেন।
পুরুষ মানুষের করা শোভা নাহি পায়॥
মহামূর্খ বটে এটা সন্দেহ নেই তায়।
ঘরে শুয়ে শুয়ে বুঝি তোমার মলে দেয়॥
নইলে কেন এমন বুদ্ধি তোমার ঘটে হবে।
সন্ধান করলে কানে বোধ হয় দাগ পাওয়া যাবে॥
গণ্ডমূর্খ বটে ওটা জানলাম এতক্ষণে।
আমায় গাধা বলে, ও জানে না তার মানে॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি ধরাধামে খ্যাত।
গাধি হন তাহার পিতা জগতে পূজিত॥
গণ্য মান্য ধন্য পুরুষ সেই তো মহাজন।
কিসে আমি মেয়ে তবে ওরে অভাজন॥
ছাগ পাঁঠা আস্ত একটা ওটা নাকি হলো।
ভেবে চিন্তে বলো কথা একটু সমঝে চলো॥
মস্ত বড় মূর্খ ওটা সন্দেহ নেই তায়।
পাত দুই পড়ে পাঁঠা পণ্ডিত হতে যায়॥
হস্তে ধস্তে কোন রকমে লেখে যদি "ক"
একটু পরে পড়তে গিয়ে বলে তায়ে "হ",

বেশী কিছু বলবো না আর সময় চলে যায়।
জবাব মোরে দিতে হবে নইলে রক্ষা নাই ॥

উত্তর

গুরুর জোরে ডঙ্কা মেরে বলে যাবো আমি।
কান পেতে ভাল মতে শুনে যেও তুমি ॥
এ যে শাস্ত্রকথা নয় অন্যথা, বাবু মহাশয়।
বিয়ে করতে গিয়ে শিব ন্যাংটা হয়ে যায় ॥
নারদের কারসাজি এটা বুঝে দেখুন মনে।
কুমন্ত্রণা দিলে ও সে গিরিরাণীর কানে ॥
ফণীতে ভূষিত অঙ্গ ফণী বাঘছালে।
ফণীময় হয়ে ঈশান বিয়ে করতে চলে ॥
ওদিকেও নারদ মুনি কৌতুকের তরে।
বরণ ডালায় ঈষুর মূল অনেক দিলে ভরে ॥
বরণ ডালা হাতে নিয়ে গিরিরাণী যায়।
ঈষু মূলের গন্ধ পেয়ে সাপ ভয়ে পালায় ॥
ফণী যদি পলাইল ভেবে দেখুন মনে।
বাঘছাল আর থাকিবে কাহার বন্ধনে ॥
বাঘছাল খুলে পড়ে গেলে ন্যাংটা হলো শিব।
লজ্জাতে গিরিরাণী কাটলেন তখন জিব ॥
শাশুড়ির কাছে ন্যাংটা হয়ে শিব মনে পেলে লাজ।
তাড়াতাড়ি হস্ত দিয়ে ঢাকতে যায় লাজ ॥
লজ্জাতে গিরিরাণী মুখ দেখাতে নারে।
সভাশুদ্ধ লোক তখন ছি ছি ছি করে ॥
মশাই, এই খানেতে শম্ভুনাথে ন্যাংটা হতে হয়।
কার ভয়ে ভীত শিব বলবো এখন তায় ॥
সুরাদৃষ্ট নামে এক মহাদৈত্য ছিল।
দারুণ তপস্যাতে সেই হরেরে পুজিল ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে হৃষ্ট দেব পঞ্চানন।
বর দিতে আসিলেন তাহারই সদন ॥

কি বর বাসনা তব কহিবে ধীমান্।
যাহা চাবে তাহা পাবে নাহি হবে আন॥
সুরাদৃষ্ট বলে, শোনো, দেব মহেশ্বর।
বাঞ্ছা যদি হয় তব দিতে মোরে বর॥
এই বর দাও, প্রভু, মাগি তব ঠাঁয়।
যার মাথায় হাত দেবো সে যেন ভস্ম হয়ে যায়॥
তথাস্তু বলিয়া হর চলিতে লাগিল।
পরীক্ষার তরে সুরাদৃষ্ট ছুটে গেলো॥
তোমার বর তোমাতেই পরীক্ষিতে চাই।
সত্য কি মিথ্যা বটে বুঝে নিব তায়॥
অলঙ্ঘ্য শিবের বাক্য মিথ্যা কভু নয়।
স্পর্শ মাত্র ভস্মীভূত হইবে নিশ্চয়॥
শিব দেখেন একি আপদ মহাবিপদ হলো।
প্রাণভয়ে শিব তখন ছুটিতে লাগিল॥
শিব ধায় আগে আর পিছে দৈত্যবর।
ত্রিভুবন ভ্রমিল শিব নিজে দিয়ে বর॥
দেখিয়া হরের দশা দেব নারায়ণ।
রমণী রূপেতে আসি দিল দরশন॥
সুন্দরী রমণী হেরি সুরাদৃষ্ট বীর।
কামেতে হইয়া মত্ত হইল অধীর॥
নাচিতে লাগিল নারী নানা রঙ্গ করি।
সুরাদৃষ্ট তার সঙ্গে নাচে বাহার করি॥
নারায়ণ বলে, শোনো, আমার বচন।
আমার মত নাচিলে মজিবে মোর মন॥
কামবাণে দগ্ধ তনু তার কোন জ্ঞান নাই।
যেমন বলে তেমন করে সেই পাপাশয়॥
মস্তকেতে হস্ত দিয়ে নাচে নারায়ণ।
কামে মত্ত সুরাদৃষ্ট করিল তেমন॥

যেই মাত্র নিজ শিরে হস্ত প্রদানিল।
সেই মাত্র ভস্মীভূত হইয়া পড়িল ॥
এই খানেতে দৈত্যভয়ে মহা ভীত হয়ে।
ত্রিভুবন ভ্রমিল শিব সঙ্কটে পড়িয়ে ॥
আর একটি জবাব আছে শিয়াল ডাকা ভাই।
কার মাথার পরে শিয়াল ডেকেছিল তাই ॥
সত্য বটে মিথ্যা নয় এ আছে রামায়ণে।
একটু চিন্তা করলে পরে পড়ে যাবে মনে ॥
শক্তিশেলে লক্ষ্মণ যেই দিন রণে পড়েছিল।
ঔষধ আনিবারে হনু পর্বতে চলিল ॥
বিশল্যকরণী আছে সেই গন্ধমাদনেতে।
সেই ঔষধ দিতে হবে আজিকার রেতে ॥
পর্বতেতে গিয়া হনু ঔষধ খুঁজিল।
বিস্তর খুঁজিল কিন্তু চিনিতে নারিল ॥
ভাবিতে ভাবিতে হনু যুক্তি করে মনে।
কেমনে বাঁচাবো আজি ঠাকুর লক্ষ্মণে ॥
পর্বত শুদ্ধ নিয়ে যাবো বিচারিয়া মনে।
উপাড়ি পর্বত তখন চলিল গগনে ॥
পর্বতের জীবজন্তু সব ছিল তথায়।
বাঘ ভালুক শিয়াল আদি করে সমুদয় ॥
রাত্রিকালে শিয়ালগুলি চীৎকার করেছিল।
এই তো, মশায়, হনুর মাথায় শিয়াল ডাকিল ॥
এই তো, মশায়, আমার সকল কথার জবাব হলো ॥
অদ্যকার তরজা গান সাঙ্গ করা হলো ॥
সাঙ্গ করি গানের পালা সবে নমস্কারি।
বন্ধুজনে চাঁদবদনে বলুন হরি হরি ॥
তোরা বলে নে বলে নে গো মধুর রামের নাম ॥
শমন-দমন রাবণ রাজা রাবণ-দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ॥ —মুর্শিদাবাদ

২

বন্দনা

নমঃ নমঃ বাগ্‌বাদিনী শ্বেতবরণী মা।
কৃপা করি অধম জনে কর করুণা॥
জ্ঞানাঞ্জন দাও, মা, আঁখে, হর অন্ধকার।
পতিত পাবনী তুমি কর, মা, উদ্ধার॥
বোবা জনে বাক্য বলে পঙ্গু হেঁটে যায়।
মূর্খজন পণ্ডিত হয়, মাগো, তোমারি কৃপায়॥
এই মাত্র ভিক্ষা মাগি, ও মা, নারায়ণী।
কণ্ঠে এসে বস মাগো বাণী বলাও তুমি॥

চাপান

হিন্দুতে আর মুসলমানে কিবা তফাৎ হয়?
সভার মাঝে আমার কাছে দেহ পরিচয়?

উত্তর

ভগবানের রাজ্য মাঝে জাতি মুসলমান।
হিন্দু পড়ে মহাভারত (তারা) পড়ে গো কোরান॥

চাপান

রক্তের রঙ্‌ ঠিকই সমান অস্থি মাংস ঠিক।
তবে কেন তাদের সহিত মোদের বিপরীত?

উত্তর

তাদের (খুড়তুত) বনের সঙ্গে হয় গো বিয়ে ধর্মমতে কয়।
হিন্দুর তাহা হয়না, দাদা, শুনুন মহোদয়॥

চাপান

দাদাগো, দশটি বোকা দাও দেখিয়ে তবে খালাস পাবে।
নাহি যদি পার, দাদা, মাগের মাথা খাবে।

উত্তর

গালি তুমি দিলে, দাদা, এত লোকের মাঝে।
এত লোক থাকতে, দাদা, বউ ভাবলে বাজে?

বোকার কথা বলি, বাবু, বোকা এই তো এক।
মুখে কথা না বলিয়া তাকায় যে ফ্যাক্ ফ্যাক্॥
বোকার কথা বলি, বাবু, বোকা আছে তুই।
বাড়ী ঢুকতে ছামু চালে যেবা লাগায় পুঁই॥
এইতো দেখুন বোকা আছে বোকা আছে তিন।
পরের কাছে ঋণ লয়ে যে পরকে দেয় গো ঋণ॥
বোকা এইতো দেখুন, বাবু, বোকা আছে চার।
কাঠ কাটতে বিনা অস্ত্রে যে যায় গো বনের ধার॥
বোকা এই তো দেখুন, বাবু, বোকা আছে পাঁচ।
নিজের টাকা দিয়ে যেবা পরের পুকুরে ফেলায় মাছ॥
বোকা আছে এইতো বাবু বোকা আছে ছয়।
এর কথা যে নিয়ে গিয়ে উহার কাছে কয়॥
বোকার বোকা ডবল বোকা বোকা আছে সাত।
ঘর জামায়ে শ্বশুর বাড়ীর যেবা খায় গো ভাত॥
বোকা আছে ভবের মাঝে বোকা আছে আট।
নিজে বাড়ীতে বসে থেকে যে মাগ্‌কে পাঠায় হাট॥
বোকা আছে অনেক, বাবু, বোকা আছে নয়।
সামনে কিছু না বলিয়া পিছনেতে কয়॥
বোকা, বাবু, শ্রেষ্ঠ বোকা বোকা আছে দশ।
পিতামাতা থাকতে যারা মাগের হয়গো বশ॥
এবার মুসলমানে বলুন আল্লা হিন্দু হরি বল।
সাঙ্গ হোল আমার জবাব মিটল গণ্ডগোল॥ —মুর্শিদাবাদ

আমি কেমন করে তরি। এ তরঙ্গা-গাঙ্গে তুফান ভারি॥
ওগো ভবের কাণ্ডারী হরি। ত্বরায় দাওগো চরণতরী॥
ওমা তারা তারিণী, বিপদকারিণী, বিপদহারিণী, রণরঙ্গিণী,
এই রণে এসে হও, মা, সদয় অসিধারিণী, পা, তুখানি বাড়াও আনি,
পার হয়ে যাব তাহা ধরি॥ অর্ধচন্দ্র সদায় ভজে,মনে মনে, মনে জ্ঞানে আর,
পরাণে সদাই সর্বক্ষণ এবার ঐ পা তু'খানি বিপদ গণি, ছাড়বোনা আর।

বন্দনা

শ্রীশ্রীতারকনাথ, শ্রীশ্রীতারক নামে মজরে আমার মন।
গোপাল গোবিন্দ শ্যাম গৌর সনাতন ॥
ওগো মা সিন্ধুসুতা, ওগো মা সিন্ধুসুতা, জগৎমাতা বেদ অধ্যয়নী।
মোর কণ্ঠে বসে তরজা আদি বলাও গো আপনি ॥
বন্দিলাম করে স্মরণ, বন্দিলাম করে স্মরণ, গুরুর চরণ আজ আসরে আনি।
এ অধমে নিজ গুণে তারিয়ে দাও তুমি।
বন্দিলাম নারায়ণী, বন্দিলাম নারায়ণী, লক্ষ্মী যিনি পুজেন নারায়ণ।
কৃপাদৃষ্টি হলে তাঁর সফল জীবন।
বন্দিলাম গাধা পৃষ্ঠে, বন্দিলাম গাধা পৃষ্ঠে, মনের নিষ্ঠে শীতলার চরণ।
যাঁর আদি অন্ত পায় না তত্ত্ব বৈদ্য কতজন।
বন্দিলাম ওলা বিবি, বন্দিলাম ওলা বিবি, চরণ সেবি যার বাড়া আর নাই।
তিনি একবার ওঠায় একবার নাবায় ধাতের ঠিক না পায় ॥
বন্দিলাম আসরেতে,
বন্দিলাম আসরেতে, আজকে রাতে যত গুরু জনে।
একে একে বন্দিলাম সবার চরণে। বন্দিলাম ডুগি কাঁসি,
প্রতিবেশী আর কিছু না ভুলি। বন্দনা শেষ হরি বল দুটি বাহু তুলে ॥

তিলোত্তমার জন্ম চাপান

এবার গাইব চাপান, এবার গাইব চাপান জুড়াবে পরাণ, শোন মহাশয়।
একটি পুরাণ কথা বলি হেথা শোন সমুদয় ॥
যে সব বেদে আছে সব বেদে আছে, নয়রে মিছে, বলে যাইগো হেথা।
তিলোত্তমার জন্ম হলো, ভেঙ্গে বলো জন্ম হ'লো কোথা।
কি নিমিত্ত জন্ম হলো, কি নিমিত্ত জন্ম হলো ভেঙ্গে বলো জন্ম দিনকে ॥
ইহার জবাব সঠিক দিও বল্‌ছি তোমাকে ॥
দিবে জবাব সেরে, দিবে জবাব মোরে, এই আসরে শুনবে সর্বজন।
খাঁটি খাঁটি পরিপাটি বলে যাও এখন।
অর্ধচন্দ্র তরজা ভণে বলি অর্ধচন্দ্র তরজা ভণে হর্ষ মনে শ্রীগোবিন্দর পায়।
এ পর্যন্ত হলাম ক্ষান্ত বিদায় মাগি তাই ॥

ঢুলি, বাজাও ঢোল, ঢুলি, বাজাও ঢোল, বল হরি বল সর্বজনে।
এই হরি বিনে গতি নাই ভাই, এই ত্রিসংসার ত্রিভুবনে ॥

—মুর্শিদাবাদ

ওহে শ্যাম কেলে সোনা বাঁশীর কথা বলে যাও আমায়।
কোন জাগাতে কোন সময়ে বাঁশের জন্ম হয় ॥
কেবা বাঁশী গড়েছিল তাহার নামটি খুলে বল।
শুনতে আমার ইচ্ছা হল
বাঁশী কে দিল তোমায় ॥
বাঁশীর কয়টি ছিদ্র ছিল কোন ছিদ্রে কি সুর উঠিল।
ঐ বাঁশে কয়টি পাব আছিল কোন পাবে কি হয় ॥ —ঐ

উত্তর

রাধা নামে আমার সাধা বাঁশী, রাধা বিনে আর জানে না হে।
যদি মনে করি অন্য নাম স্মরি বাঁশীতে শুনে না হে ॥
দশটি ছিদ্রে বাঁশী সৃষ্টি বিধাতার, সপ্ত ছিদ্রে উঠে সঙ্গীত সঞ্চার।
অন্য তিন ছিদ্র না থাকিলে তার বাঁশী ভাল বাজে না হে ॥
আদি রন্ধ্রে বাঁশী ভাঙ্গে বিধির ধ্যান, দ্বিতীয়াতে বয়ঃযমুনা উজান,
তিন ছিদ্রে হরে পবনেরই জ্ঞান বিধির বিধান ঘটে না হে ॥
চারি রন্ধ্রে উন্মাদিনী গোপীগণ, পঞ্চ ছিদ্রের গানে ফিরে ধেনুগণ,
ষষ্ঠ ছিদ্রের গীতে পশুপক্ষীগণ মনানন্দে মগন হে।
কাতর হয়ে গগন চন্দ্র বলে সপ্ত ছিদ্রে বাঁশী ডাকে রাধা বলে।
শিহরে কদম্ব যমুনা উথলে স্বরে কে না মজে হে ॥

৫

চাপান

যা কখনও শুনিনি কো তাই হয়েছে ভাই,
পাষাণ মানুষ বল হল বা কোথায়।
কোন মানুষের পায়ের ছোঁয়ায় মানুষ হয়ে ছিল,
সত্য করে, বন্ধু, তুমি প্রশ্নের উত্তর বল।

পিতৃসত্য পালনে রাম গেল বনে,
লক্ষ্মণ সীতা সাথে তার যায় দু'জনে।
গৌতম নামেতে মুনি মহাতপকারী,
অহল্যা নামেতে তার ছিল এক নারী।
ইন্দ্র কর্তৃক শরীর তার অপবিত্র হইল,
ক্রোধ ভরে অভিশাপ তারে মুনি দিল।
পাষাণ হয়ে তুমি থাক ঘোর বনে।
শাপ মুক্ত হবে তোমার রামের চরণে।
রামের চরণ স্পর্শে তার শাপ মুক্ত হল।
এই কারণে, বন্ধু, পাষাণ মানুষ হয়ে গেল। —মুর্শিদাবাদ

৬

চাপান

শোনগো সন্ন্যাসী তোমরা আমার বচন,
শিব দরশনে যাচ্ছ তোমরা হয়ে একমন।
দেবের দেবতা হয় দেব ত্রিলোচন,
সমুদ্র মন্থন করে রাষ্ট্র ত্রিভুবন।
মন্থন করিল যবে গরল উঠিল,
সেই গরল মহাদেব ভক্ষণ করিল।
বিষ খেয়ে ঢলে শিব হৈল অচেতন,
চেতন করিয়া তোমরা কর দরশন।
না উঠিলে সদাশিব কেমনে পুজিবে,
সন্ন্যাসী কেমন তোমরা এবার জানা যাবে।

উত্তর

যে কথাটি বললে, ভক্ত, মিথ্যা কথা নয়,
শিবভক্ত বটে মোরা শোন সমুদয়।
আমাদের দেবতা হয় দেব পশুপতি,
বিষ খেয়ে ঢলেছে বাবা দেখহ সম্প্রতি।

শিবভক্ত হই মোরা জানেন ভবানী,
সবে মেলে স্মরণ কর আসিবেন জননী।
ডাকিবা মাত্রেতে দেখ ভবানী আসিল,
মনসায়ে ডাকাইয়া স্তন পান করাইল।
মনসার দুগ্ধ যখন সদাশিব খাইল,
সকলেতে দেখ প্রভু সদাশিব উঠিল।
বিষ হ'তে ত্রাণ পেল দেব ত্রিলোচন,
এই বারেতে পুজি গিয়া যত ভক্তগণ।
শুনিলে সকল কথা, ওহে পথিক ভাই,
পথ ছাড়, পশুপতি পুজিবারে যাই। —মুর্শিদাবাদ

৭

লক্ষ্মণের পাষাণ চাপা

হনুমান: কে তুমি, নবীন যোগী জটাধারী, কোন দেশে বসতি।
কেন এলে শিবের বনে বল না শীঘ্র করি॥
লক্ষ্মণ: সূর্যবংশে জন্ম আমার নাম ধরি সৌমিত্র।
কেবা তোর মাতাপিতা বল না শীঘ্র করি।
হনু: পবনপুত্র হইয়ে আমি নাম ধরি মারুতি,
কেবা তোর মাতাপিতা বল না শীঘ্র করি।
লক্ষ্মণ: দশরথ পিতা মম মাতা যে সুমিত্রা,
পিতামহ অজরাজ রাম হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
হনু: মিথ্যা কেন বল, ওগো, নব জটাধারী,
দশরথের পুত্র কেন হবে বনচারী।
লক্ষ্মণ: পিতৃসত্য পালন হেতু শ্রীরাম এলো বনে,
সঙ্গেতে আইলাম মোরা জানকী তিনজনে।
হনু: কোথাকার রাম তোর কোথাকার লক্ষ্মণ,
কেন এলি শিবের বনে বল না এখন।
লক্ষ্মণ: ক্ষুধায় পীড়িত আছে দেব গদাধর।
ফলহেতু আইলাম তোমার গোচর॥

হনু : পড়েছ আমার হাতে ছেড়ে নাহি দিব।
একটী চড়ে আজি তোরে যমপুরে পাঠাব।
লক্ষ্মণ : আয়রে বনের বানর, এত দর্প তোর।
লক্ষ্মণের বাণে আজি যাবি যমের দোর ॥
হনু : কি ভয় দেখাও আমারে ভণ্ড বনচারী—
যত বৃক্ষ উপাড়িয়া আজি তোরে মারি।
লক্ষ্মণ : ঐশিক বাণেতে বিদ্ধ করি খান খান।
হনু : পর্বত চাপান দিয়া মারিব এখন ॥
পর্বত চাপান দিয়া লক্ষ্মণে রাখিল।
চাঁদ বদনে সর্বজনে হরি হরি বল ॥ —মুর্শিদাবাদ

৮

বন্দনা

মা বলে মা ডাকি মা তোরে পড়ে ঘোর সমরে,
রেখো পদে আমায় রেখো তোমার এ দাসেরে।
কারে দাও মা বালাখানা, কারো চালে খড় জোটে না,
কারও ভিক্ষা করে প্রাণ বাঁচেনা যেই দশা করালি মোরে।
শ্রীমন্ত মশানে গেল, মা মা বলে ডেকেছিল,
সেথায় তুমি উদ্ধারিলে কোলে করে নিলে তারে।
কোথায় বিশ্বগুরু কল্পতরু দেব মৃত্যুঞ্জয়।
আজ দীনহীন এ অধমকে দাও গো পদাশ্রয়।
(পদপ্রার্থী আমি।)
জয় জয় জগমাতা ভয়ত্রাতা অভয়দায়িনী,
আজ তোমার পায় নিয়ে শরণ তরজা গাইব আমি।
(পদে শরণ নিলাম।)

চাপান

আজ জুড়িদারের সাথে একটু পাল্লা দিতে হবে।
হুকুম মোরে করেছেন যে বড় বাবুরা সবে ॥
(হুকুম তামিল করি।)

আজি শাস্ত্রকথা শুন্‌ব হেথা জুড়িদারের কাছে।
জুড়ির কথা জারিজুড়ি দেখবো জানা আছে।
(এইবার ঢেলাতে হবে।)
গোজাতির জন্ম, ওগো, কোথা হতে হলো,
আর ক্ষীরসমুদ্র কোথায় আছে কে করলে, ভাই, বলো।
(অত ক্ষীর জুটলো কোথা।)
গান গল্প নয়কো এটা শাস্ত্র কথা হয়।
শাস্ত্র মত প্রমাণ দেবে নাইকো তোমার ভয়॥
(তোমায় অভয় দিলাম।)
কথার জবাব দিবে প্রাণ জুড়াবে গুণের গুণমণি।
দেখি তোমার গুণপনা কেমন তুমি গুণী॥
(এইবার বোঝা যাবে।)
এইখানেতে সংক্ষেপেতে গাওনা সাঙ্গ করি।
সবাই মিলে চাঁদবদনে বলুন হরি হরি॥ —ঐ

তাঁত চালাইবার গান

তাঁতীরা তাঁত চালাইবার কাজে একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য অনেক সময় গান গাহিয়া থাকে, ইহা কর্মসঙ্গীতের (work song) অন্তর্ভুক্ত হইলেও একক সঙ্গীত, অন্যান্য কর্মসঙ্গীতের মত সমবেত সঙ্গীত নহে। তবে এ কথাও সত্য, এই উদ্দেশ্যে যে বিশেষ প্রকৃতিরই কোন গান গাইবার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা নহে—যে কোন তালপ্রধান গানই তাহারা এই উপলক্ষে গাহিতে পার।

১

মরি হায়রে, আল্লা হায়,
আমি কি করিব কোথায় গো যাব না দেখি উপায়।
কইলকাতা আইস্যা আমি ঠেকলাম বিষম দায়,
আমি পরথমে বন্দনা করি শিক্ষাগুরুর পায়।
ঐ যে গুরুতে হাত' ধইরা শিখায় ডাইন বাঁয়॥

দেখেন অন্য দফায় কেমন তেমন এই দফায় জোম ॥
ঠেইল্যা নিব এই ভাবে শনি রবি সোম ॥
তালিমে বলে মুন্সী চল হাট' যাই।
সোলার নৌকার পাথায় উইঠ্যা পরীক্ষা চালাই ॥ —ফরিদপুর

তানাচি

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আদিবাসী সমাজে বাংলা এবং মুণ্ডা ভাষা মিশ্র ভাষায় এক শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাকে তানাচি বলে। উভয় ভাষার মিশ্রণের ফলে ইহাদের অর্থ পরিগ্রহ অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে। কখন কি উদ্দেশ্যে এই গানগুলি গীত হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

(১)

বারখানি ভিতরে তেরোখানি বাহিরে,
বাবাকে যে কহিছে চাঁদা জোড়া
বলিতে ভাল না। —পুরুলিয়া

নিম্নোদ্ধৃত তানাচি গানটি মুণ্ডা ভাষায় রচিত—

(২)

শিশু বজরা চামদাডা দিঘাড়া
শিং বোঙা শিরিজল মট জটরা। —ঐ

তিস্তাবুড়ীর গান

উত্তর বাংলার তিস্তানদীকে কেন্দ্র করিয়া যে এক লৌকিক ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে, তিস্তা বুড়ীর পুজা তাহার একটি প্রধান অঙ্গ। এই পুজা উপলক্ষে যে মেয়েলী গান প্রচলিত আছে, তাহাই তিস্তা বুড়ীর গান বা মেচেনী খেলার গান বলিয়া পরিচিত। (তিস্তাবুড়ীর পুজার বিস্তৃত বিবরণের জন্য Charu Chandra Sanyal, *The Rajbansis of North Bengal*, Calcutta, 1965, pp. 144-45 দ্রষ্টব্য)। তিস্তাবুড়ীর একটি প্রতীককে গ্রাম্য মেয়েরা মাথায় করিয়া গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাকে প্রতি গৃহের আঙ্গিনায় নামাইয়া তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করে ও গীত গায়। নৃত্যস্থল জল ঢালিয়া কাদা করিয়া লয়। তিস্তাবুড়ীর প্রতীক একটি ঘট, কিংবা বাঁশের

তৈরী ফুলের সাজির আকৃতি একটি জিনিস। ইহাকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর গ্রাম্য বিবাহিত অবিবাহিত, বিধবা সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক সমবেত হইয়া তাহা মাথায় করিয়া প্রতি গৃহস্থের আঙ্গিনায় গিয়া তাহা নামাইয়া রাখিয়া নৃত্যগীত করে।

১

মুঠি মুঠি মোর বথুয়া শাক
দোনো হাতে মোর তেত্‌লীর পাত
(হে না মোর কেশ)
হি বাড়ির চ্যাংরালা ছ্যাবেলা
খেচিয়া ধোরলে মোর গায়ের পাছেরা
(হে না মোর কেশ)
ছোরিয়া দে মোর গায়ের পাছেরা
নিন্দের ছোয়া মোর ভোকে না লাছে
(হে না মোর কেশ) —জলপাইগুড়ি

২

নয়া কুলা খান
ব্যাতের বান গে, ব্যাতের বান
কোটকি দিলে ধান —ঐ

বড়ো বড়ো বাড়িরে মোর
মাকলা বাশের থোপ
হামার তিনা খাইস কালা রে
হামার তি গেলা কুতা হুলিয়া দিম
হামার তিনা খাইস কালা রে। —ঐ

৪

নাহি জল নাহি থল নাহি তারি আকাশ
এই ছিরি মণ্ডব না হয় ছিরি কোবিলাস
বাঁও হাতে চাম্পা কেলা ডাহিনে শংক দল
তাহার উপর আসন কৈল ধর্ম নিরঞ্জন।

পুবে না বন্দিব পীর পাকাম্বর
দক্ষিণে বন্দিব মা কালীর চরণ
পশ্চিমে বন্দিব সমুদ্র সাগর
উত্তরে বন্দিব পান্‌চ বাহিনী বু'ড়
আকাশে পন্নাম করি আকাশের কামিনী
পাতালে পন্নাম করি পাতাল বাসুকি
শূন্যের মধ্যে পন্নাম করি বুড়া বুড়ি
পাটের মধ্যে পন্নাম করি মহাময়ী তিস্তা বুড়ি। —জলপাইগুড়ি

তুক

ভাঙ্গা কীর্তনের সুরে গেয় একশ্রেণীর ভক্তিমূলক গানকে তুক গান বলিয়াও উল্লেখ করা হইত, সুরের দিকে দিয়া ঢপ কীর্তনের সঙ্গে ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই।

১

না জানি হরি কেমন, নামটি এমন মিঠা এত।
দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন,
দেখ্‌লে জানি কেমন হতো।
যে হতে নাম শুনেছি যে হতে পাগল আছি,
বাঁচি কিংবা মরি সুখ বল্‌ব কত।
তাঁরে ধরি ধরি করে হিয়ে,
ধর্‌লে জীবন সফল হতো।
শুনেছি লোকমুখেতে এমন রূপ নাই জগতে,
যে দেখেছে সে হয়েছে অনুগত।
তাঁরে দেখ্‌লে অঙ্গ সঙ্গ মাগে নয়ন ঝরে অবিরত। —নদীয়া

তুখ্‌খা

জলপাইগুড়ি জিলা হইতে সংগৃহীত এক শ্রেণীর গানকে তুখ্‌খা গান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গানের কলিকে সঙ্গীতশাস্ত্রে তুক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাহার সঙ্গে তুখ্‌খা শব্দটির কোন সম্পর্ক আছে কি না, জানা যায় না। তুখ্‌খা গান জলপাইগুড়ি জেলাতেও যে বহুল প্রচলিত

তাহা মনে হয় না। একটি মাত্র গান এই নামে সংগৃহীত হইয়াছে। গানের বিষয় দেহতত্ত্ব।

১

সাধের আউলাকেশী লো,
ওরে আউলাকেশী সঙ্গে কি জ্বালা হইল।
নারিকেল ভাঙ্গিয়া মালাই বানাব বৃন্দাবনে যাব,
বৃন্দাবনে অবতীর্ণ জয়দেব দেখিব। —জলপাইগুড়ি

ইহাতে জলপাইগুড়িতে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষারও অভাব দেখা যায়।

তুষ-তুষলা ব্রতের গান

পশ্চিম বাংলার সকল বয়সের স্ত্রীলোকই—কুমারী, সধবা, বিধবা নির্বিশেষে পৌষ মাসে তুষ তুষলা ব্রত নামে এক ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকে। তুষু পূজা কিংবা টুসু পূজার ইহা একটি আঞ্চলিক রূপ। ইহা প্রধানতঃ ভাগীরথী তীরবর্তী জিলাগুলিতেই প্রচলিত। এই উপলক্ষে ছড়াজাতীয় একশ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই—

১

তুষ তুষলার কাঁধে ছাতি।
বাপ মায়ের ধন যাচা যাচি॥
ঘর করবো নগরে, মরবো গিয়ে সাগরে।
জন্মাবো উত্তম ব্রাহ্মণের কুলে॥
গায়ে গোরুর গোবর সর্ষের ফুল।
এই নিয়ে পূজা করি বাপমায়ের কুল॥
বেগুন পাতা ঢালা ঢালা।
মায়ের কানে সোনার দোলা॥ —২৪ পরগনা

তুষু পূজার গান

পুরুলিয়া জিলায় যাহাকে টুসু বলে (টুসুগান দেখ), বাঁকুড়া জিলা কিংবা পশ্চিম বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে তাহাই তুষু। তবে পুরুলিয়া অঞ্চলে টুসু গান কিংবা টুসু পূজা যেমন ব্যাপক, তুষু পূজা কোথাও তেমন নহে। গানও

সেই তুলনায় সংখ্যায় অল্পই সংগৃহীত হইয়াছে। বাঁকুড়া এবং বর্ধমান জিলার পশ্চিমাংশে অনেক ক্ষেত্রেই ভাদুপূজার গানও টুসুপূজা উপলক্ষে গীত হয়, কেবল মাত্র ভাদুর স্থলে তুষু কথাটি বসাইয়া লওয়া হয়। তুষু পূজাও পৌষ মাসের প্রথম দিন হতে আরম্ভ হইয়া মকর সংক্রান্তির দিন শেষ হয়, ইহাতে মাটি দিয়া হলুদ রঙের একটি ক্ষুদ্র প্রতিমা নির্মাণের ব্যাপক প্রচলন আছে। ইহার কারণ, ইহা হিন্দুধর্মের অধিকতর প্রভাবিত অঞ্চলে প্রচলিত।

তুষু তুষু করি আমরা তুষু নাই মা ঘরে গো,
কে তুষুকে নিয়ে গেল ফুলের মালা দিয়ে গো।
কাজ কি আমার ফুলের মালা বিনা ফুলে মালা গো।
তুষুর দুয়ারে ও ছড়া ঝাট পড়ে,
তাও নাই তুষুর ঘুম নাই ভাঙ্গে।
একটি ফুলের জন্য তুষু করেছিলে অভিমান,
তোমার দুয়ারে দিব পারিজাত ফুলের বাগান।
তুষুর দুয়ারে যে ঘোড়া ছটফট করে,
তাও নাহি তুষুর ক্ষিধা নাই ভাঙ্গে।
দেবী না হলে নাচবেক কে ?
সর্দারকে জর হয়েছে ঢ ঢা দিবেক কে ?
তিরিশ দিন রাখলাম মাকে তিরিশ সল্‌তে দিয়ে গো,
আর রাখিতে নারলাম মাকে মকর আইছেন নিতে গো।
এত দিন রাখলাম মাকে, মা বলে বই ডাকলে না,
যাবার সময় রগড় নিলে মা না হলে যাব না। —বাঁকুড়া

নিম্নোদ্ধৃত গানটি ভাদু গান উপলক্ষেও শোনা যায়—

চল্ তুষু চল্ খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বটতলা,
খেল্‌তে খেল্‌তে দেখে আস্‌ব কয়লা খাদের জল তোলা।
হলুদ বনের তুষু তুমি, হলুদ কেন রাখ না ?
তুষু বল্‌ছে—শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না।

ও তুষুর মা, ও তুষুর মা. তোদের কি কি তরকারী ?
ঐ শালারি খেতের বেগুন ঐ শালারি গুগ্‌লি।
বাড়ীময় নীল বুনেছি নীলের গুঁটি ধরে না,
ঘরে আছে লক্ষ্মণ দেওর নীল কাপড় বই পরে না।
চিঠি পাঠাই ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না,
জামাই আদর বড় আদর তিন বেলা বই থাকে না।
আর দু দিন থাক, জামাই, খেতে দিব পাকা পান,
বস্‌তে দিব শীতল পাটী নীলমণিকে কোরব দান।
চল, তুষু, চল, সারদা, কুলিতে বাঁধ বাঁধাব,
কুলির জলে সিনান করে, রোদেতে চুল শুকাব।
এক কিল সইলুম, দু কিল সইলুম, তিন কিল বই আর সইব না,
যা লো, ননদ, বলে দিবি, তোর ভাইয়ের ঘর আর করব না।
নদীর ধারে গাই বিয়াল, বাছুরের নাম হাসি গো,
রাখালটাকে কিনে পিতল বাঁধা বাঁশী গো। —পশ্চিম বর্ধমান

তেলেনা গান

পূর্ব মৈমনসিংহ এবং পশ্চিম শ্রীহট্ট অঞ্চলে যে ঘাটুগান (ঘাটু গান দেখ) নামক একশ্রেণীর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন গানে হিন্দী শব্দের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত: রাগ-সঙ্গীত হইতেই হিন্দী ভাষার প্রভাব ইহাদের উপর বিস্তার লাভ করিয়া থাকিবে ; কিন্তু লৌকিক সুরেই ইহারা গীত হয়, ইহাদের গীতরীতিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন প্রভাব দেখা যায় না। এই গানগুলি সাধারণতঃ তেলেনা গান বলিয়া পরিচিত। তেলেনা শব্দটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হইতে আসিলেও ঘাটু গানের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রীতি অনুযায়ী তেলেনা সুর ব্যবহৃত হয় না। হিন্দী শব্দ যুক্ত হইলেই ঘাটু গানকে তেলেনা গান বলে।

১

শোন কয়িলারে, হাম দুখিনীর ফাটে রে ছাতিয়া।
কোনে বিরাজে পিউয়া মেরা হাম নারী ছাড়িয়া॥

এয়ছে মধু না মাসে রে কোকিলা, না হেরি কালিয়া।
গাও মেরা পিউয়া নাম জুড়াইতে হিয়া॥ —মৈমনসিংহ

২

ক্যা রূপ হেইরে আইলাম যমুনায় সখী গো, আইলাম যমুনায়।
ও সখী, আচানৌক রূপ হেরিলাম তরুয়া মূলে।
ওরে মেরা মন হৈরে নিল—নিলরে ঐ কাল বরণে॥
একেত আচানৌক রূপ হেরি হেরিত যমুনায়।
সেইত অবলা বালা ধৈরয না মানে হামারি॥
মনেরি মন হৈরে নিল—নিল ঐ কাল বরণে॥ —ঐ

উচ্চাঙ্গ রাগে বাংলায় যে তেলেনা গান প্রচলিত আছে, তাহাতে হিন্দী শব্দের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীধর কথক রচিত তেলেনা সুরের বাংলা গান যাহা প্রচলিত আছে, তাহাদের একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

কেমনে বাঁচে প্রাণ সেই প্রাণ বিহনে।
দেহ মাত্র আছে কেবল, তারি বিরহ দহনে॥
প্রিয়ার পীযূষ পানে দরশন পরশনে
জীবিত আছে জীবনে, জীবিতের জীবন বিনে,
বঞ্চিত জীবনে॥

তৈল কাপড়ের গীত

পূর্ব-উত্তর বাংলার হিন্দু সমাজে বিবাহের একটি আচারের নাম তৈল-কাপড়, ইহাকেই অন্যত্র অধিবাস বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বিবাহের পূর্ব দিন বরের বাড়ী হইতে কনের বাড়ীতে অধিবাসের যে তত্ত্ব পাঠান হয়, তাহাকেই তৈল কাপড় বলে। এই উপলক্ষে যে মেয়েলী গীতগুলি গাওয়া হয়, তাহাই তৈল কাপড়ের গীত।

১

রামের মা কৌশল্যা রাণী বুলে, তোরা আয়।
তৈল কাপড় অধিবার শুভ সময় বইয়া যায়॥
যাইতে অইব মিথিলাতে জনক রাজার বাড়ী।
সেইখানে অইব বিয়া তাহার কুমারী॥

পন্থে আছে বিঘ্ন ভয় চোর দস্যুর থানা।
সুরুয না বসিতে পাটে করুক রওয়ানা ॥
অঘিয়া পুছিয়া তোমরা কর আশীর্বাদ।
পূরুক মনের বাঞ্ছা কৌশল্যার সাধ ॥ —মৈমনসিং

আনন্দে মাতিল সর্বপুরী।
চল রঙ্গ দেখি, সহচরী ॥
মৎস আইছে ভারে ভারে, জালুয়া সহকারে,
ঝাঁকায় ঝাঁকায় পূর্ণ করি,
তৈল কাপড় আইসাছে ঋষির বাড়ী ॥
দধি আইছে ভারে ভারে গোয়ালা সহকারে,
ভাণ্ডে ভাণ্ডে আছে সারি সারি।
তৈল কাপড় আইসাছে ঋষির বাড়ী ॥
শঙ্খ আইছে ভারে ভারে শঙ্খারু সহকারে,
দেইখা ভুলে ঝিয়ারী বহুরী।
তৈল কাপড় আইসাছে ঋষির বাড়ী ॥ —ঐ

তোয়াবালী কন্যার বারমাসী

নায়িকার বারমাসের বিরহ-বেদনা বর্ণনা করিয়া যে গান রচিত হয়, তাহাকে বারমাসী বলে (বারমাসী গান দেখ)। পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে এই শ্রেণীর একটি সুদীর্ঘ বারমাসী গানের নায়িকার নাম তোয়াবালী। তাহার সম্পর্কিত বারমাসীটিও তোয়াবালী কন্যার বারমাসী বলিয়া পরিচিত। সুদীর্ঘ বারমাসীটির প্রথমাংশের কয়েকটি পদ মাত্র উদ্ধৃত হইল।

১

কান্দন করে তোয়াবালী আউলায় মাথার কেশ।
এমন সুন্দর তোয়া সাধু পরদেশ ॥
বইয়ে গেল এই মাস, আইল পরতম আগুন মাস।
তোয়ারে ফেলাইয়া যায় রে সাধু পরবাস ॥

শ্বশুর আছে ভাসুর আছে তারা পঞ্চভাই।
তোমারি করম দোষে সাধু ঘরে নাই॥
আইন্যানি দিতে পার তোমার নিজ পতি।
এমন সুন্দর গো তোমা সাধু পরদেশী॥
আর কি আর এই ত পৌষ না মাসে।
পোবাল বায়রে বাও সেজ্যায়ায় নিদ্রা নাই সে।
নিদ্রা কাঞ্চা বাঁশের বাও, কাঞ্চা বাঁশের বাওনারে উঠল জ্বলনি।
আর কতকাল রাখব যৈবন দিয়া মুখের বাণী॥ —মৈমনসিংহ

সম্পূর্ণ বারমাসীটির জন্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য', তৃতীয় খণ্ড (১৯৬৫), পৃ ৫৫৩-৫৬ দ্রষ্টব্য।

ত্রিনাথের গান

বাংলার নাথ বা যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন জন যে নাথগুরুকে এক সঙ্গে উপাসনার রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেই ত্রিনাথের পূজা বলে। তবে ত্রিনাথের পূজাকে সাধারণভাবে ত্রিনাথের সেবা বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। ত্রিনাথ বলিতে মীননাথ, হাঁড়িপা এবং গোরক্ষনাথকেই মনে করা হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, এই তিনজন নাথগুরুই বাংলার নাথসমাজে বিশেষ প্রভাবশালী। হিন্দুধর্মের ত্রয়ী (trinity) বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিশরণ বা ত্রিরত্নের মত ত্রিনাথও তিনের সমষ্টি এবং সমষ্টিগত ভাবেই তাহাদের গুণ কীর্তন করা হয়। ত্রিনাথের গান ব্যতীতও ত্রিনাথের মাহাত্ম্যসূচক একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা-গীতি বা পাঁচালীও আছে।

১

দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও সাধুরে ভাই,
ফুল দিয়া সাজাও রে, ভাই, ত্রিনাথের ছবি ;
অনায়াসে তইরা যাইবে যমকে দিয়া ফাঁকি।
ত্রিনাথের নাম লইয়া যেবা যাত্রা করে,
সাপে নাহি দংশে তারে বাঘে নাইসে মারে,
ও সাধু ভাই, দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও। —মৈমনসিংহ

সাধু রে ভাই, দিন গেলে তিন্নাথের নাম লইও।
লইও লইও রে ভাই, ঐ নামটি পরম যতনে লইও।
সারা দিন ক'রো রে ভাই গৃহবাসের কাম।
সন্ধ্যা হইলে লইও ঠাকুর তিন্নাথের নাম।
আমার ঠাকুর তিন্নাথ যার বাড়ী যায়,
এক পয়সার তৈল দিয়া তিন বাত্তি সাজায়।
আমার ঠাকুর তিন্নাথ যার বাড়ী যায়,
এক পয়সার গাঁজা দিয়া তিন কল্কি সাজায়।
আমার ঠাকুর তিন্নাথ যার বাড়ী যায়,
এক পয়সার পান সুপারি সভাতে বিলায়।
তিন্নাথের লীলাখেলা বোঝন না যায়—
জলের মইধ্যে শিলা ভাসে শোলা তল যায়। —ঢাকা

কলিতে তিন্নাথের খেলা—তিন পয়সাতে হয় যার মেলা।
পয়সার গাঁজা কল্কি সাজা, বইস্যা আছেন চ্যালা।
গাঁজায় মারছে দম বলছে বম্
বোবোম্ বোবোম্ ভোম্ ভোলা।
আমার ঠাকুর তিন্নাথ যেবা করে হেলা,
তার হাত পাও মুচুড়্যা ভাঙ্গে চোখের বাইরয় ঢ্যালা।
তাই ভক্তি কইর‍্যা তিন্নাথের নাম লইও রে তিন বেলা। —ঐ

আইল বাবা কাশীনাথ যোগীয়া,
বোম্ বোম্ ভোলা আইল নাচিয়া।
তুমি ভূতের নাথ, ও মহাদেব, তুমি ভাঙ্গ খাও ধুতুরা খাও,
গাইলের মধ্যে কুটিয়া, কুলা দিয়া টেকিয়া।
ও টেকিয়া, ব্যোম ব্যোম ভোলা আইল নাচিয়া।

তুমি ভুতের নাথ, ও মহাদেব, ভূতের নাথ,
ভূতের পতি ভূত লইয়া কর বসতি
সদাই জোগাও ভূতের মান ;
কেমনে নিবে কলির জীব তরাইয়া
ব্যোম ব্যোম ভোলা আইল নাচিয়া,
আইল বাবা কাশীনাথ যোগিয়া। —মৈমনসিংহ

ত্রিনাথের পাঁচালী

নাথ বা যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিনাথের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া আখ্যানমূলক একখানি ক্ষুদ্র গীতি রচিত হইয়াছিল, তাহা ত্রিনাথের পাঁচালী নামে পরিচিত। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও পূব বাংলার হিন্দু-মুসলমান এবং নাথ সম্প্রদায় নির্বিশেষেই ত্রিনাথের নাম স্মরণ করিয়া গান করিত এবং এই পাঁচালী গান শুনিত। ত্রিনাথের পাঁচালীতে ত্রিনাথের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়—

১

নন্দী কন, সিদ্ধি নাই পার্বতী কহিল।
সিদ্ধি বিনিময়ে এই মলা পেতে দিল॥
এত শুনি শীঘ্র করি মলা হাতে লয়ে।
বটিকা তৈয়ার কৈলা বিষণ্ণ হৃদয়ে॥
বটিকা হৈতে হৈল মূর্তি অপরূপ।
তিন বক্ত্র ষড়ভুজ কৃষ্ণবর্ণ রূপ। —মৈমনসিংহ

এই মূর্তিই ত্রিনাথ নামে পরিচিত হইলেন,

ত্রিনাথ তোমার নাম, রাজা কিংবা প্রজা।
জাতিবর্ণ নির্বিশেষে করিবেক পূজা॥ —ঐ

নাথধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীতে অনুরূপ প্রসঙ্গ অন্যত্রও শুনিতে পাওয়া যায়। অতঃপর চম্পকনগরের মাধাই গৃহস্থ কি ভাবে ত্রিনাথের পূজা প্রচার করিলেন, তাহার বৃত্তান্তও পাঁচালীতে বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রিনাথ পীরের পাঁচালী

ত্রিনাথকে কোন কোন স্থলে ত্রিনাথ পীর বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। ইহা যে নাথধর্মের উপর মুসলমান ধর্মের প্রভাবের ফল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ত্রিনাথ পীর এবং ত্রিনাথ অভিন্ন বলিয়া ইহাদের উভয়ের পাঁচালীও অভিন্ন। কোন কোন ত্রিনাথ পীরের পাঁচালী হইতে জানা যায়, ত্রিনাথ ঠাকুর অবশেষে নদীয়ায় গৌরাঙ্গ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বৈষ্ণব ধর্মের উপর নাথ ধর্মের প্রভাবের ফল—

নবদ্বীপে ত্রিনাথ রূপ করেন ধারণ।
কেমনেতে জগজন করিবে পুজন ॥ —মৈমনসিংহ

থোয়া ব্রতের গান

পূর্ব বাংলার কোন কোন স্থানে কুমারী মেয়েরা কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন একটি ব্রত উদ্‌যাপন করে, তাহার নাম থোয়া ব্রত। বর্তমানে হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ দেবতার প্রতীক্ রূপে গোময় ও মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত প্রতিদিন এক একটি শিবলিঙ্গ এই উপলক্ষে তুলসী তলায় পুজিত হয়। কিন্তু পূর্বে থোয়া বলিতে অন্য কিছু বুঝাইত। যাহাই হউক, কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন একটি ক্ষুদ্র কলা গাছের ভেলায় করিয়া শিবলিঙ্গগুলি ফুল দূর্বা সহ জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে কুমারী ব্রতিনীদিগের কণ্ঠে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ ছড়া জাতীয়। একটু নিদর্শন এই :

১

থোয়া পুজি থুরি—আঘন মাস্যা বৌয়ারী।
কাঁথে ঝারি বুয়ানী-থোয়া পুজে জন্মের আয়োরাণী।

—মৈমনসিংহ

থোয়া ব্রত পৌষ মাসেও উদ্‌যাপন করা যাইতে পারে। তাহাকে পৌষ থোয়া বলে। বৎসরান্তে কিংবা তিন বৎসর পর এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিবার নিয়ম আছে। এই উপলক্ষে যে গান শোনা যায়, তাহাও ছড়া জাতীয় -

২

পৌষ থোয়া লাতি পাতি, বাপের ধন কান্ধে ছাতি
ভাইয়ের ধন পায়ে আল্‌তি।
সোয়ামীর ধন হাস্যা, পুত্রের ধন কান্দ্যা,
মুই বর্তীয়ে বর্ত করি সিংহাসনে বস্যা। —ঐ

দক্ষিণরায়ের গান

মকর সংক্রান্তির দিন চব্বিশ পরগণা জিলার দক্ষিণভাগে দক্ষিণ রায় নামক এক ব্যাঘ্রদেবতার পুজা হয়। কোথাও তিনি ছিন্নমুণ্ডরূপী, কোথাও তিনি ব্যাঘ্রারূঢ় নররূপী। এই পুজা উপলক্ষে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সুন্দরবন অঞ্চলের বাউলিয়া মৌল্যা মলঙ্গি এবং কৃষক-সমাজ গ্রামদেবতার পুজার থানে সমবেত হইয়া খোল করতাল বাজাইয়া গান গাহিয়া থাকে। এই গান সুদীর্ঘ আখ্যানমূলক এবং পাঁচালী জাতীয়। সেইজন্য ইহাকে দক্ষিণ রায়ের পাঁচালীও বলে। ইহার আখ্যায়িকা লইয়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল গানও রচিত হইয়াছে, তাহা রায়মঙ্গল নামে পরিচিত। পাঁচালীর একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল

১

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপীঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠার ভাটির মধ্যে হইবে প্রচার॥
পুর্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য॥
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা॥
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন।
অন্য গীত করাইয়া গায় জাগরণ॥
কাকুটি নাকুটি করে আর রঙ্গি ভঙ্গি।
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গি॥ —২৪ পরগণা

দধিমঙ্গলের গীত

পূর্ববাংলায় হিন্দুবিবাহের একটি আচারের নাম দধি-মঙ্গল। দধি মঙ্গল দ্রব্যের অন্যতম। বরকনে দধি আহার করে এবং ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলে ইহাতে দধির ভাণ্ডকে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়। এই উপলক্ষে যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই দধিমঙ্গলের গীত।

১

দধিমঙ্গল করে সীতারাণী গো,
আয় সকলে আমার নীলমণি ॥ ধুয়া ॥
আন গো দধির ভাণ্ড, ভেঙে কর অষ্ট খণ্ড,
আয় সকলে ইত্যাদি।
আন গো ক্ষীরের ভাণ্ড, ভেঙে কর অষ্ট খণ্ড,
আয় সকলে ইত্যাদি।
আন গো চিনির ভাণ্ড, ভেঙে কর অষ্ট খণ্ড,
আয় সকলে ইত্যাদি। —ঢাকা, বিক্রমপুর

দধিমঙ্গল করে সীতারাণী গো আয় সকলে (ধুয়া)
আন দধির ভাণ্ড, ভাইঙ্গে কর আষ্ট খণ্ড।
আন গো ক্ষীরের ভাণ্ড, ভাইঙ্গে কর আষ্ট খণ্ড।
আন গো চিঁড়ার ভাণ্ড, ভাইঙ্গে কর আষ্ট খণ্ড।
আন গো সকালে সকালে,
দধিমঙ্গল করে বিধুমুখী, গো আয় সকলে ॥ —ঐ

নিশি ভোর হল এক্ষণে।
ভোর হল নিশি, অস্ত গেল শশী,
রাম লয়ে তোরা বসে যা ভোজনে।
আন দধি আন চিঁড়া ছানার সন্দেশ ক্ষীরা,
রাম লয়ে তোরা বসে যা ভোজনে। —ঐ

দস্যু কেনারামের পালা

'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রকাশিত একটি পালাগানের নাম দস্যু কেনারামের পালা। পূর্ব মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলির মধ্যে 'দস্যু কেনারামের পালা'র কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্যান্য গীতিকার মত নরনারীর প্রেম ইহার ভিত্তি নহে—ইহার ভিত্তি সাধারণ মানব এবং মানব-প্রেম। ইহাতে মানুষেরই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া এক নরঘাতক দস্যুর পাষাণ-হৃদয় দ্রব হইয়াছে। ইহার মূল কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু স্বতন্ত্র একজন বিশিষ্ট কবির রচিত মনসা-মঙ্গলের আনুপূর্বিক কাহিনীটি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য ইহার মূল কাহিনীর রসটি নিবিড় হইতে পারে নাই। এই পালাটির বিচার করিতে হইলে ইহার বহিরাগত এই স্বতন্ত্র অংশটি পরিত্যাগ করিয়াই লওয়া প্রয়োজন। সেই ভাবেই কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে—

শৈশবে ব্রাহ্মণ-সন্তান কেনারাম মাতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে আশ্রয় লইল। কিন্তু দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, মাতুল তাহাকে পাঁচ কাঠা ধানের বিনিময়ে এক হালুয়ার নিকট বিক্রয় করিল। হালুয়ার পুত্রগণ ডাকাত; শৈশবেই কেনারামের ডাকাতি বিদ্যায় দীক্ষালাভ হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে দুর্দান্ত নরঘাতক দস্যুতে পরিণত হইল। তাহার নাম শুনিয়া লোক শিহরিয়া উঠিত। একবার দ্বিজ বংশীদাস তাঁহার মনসার গানের দল লইয়া কোন এক স্থানে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে কেনারামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কেনারাম দলবল সহ তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। বংশীদাস জন্মের শেষ একবার মনসার গান গাহিয়া লইবার প্রার্থনা করিলেন। কেনারাম সম্মত হইল। দ্বিজ বংশী গান আরম্ভ করিলেন, কেনারাম শুনিতে লাগিল। যখন দ্বিজ বংশী বেহুলার ভাসান অংশ গাহিলেন, তখন কেনারাম, হাতের খাঁড়া দূরে ফেলিয়া দিয়া দ্বিজ বংশীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, আজন্ম-সঞ্চিত পাপের জন্য তাহার অনুতাপের সীমা রহিল না। দ্বিজ বংশী তাহাকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তদবধি কেনারাম একজন পরম ভক্তরূপে সমাজে পরিচিত হইল।

এই কাহিনীর মধ্যে কবির যে কি শক্তি, সমাজ-জীবনে কবির যে কি দান, তাহার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সহানুভূতির সঙ্গে কবি মানুষের দুঃখের

কথা প্রকাশ করেন, তাহাতে নরঘাতক দস্যুর হৃদয়ও বিগলিত হয়, সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে। কেনারামই এই কাহিনীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাহার চরিত্রের মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ইহাই বড় কথা নহে। তাহার চরিত্রের পরিবর্তন এখানে সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইয়াছে কি না, তাহাই বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে দুইটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কেনারামের জন্ম-সংস্কার। দেখিতে পাওয়া যায়, মনসার বরে কেনারামের জন্ম হইয়াছে। অপুত্রক ব্রাহ্মণ-দম্পতি যখন সন্তান কামনা করিয়া দেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, তখন এক রাত্রিতে দেবতা স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে পুত্রবর দিয়াছিলেন, তাহার ফলেই কেনারামের জন্ম। অতএব মনসার বরে তাহার প্রথম জন্ম হইয়াছিল, দ্বিজ বংশীর মুখ হইতে মনসার গান শুনিয়া তাহার পুনর্জন্ম হইল। গীতিকার মধ্যে এই ইঙ্গিতটির একটি উচ্চাঙ্গ কাব্য মূল্য আছে। দ্বিতীয়তঃ কেনারাম ব্রাহ্মণ-সন্তান, ডাকাতি তাহার কৌলিক ব্যবসায় নহে, অবস্থাধীন হইয়া ইহাতে তাহার অভ্যাস হইয়াছে মাত্র, অতএব এই অভ্যাস অপরিত্যাজ্য নহে। দ্বিজ বংশীর মুখে মানুষের জীবনে নির্যাতের নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্যের কাহিনী শুনিয়া তাহার উচ্চকুল-সুলভ করুণাগুণের বিকাশ হইল, ইহাতেই তাহার চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—ইহাতে অস্বাভাবিকতা বা অসঙ্গতি কিছু মাত্র নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, এই গীতিকায় আয়ত্ত (acquired) ও সহজাত (inherent) সংস্কারের মধ্যে দ্বন্দ্ব নির্দেশ করিয়া পরিণামে সহজাত সংস্কারেরই জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনীটির উপর রামায়ণোক্ত রত্নাকর দস্যুর কাহিনীর প্রভাব অনুভব করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার উপর কোনও বহিঃপ্রভাব নাই।

দস্যু কেনারামের পালাটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—

১

জালিয়া বন্দের পারে বাকুলিয়া গ্রাম।
তার মধ্যে বাস করে দ্বিজ খেলারাম ॥
তিনকাল গেল রে তার অপুত্রক হৈয়া।
মুখ নাহি দেখে লোকে আটখুর বলিয়া ॥

ঘরে বৈসা যশোধারা কান্দে খেলারাম।
কি পাপ কইর‍্যাছি তাইতে বিধি হৈলা বাম॥
মনেতে আছিল যদি করবা আটকুড়িয়া।
কেন দিছিলা জন্ম আর কেন হৈল বিয়া॥
ভাত নাই সে খাইব আর না ছুঁইব পানি॥
দুয়ার বান্ধিয়া ঘরে ত্যেজিব পরাণি॥
অনাহারে মরব আর নাহি সহে দুখ।
আর না দেখিব উঠিয়া পাড়া পড়শীর মুখ।
আর না দেখিব সূর্য না জ্বালাইব বাতি।
আন্ধাইরে পড়িয়া মোরা কাটাইবাম দিবারাতি॥

—পূর্ব-মৈমনসিংহ

দাঁড় গান

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অধিবাসী মূলত আদিবাসীদিগের এক শ্রেণীর নৃত্য সম্বলিত গানের নাম দাঁড় গান। ইহার নৃত্যের নাম দাঁড়শাল বলিয়া গীতের নাম দাঁড়গান। ক্রমে আদিবাসী সমাজ হইতে এই গান নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজেও প্রবেশ করে। প্রেমের বিষয় সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা সত্ত্বেও ইহাতে রাধাকৃষ্ণের নাম আজিও প্রবেশ করে নাই।

১

তুমি তরু আমি লতা বেড়িয়া রাখিব—
যাও দেখি যাবে কোথা আমারে ছাড়িয়া।
আসিতে আশ্বিন গেল দেখিতে ভাদর গেল
আলিরে দেখা পাইলে বলিবি আসিতে।
আগে দিকে মেঘে ঘনাল পিছন দিকে জ্যোৎস্না,
ভিজেছে কি না ভিজেছে মাথা বাঁধা গুঁদনা।
শিশিরে কি ধান হয় বিনা বরিষণে রে,
বচনে কি মন মানে বিনা দরশনে রে। —অযোধ্যা (পুরুলিয়া)

২

পদ্মপাতের জল পাশে ধইলা যায়।
সাধন ধর গো বেলা বইয়ে যায়। —কাঁকড়ামুড়া (পুরুলিয়া)

লোকে বলে ভুল ভুল, আমরা ভুলিব কেমনে,
ভুলিলে তো কোনো ক্ষতি নাই।
ভুল হবে কি পরের কথায়,
দিবানিশি এইরূপ জাগিছে হিয়ায়। —ঐ

দাঁড়শালি গান

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এক শ্রেণীর লোক-নৃত্যের নাম দাঁড়শালি নাচ, এই নাচ উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই দাঁড়শালি গান নামে পরিচিত। নৃত্য সম্বলিত সঙ্গীত বলিয়া ইহা প্রধানতঃ তাল-প্রধান সঙ্গীত। পূর্বে ইহা স্ত্রীপুরুষের মিশ্র নৃত্য ছিল বলিয়া সঙ্গীতও স্ত্রীপুরুষের মিশ্র ছিল; বর্তমানে কেবল মাত্র পুরুষই এই সঙ্গীত এবং নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

১

হেঁশলা নগরীয়া দাড়িমের দান্দিয়া,
হামতো যাইব তোরি নগরীয়া, গো সজনি।
কুচিতো মোর গোলিয়া ঘন পানি ঠার থে,
ঝিকি মরি পরি লিলই ঝিনেকাকা নগরীয়া।
হামতো যাইব তোরি নগরীয়া, গো সজনি॥

—পচাপানি (মেদিনীপুর)

২

মোর মন তোর ঠেঁই নে,
খেজুর পাতে গাঁথলি মোর দধি ফুল॥
মোর মন তোর ঠেঁই নে॥
মোর মন বন মাঝে
খেজুর পাতে গাঁথলি মোর দধি ফুল॥
ফুল ফুটিল মন ফুল নাই থির মন
মোর মন বন মাঝে ধায়গো সজনি।
হেন হনুয়া বলে, ঝুমুরির নাই বলে।
মোর মন বনমাঝে ধায়গো সজনি॥ —ঐ

৩

যমুনাকে যায়েছিলি মাঝ পথে ভেটলি
দেখ না গো, দিদি, কে বটে লোকটি।
যমুনাকে যায়েছিলি মাঝ পথে ভেট্‌লি
দেখ না, দিদি, পেটু বাটে সাপটি॥ —বেলপাহাড়ী

৪

শালুক ফুল করে টলমল,
বঁধু গেছে হে ছাড়িয়ে।
গায়ের গামছা হাতে ধরিয়ে।
পায়ের জুতা হাতে ধরিয়ে।
বঁধু গেছে হে ছাড়িয়ে। —ঐ

৫

লীল কমল দহে ফুটল ফুল যে,
ফুল দেখে প্রভু দিল ঝাঁপরে। —ঐ

দাঁড়া কবি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিওয়ালার গান এদেশে প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই পশ্চিম বাংলায় একশ্রেণীর বাঁধা উত্তর-প্রত্যুত্তর-মূলক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল, তাহা দাঁড়া কবি বলিয়া পরিচিত। প্রথম অবস্থায় ইহা নিরক্ষর পল্লী কবি-দিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিয়া লোক-সঙ্গীতের ধর্ম রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে তাহা শিক্ষিত কবি এবং সুরকারদিগের হাতে পাড়ি লোক-সঙ্গীতের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, রাগ-সঙ্গীতের সুরও ইহাতে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। তখন ইহা সমসাময়িক অন্যান্য গীত-রীতির সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়া নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, '"হাফ আখড়াই," "দাঁড়া সখের কবি" ও পেসাদারি কবিতার গাহনার প্রণালী এক প্রকার। কিছু মাত্রই প্রভেদ নাই। প্রথমে "চিতেন" পরে "মহড়া" সর্বশেষে "অন্তরা" গাহিতে হয়, কিন্তু লিখনকালে অগ্রে মহড়া, পরে চিতেন, শেষে অন্তরা লিখিতে হইবে।'—সংবাদ প্রভাকর, ১৬ই অক্টোবর ১৮৫৪। প্রাচীন দাঁড়া কবির গানকে সংস্কার করিয়া রামনিধি

গুপ্তের শিষ্য মোহনচাঁদ বসু সর্বপ্রথম সখের দাঁড়া কবি গানের সৃষ্টি করেন। তিনি হাফ আখড়াই (পরে দেখ) গানেরও স্রষ্টা।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-প্রসঙ্গ লইয়াই দাঁড়া কবির গান রচিত হইত। দাঁড়া কবির ক্রম এই প্রকার হইত—'চিতান-পরচিতান-ফুকা-মেল্‌তা-মহড়া-শওয়ারি-খাদ-ফুকা-মেলতা-অন্তরা। অন্তরা সমাপ্ত হ'লে দ্বিতীয় চিতান। আগের কবিগানের অন্তরা রচনার রীতি পরে থাকে না। দ্বিতীয় ফুকার পরই গীত সমাপ্য। হাফ আখড়াই অবিকল এই রকম, কেবল ফুকার পর ডবল ফুকা। অন্তরা থাকে না।'

১

মহড়া

সখি বলব কি এ দুখিনীর এ জ্বালা বারোমাস।
গেল চিরকাল কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে,
হোয়েছে যেন সীতের বনবাস।
যদি কই, তবেই, সই, সর্বনাশ।

চিতেন

ভাল শুভক্ষণে তাতে আমাতে এক রজনী দেখা, সই।
তারপর আমিই বা কে, সেই বা কে, কর্মে পাওয়া গেল কই॥
কেমন হোয়েছে দৃষ্টি পোড়া সার।
চক্ষে দেখতে পাই দুঃখে মরে যাই, করে না সাপক্ষ ব্যাভার।
আমি লজ্জা খেয়ে যদি করি সাধাসাধি উলটে সে করে আমায় উপহাস।

অন্তরা

সই, আগে ছিলেম সুখে নব বালিকে, এখন সে কলিকে ফুট্‌লো,
মধুব্রতী হেরে বঁধু বিগুণ, দ্বিগুণ আগুন জ্বলে উঠ্‌লো॥

ঐ গীতের পালটা

মহড়া

প্রাণনাথেরে, প্রাণসখি, তোমরা যদি কেউ বুঝাও।
আমি বোল্লে তো শুনবে না, স্বভাব দোষ ছাড়বে না, বোলব না,
কোথা যেও না যেও।
যৌবন যায়, একবার তায় শুনাও॥

কেমন পোড়েছি বিষ-নয়নে তার।
ফুট্‌ল এ মুকুল, হয় না অনুকূল, ভ্রান্তে কি মাসান্তে একবার।
থাক্কে বর্তমান পৃতি, সতীর এ দুর্গতি, পারতো সকল জ্বালা ঘুচাও।
চিতেন
বুঝলাম মনে মনে কোকিলার গানে ডুবলাম কলঙ্কে এবার।
তেজলাম সকল সুখো ভোগে হায়, মোজলাম বিচ্ছেদে তাহার॥
আমি সাধে কি সাধিনে গো তায়।
দেখলে সই আমায় শক্র ফিরে চায়, সে যেন চোখের মাথা খায়।
হোলো কি গুণে পরের বশ, ছেড়ে সে ঘরের রস, গোপনে
দুটো কথা শুধাও।

দাঁড়া নাচের গান

পূর্বে যে দাঁড়শালি নাচ ও গানের কথা উল্লেখ করা হইল, ইহার সঙ্গে দাঁড়া নাচের গানের কোন পার্থক্য নাই। তথাপি ইহা দাঁড়া নাচের গান বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অধিবাসী হিন্দুভাবাপন্ন নিম্ন শ্রেণীর সমাজে ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জিলার সীমান্তবর্তী পচাপানি গ্রামের হনু মুড়া নামক একজন মুড়া বা মুণ্ডা জাতীয় লোকের নিকট হইতে নিম্নোদ্ধৃত শেষ দুইটি গান ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথমই বন্দন গান শুনিতে পাওয়া যায়—

১

আখড়া বন্দনা করি শ্রীগুরু চরণ ধরি
আখড়া বন্দন ব্রজনারী,
মগনে ঝুমুর লাগে ভারি॥ —পুরুলিয়া

২

মেঘ আঁধার রাত, পথে কাদাপানি,
পথে যদি কিবা হত জানিব কেমনে।
বঁধু, এত রাত কেনে॥
লম্ফে যদি কিবা হত দয়া না ছাইলে,
বঁধু, এত রাত কেনে। —পচাপানি

এখন বলে গো, আমি মনেও না জানি,
দুঃখ দিয়ে গেল শ্যাম পরাণে মারিয়ে।
এখন বলে গো, আমি মনেও না জানি,
ফাঁকি দিয়ে গেল শ্যাম পরাণে মারিয়ে ॥
দুঃখ দিয়ে গেল শ্যাম অন্তরে শেল দিয়ে ॥
এখন বলে গো, আমি মনেও না জানি।
কলঙ্ক ঘটিল, আমার বঁধুয়ার বিনে।
এখন বলে গো, আমি স্বপনে না জানি,
দুঃখ দিয়ে গেল শ্যাম অন্তরে শেল দিয়ে ॥ —পচাপানি

দিশা

আখ্যায়িকামূলক কোন গীত গাহিবার সময় মূল গায়েন একসঙ্গে গানের চারিটি পদ গাহিবার পর দোহারেরা যে এক বা দুই পদ গানের সুরে পুনরাবৃত্তি করে, তাহাকে দিশা, ধুয়া বা ঘোষা বলা হয়। ইহাতে সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক গান একই গায়েনের কণ্ঠ হইতে গীত হইবার একঘেয়েমি দোষ দূর হয়। দিশার বিষয়-বস্তুর সঙ্গে মূল কাহিনীর কোন সম্পর্ক থাকে না। শাক্ত মঙ্গলগানের মধ্যে বৈষ্ণব-বিষয়ক দিশা গীত হইতে পারে। (ঘোষা ও ধুয়া দেখ)।

ও শ্যামের বাঁশুরী বরানে বয়ানে,
রূপ লাইগাছে রে ভাই। —উত্তরবঙ্গ

ও আনন্দ হৈয়া শিব জুড়িল নাচন।
শিঙ্গা ডমরু বাজান ত্রিলোচন ॥ —ঐ

ও দারুণ বিধাতারে,
আমারে ভাসাল্যো মায়াজালে। —ঐ

দুর্গাপুরাণের গান

দুর্গোৎসবের সময় চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ নাট ঘরে পূর্বে যে তিন দিন ব্যাপিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের বাংলা অনুবাদমূলক গীতিরচনা দুর্গাপুরাণের গানের অনুষ্ঠান হইত, তাহাকে দুর্গাপুরাণের গান বলিত। ইহা পাঁচালী গানের আকারে পরিবেষণ করা হইত। একজন মূল গায়েন হাতে চামর ও পায়ে নূপুর পরিয়া দুই চারিজন দোহারের সহায়তায় এই গান গাহিয়া যাইত।

সুরথ রাজার দুর্গা পূজা হইতে শ্রীরামচন্দ্রের চণ্ডীপূজা পর্যন্ত ইহাতে বর্ণিত হইত। দুর্গাপুরাণ বা দুর্গামঙ্গল বহুল প্রচলিত ছিল। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ করের মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ সুপ্রচলিত ছিল। পুরাণের অনুবাদ হইলেও পরিবেষণের রীতি সম্পূর্ণ লৌকিক ছিল। সামান্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১

চণ্ডীর চরণে করি শত নমস্কার।
কহিছে মার্কণ্ড মুনি করিয়া বিস্তার॥
সাবর্ণিক নামে হৈল সূর্যের তনয়।
হইল অষ্টম মনু সেহি মহাশয়॥
শুন শুন, মুনিগণ, উৎপত্তি তাহার।
কহিব সে সব কথা করিয়া বিস্তার॥
সাবর্ণিক নামে মনু রবির তনয়।
মহামায়া প্রাদুর্ভাবে মনু সেহি হয়॥

—ভবানীপ্রসাদ

দুর্গাপূজার গান

যে কোন উৎসব এবং পুজাপার্বণ উপলক্ষেই গান গাহিবার রীতি একদিন স্ত্রীসমাজে প্রচলিত ছিল। ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে যখন দুর্গোৎসব হইত, তখন পরিবারের মহিলারা একত্র হইয়া গীত গাহিত। তাহাকে সাধারণভাবে দুর্গাপূজার মালসী বলিত। অবশ্য মালসী রাগিণীতে যে একটি বিশিষ্ট সুর আছে, তাহাই ইহার উপর আরোপ করিয়া সমবেত ভাবে ইহা গাওয়া হইত। কোন কোন সময় পুরাণ পাঠকের নিকট শ্রুত পৌরাণিক কাহিনীর কোন

কোন অংশ মেয়ালী গীতের রূপে পরিবেষণ করা হইত। নিম্নোদ্ধৃত প্রথম গীতটি তাহাই।

১

কহে শম্ভু সেনাপতি, রণে ভঙ্গ দিও না—
বধিলে তো ব্রহ্মময়ী, ভবে জন্ম আর হবে না। (দেবীর প্রতি)
দুর্গে দুর্গে, ওমা দুর্গে, তারিণী দুঃখহারিণী,
বনের মধ্যে কর যুদ্ধ, আউলাইয়া মাথার বেণী।
কৈ যাও গো, মা কৈলাসেশ্বরী—
ত্যাজ্য কইরে কৈলাসপুরী।
কি ভাইবে মা ভবরাণী, চলেছ গো একাকিনী।
জানি জানি ওমা, তারা, তুমি শিবের নয়নতারা,—
তোমাকে হইয়ে হারা বাঁচবে না গো শূলপাণি। —মৈমনসিংহ

পুণ্যধাম বাপের বাড়ী, যাইতে চাহে সকল নারী,
ঐ দেখ না দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী।
গণেশের কোলত করি আইসেন জননী॥
সম্মুখেতে নন্দী আইয়ের আশা ছোটা ধরি।
ভিঙ্গি চলে পাছে পাছে ধুতুম্ তুতুম্ করি।
মেনা আইলো বারাই নিতে আদরের ঝি।
ঝি নাতি দেখি মেনা হাসে ভাসে সুখে।
বাটা ভরি আনে পান দিতে ঝিয়ের মুখে॥
আগ বাড়াইয়া নিল মায়ে বাড়ীর ভিতর।
পূজা দিল বলি দিল খাবাইল বিস্তর॥
তিন দিন রাখিল মায়ে বড় যতন করি।
চারি দিনর দিন বিদায় দিল যাইত নিজের বাড়ী॥
শিব বোলে কি আনিলা আমার কারণ।
আলুনি কচুশাক টুনি পোড়া পানি ভাত,
গরীব বাপের বাড়ী আমার ভোজন॥ -ঢাকা

৩

রাণী, দেও গো জয়ধ্বনি।
তোমার উমা লইয়া আসিল নন্দিনী॥
একে শুক্র উদয় শরত সময়,
ভাগ্যে বুঝি ব্রহ্মময়ী আসল হিমালয়॥
উমা কোলেতে আনি বসাইলেন রাণী,
আস আমার চাঁদবদনী জুড়াও গো প্রাণী॥
আমি জিজ্ঞাসা করি, হে গো তারিণী,
কেমন কইরা হরের গৃহে আছিলা তুমি॥
না কহে বাণী, শুন জননী,
না দেয় বলে হরনাথে, উড়েছিল প্রাণী॥
জামাই কি আপন নিশির স্বপন,
উমা ধনকে না দেখিলে ত্যজিবে জীবন॥
এক পাগলের পুর, শুনিতে অদ্ভুত,
শ্মশানে মশানে ফিরে খায় ভাঙের গুড়া॥ —ত্রিপুরা

৪

দুর্গা আমার বিপদ্-বিনাশিনী।
জয়তারা তারিণী মা গো, হিমালয়-নন্দিনী।
মা গো, তোমার পদে করি স্তুতি, রাম রঘুমণি॥
ব্রহ্মা হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন যজমান।
কত ব্রহ্মা ভগবতীর পূজার বিধান॥
শঙ্খ লাগে, সিন্দুর লাগে, রজত কাঞ্চন।
কুম্‌কুম্ কস্তুরী লাগে,—আগর চন্দন॥
সপ্তমী পুজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে।
ভোগ নৈবিদ্যি দিলেন ব্রহ্মা. হাজারে হাজারে॥
অষ্টমী পূজিলেন ব্রহ্মা, অষ্ট উপচারে।
বিল্বপত্র দিলেন ব্রহ্মা—হাজারে হাজারে॥
নবমী পুজিলেন ব্রহ্মা—নব উপচারে।
মেষ-মৈষ দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে॥ —মৈমনসিং

দেওয়ান ভাবনার পালাগান

'দেওয়ান ভাবনা' 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্তর্গত একটি পালাগান। প্রেমাস্পদের জন্য আত্মবিসর্জনের একটি সকরুণ চিত্র 'দেওয়ান ভাবনা' পালাটির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কাহিনী এইরূপ—দশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া সুনাই জননীকে সঙ্গে লইয়া দরিদ্র মাতুলের গলগ্রহ হইল। মাতুল নিঃসন্তান, সেইজন্য ভগিনী ও ভাগিনেয়কে অনাদর করিল না, যথাসাধ্য ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল। সুনাইর বিবাহের বয়স হইল দেখিয়া পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সুনাই মাধব নামে এক যুবককে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, মাধবও তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু ইতিমধ্যে দেওয়ান ভাবনার নিকট সুনাইর রূপযৌবনের সংবাদ গিয়া পৌঁছিল। ভাবনা দরিদ্র মাতুলকে অর্থ ও জমির প্রলোভন দেখাইয়া সুনাইকে তাহার নিকট বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিল। মাতুল ইহাতে স্বীকৃত হইল। সুনাই মাধবের নিকট তাহাকে ভাবনার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল। পরদিন যখন সুনাই জল আনিতে গেল, তখন ভাবনার লোক তাহাকে জলের ঘাট হইতে ধরিয়া লইয়া গেল। কিন্তু ভাবনার নিকট তাহাকে লইয়া পৌঁছিবার পূর্বেই, মাধব তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজের গৃহে লইয়া গিয়া বিবাহ করিল। ভাবনা মাধবের পিতাকে বন্দী করিল; পিতার উদ্ধারের বিনিময়ে মাধব নিজে ভাবনার কারাগারে প্রবেশ করিল। ভাবনা মাধবের পিতাকে বলিয়া দিল, সুনাইকে পাইলে সে মাধবকে ছাড়িয়া দিবে। মাধবের পিতা গৃহে ফিরিয়া সুনাইর নিকট এ'কথা বলিলেন। সুনাই প্রিয়তমকে উদ্ধার করিবার জন্য ভাবনার নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত হইল, তারপর সঙ্গে বিষবড়ি লইয়া যাত্রা করিল। মাধব কিছুই জানিতে পারিল না। সুনাই পৌঁছিবা মাত্র মাধব কারামুক্ত হইল; কিন্তু ভাবনা সুনাইর নিকট আসিয়া দেখিতে পাইল, তাহার প্রাণহীন দেহ পালঙ্কের উপর লুটাইতেছে।

দশ বৎসর বয়সে যে পিতৃহীন হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়াছে, তাহার জীবন অভিশপ্ত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সেইজন্য তাহার প্রেমেও অভিশাপ প্রবেশ করিল। তাহার দুরন্ত রূপযৌবন তাহার প্রণয়াস্পদকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিবার বাধা হইল নির্মম অভিশাপের রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের

মধ্যস্থলে আসিয়া দেওয়ান ভাবনার উদয় হইল। প্রণয়াস্পদের সঙ্গে মিলনের পূর্বেই এই অভিশাপ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল; সেইজন্য মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। সুনাইর মৃত্যু আত্মত্যাগ,—মলুয়ার মত আত্মহত্যা নহে। এখানে উভয়েরই প্রেমে নিবিড়তা ছিল; সেইজন্য আত্মত্যাগের প্রেরণাও নিতান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়াছিল। প্রণয়াস্পদকে রক্ষা করিবার জন্য সুনাইর এই উদার আত্মত্যাগ, কেবল মাত্র গীতিকার নহে, যে কোন মহাকাব্যের বিষয় হইতে পারে।

মাধবের চরিত্রটি ইহার মধ্যে অপরিস্ফুট হইলেও দুই একটি আভাসে ও ইঙ্গিতে তাহার যে দৃপ্ত পৌরুষের একটু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা গীতিকার অন্যান্য পুরুষ চরিত্রের ব্যতিক্রম বলিয়াই বোধ হয়। সে বাহুবলে দেওয়ান ভাবনার অনুচরদিগের কবল হইতে তাহার প্রণয়িণীকে উদ্ধার করিল, তারপর নিজের পত্নীর সম্মান রক্ষা করিয়া নিজে দেওয়ান ভাবনার কারাবরণ করিল। তাহার এই পৌরুষ ও ত্যাগ সুনাইকে তাহার অপুর্ব আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করিল; কারণ, সুনাই বুঝিতে পারিল, সে বাঁচিয়া থাকিলে তাহার স্বামী দেওয়ান ভাবনার কবল হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না—তাহার প্রতি সুগভীর প্রেমই তাহার এই সুমহান্ আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দিয়াছিল। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র এই একটি মাত্র পুরুষ চরিত্রে যথার্থ পৌরুষের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রূপজ মোহের মধ্যে এখানে প্রেমের জন্ম হইলেও মোহকে জয় করিয়া পৌরুষ এখানে যথার্থ প্রেমের পথ বাঁধিয়া দিয়াছিল। মাধব নিজের শক্তি দ্বারা অপহরণকারী দস্যুর হাত হইতে নিজের প্রণয়িণীকে উদ্ধার করিয়াছিল,

জলের উপর হইল রণ নিশির আমলে।
কোথা রইল দাঁড়ী মাঝি পইড়া মরে জলে॥

মাধবের এই পৌরুষের পরিচয়ের মধ্যে তাহার প্রেম মোহমুক্ত হইল এবং তাহাই সুনাইকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিল।

দরিদ্র ও লোভী ব্রাহ্মণ সুনাইর মাতুলের চরিত্রটি একটি বাস্তব সৃষ্টি। পল্লীকবিগণ মানব-চরিত্র যাহা যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা সেই ভাবেই রূপায়িত করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার চরিত্রের মধ্য দিয়া কোন কোন সময় গূঢ় শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইলেও, অন্যান্য সাধারণ চরিত্র সর্বদাই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব রূপ লাভ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দেওয়ান ভাবনা পালাগানের প্রথম আরম্ভ এই প্রকার—

ছয় না বছরের সুনাই গো ইরামতী জলে।
হাসিয়া খেলিয়া উঠে গো আপন মায়ের কোলে ॥
সাত না বছরের সুনাই গো মুখে মধুর হাসি।
মায়ের কোলে উঠে সুনাই গো পুন্নিমার শশী ॥
আট না বছরের সুনাই গো ঝাইড়া বান্দে চুল।
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইর গো শতেক পদ্মফুল ॥
নয় না বছরের সুনাই গো নবীন কিশোরী।
গিরের পরদীম সুনাই সুনাই গো আঙ্গিনা পশরি ॥
দশ না বছরের সুনাই গো দশে শূন্য পড়ে।
বিধাতা হৈল বাদী গো পড়ল বিষম ফেরে ॥

—পূর্ব মৈমনসিংহ

দেওয়ানা মদিনার পালাগান

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সংগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকা 'দেওয়ানা মদিনা।' ইহার কাহিনী এই প্রকার—দুইটি বালক-পুত্র সংসারে রাখিয়া বান্যাচঙ্গ সহরের দেওয়ান সোনাফরের পত্নীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর সময় আলাল ও দুলালকে দেওয়ানের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পত্নী পুনরায় তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিবারণ করিয়া গেলেন; কারণ, জননীর আশঙ্কা হইল, সংমা সংসারে আসিলে তাঁহার পুত্র দুইটির লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। সোনাফর কিছুদিন মৃতা পত্নীর কথা রক্ষা করিলেন; কিন্তু আত্মীয়-স্বজন ও পারিষদদিগের পরামর্শে তাঁহাকে অবশেষে পুনরায় বিবাহ করিতে হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি পুত্রদিগকে নিজের কাছে রাখিয়া পূর্বের মতই আদর করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে সংমার নিকট অন্তঃপুরে যাইতে দিলেন না। ইহাতে সংমার হিংসা আরও বাড়িয়া গেল। সংমা সঙ্কল্প করিল, আপদ দুইটিকে যে ভাবেই হউক সংসার হইতে বিদায় করিতে হইবে। তারপর একদিন তাহার কৌশলে তাহারা নৌকাপথে নীত হইয়া দূর দেশান্তরে নির্বাসিত হইল। আলাল ও দুলাল এক সদাগরের গৃহে আশ্রয় লাভ করিল—তাহারা সদাগরের রাখালের কার্যে নিযুক্ত হইল। দেওয়ানের পুত্র হইয়া এই কার্য তাহারা সহ্য করিতে পারিল না,

একদিন আলাল সেখান হইতে পলাইয়া গেল। এইবার আলাল এক সহৃদয় দেওয়ানের গৃহে আশ্রয় পাইল, তাঁহার নাম সেকেন্দর। দেওয়ান তাহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতে লাগিলেন, সেও সাধ্যমত দেওয়ানের সেবায় দিন যাপন করিতে লাগিল। দেওয়ান তাহাকে মাহিনা দিতে চাহিলে সে লইল না ; বলিল, 'একসঙ্গে একদিন লইব।' দেওয়ানের দুই কন্যা ছিল—মমিনা ও আমিনা। একটি কন্যাকে দেওয়ান আলালের নিকট বিবাহ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার কোন কুলপরিচয় না পাইয়া কি করিবেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই ভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল। একদিন আলাল দেওয়ানের নিকট তাহার মাহিয়ানা চাহিল—বলিল, 'আমি অর্থ চাই না—বান্যাচঙ্ সহরের সংলগ্ন আমার একটি বাড়ী করিবার সাধ হইয়াছে, সেখানকার দেওয়ানের সঙ্গে লড়াই করিয়া যাহাতে সেই বাড়ী নির্মিত হইতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত ফৌজ আমার সঙ্গে দিন।' দেওয়ান তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। সোনাফরের মৃত্যুর পর ইতিমধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর বালক-পুত্র বান্যাচঙ্গের দেওয়ান হইয়াছিল, তাহাকে পরাজিত করিয়া আলাল পিতার দেওয়ানি অধিকার করিয়া লইল। সেকেন্দর এইবার তাঁহার এক কন্যাকে আলালের নিকট বিবাহ দিতে চাহিলেন ; আলাল বলিল, 'আমার এক ভাই আছে, তাহাকে সন্ধান করিয়া আনিয়া আমরা দুইজনে আপনার দুই কন্যা বিবাহ করিব।' এই বলিয়া আলাল দুলালের সন্ধানে বাহির হইল। বহু অনুসন্ধানের পর এক গ্রামে আসিয়া আলাল দুলালের সন্ধান পাইল। তাহাকে দেশে ফিরিয়া পিতার দেওয়ানির অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বলিল। দুলাল সঙ্কটে পড়িল, সে ইতিমধ্যে সেই গ্রামেই এক গৃহস্থ কন্যাকে বিবাহ করিয়া এতকাল সেখানেই বসবাস করিতেছে। তাহার স্ত্রীর নাম মদিনা। এই স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তানও হইয়াছে, নাম সুরুজ। ইহারা সাধারণ গৃহস্থ, ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেওয়ানি করা চলে না, লোক-নিন্দা হইবে,—অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়! আলাল বলিল, 'সেজন্য ভাবিও না, আমরা দুইজনে এক দেওয়ানের দুই কন্যা বিবাহ করিব, ইহাদিগকে ছাড়িয়া চল। স্ত্রীকে তালাক্ দিতে অধর্ম নাই।' শুনিয়া দুলাল তাহাই করিল, মদিনার ভাইয়ের নিকট তালাক্‌নামা লিখিয়া দিয়া কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া আলালের সঙ্গে চলিয়া গেল। মদিনা বিশ্বাস করিল না যে,

তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার ফিরিয়া আসিবার আশায় সে দুঃখের দিন গুণিতে লাগিল ; কিন্তু তাহার আর সহিল না, একদিন কবরের মাটিতে আশ্রয় লইল। অনুতপ্ত দুলাল ফিরিয়া আসিল ; কিন্তু দেখিল, তাহার গৃহ শ্মশান হইয়া গিয়াছে ; সুরুজ জননীর কবরের উপর কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে। দুলাল ফকির সাজিয়া মদিনার কবরের উপর একটি কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল।

কাহিনীর দুইটি অংশ—প্রথম অংশ রূপকথা, দ্বিতীয় অংশ গীতিকা। ইহার মধ্যে মদিনার চরিত্রই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলির ভিতর দিয়া নারীশক্তির বিভিন্ন দিকের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—মদিনা চরিত্র তাহাদেরই যে কেবল অন্যতম, তাহা নহে—কতকগুলি দিক দিয়া ইহাই সর্বোত্তম বলিয়া মনে হইবে ; কারণ, ইহার একটি সহজ সরল গার্হস্থ্য রূপ আছে, এই রূপটি কেবল মাত্র কল্পনামিশ্রিত বা আদর্শায়িত নহে বলিয়াই ইহা বাস্তব ও জীবন্ত ; সেইজন্য এই রূপটি চোখের সম্মুখে যেন সহজেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

'দেওয়ানা মদিনা' পালার এইভাবে সূচনা হইয়াছে—

'সত্য কর, প্রাণপতি, সত্য কর রইয়া।
আমি নারী মইরা গেলে আর নাই-সে করব বিয়া॥
আমি আভাগীরে, পিয়া. কই তোমার কাছে।
শিয়রে খাড়াইয়া যম বাকি কয়দিন আছে॥
শরীল অইল মাটি মুখে কালা ধরে।
দুইদিন পরে শুইবাম কুয়ার কয়বরে॥
ঘরে রইল আলাল দুলাল তারা দুইটি ভাই।
আভাগী মায়ের আর কোন লক্ষ্য নাই॥
শুন শুন ওহে গো পতি—আরে বলি যে তোমারে।
কোলের ছাওয়াল আলাল দুলাল রাখ্যা যাই ঘরে॥
শুন শুন ওহে গো দেওয়ান, কইয়া বুঝাই আমি।
দুধের বাচ্চা দুই না পুতে সঁপলাম অভাগিনী॥

সাক্ষী থাক্য চান্দ শুরুজ দুই নয়নের আঁখি।
তার হাতে সঁপ্যা গেলাম আরে, আমার পোষা পাখী ॥
—পূর্ব মৈমনসিংহ

দেশাগ রাগ

'গীতগোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে' উল্লেখিত একটি রাগের নাম দেশাগ রাগ। 'সঙ্গীত দর্পণ' কিংবা 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে' ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক ইহা বাংলা গানের কোন দেশী রাগ। সম্ভবতঃ ইহা কোন শাস্ত্রীয় রাগ নহে।

১

যমুনার তীরে কদমের তলে
কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।
হংসে যেহ্ন সরোবর বিগুতিল বড়ায়ি ল
তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে ॥ —(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

দেহতত্ত্বের গান

দেহতত্ত্ব বাংলাদেশের একটি লৌকিক ধর্মতত্ত্ব। বিভিন্ন ধর্মচিন্তার সংমিশ্রণের ফলে মধ্যযুগের বাংলায় ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার পরিকল্পনায় যে সকল ধর্মমত সক্রিয়, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম, যোগধর্ম এবং তান্ত্রিক ধর্ম উল্লেখযোগ্য। সহজিয়া তত্ত্বের সঙ্গেও ইহার সামান্য সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুভূত হয়। বিভিন্ন ধর্মচিন্তার সমন্বয় সাধন করিয়া মধ্যযুগের বাংলায় যেমন বাউল সাধনার উদ্ভব হইয়াছিল, দেহতত্ত্বের সাধনাও তাহারই প্রায় সমসাময়িক কালে উদ্ভূত হইয়া তাহারই সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাউল সাধনায় সঙ্গেও ইহা সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে। কালক্রমে দেহতত্ত্ব ও বাউল প্রায় একাকার হইয়াছে। কিন্তু মূলতঃ ইহাদের পার্থক্য ছিল। বাউল গান নৃত্যসম্বলিত কিন্তু দেহতত্ত্বের গানে নৃত্য নাই। বাউল সাধকগণ সাঁই স্বামিন্ বা ভগবান এবং তাঁহার শক্তিতে বিশ্বাস করে, কিন্তু দেহতত্ত্ববাদিগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাঁহারা তাহার পরিবর্তে আত্মাকে বিশ্বাস করে। তাহাদের মতে দেহ ফুলবাগান, আত্মা তাহাতে

ভ্রমর স্বরূপ বিরাজ করে। ইহা ব্যতীত পৃথিবীতে আর কিছু সত্য নহে। তবে আত্মারূপী ভ্রমর দেহরূপ ফুলবাগানের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলে দেহের আর কোন মূল্য থাকে না। আত্মাকে কখনও কখনও তাহারা রাজহংস বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকে! মৃত্যুর অবস্থাকে তাহারা এই বলিয়া বর্ণনা করে, 'উইড়া গেল রাজহংস পইড্যা রইল ছায়া।' অর্থাৎ আত্মারূপী রাজহংস দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে, দেহ ছায়ার মত মিলাইয়া যায়। দেহের কোনও মূল্য নাই। যতদিন আত্মা দেহকে আশ্রয় করিয়া বাস করে, ততদিনই দেহের মূল্য। দেহাশ্রিত আত্মাকে উপলব্ধি করাই দেহতত্ত্ববাদীদিগের সাধনা। দেহের ভিতর দিয়াই অর্থাৎ দেহের সকল রহস্য উপলব্ধি করিবার মধ্য দিয়াই আত্মাকে বুঝিতে হইবে। দেহকে বাদ দিয়া আত্মাকে বুঝিতে পারা যায় না। ক্রমে দেহকে বুঝিতে গিয়া নানা দৈহিক কদর্য বিষয়ও সাধনার অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে ইহার সাধকেরা বলিত, 'তরবি যদি ভবনদী নারী সঙ্গ কর।' কারণ, দেহ নারীসঙ্গ কামনা করে।

১

তুমি জগতকে মাতালে, নিতাই, কোন ফুলে,
গাছটির নাম চম্পকলতা পাতাটির নাম হেম,
নিতাই, পাতাটির নাম হেম,
নিতাই, কোন ফুলে ...
এক ডালে তার রসের কলি আর এক ডালে প্রেম।
নিতাই, কোন ফুলে......
তুমি জগতকে মাতালে নিতাই,
আসমানে তার গাছের আড়া জমিন্ বেড়া ডাল,
নিতাই, জমিন বেড়া ডাল।
ফুল ছাড়া ফল হয়রে, নিতাই, পাতা ছাড়া ডাল।
নিতাই, কোন ফুলে......
তেকুন্ত্যা পৃথিবীখানি মধ্যে আছে জল,
নিতাই মধ্যে আছে জল,
তাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তারাও না পায় স্থল,
নিতাই, কোন ফুলে......

তুমি জগতকে মাতালে, নিতাই, কোন ফুলে।
একটি জীবের পেটে আছে তিনটি জীবের মাথা,
নিতাই, তিনটি জীবের মাথা,
আর, মাগের পেটে জন্ম নিয়ে দুধ খেল সে কোথা।
নিতাই, কোন ফুলে……
আনন্দচাঁদ গোঁসাই রটে মিছে ভারে ভরে বটে,
মাটির দেহ মাটিই রবে মাণিক যাবে চুরে,
নিতাই, কোন ফুলে……
তুমি জগতকে মাতালে, নিতাই, কোন ফুলে।

—বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর)

ব্রহ্মচর্য পালনের উপর যোগধর্ম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে যোগধর্মের প্রভাবের ফল অনুভব করা যায়। দেহতত্ত্বের মূল ভিত্তি যোগশাস্ত্র হইলেও কালক্রমে তাহা তান্ত্রিক ও সহজ সাধনার সঙ্গে সংমিশ্রণ লাভ করিবার ফলে ব্রহ্মচর্য পালনের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল।

২

তোর চোখের চিন্তামণি চিন্তে পারলে হয়,
কর্মকানা ঠাওর পায় না
খুঁজে বেড়ায় জগৎময়।
তোর চোখের চিন্তামণি
ব্রহ্মচর্য করেন যিনি
তিনি চিনে নিবেন চিন্তামণি
হেরিবে তারে দিনরজনী
যদি না হয় শুক্রের ক্ষয়।
তোর চোখের চিন্তামণি
গোরাচাঁদ গোঁসাই বলে,
যেই শুক্র সেই ব্রহ্মা বটে
উদ্ধার অন্তর দেহ ফেটে
ব্রহ্মা বস্তু হচ্ছে লয়।

কেউ বা ভজে দেবী দেবা
কেউ বা ভজে আল্লা খোদা
ঘরের ভিতর আছেন বাবা
তার সঙ্গে নাই পরিচয়। —ঐ

৩

দেহজমি কৃষি করা মন তো বুঝে না।
জমির গন চিনিয়া করলে কৃষি,
ও তোর ক্ষেতে ফসল ফলবে সোনা ;
জমিতে সপ্ত নদী বয়,
তারই মধ্যে ছয়টী পদ্ম কিবা শোভা পায়,
আছে ইড়া পিঙ্গলা সুসম্না গো,
মৃণাল হল এই তিন জনা ॥
রতি স্থিতি প্রেম-সরোবরে,
অষ্টদল পদ্ম রহে তাহার ভিতরে,
ফোটে ঋতুর অষ্টম দিবসে গো,
তুমি সেই দিনে কেন বীজ বুনাও না ॥
যেমন পদ্মপুষ্প জলের মধ্যে রয়,
সূর্য অতি দূরে থেকে তারে প্রেম বিলায়।
তার প্রেম-আকর্ষণে গোলাপ ফুটে গো,
তুমি তখনি বীজ বুনাও না ॥
হৃদিপদ্ম শতদল হয়,
তথায় মুদলে পাবি গুরুর মন্ত্র,
শুন তার নির্ণয়।
আছে গুরু বসে পদ্মের উপর গো,
তুমি তার কাছে উপদেশ নিলে না ॥
দয়াল পাঁচুরাম তায় কয়,
অসময়ে বীজ বুনিলে ফসল কি আর হয়,
বলি তোরে অতি সাবধানে গো,
যেন অসময়ে বীজ বুনাস না ॥ —নদীয়া

৪

বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে তিন রঙের—নীল, জরদ, সাদা।
কোন ফুলে শ্রীকৃষ্ণ থাকে, কোন ফুলে শ্রীমতী রাধা।
ফুল ফোটে বার বৎসর পরে, মাসে মাসে সে ফুল ধরে,
ফুলের খবর বলব কারে রসিক ভিন্ন কইতে বাধা।
ফলেতে এ জীব ভুলেছে ফুলেতে রসিক মেতেছে,
মধুবনে মধুপানে মত্ত ব্রজের দাদা।
অন্যেরি ফলের কামনা, ফুলে মেতে থাকে রসিক জনা,
জীবে তার ফল জানে না ফলে মধু ফুলে সুধা।
গোঁসাই গুরুচাঁদে বলে, ফুল ফুটেছে নিগম ডালে।
ফুলের খবর জানলে পরে রাধে শ্যামের যেত ধাঁধা। —নদীয়া

৫

তিন জনার গর্ভেতে হল এক ছেলে।
আমি বাঞ্ছা করি হৃদে ধরি, ইচ্ছা হয় করি কোলে॥
তারা তিন জনা নারী বড় পরম সুন্দরী;
যেমন মাতা তেমনি ছেলে গঠন বলিহারি;
হল বিনা বাপে ছেলে পয়দা, বিনা বীজ বিনা ফুলে॥
যাদের চিকন বুদ্ধি হয়, তারাই ছেলে দেখতে পায়,
মোটা নজর হলে ছেলে পলকে মিলায়।
আছে যার জ্ঞান-শক্তি ছেলের মূর্তি দেখিবে সেই ছেলে।
গোঁসাই মদন চাঁদে কয়, সে ত কথার কথা নয়;
ভজন সাধন করলে পরে তবেই দেখা যায়॥

৬

যাস্‌নে রে, তুই, বাঁকা নদীর বাঁকে।
সেথায় খাপি খাবি প্রাণ হারাবি পড়ে নদীর ঘূর্ণিপাকে।
যে নদীতে মাসে মাসে, দিন দুপুরে জোয়ার আসে,
ডাঙ্গা ডহর ভাসে বিদ্‌ঘুটে বন্যা ডাকে।
খপ করে তুই দিলিরে ঝাঁপ ভুলে গুরুর মন্ত্রজপ।
কাম নামের কুম্ভীর এসে চিবিয়ে চুষে খাবে তোকে।

বলিছে গোঁসাই কুবীর যাদু বিন্দু তুই খোঁড়াইয়ে ফির ;
ভেলকী নাম পাড়ালি লো গায়ে গুঁড়ো মেখে —ঐ

একা, প্রভু, আর যাব না ভব-তরঙ্গে।
আমি ৮০ লক্ষ বার ঘুরেছি হারিয়েছি মন নানা রঙ্গে।
টলমল ফুল ডালিম দানা, ঝিলিক মারে কাঁচা সোনা,
দেখলে জীবের জ্ঞান থাকে না। ঐ নদীর উলাঙ্গে।
ত্রিমোহনীর বিষম সন্ধি, হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বন্দী,
আমি বাদাম রসি কোষে বাঁধি,
আমার মন-মাতঙ্গের ডুরি ছিঁড়ে,
হাল ছুটে জলের ছিটে লাগে অঙ্গে।
যাত্রা করলাম সহজ দেশে, মাফেলদ্দির কপাল দোষে,
বারে বারে তক্তা খসে যায়, গঙ্গায় ভেসে তাতে হীরা লাগাও,
গাবকালী দাও হালখানা লও চল রঙ্গে। —ঐ

কী আশ্চর্য মজার কথা আমার শুনে সন্দেহ গেল না।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, পণ্ডিতজন তা বুঝবে না ॥
কথা হল সৃষ্টিছাড়া, আছে কজন নদে পোড়া,
তারা প্রেমেতে দিয়েছে সাড়া দেখবি কি তাদের কারখানা ॥
ঝিএর পেটে মায়ের জন্ম, এ কথার কে বুঝবে মর্ম,
মায়ের পেটে বাপের জন্ম বেদ-পুরাণ তার নিশানা।
শুনে এলাম আর এক কথা, হব ছয়জনের একটা মাথা,
মাথা তুলে কয়না কথা কারুর ভয় সে করে না ॥
ডোমন বলে ভবে এসে দিন গেল হেসে কেসে ;
এ দীনের উদয় হবে কিসে সেই মোর ভাবনা।
তুমি দয়াল, দয়া করে, ঘুচাও মোদের সেই বাসনা ॥

কে যাবি আয়, কে যাবি আয়, ভবপারে সময় বয়ে যায়।
হিংসা নাই সে নদীর জলে, কোটি তীর্থের ফল ফলে,
নদীর উপর নিরখিলে সর্ব আশা যায় ভুলে।
সেথায় দ্বেষাদ্বেষ নাই।

পুর্বেই বলিয়াছি, দেহতত্ত্বের সাধনা ক্রমে যোগসাধনার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে এক নিতান্ত লৌকিক স্তরে অবনমিত হইয়া আসিল। তখনই তাহাতে প্রকৃতি-সাধনা বা বামাচারী তান্ত্রিক সাধনার সূচনা দেখা দিল। নারী তখন সাধন-সঙ্গিনী রূপে অপরিহার্য হইয়া উঠিল এবং তাহার ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে প্রকৃতি-সাধনার গুণকীর্তন করা হইয়াছে—

১০

মন, সাধরে প্রকৃতি, প্রকৃতির স্বভাব ধরি ;
করণ করি উর্ধ্ব করে দেহের জ্যোতি।
যে থাকে ষড়দলে, সাধু তারে উল্টো বলে,
সাধনে যায় দ্বিতলে তখন উঠবে জ্বলে।
দেহের জ্যোতি, মন, সাধরে প্রকৃতি।
সাধিয়ে সেই যুবতী বড় আশ্চর্য পতি
কলিতে গৌরাঙ্গ মুরতি. এবার দশম দশায়
মগন গৌর যেমন বৃন্দাবনের সেই শ্রীমতী।
মন সাধরে প্রকৃতি—অনর্থ নিবৃত্তি হলে হবে নিষ্ঠারতি
তখন কাম ব্রহ্ম সাকার হয়ে দেখা দেবে গুরু মূর্তি।
মন সাধরে প্রকৃতি।
স্বরূপ বিনা দরশন অসম্ভব অতি ; যেজন গুরু ত্যজে শ্রীকৃষ্ণ ভজে,
তার কি বল ভবের মাঝে গতাগতি—মন, সাধরে প্রকৃতি। —ঐ

১১

গুরু মেরে কর এবার ধর্মের জয়,
কথা মিথ্যে নয় সর্ব শাস্ত্রই কয়।

স্ত্রী থাকতে গৃহ শূন্য, সাধক তায় কি বলা যায়,
আমার মনে বলে, গুরু মারি, মনের দোষে নাহি পারি।
সঙ্গে ছয় জন দাগাদারি তাই বেহাল—তারা দাগা দেয়।
গুরু মেরে কর এবার ধর্মের জয়।
গুরুর হস্তে পদে লাগিয়ে বেড়ী, কেটে একখানা প্রেমের ছড়ি,
তার এমনি জায়গায় মারব বাড়ি
চার যুগ যেন তার দাগটা রয়।
গুরু মেরে কর এবার ধর্মের জয়।
কথা বুঝবে কি ভাই মূর্খজনা, যার ঠিকের ঘরে ঠিক মেলে না,
হারুর মনের এই বাসনা এবার বাঁধব গুরু দরিয়ায়।
শুনি গুরুর মাথা আর শিষ্যের পদ
চার যুগ ধরি বাঁধা দিনরাত,
হারাম ভেবে হল হত পঞ্চাঁদ তাই বলে যায়।
গুরু মেরে কর এবার ধর্মের জয়। —ঐ

১২

আজি আল্লা বারি তলা তুমি শক্তি রূপে উজ্জ্বলা,
আদ্যাশক্তি মা জহুরা ভিন্নভেদ নাই একই লীলা।
এক কালে ভাসালে তারা, মা হয়ে দিল হেল্লান,
আজি আল্লা বারি তলা তুমি শক্তি রূপে উজ্জ্বলা।
মায়ের কোলে আপনি বসে, আপনি যে গো ছিলেন খোসে,
তাই মধ্যে মধ্যে পড়েন খসে হয়ে নিরেন্নরে বিভুলারে।
আজি আল্লা বারি তলা।
যেমন মার উদরে বাপ গেল, এক সঙ্গেতে দুজন মল,
স্বমরণে দু'জন মল, মরে একটি বস্তু পায়।
সে মার কোলেতে বাবা বসে হাসে খায় দুগ্ধ রসে ;
পাড়ার লোক সব দেখ্‌সে এসে, যেমন পুর্ণিমা চাঁদ হয় উদয়।
রমজান বলে, ও ভাই সখী, আমি পাঁচ জনাকে জানা করি,
আর সব দেখ ফাঁকি ফুঁকি বুঝে চল এই বেলারে।
আজি আল্লা বারি তলা তুমি শক্তি রূপে উজ্জ্বলা। —ঐ

১৩

স্বজ্ঞান ধরে বিচার করে চলরে মন অনুক্ষণ।
আত্মজ্ঞানে থাকলে মেতে, হবে রিপুগণ দমন॥
স্বরূপা রামা প্রকৃতি, সাধন কর দিবারাতি,
তবে উধ্ব´ হবে দেহের রতি, করবি তুই মহা রসাস্বাদন।
নিহারিতে গোল বাঁধালে, মহাবস্তু যাবে গলে,
আপনি তখন পড়বি ঢলে, প্রাণের টানে আপন যোগে ;
সাধন কর অনুরাগে, দাস সতীশ বলে
শক্তি যোগে নিত্য করবি গমন॥ —ঐ

১৪

বল, আমার বাবা কোথায় গেল।
দেখিতে দেখিতে আমার দিন গত হলো॥
শুধাই বৃদ্ধ মাতার কাছে, বাবা আমার কোথায় গেছে ;
মা, বলে তোর ঘরের ভিতর ছিল।
সহোদর বলে, ভাই, হাটে মিলে নাই,
ভগ্নী বলে অগ্নিবেশে ঘর করেছে আলো ;
বাবার দেহ বাবার মায়, বাবার দোহাই দিয়ে বেড়াই ;
পিতা-পুত্রে আলাপ নাই যে ভালো॥
ইতিপুর্বে মাতৃগর্ভে দেখা হেয়েছিল,
কেও বলে গেছে এই পথে, কেও বলে গেছে ঐ পথে,
নানা মুনির নানা মতে ; কোন পথে বল॥
কেও বলে নেমেছে জলে ; কেও বলে তব অনলে ;
কেও বলে অনলে পুড়ে গেল।
আজম তত্ত্ব যে জেনেছে, বাবার খবর সেই পেয়েছে ;
সত্য করে আমার কাছে বল॥
বল বাবার রূপ বর্ণনা, নাম রূপ তার ভিন্ন ভিন্ন,
অনন্ত কয় বিশেষ চিহ্ন, বাবা আমার কাল নয়া ধবল॥—নদীয়া

চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বাংলার সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করিবার পর বাংলার প্রায় সকল লৌকিক ধর্মমতই কোন

না কোন ভাবে চৈতন্যদেব এবং তাঁহার পার্ষদদিগকে নিজেদের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার প্রয়াস পাইল। নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে দেহতত্ত্বের একটি মূল কথা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা এই যে দেহের আঠারটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেই দৈবী শক্তির অধিষ্ঠান রহিয়াছে। অর্থাৎ দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পবিত্র, কোন্ অঙ্গে কাহার অধিষ্ঠান, তাহা বুঝাইতে গিয়া চৈতন্যদেব এবং তাঁহার লীলা পার্ষদদিগের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে—

১৫

তত্ত্ব কথা বলি হেথা শোনহে শ্রবণে।
আঠারো মোকামের তত্ত্ব হচ্ছে নিশিদিনে॥
মুখে ভদ্রাবতী দন্তে রসবতী;
জিহ্বায় সরস্বতী দেখ বর্তমানেতে।
দেখ আলা জিহ্বায় নারদ মুনি মত্ত বীণা গানে॥
চুড়ায় চুড়ামণি উর্ধ্বে তার স্থিতি।
পীঠ মধ্যে মহাদেব করেন বসতি,
তার নীচে গয়া-গঙ্গা সুরধনি আছে সংগোপনে॥
কর্ণেতে চৈতন্য প্রভু আছে সাবধানে।
চক্ষেতে কালাচাঁদ করিতেছেন ধ্যান॥
নাসিকাতে নিত্যানন্দ মত্ত মধুপানে,
কণ্ঠেতে শ্রীদাম বসে আছে সর্বক্ষণে।
ডাইনে বামে নিতাই গৌর
পৃষ্ঠেতে সুবলচন্দ্র মত্ত জ্ঞানে করিছেন বিশ্রাম॥
বক্ষমাঝে মহাবিষ্ণু নাভিমূলে ব্রহ্মা স্থিতি,
সবে মিলে কর নিত্য নমস্তুতি;
সর্ব অঙ্গে জগন্নাথ পরান বাখানে॥
শোন হে শ্রবণে।
লিঙ্গ মূলে চন্দ্রকলা ভগে ভগবতী,
গুহ্যে বসি জানুতে ধরে ধরে মহাশক্তি,
শক্তিবলে সাধন কর গোপাল পাবি নিত্য ধনে॥ —ঐ

১৬

আন্‌খা মজা দেখে এলাম বালুবা বাজারে।
চারি গর্ভে একটী সন্তান, কার কাছে বা পাব সন্ধান,
কেন ব্যস্ত আছি হয়ে হয়রান, কে বল্‌বে মোরে ॥
সেই দেশের ২২টা মাথা, তিন চক্ষু একজন পিতা,
সাম্‌নে ঝুল্‌ছে দশটি মাথা কি মত প্রকারে ॥
সেই ছেলে কি ভাবেতে পয়দা হল,
শুনবো দুলাল তোমার কাছে, শুনব অতি যত্ন করে।
আজ আমায় বলো, ক্ষ্যাপা, নবীন চাঁদের ভূগোল বলো,
এই চারি কথার মানে পেলে,
ওগো রাগ্‌বো তারে হৃদ-মাঝারে —ঐ
রাখব অতি যত্ন করে ॥

১৭

মন, আমার পারের ঘাটে ভয় কর না।
যদি সাধ থাকে সাধনের পথে,
সাধু যোগে বিষ খেও না ॥
মন আমার এলোমেলো, হয় লো লাগ্‌বে ভুলো,
তুমি ভুলোনা মদনের মতে দিয়ে ধুলো করবে কানা ॥
ছয় জনাকে রেখো হাতে, ঠিক থেকো গুরুর মতে,
কাম কুম্ভীরে কেও ছোবে না সেই নদীর বিনা বাণে,
জোয়ার হয় রাত্রি দিনে তুফানে কেও টিকে না।
তাইতে বলে ঘাট ভালনা ॥
সেই নদী বয় ত্রিধারা, কত সাধুর নৌকা যাচ্ছে মারা,
সেই ঘাটে সাধন হয় সারা, সেধে গেছে কত জনা ॥
গোঁসাই কাশীনাথে বলে, নামের জোরে
কেউ পার হয়ে যায় ডঙ্কা মেরে,
থাক গুরুর চরণ ধরে, পুরায় যদি সেই বাসনা ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে গোপাল সা ফকির নামক একজন সাধকের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ পরবর্তী গানটিও তাঁহারই রচনা, তবে তাহাতে

কোন ভণিতা নাই। সাত্ত্বিক প্রেমের বা গোপী প্রেমের স্বরূপ এখানে নিতান্ত সহজে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগকে দেহতত্ত্বের পদ বলা যায় না। কারণ, দেহতত্ত্বের মধ্যে দেহকে অতিক্রম করিয়া কোন সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। তবে এখানেও দেহজ কামনাকে জয় করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার কথা আছে, এইটুকু মাত্র দেহতত্ত্বের কথা।

১৮

সহজে বুড়িল যারা, ওগো, ডুবে রতন পেলো তারা।
গোপীর প্রেমকরা সামান্য নয় রে, হতে হবে জ্যান্তে মরা,
গোপী প্রেমে যে ডুবেছে. অনুরাগে তার চাবি মারা।
পরো হারা হলে পরে, হবে না তার সাধন করা ॥
ত্রিবেণীর ঐ ত্রিয়ধারা, যে বেঁধেছে মনোহরা।
আনন্দ সাগর মাঝে রাম সনাতন দেয় পাহারা ॥
গোপাল সা ফকিবে বলে, সে ভাব্ কি রাখতে পারবি তোরা,
ও মন, এক মরণে দুজন মরা এমনি গোপীদের প্রেমের ধারা ॥—ঐ

১৯

গুরু করন বিষম ভজন যে করেছে সেই জানে,
কাম করিতে যার বাসনা, তার হবে না উপাসনা।
কাম থাকিতে প্রেম হবে না ব্রজগোপীর ভাব বিনে ॥
গৌর প্রেমের প্রেমিক যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা।
তারা দেয় রূপের পাহারা, পলক নাই তার নয়নে ॥
দর্পণে লাগায়ে পারা, ঠিক রেখো, ভাই, নয়নতারা।
তবে পাবি মানুষের ধারা, ত্রিবেণীর ঈশান কোণে ॥
চণ্ডীদাস রজকিনী, এরাই প্রেমের শিরোমণি।
এক মরণে দুজন মরে, এমন মরে কয় জনা ॥ —নদীয়া

২০

মরা গুরু জ্যান্ত গুরু দুই জনা দুই পারে আছে।
আসা যাওয়ার মধ্যে যারা, তাদের, ভাই ভরসা মিছে ॥
গুরু গুরু সবাই বলে, তার দেখা, ভাই, কোথায় মেলে,
থাক সে সহস্র দলে, রূপে মিশেছে।

ভাব্‌তে হয় চিদানন্দ, অমনি প্রকাশ সচ্চিদানন্দ,
তখন ভক্ত সদানন্দ, মৃত্যু হরণ সে করেছে ॥
জন্ম জরা মৃত্যু হরা, তাদের ভাব বেদ বিধি ছাড়া,
নয়নেতে রেখে পারা, সকল দেখিছে।
পিতার যোনি মায়ের লিঙ্গ, এই নিয়ে ভাই কর রঙ্গ,
গুরুশিষ্য একই অঙ্গ, অঙ্গ ভাব সঙ্গে রয়েছে ॥
দেখ দেখি অন্তরের ভাব, বাস্ত ছেড়ে বস্তু লাভ,
সঙ্গের সঙ্গী প্রকৃতি ভাব, স্বদেশে রয়েছে।
আপন যোনি পুত্রে দিয়ে, মাতৃ যোনি আপনি লয়ে,
সেই রঙেতে রঙ মিশিয়ে মৃত্যু হরণ মৃত্যুর কাছে ॥
ভু ভার হরণ ভূভার কারণ, ইচ্ছা হয় গুরু সেইজন,
আমি যেমন তিনি তেমন, ভিন্ন নয় কেউ কারু কাছে।
এই কথা হাউড়ে কহে, বাপের অন্তে মায়ের বিয়ে,
আমি তখন নয় বছরের, বিয়ে দেখি বসে কাছে ॥ —হাওড়া

২১

সাধনে সাধ থাকে যদি, স্থূল প্রবর্ত ঠিক করিয়ে কর, মন, সাধনে রতি,
বয়সের মাঝ খানেতে জেলে দাও ওজনের এক বাতি ॥
পাথরে ময়লা ধরে, তায় সোনা কমলে পরে,
সে সোনায় কি জেল্লা ধরে, শেষে হয় সোনার অখ্যাতি।
ভাব রসান দিয়ে মাজলে হিয়ে যার হবে জ্যোতি ॥
বৈদিক এক শাস্ত্র আছে, তার কি আগে পাছে,
তারপর এক সাধন আছে, সে সাধন হয় যে বেগতি।
সাধন কোত্তে পাল্লে একই কালে গুরু হন পতি ॥
ভগবান চন্দ্র বলে, অখিল তোর কর্মফলে,
ভবে এলে রইলি ভুলে, শেষে তোর কি হবে গতি।
অখিল তোর সময় আছে, গুরুর কাছে করগো মিনতি ॥
—বালিয়াডাঙ্গা (নদীয়া)

২২

আহা, মরি, নীচে পদ্ম উদয় জগৎময়।
আস্‌মানে রয় চাঁদ চকরা, তাদের কেমন কোরে যুগল হয় ॥
নীচে পদ্ম দিবসে মুদিত, আসমানেতে চন্দ্র উদয় তখন বিকশিত,
এদের দুয়েতে এক যুগল আহারে, চন্দ্র লক্ষ যোজন ছাড়া রয় ॥
পদ্ম কান্ত শান্ত দান্ত সে, সে মালীর সঙ্গে পরম রঙ্গে ভাব করেছে সে,
সে মালী যেমন সাজিয়ে ডালি রে, মালী বসে আছে দরজায় ॥
গুরু চন্দ্র শিষ্য পদ্ম যে, সে তারে তারে তার মিশায়ে গেঁথে রেখেছে।
খ্যাপা দমন বলে, তেম্নি হলো রে, তবে যুগল মিলন জানা যায় ॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে হাউড়ে নামক একজন সাধকের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। ইনি হাউড়ে গোঁসাই নামে পরিচিত; কারণ, তিনি হাওড়ার অধিবাসী ছিলেন এবং সেখান হইতেই তাঁহার সাধন সঙ্গীতগুলি তিনি রচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আজু গোঁসাই যেমন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, হাউড়ে গোঁসাই তাহাই ছিলেন। তবে তাঁহার তান্ত্রিক সাধনা দেহতত্ত্বের আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মধ্যে দেহতত্ত্বের সাধনা ও তান্ত্রিক সাধনার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তিনি আজু গোঁসাই এবং রামপ্রসাদের সামান্য পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তাহার পদগুলি প্রচারলাভ করিয়াছিল।

২৩

এ কি অসম্ভব, পিতার পেটে ছেলেরি উদ্ভব।
আবার শুক্ররূপে প্রবেশ করে, পুত্র রূপেতে আসব ॥
নাভিদলেতে সংযোগ, মাতৃনাভিতে যোগ,
নাভি ছিদ্রে মৃণালেতে আছে যোগাযোগ।
ও তার তৃতীয় পারে চিন্তামণি, বিরাজে তাহে কেশব ॥
এলাম অমাবস্যাতে, যাব পুর্ণ তিথিতে,
মাঝখানে এক গোলেতে গোল মাতৃগর্ভেতে।
নীল চন্দ্র পীত চন্দ্র চন্দ্রে চন্দ্র হয় সম্ভব ॥
পিতৃবিয়োগ কালে, আমি বসে সেই কালে,
পুত্র প্রসব করিলে, মাতা দেখি অকালে।

আবার কাল মরেছে রতির ঘরে,
একি দেখি কার্য সব ॥
হাউড়ে বলে এই বাণী, আসি তৃতীয়ার সুখ জানি,
ভগ্নির ঘরে যেতে অগ্নি আছে নিশানি।
আবার দেবাদেবীর ভাব ঐ ছেড়ে,
কামকে কর নীরব ॥ —হাওড়া

২৪

আমি একদিন না দেখিলাম তারে।
আছে বাড়ীর কাছে আরসি নগর,
সেথা এক পড়শী বসত করে ॥
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি,
তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
আমি দেখবো বলে বাঞ্ছা করি,
অমনি সেথা যাইরে ॥
কি কব পড়শীর কথা,
তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাইরে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্য পরে,
আবার ক্ষণেক থাকে নীরে ॥
পড়শী যদি আমায় ছুঁত,
আমার যম-যাতনা সকল যেত দূরে।
ফকির লালন কয়. একস্থানে রয়,
ও সে লক্ষ যোজন পরে ॥ —নদীয়া

২৫

ডুবল সাধের মানব তরী
ভব-সাগরের পাকে পড়ে!
এমন বান্ধব কে আছে আর,
কে তুলিবে কেশে ধরে?
মানব তরীর মাল্লা ছয় জনা,
ছয় দিকে ছয় জনা টানে কেউ তো শোনে না;

গুণ ছাড়িয়া রে মন!
গুণ ছাড়িয়া সব পলাইল,
একলা মাঝি রলেন পড়ে॥
এসেছিলেন ভবের (ই) হাটে,
শঠে মোরে লাগুড় পেয়ে
সব নিল লুটে;
কর্মদোষে রে মন!
কর্মদোষে সব হারাইলাম,
এই দোষ আমি দিব কারে?
ভবনদীর তরঙ্গ ভারি,
যে দিকে চাই সে দিকে নাই পারের কাণ্ডারী।
গুরু বিনে রে মন!
গুরু বিনে আর লক্ষ্য নাই,
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে॥ — ঢাকা (১৩২২)

ধর্মবিষয়ক লোক-সঙ্গীতগুলি কোন আঞ্চলিক সীমার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিত না, সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপিয়া সহজেই প্রচার লাভ করিত। বাংলার দেহতত্ত্বের গানও বাংলাদেশের যে অঞ্চলেই রচিত হউক না কেন, ভ্রামামান ফকির এবং বাউল দরবেশদিগের মধ্যস্থতায় সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। তথাপি এক এক অঞ্চলে এক একজন সাধকের গানের বাহুল্য দেখা যাইত। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সকল আখড়া ছিল, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই গানগুলি প্রচারিত হইত। ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ এবং এবং নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় নানা সম্প্রদায়ের সাধকদিগের আখড়া ছিল, তাহাদের সহায়তায় এই গানগুলি সেখানে প্রচার লাভ করিয়াছে।

২৬

মানুষ তারে চিন্না নে।
নবরঙ্গ দেহের মাঝে বিরাজ করে যে;
যখন ছিলা রে, মানুষ, পিতার মস্তকে,
কোন্ সন্ধানে আইলা মানুষ জননী জঠরে।—
মানুষ তারে চিন্না নে॥

ছোট ছোট ঘরখানি, খোপে খোপে বেড়া,
তাহার মধ্যে বিরাজ করে নবীন কিশোরা রে।—
মানুষ তারে চিন্না নে॥
বৃন্দাবনে তিনটী পুষ্প এক পুষ্প সাদা,
একটি পুষ্প ঠাকুর কৃষ্ণ আরেক পুষ্প রাধা রে।—
মানুষ তারে চিন্না নে॥ —ঐ (১৩২২)

২৭

হরি বল নৌকা রে খোল সাধের জোয়ার যায়।
মনমাঝি তোর পায়ে ধরি,
নদীর ধার চিনিয়ে ধইর পাড়ি, না পড়ে ঘোলায় ;
মন পবনের বেগ উঠেছে,
বাদাম তুলে দেও নৌকায়। আগের নাইয়া মাঝি ভাল,
পাছে থেকে আগে গেল, ফিরে ফিরে চায় ;
মাঝি ডেকে বলে, আয় সকলে, নৌকা ভিড়া প্রেম-তলায়।
—ঐ (১৩২২)

২৮

তরী বেয়ে যা সুজন নাইয়া, কইয়া যা তোর গোঁসাইর কাছে।
শোন সাধু বীর ভক্ত, তোমার জনম্ কোন দিবস,
তোমার গোঁসাইর জনম কোন্ দিবস,
তোমার জনম আগে না পাছে॥
একটী গাছের তিনটী ডাল, এক ডালে বসেছে কাল,
এক এক ডালে ব্রহ্মা বিষ্ণু—কোন্ ডালে তোর গুরু না বসে॥
সমুদ্রে উঠেছে লহর, ঢেউ লাগিয়ে ভাঙ্গল পাড়,
স্বর্ণ উজল করে মন, জুনী পোকা আগে না পাছে॥ —ঐ (১৩২৬)

২৯

ভাইস্তা রৈলাম কুল না পাই,
দুইটা নারী শাদী করি শুইতাম জাগা নাই
চারিকিনারে নালী নদী মধ্যে একটি ভিঁদ,
কি হালে বসতি করি আমরা দুই হতিন।

ইচ্ছা হয়রে উড়কা দিতাম রে, কলঙ্কেরে লাগের ডর,
মা ও বাপে খবর দিও লই যাইত নাইয়র —চট্টগ্রাম

ঘর বানাইল কেমনে,—
এমন রঙ্গিলা ঘর কোন্ জনে ? ভাইরে ভাই—
এক মাঝুইলে বান্ধা ঘর আষ্ট গোটা ঠুনি।
চৌদ্দ রোওয়ায় চাল বান্ধিয়া চামেড়ায় দিছে ছানি ॥
ভাইরে ভাই—বিনা বাঁশে বিনা বেতে এই ঘরের বান্।
এক দিকেতে সুষ ঘরের আরেক দিকে চান ॥
হাওয়ার ভরে খাড়া।
এই হাওয়া ছুটিয়া গেলে
(ঘর) ভাঙ্গ্যা হৈব গুঁড়া। ভাইরে ভাই,—
কাম করে কামেলা বেটা কামের জানে সন্ধি।
বানাইয়া রঙ্গের ঘর কাম্‌লা রৈল বন্দী ॥

—মৈমনসিংহ (১৩২৬)

হেঁয়ালীর ভিতর দিয়া তত্ত্বকথা প্রকাশ করিবার রীতির সন্ধান হাজার বছরের আগেকার বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদগুলির মধ্য হইতেই পাওয়া যায়। তাহারই ধারা অনুররণ করিয়া দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানগুলি রচিত হইয়াছে। নদ-নদীর রূপক অবলম্বন করিয়া চর্যাপদের যুগ হইতেই বাংলার যে সাধন-সঙ্গীত রচিত হইতেছে, নিম্নোদ্ধৃত গানটির মধ্যে তাহারও ধারা অনুসরণ করিতে দেখা যায়। এই গানগুলি চর্যাগীতির উত্তর সাধক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

৩১

আমার এ দেহ-নদী যতই বাঁধি বাঁধলে বাঁধ আর ঠেক মানে না।
(ওরে ও বাদী মন)
নদী শুকায়ে গেল চড়া পৈল তাও নদীর বেগ গেল না।
নদীর বাহস্ত ছিল নাও চলিত বাও বাতাসে ভয় ছিল না।
গাঙ্গের অধাল যারা গোলায় তারা সহজ খবর বইল্‌তে পারে,
ইন্দুরে গাত কৈরে মাটি তুলে নয় দরজা দিল মাইরে।

দীন তাই ভেইবে বলে নদীর কূলে বাসা করা আর হইল না।
আমার এ দেহ-নদী যতই বাঁধি বাঁধলে বাঁধ আর ঠেক মানে না॥

—মৈমনসিং

৩২

আমি এই দরখাস্ত দিয়া যাই, দেখা দেও, হে গহুর নিতাই।
তিন খণ্ড বাড়ী ছিল, প্রেমানলে দগ্ধ হইল,
এখন আমার কিছুই মাত্র নাই॥
সাড়ে তিন পোয়া বাড়ী জমি, জড়ি পেতে হইল কমি,
আউয়াল ছয়ম-ছিয়মের ঠিক নাই।
আমি মালখানাতে পড়িয়া কান্দি আমার দলিল পত্র কিছুই নাই।
বিলাত গিয়া করব নালিশ, তুমি হইলা জজের উকিল গো,
আমি আপিলেতে ডিক্রি পাই।
দেখা দিও, হে গহুর নিতাই॥

৩৩

ওরে আমার মন-গোয়ালা, দু'বেলা তুই দুধ যোগাবি।
ঐ কথাটি খাঁটি উটি খাঁটি দুধ আমারে দিবি॥ ধ্রু॥
ঘরে আছে ধর্ম গাভী ভক্তি ভরে সেবা দিবি।
কামধেনুর দুধ দুয়ে নিবি, যখন চাইবি তখন পাবি॥ ধ্রু।
দুধ থুইয়া খালি ঘরে, হিংসা বিড়াল সদাই ঘুরে,
ঐ অনন্ত পিঁপড়ার সারি—কত তাড়াবি কত খেদাবি।
ওরে আমার মন গোয়ালা, দু'বেলা তুই দুধ যোগাবি॥
ঐ অনন্ত কুবীর বলে, কাম বাছুরে দড়ি ছিঁড়ে,
এক ঘরের চৌদ্দ গাভী কেমন করে ঠেক মানাবি॥ ধ্রু॥ —ঐ

৩৪

এই যে আমার দেহ-তরীকে করিয়াছে সুগঠন,
মিস্তিরিকে চিন নারে মন।
এই যে তোমার গায়ের চারা তারা তারা কর্চ্ছে জুরা,
লোহা ছাড়া তক্তা গায়, করছে সোনায় পাটাতন॥ —ঐ

৩৫

এক যে ছাইলা পয়দা হৈল তার না হইল হাত পাও,
তাহা কেহ জানে না।।
কেবল জানে বিধাতা—বাপের খবর যায় না জানা
—একথা বল্‌ছে তার মায়॥
এক যে ছাইলা পয়দা হইল সে চার জনার উদরে।
সে মা বলবে কারে, ছাইলা হৈল কি প্রকারে,
এই ধুয়াটি মনে করে বয়াতি বল মোরে ।।

৩৬

একদিন তোর দেহের ভাবনা ভাবলি নারে মন।
দেহের মধ্যে আছে মানুষ, তারে চিন্‌লি না রে মন॥
কি জবাব দিবে রে বান্দা হিসাবের কালে।।

৩৭

ওকি, আরে ও শোন গাছের খবর।
আছে কোরাণে জের জব্বর ।।
সে গাছটি চলে উর্ধ্ব মুখে সে বেড়ায় নইড়া চইরা।
সে গাছ চিনবে কেমন কইরা ।।
সে গাছ বেড়ায় নইড়া চইরা আকাশেতে গাছের গোড়া।
ওকি আরে শোন, আরে ও শোন, গাছের দেরা॥
কুলের খালে কি আর পাবে তারা ।
এ সব বলি যে তোমারে, আমি অধম, তুমি তরাও আমারে।
এক কুলে উৎপত্তি দুই কুলে স্থিতি
চারি রোজ ধইরা সেও গাছের নাই পাতি।
দিন-কাণা, গাছ চিনলি নারে,
সাধের গাছ মইলে পরে দিবে মাটি ।। —ঐ

৩৮

ও বয়াতি, তোরে জিজ্ঞাসা না করি আমি দেহের কারখানা।
তিনশো ষাট জোড়া আছে, তিনশো ষাট আছে টানা, টানার সনে ঘটনা।

সেই টানা বান কোথায় আছে, তাই আমার শুনতে বাসনা।
আ-রে—আহারে—আরে॥
ভাটিরতের কাল যমুনা তিরপিনের ঘাট চিরাখোনার হাট,
কোথায় ঠিকানা নাকের নিঃশ্বাস কে বলে টানে।
ভাইঙ্গে কেন তাই বলনা, মনা মন আছে তিন জনা॥
তারা কি নাম করে জপ না ঘুম আসিলে দেহ ছাইড়ে,
বাহিরে থাকে কোন জনা।
(আ-রে—আহারে—আরে॥)
মুকুদমুদ্দিন বইলা গেছে, আর দেহের খবর অনেক আছে,
বেশী বলব কি তুই চাইর কথা করি জিজ্ঞাসা।
জবাব দে ভাই, বয়াতি, আমি যে ভাই মূর্খমতি।
আমি আগে করি মিনতি ধুয়ার কাছে জবাব না পাইলে
শেষে লাগাই কুমতি। (ই—হি—ই)।
তোর মায়ের উদরে জন্ম লয়ে, ভাইসা ছিলি কোন সাগরে, আসল ছিল কি
কি খাইয়া জীবন বাঁচাইল। শুইয়াছিলা কোন শিয়রি।
তাই বল ও, ভাই বয়াতি, তোর দেহের ছিল ছাপ-কালী।
ছাপ কালীয়ে চোখ মুইচাছে আগে জইর মা দেখ চোখে॥ —

হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক লইয়াই যেমন বাউল সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, দেহতত্ত্ববাদীদিগের সম্প্রদায়ও এই উভয় সম্প্রদায়ের সাধক ও ফকির দরবেশ লইয়া গঠিত হইয়াছে। যাহারা মুসলমান সমাজ হইতে আসিয়াছে, তাহাদের রচিত গানে দেহতত্ত্বের ভাবটি যত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, হিন্দু সমাজ হইতে আগত যোগী ও সাধকদিগের গানের মধ্যে তাহা তত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। কারণ, শেষোক্ত সাধকদিগের গানে হিন্দু পুরাণ এবং বৈষ্ণব ধর্মের কথা প্রবেশ করিয়া নানা আবিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। মুসলমান ফকিরদিগের গানে তাহা নাই।

৩৯

কুদ্রতি এক গাছ পয়দা দেখরে ভবের পরে।
বারমাসে ফুল-ফল ধরে, সে গাছের শিকড় নাই রে।

জমিনেতে চলেরে পবন ভরে, কুদ্রৎ আল্লার কে বুঝিতে পারে।
আগে গাছের ফুল ফুটিয়ে জমিনে ঝইরে পড়ে গুপ্তরূপে শেষে ফল ধরে।
তার একটি ফল চার লক্ষ টাকা খরিদ করে বাজারে,
কার সাধ্যি আছে সে ফল কিন্‌তে পারে,
এক বিন্দু মণি বান্দার মাস কতেক আটক রয়।
তাতে কত মালিক পয়দা হয় এইরূপে কত ফল,
বান্দা ডাইনে বাঁয়ে খোওয়াইতে যায়, পিছে বান্দা বল্‌ছে, হায়রে হায়॥

—ঐ

৪০

কুদরতি এক রথের কথা বলি।
সাত মোকাম চৌদ্দ পোয়া, ভাই, রথের তৈয়ারী॥
দুই চাকা তার গিয়াছে নইড়া রথের উপর খিলকাঠি।
দীননাথ সূতার রথ গড়াইছে রথের জলে দুই বাতি॥
চাঁদ-সূর্য যেদিন ঘরে যায়, অমাবস্যা প্রতিপদ সেদিন হয়।
আর একদিন থাকে মায়ের কোলে, তা হিন্দুর পঞ্জিকায় কয়।
চৌদ্দপোয়া ছয়ালের জব দিচ্ছি আমি পরিচয়,
নিকাশ করে দেখ, বয়াতি, ধুয়ার উত্তর হয় কি না হয়॥ —ঐ

৪১

কেন মিছে আর জাল ফেল, ওরে মন-জেলে।
নাড়াচাড়া গুগ্‌লী ঝাড়া সারা হবে তোর কপালে।
ওরে, মন-জেলে॥

ও তুই এলি উজান বেয়ে, ফিরে দেখলি না চেয়ে,
অসাধ্য সে হরি মাছ সে অতলে যায় সাঁতরায়ে।
তুমি কিনারে দিচ্ছ খেয়া রে, মাছ রয়েছে গভীর জলে।
ওরে, মন জেলে॥

জালের চৌষট্টিটা ঘাই, তার একটাও ভাই নাই,
ভজন-সাধন পুণ্য কাঠি আমি শূন্য দেখতে পাই।
তোমার জীর্ণ অনুরাগের সূতারে, সেটা টাইন্‌তে গেলে যায় ছিঁড়ে।
ওরে, মন-জেলে॥

তোমার মাছ ধরতে বাসনা, জাল ফেলতে শিখলে না,
জল চিনে জাল ফেলতে পারে জেলে যারা হয় সিয়ানা।
তুই বা কোথায়, চাঁদ বা কোথায়, হাত বাড়াইলে কি চাঁদ মিলে।
ওরে, মন-জেলে ॥　　　　—ঐ

৪২

গোরের মাঝে চেতন মানুষ কইরেছে আসন। ধ্রু ॥
গোরের খবর জান্‌ত যদি সাধুলোকে বাইন্‌ত নদী।
ভবে তারাই হইত মহাজন ॥ ধ্রু
মক্কার উপরে যে গোর, তার উপর মদিনা সহর।
নবীর নাতি বেহেস্তের বাতি তারাই পাইল না অন্বেষণ ॥ ধ্রু ॥　　— ঐ

নিরক্ষর লোকের মধ্যেও আমাদের দেশে তত্ত্বচিন্তা যে কত গভীর ছিল, তাহা ইহার এই শ্রেণীর গানগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়। নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে দাম্পত্য জীবন-চিত্রের রূপকের মধ্য দিয়া একটি গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মাকে এখানে ঘরের গিন্নী বলা হইয়াছে। দেহের সঙ্গে আত্মার প্রীতি যেন পরপুরুষের সঙ্গে নারীর প্রণয়। কারণ, দেহ নিত্য নয়, পরপুরুষও নারীর সত্য স্বামী নয়। দেহের মায়া দ্বারা যে আত্মা আচ্ছন্ন, সেই আত্মা মোহগ্রস্ত।

৪৩

ঘরের গিন্নী ঘরে নাই, গুরু ভজবে কে,
গুরু ভজবে কে আমার, পতি ভজবে কে।
আমার গতি বুঝবে কে ॥
ছাই কপালী গিন্নী আমার বাইরা পেত্নী পাইয়াছে।
ঘর থইয়া জঙ্গলে যাইয়া স্যাওড়া গাছে চইরাছে ॥
ছাই কপালীর কর্মে ছাই, রান্দাভাত বরাতে নাই,
খিদার জ্বালায় ছচিশালায় আঁইটা চাটতাছে।
আর উটকী পরতাছে ॥
কতই করলাম উপাস কাপাস কতই করলাম পুজাধ্যান,
কতই তীর্থে নাইলাম, কত প্রসাদ খাইলাম ;

ছাড়াইতে না পারিলাম বাইরা পেত্নীকে।

একটি পলকে ॥

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তিন শক্তি তার হয় প্রধান।

জীবশক্তি আর চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ধরে নাম।

তটস্থ সেই জীবশক্তি, ভুইলা যাইয়া আপন পতি,

মায়ার এক পুরুষের সঙ্গে পুরুষ সাইজাছে।

তার স্বরূপ ভুইলাছে ॥ —ঐ

৪৪

চারি পোতায় ঘর বান্দ হে, ঘরখানির নাম কুষ্ঠধর।

আড়ে-পাশে চতুর্দিকে ঠিক সমান সে ঘর ॥

সাকার গলির মধ্যস্থলে মুখ সোজা বাজ সদরওলা।

কতগলি সে যে বলি তার, চৌষট্টি গলি চার বাজার।

কালা কাণা চোবারী কারবার ॥

দেখে ভয় লাগে আমার, চারি বাজারে চারি দোকানদার,

করতেছে কারবার, আইসে দোকান সাথে লইয়া যায়।

কানা দেখিয়া হাসে, কানা জিনিষ খরিদ করে,

বোঁচায় দোক মূল্য নিয়াছে।

কত কালা করছে খেলা করছে নিশি দিবসে

শুক-সাদন তাহারি বশে ॥

আমি পাইনে তার দিশে ॥

সেই ঘরেতে বসত করে জন্মাবধি একজনা,

তার হস্ত-পদ নাই, চক্ষুদুটি তার কানা।

সে চক্ষে না দেখে, পর-হাতে লেখে

তাহারি হাতে ক্ষমতা।

আমি জহির মূর্খমতি সাধু জানে তাহা,

আমি স্ত্রীর আজ্ঞাকারী ত্রিপুরার ঐ হরের মামা।

ভালমন্দ লাগে ধন্দ গঞ্জন মানুষ হয় তাতা,

মাতালে কি জানতে পারে, তাহা সাধুর মুখে নাই কথা ॥

৪৫

জান জান, মন-মাঝি, হাইল ধর হুঁশিয়ারি হইয়ে।
যে জিনিষ কইরাছ বোঝাই সোজা বাগে যাও বাইয়ে ॥
বোম্বাইটারা সব রইয়াছে চাইয়ে।
তরী বেহুঁস হইলে শোন বলি মাল করিবে চুরি।
থাকবা বেকুবি হইয়ে ॥
ভাও জানিয়া বেচ্‌লে পরে লাভের অংশ দেখি তারে।
এই দোকানে খরিদ বিক্রী. যাইও না অন্যস্থানে
ডুবলে তরী অকুল সাগরে।
তরীর লাভে মূলে সব হারাবে, কি জবাব দিবা তুমি মহাজনেরে। —ঐ

৪৬

নিজের জ্বালায় জলে মরি পরের জ্বালা কত সই।
গুরুধন ভবার্ণবে, আমার জায়গা কই ॥
গুরুধন, দুধ কিনিয়া আনলাম কর্মদোষে হইয়া গেল দই।
একদিন দুইটা চাউল পাইলাম না অতিথ্‌ হইয়া কয়দিন রই ॥
মনরে, এ রাজ্যে কি কল কইরাছে জঙ্গল কাইটা সড়ক দিছে.
তার উপরে তার টাঙ্গাইছে দিনের খবর ঘড়িতে লই ॥ —ঐ

৪৭

দুইটা ফুল ফুইটা রয় প্রেম-সরোবরে।
ফুলের উদ্দিশ বারণ কে করে দৈনিক ফুল সাধু সাধন কে করে।
রত্নযোগে ফুল আসে না রে, কত ফুল ভাসে জোয়ারে।
আর চান্দ বিরাজ করে মনফুলে বইসে।
আমি ফুলের কারণ হইছিরে ভোলা, শুইয়া থাকি গাছতলা ;
গাছতলা ঘুরি দু'বেলা। (আয়—আ-হায়-আয়)।
ও ফুল পাইয়াছে যে জন, হইয়াছে সে মন,
ঘটবেরে নিঠুর কালা একটি ফুল পাইলে পরে।
চৌদ্দপুরী হয় তীর উজলা (আয়-আ-হায়-আয়)।
বারমাসে বার ফুল আসে, এক ফুল তার পুর পাশে।
কতই ফুল জোয়ারে ভাসে ॥ (এ-এহে-এ) —ঐ

৪৮

ভবের পর এক রথ গড়াইছে, আরে, ও দীননাথ সূতার,
রথের আড়ে-পাশে চৌদ্দপোয়া দেইখ্যা ভয়ঙ্কর।
অতি ভয়ঙ্কর চমৎকার, ভাই, কামিল কর, সে রথ চলে হাওয়ার পর।
দুইমন বাতি জ্বলেরে, আরে ও রথের চূড়ার পর।
ভবের পরে আইছরে পাগল মন, শোন তোরে বলি।
কি ভাবেতে আইলিরে, মন, কি ভাবেতে রইলি।
দিন'ত হারাইলি খোয়াইলি মন কি করলি,
শরীরে আগুন দিলি এই করালের দায়েতে ?
আরে ও খাইয়া নিন্দিলি।
হুকুমেতে আইছরে, বান্দা, তলপেতে যাও,
সাক্ষী থাইক, ভাই-বেরাদ্দর, হাট করিতে যাই—
যার যার সদাইর কাম সাইরারে যাইবে না সন্ধ্যা হয়।
যার যার বাড়ীতে সেই সেই চইলে যাও,
কারুক দিকে নাহিরে আরে ও নয় হে চাও॥ —ঐ

নিম্নোদ্ধৃত গানটিকে গুরুবাদী সঙ্গীত বলিয়াও উল্লেখ করা যায়। দেহতত্ত্ব-বাদীরা মূলতঃ গুরুবাদী ছিল না, ক্রমে নাথ ও তান্ত্রিক ধর্মের গুরুবাদের প্রভাবের ফলে তাহাদের মধ্যেও গুরুবাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। গানটির মধ্যে মন বা আত্মাকে যে পাখী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই ইহার দেহতত্ত্বের একমাত্র লক্ষণ। পূর্বেই বলিয়াছি, দেহতত্ত্বে মন বা আত্মাকে রাজহংস কিংবা ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করা হয়, এখানে পাখীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

৪৯

মনরে পাখী, কি সুখে রইয়াছ, মনরে, মায়াজালে,
ঘোর হইল আঁখি।
ভবে আইসে এই করিলাম, গুরুর চরণ না ভজিলাম,
মায়াজালে ভুলিয়া রইলাম।
পরকালের কি হইবে উপায়, পরকালের কি হইবে উপায়,
মায়াজালে ঘোর হইল আঁখি॥ —ঐ

৫০

মন-পাগলা ঘোড়ারে, তুমি কোথা হতে কোথা নিয়া যাও।
মন হইল ঘোড়ারে, ভাই, পবন হইল জীন,
কোন বা রসিকে ঘোড়া চালায় রাত্রিদিন।
ও মন, কোথায় তোমার ভাই বন্ধু, কোথায় তোমার মাও।
তারে না চিনিয়া, মন, বাজারে বেড়াও॥
কোথায় তোমার ভাইবন্ধু, কোথায় তোমার নারী।
নীলমাধব ছাড়িয়া গেলে হবা দেশান্তরী॥ —ঐ

৫১

মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াই আমি পাই না তার অন্বেষণ।
মনের মানুষ পাইতাম যদি তারে হৃদ্‌কমলে বসাইতাম।
নয়নজলে ধোয়াইতাম চরণ গো নয়নজলে॥
আমি মন-সুধারত্ন দিয়ে তারে করাইতাম ভোজন।
মনের মানুষ পাবার লাগি, শিব হইয়াছেন সর্বত্যাগী,
করেন শিব শ্মশানে গমন।
মনের মানুষ বিনে রাত্রদিনে ঝরে দুনয়ন।
মনের মানুষ দুধের গুঁড়া, নদীয়ায় পৈরাছে ধরা,
যে মানুষ বৃন্দাবনে পড়েছে ধরা তারে ধরেছে গোপীগণ॥ —ঐ

৫২

মানুষ, দেহের গরব আর কইরো না।
পাখী যেদিন যাবে উইড়ে শুধু খাঁচা পড়ি রবে, মরি হায়।
ভাই-বেরাদার কান্দবে বসে, ও বলে কেউ ঠেকাতে আর পাইরবে না॥
পদ্মের পাতায় জল শুধু করে টলমল, মরি হায়।
সোনার দেহ ছাইড়ে প্রাণ পালাবে ফিরেতে আইবে না।
মানব-দেহের গরব আর কেউ কইরো না।
ফকির লাল বলে তোমার শরীর আর চিরকাল যাইবে না।
থাইকবে না সুখ, বিধির বিমুখ সেদিন হবে॥ —ঐ

৫৩

মিছে ভাবছ মন আমার।
আইসারে শমন বান্ধবে বান্ধন, কেবা হবে আপন পর॥
ঘরে নয় দরজা ছয়জন বসে রয়,
মানুষ ডাকতে পাইলে কথা কয়।
সোদরপুরে খোঁজে যে জন,
ওরে ভাই, আইলো ভাই, আইলো কথা শোন।
পলায় যায় প্রেমের ঝোলার সেই মহাজন।
সাঁইও জন শোন মাদারে, আপন বস্তু নে না সেরে,
মাদারে কয় ঐ জনা লো
জায়গা রাইখো পরপার॥
মিছে ভাবছ কেন, মন আমার॥ —ঐ

৫৪

মন ভুইল নারে ছাড় ভবের মায়া।
উড়িয়া যাবে পাখী পড়িয়া থাকবে কায়া॥
রাম নামের ঘর খানি কৃষ্ণ নামের বেড়া।
হরি নামের দুয়ার খুলিয়া দেখ বান্দে বান্দে জোড়া॥
ঘরখানি ভাদর জোড়া দুয়ার কেন বান্ধা—
আপনি মরিয়া যাবে—পরের লাগি কান্দ, মন, ভুইলনা রে।
যার লাগি করি গো চুরি সেই ডাকে চোরা।
চাকুরি করিয়া দরমা পাই না নসিব আমার বুড়া॥ -ঐ

দেহতত্ত্বের গান বৈরাগ্যের গান। যে অধ্যাত্মচিন্তায় দেহের কোন মূল্য নাই, কিংবা দেহকে নশ্বর বলিয়া তুচ্ছ এবং অসার মনে করা হয়, তাহা বৈরাগ্যের গান হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কিছু নাই। আত্মার অবিনশ্বরত্বের স্বীকৃতি বৌদ্ধধর্মচিন্তা হইতে ইহাতে আসিয়াছিল। সেইজন্য বৌদ্ধধর্ম এবং দেহতত্ত্ব দুইই বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছে।

৫৫

মন আমার যাইস নারে ভয়ঙ্কর জংলা মুল্লুকে। ধ্রু॥
গেলে পাইবি কেরে অন্ধকারে তোর মুণ্ডু ঘোরে যাবে সব দেখে॥ ধ্রু॥

জংলা হাওয়া লাগে যদি গায়, কত মণির মগজ গলে যায়।
বাস্তহারা দিশেহারা হইতে হয় সবায়।
সে যে তুইল্‌তে সিঙ্গে তুইল্‌তে ঝিঙ্গে ঘোর লেগে যায়।
মন আমার যাইস্‌ নারে ভয়ঙ্কর জংলা মুল্লুকে ॥ —ঐ

৫৬

বড় ফিকির করে তারিপ কইরে বসাইলাম আজু এক রথ।
চার চিজে তার গঠন সারা ওজনে ঠিক হয় তাত ॥
সাড়ে তিন হাত ওরে, নয় দরজা দেখতে মজা,
চলছে যে পবনের সাথ, ছয় জন সে রথের পরে,
নিচে দুই চাকা ঘোরে মাঝখানে বসত কার।
ভাইরে, ত্রিজগৎ পাই তাহার নয় কুঠারী বিরামখানা,
সেই রথের উপর কামিল কর মাঝখানে থাইকে।
দুনিয়ার গঠন সারে, ওরে কইছিলাম কই, ভাই সাহেবরা,
তোমরা কি চেন তারে কামিল কর নগুন পাইলে।
দুনিয়ার গঠন সারে, ওরে কইছিলাম কই ভাই সাহেবরা
তোমরা কি চেন তারে কামিল কর নগুণ পাইলে,
মোছাইতাম কালশিরে নাগাইতাম তালি ভাই।
রথ চালাইতাম জোরে ॥
উহার ছয় জন বিপক্ষ হইয়া সদায় কার গেল মালি,
কেউ চেনে তার কেউ চেনে না, ভাই, সকলরে চিরদিন।
রথ চলে না ভাইরে, সারথি পাইনি ॥ —ঐ

৫৭

যাইস্‌নারে, ও মন-পাখী, ফিরে আয় ফিরে আয় রে।
ও মন-পাখী হায়রে হৃদয় পিঞ্জিরায় ॥
হৃদ্‌পিঞ্জিরা শূন্য কইরে, মন পাখীরে যাইস্‌না উড়ে।
মনের পাখী বনে গেলে সেই পাখী ধরণী পড়ে ॥ —ঐ

দৈরাপীরের গান

যে পীর বিশাল নদী বা দরিয়া নিরাপদে যাত্রীকে পার করিয়া দেন বলিয়া বিশ্বাস, তাহাকে পুর্ব বঙ্গে দৈরাপীর বলে। দৈরাপীরের মাহাত্ম্যসূচক পাঁচালী শ্রেণীর গানকে দৈরাপীরের গান বলে। এই পাঁচালীতে কি ভাবে যে একজন যাত্রী তাঁহার মন্ত্রপুত একটি মাত্র তণ্ডুল-কণা খাইয়া এক বিশাল নদী পার হইয়া গিয়াছিল এবং আর একজন যে তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছিল, তাহার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনী গদ্যেও ব্রতকথার আকারে প্রচলিত আছে।

একদিন দৈরাপীর দৈরার কিনারায়।
ঝুলা কান্ধে লইয়া চাইর দিকেতে চায়॥
আসমান জমিন মালুম নাই মেঘে ধুন্ধুকার।
দরিয়ার ঢেউ যেমুন হিমানীর পাহাড়॥
পন্থে আইস্যা দুইজন সামনে খাড়া হৈল।
কেমনে হৈম দৈরা পার পীরেরে শুধাইল॥ —মৈমনসিংহ

দোতারার গান

উত্তর বাংলা প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও রংপুর জিলার লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত ভাওয়াইয়া গান যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হয়, তাহাকে দোতারা বা দোতরা বলিয়া উল্লেখ করা হয়, দোতারার সহযোগে যে গান গাওয়া হয়, তাহাই দোতারার গান নামে পরিচিত। ইহা প্রধানতঃ ভাওয়াইয়া গান (পরে দেখ) হইলেও অন্য ভাবমূলক গানও দোতারার সাহায্যে গীত হইতে পারে। তবে সাধারণভাবে ভাওয়াইয়া গানকেও দোতারার গান বলা হয়, কারণ, দোতারার সঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

ওই কালীর দুয়ারে সিনান করিয়া
ধাউলী চেংরীটা জোর পাঠা মানে।

সত্যের মোর কালী হোবা
পরকতে উতুরিবো
কালা চেংরীটার মানেয়া দিবো মোকে গে।
হে কালী জোর পাঠা পাবো।
ও মরি রে, হে, হে,
মোর দারুণ বিধুতা
দিনে দিনে নারীর
উপ অং যাছে চলিয়া। —জলপাইগুড়ি

ইহার অর্থ এই :—

ঐ গৌরবর্ণা যুবতীটি স্নান করিয়া কালীর দুয়ারে জোড়া পাঁঠা মানসিক করিল। সে বলিল, তুমি যদি সত্যের কালী হও, তবে আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তুমি ঐ কালো ছোঁড়াটাকে আমার নিকট লইয়া আস, সে আমাকে বিবাহ করুক। যদি তাহা করিতে পার, তবে আমি জোড়া পাঁঠা তোমার নিকট বলি দিব। হে নিদ্দারুণ বিধাতা, তুমি কি দেখ না যে যতই নারীর বয়স বাড়িতেছে, ততই তাহার গায়ের রঙ মলিন হইয়া যাইতেছে?

২

ওই নদী সিনাইতে
বালু ঝাটা মোক কিতায় দিলো।
ওইঠে মনটা পাগল করলো ধাউলী গে,
তোর উপর মোর বড় তিষিনা
তোর উপর মুই জিউটা দিসু ঢালিয়া।
ও, মরি, রে
ধাউলী চেংরীটার দাঁতত মিশি
পাগল করলে চান মুখের হাসি। — জলপাইগুডি

ইহার অর্থ :—

নদীতে স্নান করিবার সময় এক মুঠি বালু কেন তুই আমার গায়ে ছড়াইয়া দিলি? তখন হইতেই আমার মন, হে গৌরাঙ্গী, তোর জন্ম পাগল হইয়াছে। তোকে পাইবার আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা, তোর উপর আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। তোর দাঁতের মিশি সুন্দর মুখের হাসি আমাকে পাগল করিয়াছে।

ধ

ধর্ম পুজার গান

পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের পুজা উপলক্ষে ডোম পণ্ডিত বা পুজারিগণ বহুকালাবধি যে বাংলা গান গাহিয়া ধর্মঠাকুরের পুজা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই এখানে ধর্মপুজার গান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আচার-সঙ্গীতের (ritual song) অন্তর্গত। শূন্যপুরাণ নামক ধর্মঠাকুরের পুজাবিধানে ইহার যে উল্লেখ আছে, তাহা অংশত এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

১

দেব নিরঞ্জন পুজার কারণ
ডাক দিয়া হনুমানে।
করিয়া তুষিত পুখরি নিমিত্ত
দেহ মোর সন্নিধানে॥
হনুমান আসি মনে অভিলাষী
প্রদক্ষিণ সাতবার।
করি জোড় কর পবন কোঙর
হনু কৈল অঙ্গীকার॥
দেব আজ্ঞা লয়ে পন্নাম করিয়ে
হনু যান লঘুগতি।
করিয়া কৌতুকে কুড়ে বজ্জ নখে
করিয়া অনেক ভকতি॥ —বাঁকুড়া (শূন্যপুরাণ)

ধর্মমঙ্গল গান

পশ্চিমবাংলার প্রধানত রাঢ়অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের মৌখিক প্রচলিত মাহাত্ম্যকীর্তন অবলম্বণ করিয়া মধ্যযুগে যে সুদীর্ঘ আখ্যানগীতি রচিত হইয়াছে, তাহা ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিত। ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল গান রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। তাঁহার মূল

পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে যাঁহারা ধর্মমঙ্গল গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের রচনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলের ভিতর দিয়া মঙ্গল গানের একটি প্রধান ধারা বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ইহার কাহিনীটি এই প্রকার—ধর্মপালের পুত্র তখন গৌড়ের রাজা। তাঁহার শ্যালক তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, নাম মহামদ। মহামদ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি, সে অকারণে একজন অনুগত প্রজা সোম ঘোষকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, রাজা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া ত্রিষষ্ঠীর গড়ে পাঠাইয়া দিলেন। ত্রিষষ্ঠীর গড়ে কর্ণসেন নামক একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সোম ঘোষ তাঁহার উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। সোম ঘোষের এক পুত্র ছিল, নাম ইছাই ঘোষ ; সে ক্রমে অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠিল ; পরিশেষে কর্ণসেনকে গৌড় হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে সে গড়ের মালিক হইয়া বসিল। গড় হইতে যখন খাজনা লইতে আসিল, তখন রাজকর্মচারীকেও অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। এইবার গৌড়েশ্বর নয় লক্ষ সৈন্য লইয়া ত্রিষষ্ঠীর গড় আক্রমণ করিলেন। অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইছাই গৌড়ের সৈন্যকে পরাজিত করিল যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইল, শোকে রাণী আত্মঘাতিনী হইলেন, শোকে দুঃখে কর্ণসেন পাগল হইয়া গেলেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে পুনরায় সংসারী করিতে চাহিলেন। নিজের একটি সুন্দরী শ্যালিকা ছিল, নাম রঞ্জাবতী ; তাঁহার সহিতই তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। রঞ্জাবতী মহামদ পাত্রের ভগিনী ; মহামদের এই বিবাহে মত ছিল না বলিয়া রাজা কৌশল করিয়া তাহাকে দূরে পাঠাইয়া দিয়া বিবাহ নির্বাহ করিয়া ফেলিলেন। জানিতে পারিয়া মহামদ ক্রোধে আত্মহারা হইল, রাজার কিছুই করিতে পারিল না বলিয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতির উপরই গিয়া তাহার রাগ পড়িল। কিছুদিন না যাইতেই ভগ্নীকে বন্ধ্যা বলিয়া গালি দিল। রঞ্জাবতী পুত্রলাভের জন্য নানা দেবদেবীর নিকট পূজা মানসিক করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধর্মের নামে শালে ভর দিয়া এক পুত্র লাভ করিলেন। তাঁহার নাম রাখিলেন লাউসেন।

ক্রমে লাউসেন অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন। গৌড়ে গিয়া গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গৌড়েশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানা পারিতোষিক।

দিয়া বিদায় করিলেন। মহামদ তাঁহার নানা অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। তিনি নির্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই গৌড়েশ্বর তাঁহাকে কামরূপ রাজ্য জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। লাউসেন কামরূপ জয় করিয়া কামরূপের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

বৃদ্ধবয়সে গৌড়েশ্বর সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কাণড়াকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কাণড়া লাউসেনকে পতিরূপে কামনা করিয়া আসিয়াছেন, বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে তিনি বিবাহ করিতে চাহিলেন না। তিনি একটি লোহার গণ্ডার নির্মাণ করাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ইহাকে এক কোপে দুই টুকরা করিতে পারিবে, তিনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন। গৌড়েশ্বর তাহা পারিলেন না, অবশেষে তিনি লাউসেনকে ডাকাইয়া আনিলেন। লাউসেন এক কোপে লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করিলেন, কাণড়া তাহাকেই বরমাল্য দান করিলেন। নিরাশ হইয়া গৌড়েশ্বর ফিরিয়া গেলেন।

মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর এইবার লাউসেনকে ত্রিষষ্ঠীর গড়ে ইছাই ঘোষকে আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। ইছাই ঘোষের পরাক্রমের কথা কর্ণসেন জানিতেন ; সেইজন্য এই সংবাদ শুনিয়া তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লাউসেন কাহারও কথা শুনিলেন না, রাজার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ত্রিষষ্ঠীর গড়ে ইছাই ঘোষকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে দুর্দান্ত যুদ্ধ হইল। অবশেষে ইছাই ঘোষ পরাজিত ও নিহত হইল। গৌড়েশ্বরের শত্রু নির্মূল হইল। বিজয়-গৌরবে লাউসেন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কোনভাবেই লাউসেনকে অপদস্থ করিতে না পারিয়া মহামদ পাত্র ভাবিল, যে-দেবতার বরে লাউসেন এত শক্তিশালী, সে সেই দেবতারই পূজা করিবে। মহামদ গৌড়ে ধর্মঠাকুরের পূজা আরম্ভ করিল, কিন্তু ঠাকুর তাহার পূজা গ্রহণ করিলেন না, তিনি পূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিলেন। অকালে গৌড়ে বাদল নামিল। পথ-ঘাট-মাঠ সকল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সকল পাপ হইতে রাজাকে মুক্ত করিবার জন্য গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ডাকিলেন। লাউসেন কঠিন তপস্যা দ্বারা ধর্মপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া গৌড়রাজ্যকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ ময়নানগর আক্রমণ করিয়া বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিল। ধর্মঠাকুরের

অভিশাপে সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল। লাউসেন ময়নানগরে ফিরিয়া আসিলেন।

মৌখিক প্রচলিত এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া যিনি প্রথম ধর্মমঙ্গল রচনা করেন, তাঁহার নাম ময়ূরভট্ট। প্রত্যেক পরবর্তী কবিই আদিকবি বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু ময়ূরভট্টের পুঁথি আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয় উদ্ধার করা কঠিন। ময়ূরভট্ট পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হইল—

ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্যবন্ত পুত্র তার গৌড়ের ঈশ্বর॥
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পুজিত।
কৃষ্ণ পরায়ণ যেন রাজা পরীক্ষিত॥
কলি কালে কর্ণ হেন দানে কল্পতরু।
নিত্যদান অখিলে অক্ষয় অন্নমেরু॥
প্রতাপে পতঙ্গ যেন সেন মহাশয়।
দুষ্টের দমনে কাল কেহ কেহ কয়॥

ধর্মমঙ্গল বারদিনে চব্বিশটি সর্গ বা পালায় বিভক্ত হইয়া গীত হইত।

ধর্মসঙ্গীত

ধর্মের বিষয় অবলম্বন করিয়া যে সঙ্গীত রচিত হয়, তাহাই সাধারণ ভাবে ধর্মসঙ্গীত নামে পরিচিত। কিন্তু ধর্মের ভাব অবলম্বন করিয়া যাহা রচিত হয়, তাহাকে পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদগণ লোক-সঙ্গীতের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিতে চাহেন না।

সুতরাং বাংলার পল্লীর সহজিয়া তত্ত্বের গান, নামধর্মতত্ত্বের গান, দেহতত্ত্বের গান, বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতী, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি বাংলার লোক-সঙ্গীত নহে। কিন্তু তথাপি ইহাদিগকে লোক-সঙ্গীত বলিয়া ভুল করিবার যথেষ্ট

কারণ আছে। কারণ, ভাবের দিক দিয়া ইহারা লোক-সঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত না হইলেও আঙ্গিকের (form) দিক দিয়া ইহারা লোক-সঙ্গীতেরই বিভিন্ন রূপ। লোক-সঙ্গীতের যে সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে, তাহা গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উল্লিখিত ধর্ম বা তত্ত্ব-সঙ্গীতগুলির মধ্যে তাহাদের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যেরই অভাব আছে। বিশেষতঃ পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-সঙ্গীত স্বাধীন বলিয়া সর্বদা পরিবর্তনশীল (dynamic), কিন্তু ধর্মসঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহা আচারের অধীন বলিয়া অপরিবর্তনশীল (static)। সুতরাং ইহাদের উভয়ের প্রকৃতি পরস্পর বিপরীত-ধর্মী। বিষয়টি একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। সেইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে একসঙ্গে সাধারণ ভাবে কোন আলোচনা না করিয়া প্রত্যেকটি বিষয় লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ সহজিয়া সঙ্গীতের কথাই ধরা যাউক। বিশেষ একটি সাধনার প্রণালীর নাম সহজ; ইহা সহজ সাধনা বা সহজিয়া সাধনা নামে পরিচিত। অন্যান্য অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সাধনার মতই ইহাও একটি গূঢ় সাধনা। সহজিয়া কবি বলিয়াছেন,

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানয়ে কেবা।

অর্থাৎ মুখে সকলেই ইহার নাম করিলেও ইহার গূঢ় রহস্য কেহই জানিতে পারে না। সহজিয়া গানের ভিতর দিয়া এই গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে—ইহার সর্বজনীন রস-আবেদন নাই, অতএব ইহা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নহে, সেই সূত্রেই ইহা লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। সাধকের ব্যক্তিমানসের মধ্যে ইহার বিকাশ হইয়া থাকে, অতঃপর শিষ্য বা গোষ্ঠী-পরম্পরায় তাহা প্রচার লাভ করে—বৃহত্তর লোক-সমাজের সঙ্গে ইহার স্বাভাবিক যোগ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত (sectarian) সৃষ্টি এবং বাংলার মধ্যযুগের কোন কোন বিষয়-বস্তুর মত ইহার এই সুনির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইহা বিস্তৃততর মানবিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।

নাথ-গীতিও নাথ-সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট সৃষ্টি, এই জন্য ইহাও সাম্প্রদায়িক

(sectarian) সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। সহজিয়া গীতি অপেক্ষা নাথ-গীতি অধিকতর অস্পষ্ট বা গূঢ়ার্থবাচক (mystic), ইহাতেও একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনারই কথা আছে ; কিন্তু এই কথাটি এমন ভাবে প্রকাশ করা হয় যে, সাধারণ ভাবে ইহার কোন অর্থই বুঝিতে পারা যায় না ; অতএব ভাব যাহাতে গূঢ় ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন এবং বহিরঙ্গগত অর্থও যাহাতে অস্পষ্ট, তাহা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত একটি নাথ-গীতি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই ইহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাইবে,

গুরু মীননাথ রে, উল্টা উল্টা ধারা।
পুকুর মুরে ধান শুকাইয়া উগারতলে বাড়া ॥
গুরু হে, আম গাছে শৈলের পোনা বগায় ধরি খায়।
তা দেখিয়া খুদি পিঁপড়া পল' লইয়া যায় ॥
গুরু হে, পাঁচ পণ দিয়া কিনলাম নাও, নয় বুড়ি তার জলই।
কচু বনে রাখলাম নাও বেঙে গিল্‌ল্‌ গলই ॥
গুরু হে, একটি কথা শুনেছিলাম ত্রিপিণীর ঘাটে।
মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে ॥
গুরু হে······ইত্যাদি।

এই দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর ভিতর হইতে সাহিত্য-রস অনুসন্ধান করিলে যে ব্যর্থ হইতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব এই সকল তত্ত্ববিষয়ক গূঢ়ার্থবাচক গীতি লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় না ; কারণ, সঙ্গীতের সর্বজনীন মানবিক আবেদন ইহাদের মধ্যে নাই।

দেহতত্ত্বের গান বাংলার পল্লীগীতির এক বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কালক্রমে নানা ভাবের সংমিশ্রণ হইলেও ইহার মূল বক্তব্য বিষয় এই যে, এই পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত দেহ সকল শক্তির আধার ও ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনার একমাত্র অবলম্বন, ইহার তুষ্টিতেই সকল সাধনার সিদ্ধি। সেইজন্য ইহার মূল কথাই হইতেছে—'তরবি যদি ভবনদী নারী সঙ্গ কর।' ইহা সাধনার কথা, সাহিত্যের কথা নহে। সাহিত্যে নারী পুরুষের কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক সাধনার অবলম্বন নহে, তাহার ক্ষেত্র আরও বহু বিস্তৃত, বরং আধ্যাত্মিক সাধনা সাহিত্য রস-সৃষ্টির বিরোধী। যদিও দেহতত্ত্বের

সাধনার মধ্যে একটি স্থূল বাস্তব আবেদন আছে সত্য, তথাপি যে সংযম ও সৌন্দর্যের অভাবে বাস্তব জীবনের উপকরণও সাহিত্য হইতে পারে না, দেহ-তত্ত্বের গীতিগুলির পরিকল্পনায় অনেক সময় তাহারই অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। ইহাও একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনার প্রণালী—ইহারও সর্বজনীন আবেদন নাই—ইহাও mystic বা গূঢ়ার্থবাচক। অতএব এই সকল দিক বিচার করিয়া দেহতত্ত্ববিষয়ক গীতিও বাংলার লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয় না।

কিন্তু এ'কথা সত্য যে, দেহতত্ত্বের যে সকল গানের মধ্যে শুচি ও সংযম রক্ষা করা হইয়াছে, তাহা লোক-সঙ্গীতের গৌরব হইতে বঞ্চিত হয় না। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি,

নিশিতে যাইও ফুলবনে, রে মন-ভমরা।
জ্বালাইয়া দিলের বাতি জাগি রব সারারাতি (গো)
কব কথা প্রাণবন্ধুর কানে, রে মন-ভমরা ॥

ইহা একটি অপূর্ব ভাবগৌরবে গৌরবান্বিত; তত্ত্বকথা ইহার মধ্যে থাকিলেও তাহা ইহার এই উচ্চ ভাবটি আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে নাই, বিশেষতঃ ইহার তত্ত্বটি মানুষের 'ফুলবন' সদৃশ পবিত্র সুন্দর দেহ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে একটি সর্বজনীন আবেদনও আছে। ইহার অর্থ এই প্রকার—দেহ ফুলবন, মন তাহার ভ্রমর, জীবনের নিশি যখন ঘনাইয়া আসে, তখন মনের সেই ভ্রমর জাগিয়া উঠে। জীবনের নিশিতে অন্তরের আলো ('দিলে'র বাতি,) অনির্বাণ থাকে, তখনই প্রাণরূপ বন্ধুর সঙ্গে নিভৃত আলাপনের অবসর। এখানে 'মন', 'দিল্' ও 'প্রাণ' এই তিনটি শব্দের মধ্যে পরস্পর সূক্ষ্ম পার্থক্য কল্পনা করা হইয়াছে—সকল দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানের মধ্যেই এই তিনটি শব্দ বিশেষ অর্থবাচক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমগ্র ভাবে এই গানটি যে একটি ভাবের সৃষ্টি করে, তাহা ইহার গূঢ়ার্থ উপলব্ধি ব্যতীতও উপভোগ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। ইহার গূঢ় বা mystic ভাব ব্যতীতও ইহার একটি রসাবেদন সার্থক হইয়াছে। অতএব এই শ্রেণীর কোন কোন দেহতত্ত্বের গান নিঃসন্দেহে লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু তাহা তত্ত্ব-সর্বস্ব হইলে তাহা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক (sectarian) গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, তবে কখনও দর্শনের পর্যায়ে উঠিতে পারে এই মাত্র।

এখন বাউল গানের কথা বলিব। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট একটি প্রণালীর নামই বাউল, যাহারা এই প্রণালীর সাধক, তাহাদিগকে বাউল বলে। ইহা একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বিশিষ্ট প্রণালীর সাধকদিগের নিকটই এই অনুভূতির উপলব্ধি হয়—ইহা ভগবানের সঙ্গে মানবের একটি অবিচ্ছেদ্য ও সুনিবিড় সম্পর্কবোধের অনুভূতি; সেই জন্য ইহাতে বলা হইয়াছে—'ওগো সাঁই, তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।' ভগবানই স্বামী (সাঁই) বা একমাত্র প্রভু; তাঁহার সঙ্গে বাউল অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যস্থতা ব্যতীতই সুনিবিড় মিলনের আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। মূলতঃ এই সম্প্রদায় গুরুবাদী ছিল না, কিন্তু কালক্রমে নাথ ও সূফী ধর্মের প্রভাব বশতঃ ইহাতে গুরুবাদ, এমন কি চৈতন্যধর্মের প্রভাব বশতঃ চৈতন্যবাদও আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ফলে কালক্রমে ইহা সাধনার একটি মিশ্র রূপেই পরিচয় লাভ করিয়াছে। ভগবানকে স্বামিরূপে বা অন্তরের নিবিড়তম সান্নিধ্যে লাভ করিবার যে অনুভূতি, তাহা এক অতি সূক্ষ্ম ব্যক্তি-সাধনাজাত আধ্যাত্মিক অনুভূতি মাত্র, ইহার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমাজ বা লোক-সমাজের সামগ্রিক চৈতন্যের কোন সম্পর্ক নাই; অতএব বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্য হইতে যে ভাবে লোক-সাহিত্যের জন্ম হয়, ইহার সঙ্গীতগুলি সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করে না—বরং ব্যক্তিমনের আধ্যাত্মিক চৈতন্যবোধ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই আধ্যাত্মিক বোধও সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয়, সহজাত প্রবৃত্তির পথে মানব-মনে তাহা উদ্ভূত হয় না। অতএব ইহাও তত্ত্বমূলক রচনারই অন্তর্গত, ইহার মধ্যেও গূঢ়ার্থ (mysticism) আছে, সেই অর্থ একমাত্র সাধকের নিকটই বোধ্য, সাধারণের নিকট বোধ্য নহে। এইজন্য বাংলার বাউলগানও লোক-সঙ্গীতের অন্তর্গত মনে না করিয়া বরং এ'দেশের আধ্যাত্মিক দর্শনরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন। তবে কোন কোন দেহতত্ত্বের গানের সাহিত্যিক দাবী সম্পর্কে পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাউল গান সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

মুর্শীদ্যা এবং মারফতী গানও নাথ তত্ত্বসঙ্গীতের মত বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই সৃষ্টি, সমাজ-জীবনের সৃষ্টি নহে। মুর্শীদ্যা সম্প্রদায় গুরুবাদী, মুর্শীদ শব্দের অর্থই গুরু বা ভগবানের সঙ্গে যিনি মধ্যস্থতা করিয়া থাকেন—ইহার লক্ষ্য ভগবান্, সহায় মুর্শীদ; এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন ইহার নিকট অর্থহীন। অতএব যাহা সাহিত্যের উৎস, তাহাই এখানে উপেক্ষিত হইয়াছে।

সুতরাং ইহার মধ্যে যথার্থ সাহিত্য-রস ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। তবে কোন কোন মারফতী গানে আধ্যাত্মিক ভাবটি প্রকট না হইয়া মানব-জীবনের কোন শাশ্বত সত্যের বাণী প্রচারিত হইয়াছে; কেবল সেই গানগুলিই লোক-সাহিত্যের মর্যাদালাভের অধিকারী। নিরক্ষর মুসলমান কবি রচিত এমন একটি মারফতী গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছে,—

মন আমার চিনির বলদ চিনি বয়, চিনে না চিনি,
ও! ভুলে কল্লি না একদিন চিনির সাথে চিনা চিনি।
কার কি কুমন্তনা পেলে,
ঘোল খেতে চাও মাখম ফেলে,
ওহে! বুঝবে মজা নোক্‌রি পেলে
তখন সার হবে শুধুই কাঁদুনী।
ওহে! সোনার কমল গেছ ভুলে,
মজে আছ শুক্‌নো ফুলে;
আবার সোজা পথে কাঁটা দিলে,
কি সাহসে বল শুনি
ওহে! জমির বলে অবোধ মন,
বাঁচ্‌বে যদি চিনি চিন,
কেন কড়ি দিয়ে জহর কিন,
আপন হাতে খাও আপনি।

শ্যামা-সঙ্গীতও সাধন-সঙ্গীত, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথাই ইহাতে বলা হইয়াছে; ইহাও ব্যক্তি-চৈতন্য সাপেক্ষ, সমাজ-চৈতন্য সাপেক্ষ নহে; সেইজন্য ইহাও ধর্মীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই; কিন্তু তথাপি কোন কোন সময় ইহাদের মধ্য দিয়া ধর্মনিরপেক্ষ এক একটি শাশ্বত মানবিক অনুভূতিও প্রকাশ পাইয়াছে; যেমন রামপ্রসাদের একটি সুপরিচিত গানে আছে,

মন, তুমি কৃষি-কাজ জান না,
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।

ইহার মধ্যে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক চৈতন্য-মুক্ত একটি সহজ মানবিক ভাব আছে—এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলি লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

এই বিষয়ে শ্যামা-সঙ্গীতের সঙ্গে উমা-সঙ্গীতের পার্থক্য আছে। উমা-সঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়া গানগুলি গার্হস্থ্য ধর্মবিষয়ক, ইহাদের প্রধান রস বাৎসল্য। অতএব ইহাদের একটি নিতান্ত সহজ ও প্রত্যক্ষ মানবিক আবেদন আছে—এই সূত্রেই উমা-সঙ্গীত লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাবের দিক দিয়া উল্লিখিত তত্ত্বসঙ্গীতগুলি লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না, তথাপি ইহাদের রূপ লোক-সঙ্গীতেরই রূপ, সুর লোক-সঙ্গীতেরই সুর; বিশেষতঃ এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যে মধ্যে যে সাধারণ মানবিক বিষয়ক সঙ্গীতও আছে, তাহাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য অনেক সময় উপলব্ধি করা কঠিন। এই সকল কারণে ইহাদিগকে কেহ কেহ লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সহজিয়া, বাউল, মুর্শীদ্যা, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম বাংলা দেশের জলবায়ুতেই জন্মলাভ করিয়া বাংলা ভাষা নিজেদের প্রচারের বাহন করিয়াছে; সুতরাং ইহাদের তত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীতগুলি বাংলা লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এ'কথা মনে রাখিতে হইবে যে, লোক-সাহিত্য আর যাহাই হউক, ইহা সাহিত্য। অলৌকিকতা ধর্ম-বোধের ভিত্তি, কিন্তু বাস্তব জীবনবোধ সাহিত্যের ভিত্তি; লোক-সাহিত্য বাস্তব জীবন চেতনা হইতেই উদ্ভূত, কিন্তু ধর্মবোধ বাস্তব-জীবন-বিমুখী। অদৃশ্য সাঁই (স্বামী, প্রভু বা ভগবান), অলৌকিক শক্তির অধধিকারী মুর্শীদ বা গুরু, বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতী প্রভৃতি ধর্মের লক্ষ্য। ইহাদের অলোক (mystic) নির্দেশ দ্বারা ইহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যের জীবন সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ভোগবাদী ধর্মমত যেমন সহজিয়া, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে জীবন-ভোগের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভোগের যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে প্রাকৃত জনের জীবন-ভোগের কোনও সাদৃশ্য নাই। তাহাদের জীবন-ভোগ একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুসরণ করিয়া থাকে। সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্যপালনের ভিতর দিয়া জীবন সেখানে একটি অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ দেহবাদী যখন দেহতত্ত্ব-বিষয়ক সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রচার করেন যে, 'তরবি যদি ভবনদী নারী সঙ্গ কর', তখন তাঁহাদের একটি সুদূর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য থাকে, তাহা ভবনদী উত্তীর্ণ হওয়া; এই উদ্দেশ্যে নারীর সঙ্গ ভোগ করা এই ধর্মাবলম্বীদের

একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় আচার। কিন্তু যে সকল সাধারণ মানুষের জীবন সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া থাকে, তাহাদের যেমন কোন আধ্যাত্মিক লক্ষ্য থাকে না, তেমনই জীবন-ভোগের একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী পূর্ব পরিকল্পিত হইয়াও থাকিতে পারে না। সুতরাং দেহবাদীর জীবন-ভোগ এবং সাধারণ মানুষের জীবন-ভোগ এক নহে। অতএব কেবল মাত্র বাস্তব জীবন-ভোগের কথা আছে বলিয়াই দেহতত্ত্বের গানও সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলার ধর্মসঙ্গীতগুলির লৌকিক আবেদন যত গভীরই হউক না কেন, লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহাদের প্রবেশাধিকার নাই।

ধর্মস্নানের গান

পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজায় ধর্মরূপী শিলাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করান একটি বিশিষ্ট আচার। সেই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা আচার-সঙ্গীতের অন্তর্গত। সেইজন্যই অনেক সময় ইহাদের ভাষায় প্রাচীনতা রক্ষা পাইয়াছে।

১

করন্তি ধর্মস্নান পণ্ডিতে বেদগান
দিলেন সভে হুলাহুলি।
সুগন্ধি গন্ধ চুয়া ফুল তৈল লইআ
ধর্মর অঙ্গর তুলিয়া মলি॥
পশ্চিম ঘাটে রূপাতে বিরাজিত
বিবিধ কুসুম ফুটে কুলে।
রকত উৎপল শোভিত পানিফল
উল্লাস পাখ করএ জলে॥ —বাঁকুড়া

ধর্মের গাজনের গান

চৈত্রী পুর্ণিমা হইতে আষাঢ়ী পুর্ণিমা পর্যন্ত যে কোন পুর্ণিমা তিথিতে পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলে যে ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক গাজন উৎসব হয়, তাহাতে গাজনে সন্ন্যাসিগণ নানা আচার-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে, তাহাই ধর্মের গাজনের

গান। গাজনের বিভিন্ন আচার পালনের সময় বিভিন্ন গান গাওয়া হয়। প্রত্যেকটি আচারের সঙ্গেই ঢাক বাদ্যের সঙ্গে সন্ন্যাসীদিগের নৃত্য ও সঙ্গীত প্রচলিত আছে। জলকে মন্ত্র দ্বারা পবিত্র করিবার অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হয়, তাহা 'জল পাবন' নামে পরিচিত। এই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১

সোনার কলসী নিল নেতের বসন।
জল আনিতে বসুয়া আপনি করিলা গমন ॥
তুরিতে গমন হৈল বিজয়া গমন।
বল্লুকার তটে গিয়া দিলা দরশন ॥
আগম নিগম জল তুলিল ছাঁকিয়া।
জল লইয়ে আইল তবে আপুনি বিজয়া ॥
আইস বইস সতের আপুনি মোর পাশে।
আগম নিগম কথা কহিব বিশেষে ॥ —বাঁকুড়া (শূন্যপুরাণ.)

ধান কাটার গান

ক্ষেতে পাকা ধান কাটিবার সময় কোন কোন অঞ্চলে কৃষকেরা এক সঙ্গে যে গান গাহিতে শুনা যায়, তাহাকে ধান কাটার গান বলা যায়। ইহা সাধারণতঃ কর্মসঙ্গীতের (work song) অন্তর্গত। ধান কাটা যে সর্বদা ইহাদের বিষয় তাহা নহে, লৌকিক প্রেমের বিষয়ও ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। তবে রাধাকৃষ্ণের নাম ইহাদের মধ্যে অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর গান বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। নিম্নে একটি উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু ইহার প্রামাণিকতা সংশয়াতীত নহে।

১

হারে ও আমার কাতিশাল,
বছর বছর থাকিস্ রে বহাল।
ভুঁই আমাদের মাতাপিতা,
ভুঁই হামাদের নাতি ছাওয়াল।

সাত পুরুষের জমিন হামার
তিন পুরুষের হাল।
কাঠ ফাটা রৌদ্দুরে পুড়্যা
বলদ জোড়া হল আধ মরা
আবার পানি কাদায় ভিজা সারা
হৈলাম আমি নাজেহাল,
তোর আশাতে ভাবি বস্যা
কতই না রাইত সকাল। —ঐ

ধান ভানার গান

ঢেঁকিতে ধান ভানিবার সময় যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই ধান ভানার গান। ইহাও কর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত। ইহা সারি জাতীয় গান (group song).

ধান ভানার গান বাংলার সারিগানের আর একটি প্রধান অংশ। ইহা সমবেত কণ্ঠেই গীত হয়, তবে ইহার ধুয়া অংশটিই সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে, অন্যান্য অংশ এক বা একাধিক গায়িকা কর্তৃক উচ্চারিত হইতে পারে। ইহার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা নৌকা বাইচের গানের মত কয়েকটি অঞ্চলেই মাত্র সীমাবদ্ধ নহে ; বরং কৃষিভিত্তিক ভারতের পল্লীসমাজের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। বাংলা দেশেও পল্লী অঞ্চলে যতদিন ধান কল প্রবেশ না করিয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত ইহার ব্যবহার ব্যাপক ছিল। কর্মের ঐক্য অনুসরণ করিয়া ইহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজেই বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ধান বাহানো ধান বাহানো ওরে নারদ-মুনি,
বিন্দ্যাবনে ধান বাহানে রাধে গোয়ালিনী।
এ ধান বাহানো রে, সোনার কামিনী,
এ ধান বাহানো রে ॥ ধুয়া

ঢেঁকিতে উঠিয়া বলে,—আমি সারে চারি হাতের কাঠ,
সোনার কামিনী ধান বাহানে, ঝাইড়্যা মারে লাথ।
এ ধান বাহানো রে, সোনার কামিনী,
এ ধান বাহানো রে। ধুয়া ॥
পুয়াতে উঠিয়া বলে, আমরা দোনো ভাই,
সোনার কামিনী ধান বাহানে আমরা গান গাই।
আগশালাইতে উঠিয়া বলে,—আমি থাকি মধ্যস্থলে,
সোনার কামিনী ধান বাহানে আমার বাহুর বলে।
এ ধান বাহানো রে। —রংপুর

২

ও নব ঢেঁকিয়ারে, সামালে কুট ধান।
ঢেঁকিটায় বলে রে, ভাই, আমি নারদেরই নাতি,
অষ্টাঙ্গ থাকিতে মোর ল্যাজে মারে লাথি।
ও নব ঢেঁকিয়ারে, সামালে কুট ধান ॥ (ধুয়া) ॥
আঁকশোলোয়াটা বলে রে, ভাই, আমি এক রিত্ত্যে কাঠ,
আমি না থাকিলে ঢেঁকি, চিৎ পট্টাং কাত।
ও নব ঢেঁকিয়ারে······
ঢুসলিটায় বলে রে, ভাই, আমার লোহায় বাঁধা মুখ,
আমার এঁটো খেয়ে যত চাঁদপারা মুখ,
ও নব ঢেঁকিয়ারে······
পায়া দু'টোয় বলে রে, ভাই, আমরা দু'টি ভাই,
নব ঢেঁকি ধান ভানে আমরা গীত গাই।
ও নব ঢেঁকিয়ারে······
আর ঝাঁটাটায় বলে রে, ভাই, আমার কোমরে বাঁধা দড়ি,
নব ঢেঁকি ধান ভানে ঝ্যাঁটায় জড় করি।
ও নব ঢেঁকিয়ারে······
কুলাটায় বলে রে, ভাই, আমি বাঁশেরই পাতুলি,
ও নব ঢেঁকি ধান ভানে লিকায় আর পাছুড়ি।
ও নব ঢেঁকিয়া রে, সামালে কুট ধান ॥ —মেদিনীপুর

বারা বাঁধরে, সুন্দর কামিনী, হওসের চুড়া দু'করে,
ঢেঁকিৎ উইঠ্যা বলে আঁই বনর হাতী।
সুন্দরী ও বারা বান্‌তে পিঠ চাই মারে লাথি,
আড়ালে উইঠ্যা বলে আঁই তুঁই মিশ,
সুন্দরীতে বারা বাস্তে আঁরা গাইয়ম গীত।
কিলায়ে উইঠ্যা বলে আঁই আছি দড়।
আঁই না থাকিলে তুঁই কি বইল্যা পড়।
ওঁচায়ে উইঠ্যা বলে আঁরার মুখর গেড় চড়।
ঘরে যাই কুটনা বুড়ী চইলর হিসাব লড়।
পয়লে উইঠ্যা পলে আঁয়ার বুকখানা গেল।
নিত্যি পত্যি বারা বান্ধি কলিজা কইল্য জোল।
পিছাই উইঠ্যা বলে আঁর গলা পেচা বাঁধ।
সঅল কাইতুন পুড়ি কোঁচাই পয়লে দিলাম ধান।
চালুনী উইঠ্যা বলে আঁয়ার চাক পেইচ্যা বাঁধ।
আড়াই পেঁচ ঘুরাইয়া আঁই ভাসাইয়া তুলি ধান।
কুলাই উইঠ্যা বলে আঁর পিঠে একটা কুঁজ।
বাম হাতে পাট্‌কাইয়া সুন্দরী উড়াইয়া দিছে তুস।
লাইয়ে উইঠ্যা বলে আঁই নিত্যি ঘুরাই ধান।
দুজনে দুকান চাই ধরি হেঁচকাই মারে টান॥ —চট্টগ্রাম

সারি গানের মধ্যে একমাত্র ধান ভানার গান স্ত্রীসমাজ কর্তৃক গীত হইয়া থাকে। এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া ঢেঁকির গান বিকাশ লাভ করিয়া আসিতেছে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে। 'ধান ভানতে শিবের গীত', 'ধান ভানতে মহীপালের গীত'—এই প্রবাদগুলিই তাহার প্রমাণ।

আজ সভ্য সমাজে মানুষের হাতের কাজ যন্ত্র কাড়িয়া লইতেছে, সেই সূত্রে আজ যন্ত্রের গর্জনের মধ্যে কর্মসঙ্গীত-গায়কের কণ্ঠ ডুবিয়া যাইতেছে। নদনদী মজিয়া যাইতেছে, নৌকার ব্যবহার অপ্রচলিত হইতেছে—যেখানে এখনও কিছু কিছু নদনদীর চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে, সেখানেও নৌকার পরিবর্তে

লঞ্চ ষ্টীমার বা বৈঠা চালিত নৌকার পরিবর্তে বাষ্প চালিত পোত দেখা দিয়াছে ; সেখানে মাঝির গানের অবকাশ নাই, কেবল যন্ত্রের গর্জন বেসুরা হইয়া তর্জন করিতেছে। যন্ত্রের সম্মুখে মানুষের কণ্ঠ আজ দিকে দিকেই নীরব হইয়া যাইতেছে। সেইজন্য কর্মসঙ্গীতের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে, সারি গানের ক্ষেত্র সেই সূত্রে আরও সঙ্কুচিত হইয়াছে।

ধামাইল গান

শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা জিলার এক শ্রেণীর মেয়েলী নৃত্যের নাম ধামাইল নাচ। এই নৃত্য উপলক্ষে হাতে তালি দিয়া ও পায়ে তাল রক্ষা করিয়া যে গান গাওয়া হয়, তাহাকে ধামাইল নাচের গান বা ধামাইল গান বলে।

১

গৌর বরণ রূপের কিরণ লাগল নয়নে।
(লাগল নয়নে, সজনি, লাগল নয়নে।)
আমার গৌর অপরূপ, কোটি মন্মথ স্বরূপ,
সজনী, কখনও চক্ষে দেখি দেখি না এ'রূপ ;
গোরা আড়-নয়নের চাউনি দিয়ে পরাণ ধরিয়া টানে।
য'দি গৌরকুল পাই, আমার এ কুলের কাজ নাই,
সজনি, কুল তিন কড়ার মুল, কুলে দিলাম ছাই।
আমি গৌরকুলে কুল মিশায়ে, সজনি মজে রব তার চরণে,
ভেবে জয় মঙ্গল কয়, আমার গৌর রসময়,
সজনি, রসে মাখা তনুখানি হয়,
গোরার রসে ডুবু ডুবু আঁখি,
একদিন চেয়েছিল আমার পানে। —মৈমনসিং

ধামালী (কৃষ্ণধামালী)

সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কথোপকথন মূলক গীতি রচনা ধামালী বা কৃষ্ণধামালী বলিয়া পরিচিত। ইহা অনেকটা কৃষ্ণযাত্রার রূপ, তবে কৃষ্ণযাত্রা অধিকতর মার্জিত এবং ধামালী অনেকটা গ্রাম্যভাবাপন্ন। কৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রবেশ করিবার পুর্বে ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র লৌকিক প্রসঙ্গই এই

উপায়ে গীত হইত, তখন ইহাদিগকে ধামালীই বলিত। কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়, যেমন, কৃষ্ণধামালী ও লৌকিক ধামালী। ইহারা অনেক সময় একান্ত স্থূল গ্রাম্য রুচির পরিচায়ক। অনেকের বিশ্বাস বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কৃষ্ণ ধামালীরই ধারা অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছে। তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' যেমন বহু সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহাদের অনুবাদ আছে, কৃষ্ণধামালীতে তাহা নাই, থাকিবার কথাও নহে। কৃষ্ণধামালার ভিত্তির উপরই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচিত হইয়াছে, এমন অনুমান করা ভুল হইবে না। বৈষ্ণব কবি লোচন দাস ধামালীকে অনেকখানি গ্রাম্যভাব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর রস সঞ্চার করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনিই ধামালীকে লোক-সঙ্গীতের স্তর হইতে সর্বপ্রথম উচ্চতর ভাবপ্রকাশের উপযোগী করিয়া শিল্পরূপ দিয়াছিলেন।

১

বসুদেব বলে,— অনেক পুণ্যের ফলে আসিছ মোর ঘরে।
আন দেখি তোর মহামায়া।
নন্দ বলে,— মোর ঘরে হইছে ছাওয়া নাম থুইছি মহামায়া
রূপে গুণে গুণে বিদ্যাধরী ॥
কৃষ্ণ বলে,— এক কন্যা দান করবে কোটি পুরুষ উদ্ধার হইবে
পুত্তর রূপে পাইবে শ্রীহরি। —রঙ্গপুর

ধামালীতে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া এই প্রকার সঙ্গীত সংলাপের সহায়তায় সমগ্র কৃষ্ণপ্রসঙ্গ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

ধুমরি নাচের গান

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বাংলাভাষী আদিবাসী এবং নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে এক শ্রেণীর মেয়েলী নৃত্যকে ধুম্‌রি নাচ বলে। ওড়িয়া ভাষায় ধাংড়ী শব্দের অর্থ যুবতী। ধুমরি শব্দটি তাহা হইতেও আসিতে পারে, তাহা হইলে ইহার অর্থ দাঁড়ায় বয়স্থা বা যুবতীর নৃত্য। সেই নৃত্য কালীন গানই ধুমরি নাচের গান।

১

কুইলাপালের হাট যাব হাঁড়ি কিনিব গো তোরই মতন।
ধসকিটে চলি গো দিদি তোরই মতন ॥ —বাঁশপাহাড়ী

কুইলাপালের হাট যাব
চুড়ি কিনিব গো, দিদি, তোরই মতন
দিদি, হাত নাড়িব গো তোরই মতন। —বাঁশপাহাড়ী

কার যদি থাকে দালান কোঠাবাড়ী
কপালের দোষে ওরে যদি যায় পুড়ি
ও যে হিয়ার মন্দিরে লুহার কড়ি
পাটা তাও তো ঘুণে লেইল্লারে।
যত লীলা কর, হরি, এ সংসারে,
হরি, সেও তো অসুখ যেজন
আসল জমিন চষি তবু শস্য নাশি
পাপ ধান্য চোরে নেয় কাটি।
আগেকার ধান্য সেও করে অমান্য।
নাগর কুঞ্জে কেন এল না
কত লীলা কর, হরি, এ সংসারে,
অদৃষ্টের দোষে জাতি পুত্র নাশে, অধিবাস কান্দে কারাগারে।
কত লীলা কর, হরি, এ সংসারে ॥

ধুয়া গান

ছড়া জাতীয় লঘু বিষয়ক এক শ্রেণীর গানকে মধ্য ও পূর্ববঙ্গে ধুয়া গান বলে। তাহাতে সাধারণতঃ সমসাময়িক সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থার দোষ কীর্তন করা হয়। বিষয়ের দিক হইতে কোন গুরুত্ব দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে ঢুয়া গান নামে বৈরাগ্যমুলক তত্ত্বসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদিও ঢুয়া গানই পূর্ব বাংলার উচ্চারণে ধুয়া গান হওয়া সম্ভব।

ভাইরে, ভাই এগারো ভাদরে, ধরলেন পালা জ্বরে।
আজি সাতখান কাঁথা দিয়ে, শুই গোহাল দুয়ারে॥
যেমন কলুর গাছে চাপায় ভারা, তেমনি চাপায় আমারে।
ধরিল কি কীর্তি জ্বরে, জ্বর বলে পাগলা কানাই॥
আজি রং দেখায় তোমারে।
ভাইরে ভাই, এগারো ভাদরে ধরলেন পালা জ্বরে॥

২

আমি ভেবে হত, বলব কত,
ছাগলে চাটে বাঘের গা, কলির এই শেষকালে।
লোকে ছেলে বিয়ে দিয়ে বেটার বৌ এনে ঘরে,
আমোদ আহ্লাদে কাটাবে কাল
মনে সেই খেয়াল করে।
কিছু দিন পরে বৌ গোঁসা করে রে
তার ঘরে বাঁধালো গোলমাল।
শাশুড়ী বলে, বৌমা—
তুমি কেন কাজ কর না কাম কর না,
মুখ ফোলায়ে বসে রও খাবার বেলায় খাও।
তোমার প্রেম জ্বরে ধরেছে মাথা ঠেকারে কও না কথা,
থাক তুমি আহ্লাদের জ্বালায়।
সোয়ামী বলে, প্রাণ!
প্রাণ, তুমি কথা বল না কেন?
কি গুণের স্বামী তুমি, কি কথা কইব আমি।
বলি এক খান গওনা দাওনা কেন?
আজকের মত থাক শুয়ে,
কালকে দেব গওনা কিনে বেচে গোলার ধান।
আমি ভেবে হত, বলব কত,
ছাগলে চাটে বাঘের গা, কলির এই শেষকালে॥ —মুর্শিদাবাদ

আল্লা যারে ব্যাটা কোলে ছায়
খুসী হয় তার বাপ মায় ;
খুসী হয়্যা আল্লার আগে কয়
আমি নালিস করি, ওগো, আল্লা, বেটা যেন আমায় বাঁচিয়ে রয়।
ইষ্টি কুটুম দরদবন্ধু আল্লা রাখো বরজায় ॥
তিনে সুখে ব্যাটার বিয়্যা ছ্যায়
পরের ম্যায়্যা আন্যা ছ্যায়
সেই ঘরেতে রসের ময়না রয়।
চেক্‌না স্বরে কয়না কথা, চোক্ ঢুলিয়ে আর কাঁদিয়ে কয়—
এত জ্বালা কার শরীরে সয়।
বুড়্যা বুড়ীর ক্যানক্যানির জ্বালায়
শরীর কালা হয়ে যায় ॥
কইয়ে পতির চরণ ধরি, তুমি আমার গলায় দেও ছুরি,
নইলে দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মরি।
এই কথাটী শুনে বড়, উঠলো বড় রাগ করে বুড়্যাবুড়ীর কিসের ঘরবাড়ী,
তুমি ন্যাও বুঝ্যা হাঁড়ি ॥
চাইলে দিস্‌না খড় আলোপাতা।
তোর বাপমার কি এমনি কথা
চাইলে পাইনা খড় আলোপাতা ;
মুক্ নাড়ে পাঙাশের মত, পান চাবায় আর ক্যানক্যানায়—
এত জ্বালা কার শরীরে সয়। —পাবনা (১৩৩১

নিম্নোদ্ধৃত ধুয়াগানটির সঙ্গে পশ্চিম বাংলার ঢুয়া গানের (ঢুয়া গান) অনেকখানি ভাগবত ঐক্য আছে।

অধম ছোরমান আলি কয়, আন্‌কা ধুয়ো বেঁধে গাওয়া আমার সাধ্য নয়,
চার চিজে হয় দেহ পয়দা, কোন চিজ তখন কোথায় রয় ?
আগেতে হয় চক্ষু পয়দা, পিছেতে নাক পয়দা হয়,
আতশে মগজ পয়দা, খাকীতে দেহ পয়দা হয় ॥

যেদিন শমন আসবে ভবে, সঙ্গের সাথী কেউ হবে না পুত্র পরিবার।
কাল শমনে ধরিয়া নিবে একলা গোরের মাঝার ;
অধম ছোরমান আলি বাঁধছে ধুয়ো, পয়ার মেলা বিষম ভার।
দিনের দিন গত হল, সকলে হওরে হুঁসিয়ার ॥
ও দলের "ধরতা" কয় জনা, লাল, খলিল, কিছু কদম ওরাই তিন জনা।
লাল খলিলের সঙ্গে মেরা পাল্লা দেওয়া হল না ;
সে কথা বলে পাজীর মতন, এক কথাও তার ঠিক মেলে না।
অনুমানে বুঝতে পারলাম নিতান্ত শয়তানের পোনা ॥ —পাবনা (১৩৩১)

ধুয়া পদ

সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা-গীতিকা যে সকল পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটির সূচনায় এক বা একাধিক পদ দোহার (repeater) কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গীত হয়, তাহাকে ধুয়া পদ বলে। ধ্রুবপদ শব্দ হইতেই ধুয়া পদ শব্দটি আসিয়াছে। ইহারা কাহিনীর প্রসঙ্গ বহির্ভূত হইতে পারে, কিংবা অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। সাধারণ ধুয়া একটি মাত্র পদেই রচিত হয়, তবে দীর্ঘতর ধুয়াও দেখা যায়। ইহা দ্বারা গানের একঘেয়েমি দোষ দূর হয়।

১

অকান্দনে কান্দন কান্দেন মনসা,
প্রভু, মোরে না যাও ছাড়িয়া।
আঁচলের নিধি, আহা রে, দারুণ বিধি,
এখন আমি মরিব কান্দিয়া ॥ —বরিশাল

২

গা তোল, ও গো, অভাগিনী কমলা।
কেন, প্রিয়ে, হেন বুদ্ধি করিলা ॥ —ঐ

৩

কান্দে ধোনা মোনা দোঁহে বিষাদ ভাবিয়া।
ঘরেতে রহিব, গুরু, কার মুখ চাহিয়া ॥ —ঐ

৪

শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সাড়া।
নাচে ধাই দিয়া বাহু লাড়া ॥ —ঐ

৫

চান্দর করুণার সীমা নাই।
বাকল খাইল চোরা গাই ॥ — ঐ

ধোপার গান

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চল হইতে এক শ্রেণীর গান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কাপড় কাচিবার গান বা ধোপার গান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে ইহারা কর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত। কিন্তু এই শ্রেণীর গান বাংলার অন্যত্র সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সংগৃহীত গানটিতে বাংলা ভাষার মধ্যে হিন্দী শব্দও প্রবেশ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

১

কোন নগরে কেরা ধোবাকা বেটিয়া।
কোন নগরে মুগা ধোয়াকো, সজনি ॥
টামার নগরে কেবা ধোবাকো বেটিয়া
বুণ্ডু নগরে মুগা ধোয়েগো, সজনি ॥
ছাড় ছাড় রাজার ব্যাটা ইয়ো প্রাণী ঘাট হো।
ক্ষারে ভিজত গোটা গাত যে ॥ —পচাপানি (ঝাড়গ্রাম)

ধোপার পাট পালাগান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় 'ধোপার পাট' নামে একটি পালাগান সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। এক চপলমতি তরুণ রাজকুমার এবং এক রজক-কন্যার প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'ধোপার পাট' নামক গীতিকাটি রচিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহার কাহিনীর উপর চণ্ডীদাস এবং রামীর কাহিনীর প্রভাব অনুভব করা যাইতে পারে; কিন্তু একটু গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে রাজকুমারের চরিত্রটি এমন এক স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত বলিয়া মনে হয় যে, ইহার স্বাধীন উদ্ভবের সম্ভাবনাও অবিশ্বাস্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। লৌকিক প্রেমই যে বৈষ্ণব প্রেমের ভিত্তি, তাহা এই গীতিকার কয়েকটি পদ হইতে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়।

ন

নছর মালুমের পালাগান

'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্তর্গত একটি পালাগানের নাম নছর মালুমের পালা। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—হায়দরের কন্যা আমিনা খাতুন এবং হায়দরের ভাগিনেয় নছরের কাহিনী লইয়া এই পালাগান রচিত হইয়াছে। আমিনাকে বিবাহ করিয়া নছর নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গেল, তারপর এছাক মিঞা তাহার জীবনের সঙ্গে জড়িত হইতে চাহিল। কিন্তু আমিনা তাহাতে সম্মত না হইয়া গৃহ হইতে পলাইয়া গেল, গফুর নাম এক বৃদ্ধের পালিত কন্যারূপে আশ্রয় লাভ করিল। অনুতপ্ত নছর ফিরিয়া আসিয়া আমিনাকে তাহার পিত্রালয়ে দেখিতে পাইল না। ফকির সাজিয়া নছর সেইখানেই পড়িয়া রহিল। এদিকে এছাক আমিনাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। কিন্তু আমিনা তাহাকে আত্মদান করিল না। সে তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। নিজের বহুদিনের পরিত্যক্ত পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেখানে আর কেহই ছিল না। এছাক সেইখান পর্যন্ত আমিনাকে অনুসরণ করিল। যখন সে আমিনার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল, সেই মুহূর্তে সেখানে নছরের আবির্ভাব হইল। নছর এক আঘাতে এছাককে ধরাশায়ী করিল। নছর এবং আমিনার মিলন হইল।

এই পালাগানের একটু অংশ এই প্রকার—

১

আমিনা খাতুন কইন্যা বাপের এক ঝি।
ছয় বছর খসম ছাড়া উপায় হৈব কি ॥
হায়দর বাপের নাম মাঝির গাঁও বাড়ী।
অতি কষ্টে দিন কাটে ঘরজার কাম করি ॥
জাগাজমি নাইরে তার নাইরে হাল চাষ।
দিনের রুজি দিনে খায় কতদিন উয়াস ॥
কৈন্যারে দিছিলা বিয়া ভালা ঘর চাই।
ছয় বছর গত হৈল কন পুশ্চিশ নাই ॥

কন পুন্তিশ নাইরে তার গেল ছুয় বছর।
ভৈনর পুত ভাগিনা দুলা নাম যে নছর॥
ভৈনর পুত ভাগিনা নছর তার কথা শুন।
আমিনার কপালে সেই লাগাইছে আগুন॥ —চট্টগ্রাম

নন্দপুরের ধুয়া

নিম্নোদ্ধৃত ব্যক্তিগত ঘটনামূলক সঙ্গীতটি নন্দপুরের ধুয়া নামে পরিচিত। নন্দপুর স্থানটি টাঙ্গাইল গোপালপুরের সন্নিকট। ইহাতে জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী ও তাহার মোক্তার রাজচন্দ্র সরকারের একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—

১

হুন বই এ্যাক নতুন ডুইয়া কই হবাকারে—এ-এ।
মাঘ মাসে, অবিবারে, হুক্-দশানী[১] মিলন অইয়ে,
তারা এ্যাক মন্ত্রণা করে। এয়-এহে—এ॥
সুবনখুলির হ্যামবাবু সে পরগণার জমিদার,
আজচন্দ্র হরকার তার মুক্তার,
নন্দনপুরের হটো আইসা তালাই[২] কিন্‌লো,
দশ টাহার, আয়—আহা-আর্।
সে আটের ইজাদ্দারে দেহিয়া তালাই—আই—
আমি দুইটী টাহা খাজনা চাই,—
চন্দমনায় হুইনা বলে, এ-এ—
খাজনাত দিমু নারে, বাই—আই-আহা-আই।
আমি কৈলাস কথা বুঝ মাথা, হ্যামবাবুর তালাই—আই—
চল নায়েব মশর কাছে যাই,
ইজাদ্দারে হুইন্যা বলে, চল আর দেরী মাত্র নাই—আই॥
হে কাচারীর নায়েব-অ মশয়,
তিন জোনের কাছে কয়,
কুঠাইকার[৩] হিমচন্দ্র বাবু, কে চিনে, দেও না পুরিচয়—অয়-অয়—

১। সিকি ও দশানী ২। খেলুপা বা দরমা ৩। কোথাকার

হুইনা কথা চন্দ্রমশয়, আ গ, কল্লেন ভারি—ই-ই—
অম্‌নি চইলা গেলেন আজবারী।
এমুন আজার মান মাইরা যায়, কে করে এমুন চাহুরী-ইয়-ইহী-ইঃ।
হুবনখুলির বড়বাবু হে পর্‌গণের জুমিদার,
হুইনা আটের হোমাচার[৪]—
দশ আনীর সাৎ মিলন অইয়ে, কর্‌ছে আট বাঙ্গার যোগাড়।
হে কাচারীর আজা বাহাদুর, তার আটটী ছিল সুন্দনপুর।
আটের স্থলে উপজদলে[৫] মাটি কিন্‌লে রুপিন্দ্রবাবুর,
আনিরুল্লা বান্দছে দুইয়া চক্ষে ছ্যাহে না—আয়-আহা-আ—
আমি আন্দাজী কই রচনা—
কিবা অইছে দুইয়ার মিল বাই, আমার ত ভাল বেহে[৬] না॥

--টাঙ্গাইল (মৈমনসিং)

পুর্ব বাংলার সারি গানে অনেক সময় ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর সঙ্গীত নানা কারণেই সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।

নাচনী নাচের গান

প্রধানতঃ পুরুলিয়া জিলায় এক শ্রেণীর নৃত্যগীতকারিণীকে নাচনী বলে। ইহারা খেমটি হইতে স্বতন্ত্র (নাচ্‌নীদিগের বিস্তৃত আলোচনার জন্য খেম্‌টি, পৃ. ৩০৩-৩০৫ দেখ)। খেম্‌টি অর্থের বিনিময়ে যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক নাচ এবং গানের জন্য যে কোন উপলক্ষে নিয়োজিত হইতে পারে। ইহারা সাধারণের মধ্যে নৃত্যগীতের ব্যবসায় করিয়া থাকে। কিন্তু নাচনীরা ব্যক্তিবিশেষের পারিবারিক প্রয়োজনে কেবল মাত্র তাহাদিগের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই নৃত্যগীত করিয়া থাকে। 'খেম্‌টি'র পরিচয় দিবার উপলক্ষে তাহাদের কথা বিস্তৃত আলোচিত হইয়াছে। এখানে তাহাদের একটি মাত্র গান উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

৪। সংবাদ ৫। ঠিক বুঝা যায় না, উপস্থিত হইয়া কি উপহাস বলে? সম্ভবতঃ শেষেরটি
৬। ঠেকেনা, লাগে না।

১

ফুলটি যখন কলি ছিল কত ভ্রমর আইল গেল,
ফুলবন আইল ভ্রমর, ফুলে বসে নাই,
ফোটা ফুলটি ছেড়ে ভ্রমর কলি ফুলে মজিল।
বন্ধু, আর কি সেদিন আছে, ধাতকি ফুলের মধু,
তাপে শুকিয়ে গেছে।
বঁধু, আর কি সেদিন আছে হে,
আর কি সেদিন আছে ॥

রঙ্—

প্রেম কি গাছে ফলে গো সখি,
প্রেম ফলিছে মানুষেরই কাছে গো,
প্রেম কি গাছে ফলে গো সখি।

তুমি আমার ফুলাম তেল, তুমি আমার মনভোলা,
তুমি আমার আয়না চিরুণী গো,
ওগো সখি, তুমি আমার আয়না চিরুণী ॥

—পচাপানি (মেদিনীপুর)

নাটগীত

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যাত্রা বলিতে দেবোৎসব মাত্রই বুঝাইত। এই উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গীত অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া সাধারণভাবে ইহাকে নাটগীতও বলিত। কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে শিবদুর্গার বিবাহের উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে—

নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতুহলে।
কেহো বেদ পড়ে কেহ পড়এ মঙ্গলে ॥
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে ॥

(সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ. ৫)

জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকর্তন' এই নাটগীত শ্রেণীর রচনা। সে কথা পরে বলিব। যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের

অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কেবলমাত্র নাটগীত বা গীতাভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না, তথাপি শব্দটি এই অর্থে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, তখন গীতাভিনয়ের মধ্যে নূতনত্ব লক্ষ্য করিয়া ইহাকে 'নূতন যাত্রা' বলিয়া সর্বত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। 'নূতন যাত্রা' কথাটি হইতেই পুরাতন যাত্রা কথাটি স্বভাবতই আসিয়া পড়ে; অতএব মনে হয়, মধ্যযুগে নাটগীত যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া, তাহাকেও সাধারণভাবে যাত্রাই বলা হইত। কিন্তু তথাপি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন প্রকার অভিনয় অর্থেই যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না—উৎসব অর্থেই যাত্রা শব্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত' নামক গ্রন্থে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে চৈতন্যদেব তাঁহার পার্ষদদিগকে লইয়া যে অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহাও যাত্রা বলিয়া উল্লেখিত হয় নাই, বরং তাহাকে 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক-বিধানকেই মনে করা হইয়াছে। তথাপি ইহা ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী অভিনয় ছিল না, এই সম্পর্কিত লৌকিক ধারাকেই যে ইহা অনুসরণ করিয়াছে, তাহা ইহার বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, যাত্রা বা দেবোৎসবের মধ্যে ক্রমে গীত ও অভিনয় ব্যাপার প্রাধান্য লাভ করিবার ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল হইতেই যাত্রা শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র গীতাভিনয়কেই বুঝাইতে থাকে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনয়োপযোগী উপাদানের কোন অভাব ছিল না। জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'কে কেহ কেহ প্রাচীন বাংলার যাত্রার অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'গীত-গোবিন্দ' সর্গবদ্ধ কাব্য হইলেও ইহাতে যে রাগ ও তালের লিখিত নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, নৃত্য ও গীতের জন্যই ইহা ব্যবহৃত হইত এবং 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' কবি জয়দেবও এই উদ্দেশ্যেই ইহা রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন যাত্রা বা নাটগীত কি প্রকার ছিল, তাহা সুস্পষ্টভাবে জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাহা যে প্রকারেরই হউক, তাহাতে যে উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রার বীজ নিহিত ছিল, তাহা

অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; কারণ, যাত্রার মধ্যে নৃত্য এবং গীতের ধারাটি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

'গীতগোবিন্দের'র পরই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও যে বাহ্যতঃ 'গীতগোবিন্দে'রই আদর্শে রচিত, তাহা ইহার মধ্যে 'গীত-গোবিন্দে'র বহু শ্লোকেরই বঙ্গানুবাদ হইতে প্রমাণিত হইবে। ইহার মধ্যে তিনটি চরিত্র প্রধান—শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও বড়াই ; ইহাদের গীতি-সংলাপ নাটকীয় ভঙ্গিতেই রচিত। পাত্রপাত্রীর বেশ ধারণ করিয়া ইহা উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনীত না হইলেও কোন প্রকার নাটকীয় ভঙ্গিতেই যে ইহাকে রূপদান করা হইত, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ, ইহার মধ্যেই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ উক্তি-প্রত্যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রার লক্ষণ ইহার মধ্যে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ব্যবহৃত এই রীতিটি তৎকালীন একটি ব্যাপক প্রচলিত রীতিরই প্রতিনিধি মাত্র ; কারণ, পরবর্তী যুগের বাংলা লোক-সঙ্গীতের ধারায় অনুরূপ রীতির বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহা কৃষ্ণধামালী নামে পরিচিত। এই সকল সঙ্গীত সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহা স্বভাবতঃই সাধারণের রুচি ও নীতিবোধের অনুগামী করিয়া রচিত হইত এবং ইহাদিগকে রূপদান করিবার জন্যও সাধারণের সহজবোধ্য প্রণালী অবলম্বন করিবার আবশ্যক হইত। অতএব মনে হয়, পাত্রপাত্রীর বেশ ধারণ না করিলেও অন্ততঃ অঙ্গভঙ্গি সহকারে ইহার উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা হইত। ইহার মধ্যেও 'নূতন যাত্রা'র পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বাংলা দেশে যে সকল মঙ্গল ও পাঁচালী গান প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যেও নাটকীয় উপাদানের অভাব ছিল না। প্রাচীন মঙ্গল ও পাঁচালী গান যে কি প্রণালীতে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত, তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ কোথা হইতেও সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। তথাপি মনে হয়, প্রাচীন পাঁচালী কিংবা মঙ্গল গান একজন মূল গায়েন কর্তৃকই গীত হইত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মত তাহাতে পাত্রপাত্রীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়া কাহিনী অগ্রসর হইত না। এখনও বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে শ্রীরাম-পাঁচালী বা রামায়ণ গাহিবার

যে প্রণালী অবলম্বন কয়া হইয়া থাকে, তাহাই প্রাচীন পাঁচালী বা মঙ্গল গান গাহিবার প্রণালীর অনেকটা অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহা হইতে মনে হইবে যে, প্রাচীন পাঁচালী ও মঙ্গল গান অপেক্ষা উল্লেখিত দুইখানি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্যেই নাটকীয় রূপ অধিকতর প্রত্যক্ষ। সেইজন্য কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, একমাত্র কৃষ্ণ-সম্পর্কিত বিষয়বস্তু লইয়াই প্রাচীন যাত্রা রচিত হইত। কিন্তু এ'কথা সত্য নহে। কারণ, চৈতন্য-পূর্ববর্তী কাল হইতেই এ'দেশের উপর বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বশতঃ কৃষ্ণসম্পর্কিত বিষয়বস্তু জনসাধারণের স্বভাববতঃই অধিকতর প্রীতিকর হইত বলিয়া এই বিষয়ের উপরই গীতি-রচয়িতাদিগের মনোযোগ অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শাক্তধর্ম সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াও যে অনুরূপ রচনা সেইযুগে প্রচলিত ছিল, তাহাও অনুমান করিতে পারা যায়। বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে যে ভাসান-যাত্রা নামক এক শ্রেণীর যাত্রার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল, তাহা এই বিষয়ক পূর্ববর্তী কোন ধারা অনুসরণ করিয়াই রচিত হইত বলিয়া মনে হয়। এই প্রকার রামযাত্রা এবং চণ্ডীযাত্রাও মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ; কিন্তু একথা সত্য যে, এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই, কারণ, অন্ততঃ 'গীতগোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মতও এই সকল বিষয়ের লিখিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং উনবিংশ শতাব্দীতে রামায়ণের দল ভাঙ্গিয়া রামযাত্রা, কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের দল ভাঙ্গিয়া চণ্ডীযাত্রার যে সকল দল সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়, তাহা হইতে ইহাদের পূর্ববর্তী অবস্থা কিছুই অনুমান করা যাইতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের গাজন ও পূর্ববঙ্গের কুমারী মেয়েদিগের মাঘমণ্ডল ব্রতের কতকগুলি আচারের ভিতর দিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর জাতীয় যে সকল ছড়া অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে নাটগীতের কোনও যোগ আছে বলিয়া মনে করা সমীচীন হয় না। অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবজ। সেইজন্য কোন বিষয় বুঝাইয়া বলিতে হইলে তাহারা সহজেই অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করিয়া থাকে। এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর সেই প্রবৃত্তি হইতে জাত।

উনবিংশ শতাব্দীর নব সংস্কৃত পাঁচালী গানের রূপ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহা

ভুল। প্রাচীন পাঁচালীর যে কি প্রকৃতি ছিল, অর্থাৎ মধ্যযুগে মনসার পাঁচালী, শ্রীরাম-পাঁচালী বা ভারত-পাঁচালী সমূহ যে কি প্রণালীতে গাওয়া হইত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর যে পাঁচালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রাচীন পাঁচালীর কোন যোগ ছিল না। বরং কালক্রমে তাহার উপর 'নূতন যাত্রা'র প্রভাব সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আখ্যানমূলক রচনা মাত্রকেই মধ্যযুগে পাঁচালী বলিত; সুদীর্ঘ রচনা মঙ্গল গান, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদও যেমন পাঁচালী, অনতিদীর্ঘ লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য-বিষয়ক আখ্যায়িকা যেমন, শনির পাঁচালী, সত্যপীরের পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী প্রভৃতিও পাঁচালী। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে নূতন পাঁচালীর কোনই সাদৃশ্য নাই। উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী সমসাময়িক হাফ-আখড়াই, দাঁড়া কবি এমন কি নূতন যাত্রার আদর্শেও পুনর্গঠিত হইয়াছিল—ইহাতে পূর্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানের লড়াই হইত, এমন কি, অনেক সময় পাত্রপাত্রীর সাজও গ্রহণ করা হইত। বলা বাহুল্য, ইহা সমসাময়িক অন্যান্য লৌকিক সঙ্গীতানুষ্ঠানেরই প্রভাবের ফল।

অতএব ইহা হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে, এমন অনুমান করা সমীচীন হইবে না। হাফ-আখড়াই, দাঁড়া কবি, কবি ও নূতন যাত্রা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে পাঁচালী এক নূতন পাঁচমিশালী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। চামর-মন্দিরার সাহায্যে দোহারের সহযোগিতায় একজন মাত্র গায়েন আসরে দাঁড়াইয়া সামান্য অঙ্গভঙ্গি দ্বারা এখনও যে রামায়ণ কিংবা মঙ্গলগান কোন কোন স্থানে গাহিতে শোনা যায়, তাহাই দীর্ঘতর পাঁচালীগুলির প্রাচীনতম প্রকাশ-ভঙ্গি ছিল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ইহাদের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীর কোন যোগ নাই। নূতন পাঁচালীতে দুই দলে 'সঙ্গীত-সংগ্রাম' হইত, প্রাচীন পাঁচালীতে তাহা হইত না; এক দলই আনুপূর্বিক বিষয়-বস্তু পালায় পালায় বিভক্ত করিয়া দিনের পর দিন গাহিয়া যাইত। প্রাচীন পাঁচালী বর্ণনাত্মক—লাচাড়ী ও পয়ার ব্যতীত ইহাতে আর কোন রাগ-রাগিণী ছিল না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী প্রধানতঃ ভাবাত্মক; সেইজন্য রাগ-রাগিণীর নানা বৈচিত্র্যও ইহাতে দেখা দিয়াছিল। অতএব নূতন পাঁচালীর প্রকৃতি দেখিয়া বাংলার প্রাচীন নাটগীত কিংবা নূতন যাত্রার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অনুমান করা যায় না।

তথাপি একথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পায়া যায় না যে, যাত্রার মত এক শ্রেণীর লৌকিক নাটক (Folk drama) অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগ ইহাকেই নাটগীত বলিত। এমন কি, ইহা স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একটি প্রচলিত লোক-নাট্যের ধারাকেই সংস্কার করিয়া ইহার একটি আদর্শ রূপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাচীনতর কাল হইতে প্রচলিত সেই লোক-নাট্যের ধারাটি লুপ্ত হইয়া যায় নাই—তাহা কখনও লুপ্ত হইয়া যাইতে পারেও না। ভরত-নির্দিষ্ট নাট্যশাস্ত্রের আদর্শ সমাজের উচ্চতর স্তরের নাট্যরচনায় নিয়োজিত হইলেও, সমাজের নিম্নতর স্তরে সেই লোক-নাট্য রচনার ধারাটি বহুদূর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এই সম্পর্কে একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, সমগ্র ভারতব্যাপী সেই লোক-নাট্যের ধারাটি অভিন্ন ছিল না ; কারণ, এই বিস্তৃত দেশের বিভিন্ন সমাজ-সংহতির ভিতর হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক-নাট্যের উদ্ভব হইয়াছিল। যাত্রার অনুরূপ একটি ধারা হয়ত পূর্বভারতীয় অঞ্চলে নানা কারণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাই কালক্রমে জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ এবং বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র ন্যায় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাহার কতকটা পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাত্রা শব্দটি দেবোৎসব ব্যতীত অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হইত না ; সেইজন্য অভিনয় অর্থে যাত্রার উল্লেখ মধ্যযুগের সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। দেবমাহাত্ম্য কীর্তন সম্পর্কে ‘জাগরণ’ কথাটির উল্লেখ আছে ; যেমন, ‘পুজিয়া ত ভগবতী করিল জাগরণে’ (‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’), ‘মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে’ (‘চৈতন্যভাগত’) ; কিন্তু জাগরণ-গানের যে ধারা আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যাত্রা হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল।

একদিকে ‘গীতগোবিন্দ’, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ ও অপর দিকে উনবিংশ শতাব্দীর নব সংস্কৃত যাত্রা—বাংলা লোক-নাট্যের এই দুই প্রান্তবর্তী দুইটি নিদর্শনের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। ‘নূতন যাত্রা’র ভিতর হইতে প্রাচীন ধারাটিকে উদ্ধার করিয়া বহুলাংশে ইহাকে যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ইহার নব সংস্কৃত রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণকমল গোস্বামী। অতএব একদিকে যেমন ‘গীতগোবিন্দ’, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র

মধ্যে নাটগীত বা প্রাচীন যাত্রার প্রত্যক্ষ নিদর্শন কিছু কিছু বর্তমান আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, তেমনই অন্য দিকে উনবিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নব সংস্কৃত কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেও তাহার অন্যান্য কোন কোন উপাদানের অস্তিত্ব অনুভব করা যাইতে পারে।

নাথ-গীতিকা

মধ্যযুগের বাংলার নাথ যোগীসম্প্রদায় কয়েকজন নাথগুরু বা সিদ্ধাচার্যের জীবনের অলৌকিক মাহাত্ম্য ও আত্মত্যাগের বিষয় বর্ণনা করিয়া কয়েকখানি গীতিকা বা ballad রচনা করিয়াছিল, তাহাই নাথ-গীতিকা নামে পরিচিত।

নাথ-গীতিকার দুইটি ভাগ—একটি গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী, অপরটি গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী। গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী 'গোর্খবিজয়', 'গোরক্ষ-বিজয়' ও 'মীন-চেতন' নামে প্রকাশিত হইয়াছে, 'গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী', 'মানিকচন্দ্র রাজার গান', 'ময়নামতীর গান', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হইয়াছে। গোর্খনাথ-মীননাথের কাহিনী এখানে সর্বপ্রথম আলোচনা করা যাইবে।

একদিন পার্বতী শিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার শিষ্যগণ বিবাহ করে না কেন? তুমি আদেশ কর, তাহারা বিবাহ করিয়া সংসারী হউক।' শিব বলিলেন, 'তাহারা সকলেই কাম-ক্রোধ-লোভমুক্ত। তাহারা বিবাহ করিবে না।' পার্বতী বলিলেন, 'কাম-ভাব কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না, আমি তাহাদিগকে কটাক্ষে ভুলাইতে পারি। তুমি আদেশ কর, আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি।' শিব সম্মত হইলেন, তিনি পাঁচ জন সিদ্ধাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিবার আসন দিলেন। পরমা সুন্দরী নারীরূপ ধারণ করিয়া পার্বতী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া অন্ন পরিবেষণ করিলেন। অন্ন পরিবেষণ-কালে পরিপূর্ণ জল-পাত্রের উপর তাঁহার দেহের ছায়া পড়িল, দেখিয়া সিদ্ধাগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মীননাথ মনে মনে বলিলেন, 'এমন নারী যদি জীবনে লাভ করিতে পারিতাম, তবে তাহাকে লইয়া কেলি-কৌতুকে সমস্ত জীবন যাপন করিতাম।' পার্বতী তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর দিলেন, 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক, কদলীপত্তনে গিয়া তুমি ষোল শত নারীর সমভিব্যাহারে জীবন যাপন কর।' হাড়িসিদ্ধা জলমধ্যে

পার্বতীর ছায়া দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'এমন সুন্দরী নারী যদি আমি পাই, তবে হাড়িকর্ম (উঠানে ঝাঁট দেওয়া) করিয়াও তাহার পাশে পড়িয়া থাকি।' দেবী তাঁহারও অভিলাষ পূর্ণ হইবার বর দিয়া বলিলেন, 'হাতে ঝাড়ু ও কাঁধে কোদাল লইয়া হাড়ির রূপ ধারণ করিয়া তুমি ময়নামতীর গৃহে চলিয়া যাও।' সিদ্ধা কানফা যখন জলপাত্রে দেবীর ছায়ারূপ দেখিতে পাইলেন, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'এমন সুন্দরী নারী যদি আমার গৃহে থাকিত, তবে তাহার সঙ্গে কেলি করিয়া আমি মৃত্যুতেও সুখ পাইতাম।' পার্বতী তাঁহারও অভিলাষ পূর্ণ হইবে বলিয়া বর দিলেন এবং বলিলেন, 'দ্রুত তুমি ডাহুকা চলিয়া যাও, সেখানে গিয়া বহরির গৃহে তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর।' গাভুর সিদ্ধা যখন দেবীর রূপ দেখিতে পাইলেন, তখন মনে মনে বলিলেন, 'এমন সুন্দরী নারী যদি আমার গৃহে থাকিত, তাহার জন্য আমার হাত-পা কাটা গেলেও আমি কিছু মনে করিতাম না।' দেবী তাঁহাকেও 'তথাস্তু' বলিয়া বর দিলেন এবং তাঁহার সৎমার নিকট তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন—সৎমা তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিবেন, তাহার ফলেই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। গোর্খনাথ যখন জলপাত্রের মধ্যে দেবীর ছায়ারূপ দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন,

> তবে ভাবি গোর্খে মনে করি সার।
> এরূপ জননী যদি থাকএ আহ্মার ॥
> তাহান কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই।
> এমন জননী আহ্মি কভো নাহি পাই ॥

একমাত্র গোর্খনাথই দেবীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ; অন্যান্য শিষ্যগণ যে যাঁহার বর বা অভিশাপ ভোগ করিবার জন্য নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। গোর্খনাথের উপর পার্বতীর এই ছলনা নিষ্ফল হইল দেখিয়া তিনি তাঁহার অন্য পরীক্ষা লইবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন, তাঁহার কাছে কিছুতেই নিজের পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিলেন না। অচিরেই গোর্খনাথের সম্মুখে তিনি পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নূতন নূতন উপায়ে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু গোর্খনাথ তাঁহার চরিত্র-বলে সকল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন, বার বারই পার্বতী অপমানিত হইলেন। পত্নীর অপমানে শিব মর্মাহত হইয়া নিজেই গোর্খনাথকে এইবার এক কঠোর পরীক্ষায় ফেলিলেন—

বিরহিণী নামক এক রাজকন্যা শিবের নিকট অমর স্বামীর বর প্রার্থনা করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, শিব তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গোর্খনাথকে স্বামিরূপে লাভ করিবার বর দিলেন। গোর্খনাথ ছয় মাসের শিশুতে পরিবর্তিত হইয়া কন্যাকে মাতৃসম্বোধন করিলেন। শিবের পরীক্ষাতেও গোর্খনাথ উত্তীর্ণ হইয়া নিজের চরিত্র-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। একদিন গোর্খনাথ এক বকুল বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সিদ্ধা কানফা শূন্যপথে উড়িয়া যাইতেছেন। গোর্খের আদেশে তাঁহাকে নামিয়া আসিতে হইল। তাঁহার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার গুরু মীননাথ কদলী রাজ্যে গিয়া ষোলশত নারীর সঙ্গে ব্যভিচার-জীবন যাপন করিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন, আর তিনদিন মাত্র তাহার আয়ু অবশিষ্ট আছে। শুনিয়া গোর্খনাথ তাহাকে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন। বহু কৌশলে তিনি কদলী রাজ্যে মোহগ্রস্ত গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, উপদেশ দ্বারা গুরুর মোহ অপনোদন করিলেন, তাহার চৈতন্যোদয় হইল। মীননাথ পুনরায় যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গানের সংক্ষিপ্তসার পূর্বে বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে (গোপীচন্দ্রের গান, পৃ. ৪০১-৪০৯ দেখ)।

নাথধর্মের গান

নাথধর্মের বিভিন্ন তত্ত্বকথা অবলম্বন করিয়া যে গান রচিত হইয়াছে, তাহাই নাথধর্মের গান। অনেক ক্ষেত্রে নাথধর্মের গান দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কারণ, দেহতত্ত্ব যেমন যোগ-সাধনা হইতে উদ্ভূত, নাথধর্মও তেমনই যোগ-সাধনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। নাথগীতিকার মধ্যে মানবিকতার বিকাশ অনুভব করা গেলেও নাথধর্মের গানে প্রধানত তত্ত্বকথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

১

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
ছাব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন ॥
পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ্ব্যোম।
ষড়্‌রিপু কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য দম্ভ।

দশ ইন্দ্র তারা হয়তো পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় বিবিধ নামাত্মক ॥
কর্মেন্দ্রিয় হস্তপদ গুহ্য লিঙ্গ বপু।
মহাভুত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় ছাব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ ॥
কিবা কারিগরের আজব কারিগুরি।
তার মধ্যে ছয় পথ রাখিয়াছে পুরি ॥
সহস্রাধারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের মূল ॥
নাসামূলে দ্বিতল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি ॥
হৃদপদ্ম নির্মিত আছে শতদলে।
কুলকুণ্ডলিনী দল দিল নাভিমূলে ॥
নাভির নিম্নভাগে প্রেম সরোবর।
আর পঞ্চচক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার ॥
প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠা মুক্তাবধি চতুদলে অবস্থান ॥
কণ্ঠোপরি উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান ॥
চতুর্দলে অপান সর্ব ভুতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান ॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভ করে চক।
অনুলোম উর্ধ্বরেতা বিলোম প্রবর্তক ॥
প্রবর্তসাধক হৃদ নাভিপদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রাধারে আছয়ে নিশ্চয় ॥
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্ট দলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে ॥ —মুর্শিদাবাদ

নামকীর্তন

কীর্তন গান প্রধানতঃ দুইপ্রকার—নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। যে কীর্তন গানে কেবলমাত্র হরিনাম কিংবা কৃষ্ণনাম বারবার উচ্চারণ করা হয়, তাহাই নামকীর্তন। চৈতন্যদেব এই নামকীর্তনের প্রবর্তক। অষ্টপ্রহর ব্যাপী অবিরাম নামকীর্তন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী নামকীর্তনও বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে। পুরীতে কাশী মিশ্রের গৃহে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাল হইতে নামকীর্তন হইয়া আসিতেছে বলিয়া বিশ্বাস।

হরি বল হরি বল রে ও মন,
দিন গেল বিফলে।
মন রে এখন না বলে হরি (ও মন),
হরি বল্‌বি কি আর দেহ গেলে ॥
মন রে এ দেহ জলের বিম্ব (ও মন),
বিম্ব ভাঙ্গলে মিশে যাবে জলে ॥
মন রে, ভাই, বন্ধু দারা সুত (ও মন),
তারা কেউ যাবে না নিদান কালে ॥ —২৪ পরগণা

হরি বল, ভাই, দিন যায় বয়ে।
ওরে দিন যায় বয়ে তোর সময় যায় বয়ে।
ওরে এ ভব সমুদ্র মাঝে নিতাই চাঁদ নেয়ে,
ওরে কি কার্য করিলে, ভাই, মানব জন্ম পেয়ে —ঐ

এমন সুন্দর হরিনাম, নিতাই, কোথায় পেলে।
নিতাই কোথায় পেলি, অবধৌত কোথায় পেলি ॥
নিতাই আনিয়ে জগতের ধন জগৎ মাতালি,
আমায় ভাঁড়ায়ে ধন জগতে বিলালি।
(আমি তোর কেউ নইরে নিতাই)। —ঐ

৪

একবার হরিবল হরিবল, হরিবল ভাইরে,
হরিনাম তরী বিনে অন্য গতি নাইরে।
হরেকৃষ্ণ নারায়ণ মধুকৈটভারে মাধব মধুসূদন মুকুন্দ মুরারে,
গোপাল গোবিন্দ রাম, কেশব করুণাধাম, বল বল অবিশ্রাম।
হরির নাম অমৃত রসে তাপিত প্রাণ জুড়াইরে।
থাকে যত পাপরাশি, নাম তরঙ্গে যাবে ভাসি,
উদয় হবে জ্ঞানশশী, অন্ধকার যাবে দূরে। —মৈমনসিংহ

নালগীত

যশোহর জেলায় মুসলমান কৃষক সমাজের অল্প বয়স্কা বালিকাদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর গান প্রচলিত আছে, তাহাকে নালগীত বলে। পুর্ব বাংলার মাঘমণ্ডল ব্রতের গানে যেমন রৌদ্রকে ঘুম হইতে জাগাইবার জন্য গীত গাহিতে শুনা যায়, ইহাও প্রধানতঃ সেই শ্রেণীর গান।

১

গম্বুজে ঠেকেছে মাথা সোনার মুকুট পরা
আগুন পানির গড়া মানুষ কোমরেতে, আঁটাদনে মানুষ করা;
আচ্ছা চেহারা ধরলি তুই, না বেটী না বেটা,
মর্তের মা আসমানের বাপ চেনা বড় লেটা॥ —যশোহর

নীলের গান

চৈত্র সংক্রান্তির শিবের গাজনকে পুর্ব বাংলার কোন কোন স্থানে নীলের গাজন বা নীলপুজা বলা হয়। নীল বলিতে নীলকণ্ঠ শিবকে বুঝায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীলের উৎসব পুর্বে কোন লৌকিক দেবতার উৎসব ছিল। ক্রমে হিন্দুপ্রভাবের ফলে নীল বলিতে নীলকণ্ঠ বা শিবকে বুঝাইতেছে। তখন হইতে শিবের নাম নানাভাবে ইহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। নীলের গানে নানাভাবে শিবের বিবাহ-প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই শিবের নিদ্রাভঙ্গ।

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমারে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ ॥
খোল চন্দন কাঠের কপাট দেও দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ॥ (শিবনাথ কি মহেশ)

—বরিশাল

২

শিব বইল্যাছে, নারদ মুনি, শুন দিয়া মন।
তোমার মতন ভাইগ্না নাই এ ত্রিভুবন ॥
হাসিয়া বলেরে নারদ বিয়া কর তুমি।
অবশ্য তোমার বিয়া দিব আমি ॥
এত বলি নারদ মুনি করিল গমন।
দেশ ছাড়াইয়া গিয়া দিল দরশন ॥ —ফরিদপুর

৩

একদিন শিবানী হরকে কহেন ডাকি,
শঙ্খ পরিতে বড় সাধ যায় মনে।
(ও) সে শঙ্খ চুড়ি হীরার বালা
বিয়ার বয়সে কতই দিলা,
শুনিয়া পড়সীরা সব হাসে ॥
শিব শঙ্খ যদি পরতে চাও, বাপের বাড়ী চইলা যাও।
শ্মশানে মশানে ঘুরি, ভাঙ ধুতরা গিলি,
খাদ্য আমার ভাঙের লাড়ু, বাহন আমার বুড়া গোরু,
শঙ্খ দেওয়া আমার কর্ম নয় ॥ —ঐ

নীলের গাজনের গান

যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর অঞ্চলে শিবের গাজনকে নীলের গাজন বলে। সেই উপলক্ষে যে গান হয়, তাহা আচার-সঙ্গীতের অন্তর্গত। শিবের গাজনের গান এবং নীলের গাজনের গানে কোন পার্থক্য নাই। আচার পালনেও কোন পার্থক্য নাই। (গাজনের গান দেখ)

নীলপূজার গান

চৈত্র সংক্রান্তিতে পূর্ব বাংলার নানাস্থানে যে শিবের পুজা ও গাজন হয়, তাহাকে কোন কোন স্থানে নীল পুজা বলে। এই উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই নীলপূজার গান (নীলের গান দেখ)। নীলপূজা আজ শিবের পুজা বুঝাইলেও নীল অর্থাৎ নীল রং দ্বারা কোন লৌকিক দেবতাকে বুঝাইত বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রে নীল রংকে বর্জন করিবার কথা বলা হইয়াছে। নীলবস্ত্রধারীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সুতরাং মনে হয়, নীলবস্ত্রধারী কোন সম্প্রদায়কে হিন্দুসমাজ স্বীকৃতি দিতে চাহে নাই। তাহারাই নীলপূজা করিত এবং পুজা উপলক্ষে গান গাহিত। নীল ক্রমে নীলকণ্ঠরূপে পরিচিত হইয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে কোনমতে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা আচার-সঙ্গীতের অন্তর্গত।

১

মোচ্‌রা শিঙ্গে মোচ্‌রা শিঙ্গে মোচর পায়ে চলে,
নয়ত চলে ধাপবনে নয়ত চলে জলে,
শুন্‌তে যদি চাস্ ওলো মোচ্‌রা শিঙ্গের কথা,
ভূতপ্রেত সঙ্গে করে দেও দেখি দেখা।

মুন্দুদাদার গীত

রংপুর জিলার মুসলমান কৃষক-সমাজ হইতে এক শ্রেণীর গীত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা মুন্দুদাদার গীত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে কেঁওয়া নাম্নী এক যুবতীর সঙ্গে মুন্দু দাদার প্রণয়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৬১)।

১

বাঁশের তলে কেঁওয়া চন্দন খড়ি করে রে।
ওদিয়া যায় মুন্দু না যে ভাইয়া রে॥
মুন্দু দাদা ক্যানে হাতের জোকা নিল রে।
দৌড়ি যায় কেঁওয়া বড় ভাবির আগে রে॥

তোকে বল মুই বড় না ভাবি রে।
সুন্দু দাদা ক্যানে হাতের জোকা নিল রে॥
তুই কেঁওয়া আজিলি না পাগিলি রে।
তোর সুন্দু দাদায় তোকে জোক কইল রে॥
দৌড়ি যায় কেঁওয়া জলনি মাএর আগে রে।
তোকে বল মুই জলনি না মাও রে॥
সুন্দু দাদা ক্যানে হাতের জোকা নিল রে।
তুইও কেঁওয়া আজিলি না পাগিলি রে॥
তোর সুন্দু ভাইয়া তোকে জোক কই না রে।
দৌড়ি যায় কেঁওয়া আশ-পড়শির বাড়ী রে॥
তোকে বল মুই আশপড়িসি মাও রে।
সুন্দু দাদা ক্যানে হাতের জোকা নিল রে॥
তুই কেঁওয়া আজিলি না পাগিলি রে।
তোর সুন্দু ভাইয়া তোকে বিয়াও করিবে রে॥
দৌড়ি যায় কেঁওয়া বাড়িক নাগিয়া রে।
ন্যায় ন্যায় কেঁওয়া সোনার নও বুড়ি কড়ি।
যায় যায় কেঁওয়া বাদিয়ার বাড়ী॥
তোকে বল মুই বাদিয়া না ভাইয়া রে।
ন্যায়েক ভাইয়া তুই সোনার নও বুড়ি কড়ি রে॥
ন্যায়েক ভাইয়া তুই সোনার নও বুড়ি কড়ি রে।
মোক দেইস ভাইয়া আলাও সাপের বিষ রে॥
যায় যায় কেঁওয়া গোয়াল পাড়ায় রে।
তোকে বল মুই গোয়াল না ভাইয়া রে॥
মাফ দেইস ভাইয়া এক বর্ণী গাইরে দুধ রে।
আইস আইস কেঁওয়া বাড়িক নাগিয়া রে।
সোন্দার সোন্দায় কেঁওয়া জোড়া মন্দির ঘরে রে॥ —রংপুর

নুরন্নেহা ও কবরের পালা

চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ-গীতিকার অন্তর্গত একটি পালাগানের নাম 'নুরন্নেহা ও কবরের পালা'। ইহা চট্টগ্রামের সন্নিকটবর্তী রংদিয়া চরের আজগরের কন্যা নুরন্নেহা ও দেওগাঁর অধিবাসী মালেকের কাহিনী লইয়া রচিত। শৈশবে মালেক মাতৃপিতৃহীন হয়। পিতামহী তাহাকে অতি কষ্টে মানুষ করিতে থাকে। তাহারই প্রতিবেশীর কন্যা নুরন্নেহা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইত, ক্রমে উভয়ের প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এমন সময় সমুদ্রে একদিন প্রবল জলোচ্ছ্বাস হইল। উভয়েরই বাড়ীঘর ভাসাইয়া নিল। দুইজন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিছুদিন পর মালেকের সঙ্গে পুনরায় নুরন্নেহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা যখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার স্বপ্ন দেখিতেছে, তখন একদিন গ্রামে হার্মাদ বা জলদস্যুর আক্রমণ হইল। দস্যুরা নুরন্নেহা এবং মালেক উভয়কেই বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই জলদস্যুরা এক জেলের দলের সম্মুখীন হইল। তাহারা মালেক ও নুরন্নেহাকে জলদস্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিল। তাহাকে লইয়া মালেক রংদিয়ায় ফিরিয়া আসিল। নুরন্নেহার পিতা আজগর জানাইল, নুরন্নেহা তাহার সহোদরা ভগিনী ; তাহার মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাহাকে নিজের কন্যার মত পালন করিতেছে ; সুতরাং সে তাহার বিবাহযোগ্যা নহে। সেই রাত্রেই মালেক গৃহত্যাগ করিয়া গেল। এদিকে নুরন্নেহাও শয্যা গ্রহণ করিল। ক্রমে সে কবরের মাটি আশ্রয় করিল। বিদেশ হইতে ধনরত্ন লইয়া মালেক আবার কিছুদিন পর দেশে ফিরিল। আজগরের বাড়ীতে গিয়া শুনিল, তাহাদের আর কেহ বাঁচিয়া নাই। গৃহের অদূরে মালেক তিনটি কবর দেখিতে পাইল। নুরন্নেহার কবরটি সে চিনিয়া লইল। গভীর রাত্রে কান পাতিয়া ইহার ভিতর হইতে নুরন্নেহার কান্না শুনিতে পাইল। মালেক উন্মাদ হইয়া গিয়া সেই কবরের চারিপাশে কেবলি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইহার কয়েকটি পদ এই প্রকার।

১

ওরে দেয়াঙের পাহাড়ের বিছে বাহার দরিয়া।
নয়া চর পড়িল এক নাম রংদিয়া ॥

নয়া চরে নয়া বস্তি চারা চারা গাছ।
পেরাবনে জাগদি থাকে লৈট্যা বিশ্যা মাছ॥
নয়া চরে বলা জবিন তুনা হয় রে ধান।
মুনা মারার ডরে মাইনসে দিয়ে মাডির বান॥
বলী বলী গরু মৈষর গায়ত ভাসে তেল।
গড়কি আর মড়কি আইলে এক্কিবারে গেল॥
রংদিয়া চরেতে, ভাইরে, মাছে মানুষ খায়।
হাঙর কুমীর দৌড়ে বাহার দরিয়ায়॥ —চট্টগ্রাম

নৃত্য-সম্বলিত গীত

বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, একমাত্র ভাটিয়ালী সঙ্গীত বাদ দিলে ইহার প্রায় অধিকাংশেরই সঙ্গে নৃত্যও সংযুক্ত। বাঙ্গালী যেমন সঙ্গীত-প্রিয়, তেমনই নৃত্যপ্রিয় জাতি। এমন কি, জীবনের সাধন-ভজনের নিগূঢ় তত্ত্বকথাও বাঙ্গালী নৃত্য-সম্বলিত সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিয়াছে—বাউল সঙ্গীতই তাহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বাউলের সাধনার মধ্যে নৃত্য এবং সঙ্গীত একসঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে—নৃত্য ব্যতীত বাউল সঙ্গীত সম্ভব নহে। নৃত্যের একটি প্রধান আকর্ষণ এই যে, ইহার ভিতর দিয়াই সঙ্গীতের নিগূঢ় ভাবটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। নৈর্ব্যক্তিক ভাবই সঙ্গীতের অবলম্বন ; সুরই সঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ, কিন্তু সুরের মধ্যে সঙ্গীতের ভাবটি অনেক সময় অস্পষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহা প্রায়শঃই ভাবের দিক দিয়া আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে নৃত্য সংযুক্ত হইয়া থাকিলে দেহের প্রত্যক্ষ ভঙ্গির ভিতর দিয়া সঙ্গীতের ভাবটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। সেজন্য আদিম সমাজে সঙ্গীতের যখন প্রথম জন্ম হয়, তখন নৃত্যও তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছিল ; ক্রমে আমরা সভ্যতার পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, সঙ্গীতকে ততই নৃত্যের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছি। এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী সমাজে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত যুক্ত রহিয়াছে ; নৃত্যের প্রকৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন হইলেও সঙ্গীতের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কোন দিন ছিন্ন হয় নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও যে সকল আদিবাসী বাস করে, তাহাদের মধ্যেও নৃত্যের সঙ্গে

সঙ্গীত যুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের 'সদিচ্ছা' নানাদিক দিয়া আমাদের মধ্যে যে ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ইহাদের মধ্য হইতেও এই অভ্যাস অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। বাংলাদেশে ইতিপূর্বেই তাহা বহুলাংশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও ভবিষ্যতে লুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সেদিন কোন্ সঙ্গীতের সঙ্গে কোন্ প্রকৃতির নৃত্য সংযুক্ত ছিল, সেই তথ্য গভীর গবেষণা দ্বারাও উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'নাটগীত' নামে একটি কথার উল্লেখ আছে। বিবাহ প্রমুখ উৎসবাদি উপলক্ষে সমৃদ্ধ গৃহস্থ মাত্রের গৃহেই নাটগীতের অনুষ্ঠান হইত। নাটগীতের অর্থ নৃত্যগীত, অর্থাৎ নৃত্য-সম্বলিত বিশেষ কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই যে ইহার অনুষ্ঠান হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং ইহা গ্রাম্য কিংবা নিতান্ত লৌকিক স্তরের লঘু নৃত্যগীতানুষ্ঠান ছিল না। কৃত্তিবাস তাঁহার অনূদিত রামায়ণে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শিবদুর্গার বিবাহ উপলক্ষে হিমালয়ের গৃহে নাটগীতের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যেমন,

> নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
> কেহ বেদ পড়ে কেহ পড়য়ে মঙ্গলে॥
> নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
> পরম আনন্দে লোক আপনা পাশরে॥

লোক-সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া যেমন মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই লোক-নৃত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াই যে মধ্যযুগে নাটগীতের উদ্ভব হইয়াছিল, এ কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এক নাটগীত শ্রেণীর রচনা। কেবল মাত্র তিনটি চরিত্রের গীতি-সংলাপের মধ্য দিয়া কাহিনীটি সমাপ্ত হইয়াছে। এই তিনটি চরিত্র যে সঙ্গীতের মাধ্যমে কাহিনীটি পরিবেষণ কালে নৃত্যেরও সহায়তা গ্রহণ করিত, তাহা অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। সেইজন্য কেহ কেহ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে কৃষ্ণধামালী শ্রেণীর রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ধামালী বাংলার এক শ্রেণীর লোক-নৃত্য। ইহার বিষয় অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে (ধামালী দেখ)। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত বৃন্দাবনদাসের

'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে তাঁহার পার্ষদদিগকে সঙ্গে লইয়া একবার কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। সেই অভিনয়ের বর্ণনাটি পাঠ করিলে দেখা যায়, ইহা নৃত্য-সম্বলিত গীতাভিনয় ছিল। অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মধ্যে যে প্রণালীতে কৃষ্ণপ্রসঙ্গটি পরিবেষণ করা হইত, ইহাও তাহারই ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ, তাহাতেও নৃত্যের কথা এবং নৃত্য-সম্বলিত গীতের কথা উল্লেখিত আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নৃত্যই যে সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহা বৃন্দাবন দাসের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জা কর গিয়া॥

নৃত্যের জন্য যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা হয়, তাহাকেই মধ্যযুগে কাচ বলিত। আধুনিক বাংলায় কোন কোন অঞ্চলে কাচ শব্দে নৃত্যই বুঝায়, যেমন, ঢাকা অঞ্চলে কালীর নাচকে কালীনাচ বলে। এইভাবে মহাপ্রভু তাঁহার প্রত্যেকটি পার্ষদকে নৃত্যের জন্য সজ্জা গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজেও রুক্মিণীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্যের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তারপর

জগত-জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহাও গীত-সম্বলিত নৃত্যাভিনয়।। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র কিংবা অন্য কোনও সঙ্গীত-নাটক সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই শ্রেণীর নৃত্য কিংবা সঙ্গীতের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা যে লোক-নৃত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। আধুনিক কালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যে নৃত্যনাট্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি যে আদর্শে রচিত হইয়াছে, চৈতন্যদেব অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্যের মধ্যে তাহারই প্রথম পরিচয় লাভ করা যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই দেশীয় লোক-নৃত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই যে তাঁহার নৃত্যনাট্যগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; কিংবা শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যে নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার সঙ্গেও যে বাংলার মধ্যযুগের লোক-নৃত্যের কোন যোগ

আছে, তাহাও নহে ; তথাপি ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে প্রকৃতিগত অভিন্নতা আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাং দেখা যায়, মধ্যযুগের সাহিত্যে উল্লেখিত নাট-গীত ইহারই অনুরূপ কোনও নৃত্যগীতানুষ্ঠান ; নৃত্যের সঙ্গে তাহাতে সঙ্গীত সংযুক্ত ছিল বলিয়া তাহা নাটগীত বলিয়া পরিচিত ছিল। মধ্যযুগের বাংলার রস-সংস্কারের মধ্যে ইহার একটি বিশেষ স্থান ছিল। তাহার ধারা বাংলার রস-চেতনার মধ্য দিয়া অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক জীবনে এই নৃত্য-সম্বলিত গীত যে কেবল মাত্র সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে ; বরং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজের নিতান্ত সাধারণ স্তর পর্যন্ত তাহা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রকৃতি অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সমাজের উচ্চতর স্তর হইতে নিম্নতর স্তরে বিস্তার লাভ করিবার পরিবর্তে বরং নিম্নতর স্তর হইতেই সমাজের উচ্চতর স্তরে গিয়া আরোহণ করিয়াছে। লোক-সংস্কৃতির পক্ষে সাধারণত ইহাই নিয়ম।

বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থখানি মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একখানি অমূল্য তথ্যভাণ্ডার। ইহার অন্যত্র এই বিষয়ের যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, সমাজের নিতান্ত সাধারণ স্তরেও নাটগীত বা গীত-সম্বলিত নৃত্যের একটি বিশিষ্ট রূপের অস্তিত্ব ছিল। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, একদিন এক শিবের গায়েন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর গৃহে আসিয়া সঙ্গীতসহ নৃত্য করিতে লাগিল,

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥

ইহা যে নিতান্ত লৌকিক স্তরের নৃত্য, অর্থাৎ প্রকৃতই লোক-নৃত্য, সেই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। নাটগীতের মধ্যে যে নৃত্যাঙ্গ প্রচলিত ছিল, তাহাও লোক-নৃত্যের স্তর হইতে উন্নীত হইলেও ব্যক্তিগত অনুশীলন দ্বারা তাহাকে নানাদিক দিয়া গ্রাম্যতামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া লওয়া সম্ভব। কিন্তু এখানে যে নৃত্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বাংলার তদানীন্তন লোক-নৃত্যেরই

একটি সাধারণ রূপ বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। ইহার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গায়েন নৃত্যের ভিতর দিয়া তাহার সঙ্গীতের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। সুতরাং এখানেও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই। মধ্যযুগের সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে আরও যে সকল নৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় সর্বত্রই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত সংযুক্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, বিজয় গুপ্ত রচিত মনসা-মঙ্গলে একটি প্রাচীন পদ্ধতির শিবনৃত্যের বর্ণনাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিব মুখে গীত গাহিয়া নৃত্য করিতেন,

শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে।
হাতে তালি দিয়া কিঙ্করে গীত গাহে॥

বাংলার লোক-নৃত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে অনিবার্যভাবে সঙ্গীতও যুক্ত হইয়া আছে, সঙ্গীত ব্যতীত নৃত্যের রূপ কল্পনাতীত। এই বিষয়টি বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া বলিবার একটি বিশেষ কারণ আছে। সাধারণতঃ প্রাচীন পদ্ধতির (classical) নৃত্যে সঙ্গীত গৌণ স্থান অধিকার করে মাত্র। যেখানে দুরূহ মুদ্রার বিন্যাস এবং কঠিন অঙ্গ সঞ্চালন লক্ষ্য থাকে, সেখানে সঙ্গীত নৃত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে নৃত্যকারী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি সেখানে সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা দ্বারা সেই সঙ্গীত নৃত্যের অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত (integrated) হইতে পারে না। নৃত্য এবং সঙ্গীত যদি একটি অখণ্ড রস-সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে সেই ক্ষেত্রে নৃত্যের আবেদন যেমন ব্যর্থ হয়, সঙ্গীতের আবেদনও তেমনই ব্যর্থ হয়। বাংলার লোক-নৃত্যে এই ত্রুটি প্রায় নাই বলিলেই চলে। প্রাচীন পদ্ধতির নৃত্যে এই ত্রুটি প্রকাশ পায়।

এ কথাও কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, লোক-নৃত্য মাত্রেরই ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাহা সত্য নহে। আমাদেরই প্রতিবেশী রূপে যে সকল আদিবাসী বাস করে, তাহাদের নৃত্যের দিকে লক্ষ্য করিলে সর্বত্রই যে ইহার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা নহে। ইহাদের অনেক ক্ষেত্রেই নৃত্য মৌন অনুষ্ঠান মাত্র। কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে যদি নৃত্য থাকে, তবে তাহাও কোন উল্লেখযোগ্য রূপ লাভ করিতে পারে না। সাধারণতঃ সাঁওতালি ঝুমুর নৃত্যের কথাই যদি ধরা

যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, তাহাতে সঙ্গীত যুক্ত থাকে সত্য, কিন্তু নৃত্য সেখানে বৈচিত্র্যহীন ; বাংলার লোক-নৃত্যের মত জটিল নৃত্য তাহা নহে, সেই নৃত্যের পদ-সঞ্চালন ব্যতীত অঙ্গের আর কোন অংশই সঞ্চালিত হয় না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে নৃত্যের যে প্রধান গুণ, তাহা তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। উড়িষ্যা প্রদেশের কোরাপুট জিলার অধিবাসী বোণ্ডা জাতির মধ্যে যে নৃত্য প্রচলিত আছে, তাহা আনুপূর্বিক মৌন অনুষ্ঠান, কোন সঙ্গীত তাহাতে গীত হয় না। তাহার ফলে সেই নৃত্যও নির্জীব এবং প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এমন বিশেষ কোন লোক-নৃত্য নাই, যাহাতে সঙ্গীতের সম্পর্ক নাই। সেইজন্যই বাংলার লোক-নৃত্য এত শক্তিশালী এবং প্রাণবন্ত।

উপরের আলোচনা হইতে এই কথাও মনে করা ভুল হইবে যে, বাংলার লোক-নৃত্য সর্বত্রই সঙ্গীতের সঙ্গে সংযুক্ত—ইহার দুই একটি ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের বউ নাচ। ইহা অবগুণ্ঠনবতী নববধূর নৃত্য মাত্র, ইহার মধ্যে এখন কোন সঙ্গীত ব্যবহৃত হয় না, ইহাতে বধূ নিজে কোনও গীত গাহে না। তবে কোন কোন সময় আর কেহ তাহার নৃত্যের পটভূমিকায় সঙ্গীত পরিবেষণ করে। ইহা পূর্ণাঙ্গ মৌন নৃত্য নহে। বধূর মুখ ইহাতে অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া কেবল মাত্র তাহার পদ-সঞ্চালন ও হস্তাঙ্গুলির মুদ্রাবিন্যাসই ইহাতে দর্শকের লক্ষ্য থাকে। অন্যত্র যেমন সঙ্গীত নৃত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে তাহা হয় না। ইহার মধ্য দিয়া নৃত্যকারিণীর একটি অতি কঠিন দায়িত্ব পালন করিতে হয়। যেখানে সঙ্গীত নৃত্যের সহচর হইয়া থাকে, সেখানে নৃত্যের ত্রুটি সঙ্গীত দ্বারা পূর্ণ হয় এবং সঙ্গীতের মধ্যেও কোন ত্রুটি থাকিলে তাহাও নৃত্য দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে কেবল মাত্র নৃত্যই লক্ষ্য, সেখানে নৃত্যের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় গুণ বিকাশ করিতে না পারিলে তাহা আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয় ; কারণ, নৃত্য ও গীত পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক (complement)। যেখানে একের অভাব, সেখানে অন্যকে সেই অভাব পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কাছাড়ের বউ নাচে বধূর সঙ্গীতের অভাব কেবল মাত্র নৃত্য দ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা হইতেই সেই নৃত্য যে একদিন কত উচ্চাঙ্গের ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব বাংলা বিশেষতঃ ঢাকার কালীকাচের মধ্যে কেবল নৃত্যই আছে, তাহাতে কোন সঙ্গীত নাই ; তাহাতে সঙ্গীতের কিছু মাত্র অবকাশও নাই। অথচ এই নৃত্য যে প্রাণহীন কিংবা নির্জীব, তাহা বলিবার উপায় নাই। নৃত্যকারীর কৃতিত্বের উপরই ইহা নির্ভর করে। কালীকাচের মধ্য দিয়া সাধারণতঃ কালীর বেশ ধারণকারী নৃত্যকারীর সঙ্গে অসুরের একটি যুদ্ধের অভিনয় হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সঙ্গীতের অভাব এক দিক দিয়া নৃত্য-কুশলতা এবং অপর দিক দিয়া ইহার অভিনয়ের মধ্য দিয়া পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার মধ্যে সঙ্গীতের কোন অবকাশই সৃষ্টি হইবার সুযোগ পায় না। কালী লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া নৃত্যের মধ্য দিয়া খড়্গহস্তে অসুরের মুণ্ডচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহার নিজের পক্ষে সঙ্গীত যে অসাধ্য, তাহা কেবল মাত্র তাঁহার লোলজিহ্বার জন্য নহে, যুদ্ধের অভিনয়ের ভিতর দিয়া যে ভাবে তাঁহাকে দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হয়, তাহার মধ্য দিয়াও তাঁহার নিজের সঙ্গীত পরিবেষণের কোন অবকাশ থাকে না। এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন, যে-নৃত্যকারীর পক্ষে প্রবলভাবে অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রধানতঃ যাহা তাণ্ডব শ্রেণীর নৃত্য, তাহার মধ্যে নৃত্যকারীর নিজের সঙ্গীত পরিবেষণের অবকাশ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে এই অবস্থায় পটভূমিকা হইতে সঙ্গীত পরিবেষণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারও বিশেষ পরিবেশ বা situation-এর প্রয়োজন। অথচ কালীকাচের মধ্যে কালী কিংবা অসুর যে বিষয় অবলম্বন করিয়া যে ভাবে নৃত্য করিয়া থাকে, তাহাতে পটভূমিকা হইতেও সঙ্গীত পরিবেষণের অবকাশ নাই। যুদ্ধের অভিনয়টিই এখানে সঙ্গীতের অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়। যেখানে এই শ্রেণীর অবকাশ লাভ করা যায় না, সেখানে সঙ্গীতই নৃত্যের অবলম্বন হইয়া থাকে। তবে উপরে যে বউ নাচের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র নৃত্য-দক্ষতার গুণেই সঙ্গীতের অভাব পূর্ণ হইয়া যায়।

এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। অনেক সময় কোন কোন আচার-নৃত্যের (ritual dance) সঙ্গে সঙ্গীতের কোন সম্পর্ক থাকে না। অধিকাংশ আচার-নৃত্য ঐন্দ্রজালিক নৃত্য (magical dance) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের উদ্দেশ্য লোক-মনোরঞ্জন নহে, বরং অলৌকিক। অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস হইতেই ঐন্দ্রজালিক নৃত্য এবং অন্যান্য ক্রিয়া

অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বউনাচও মূলতঃ ঐন্দ্রজালিক মনোভাব হইতেই যদি উদ্ভূত হইয়া থাকে, তবে তাহার অনুষ্ঠানের মধ্যে সঙ্গীত সংযুক্ত না থাকিবারই কথা। সুতরাং ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত যুক্ত হইতে পারে নাই। নতুবা সাধারণ আনন্দ অনুষ্ঠান হিসাবে যদি ইহা জন্মলাভ করিত, তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক থাকিত। উপরে যে কালীকাচের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার সঙ্গেও একটি অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস জড়িত হইয়া রহিয়াছে, ইহার আচারটি প্রধানতঃ ধর্মীয়, কেবলমাত্র কৌতুককর (secular) নহে। সেইজন্য ইহার সম্পর্ক হইতেও সঙ্গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, যে সকল লোক-নৃত্যের উদ্ভবের মূলে কোন ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য কিংবা অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহাই প্রধানত সঙ্গীত বিবর্জিত হয়, নতুবা লোক-নৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গীত যুক্ত থাকিবেই।

নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত থাকিবার অর্থ সর্বদাই ইহাই নহে যে, নৃত্যকারী কিংবা নৃত্যকারিণী নৃত্যকালীন স্বয়ং অর্থাৎ নিজ কণ্ঠেই সঙ্গীত পরিবেষণ করিবেন। বরং যে ক্ষেত্রে নৃত্যকারীকে নৃত্যকালীন নিজ কণ্ঠে স্বয়ং সঙ্গীত পরিবেষণ করিতে হয়, সে ক্ষেত্রে নৃত্য খুব উচ্চাঙ্গের হইতে পারে না। সেইজন্য একক নৃত্যের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই নৃত্যকারী স্বয়ং গীত পরিবেষণ করিতে পারে না, বরং নেপথ্য কিংবা পটভূমিকা হইতে অন্য গায়ক তাহার হইয়া সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। ইহাও গীত-সংবলিত নৃত্য বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, একক নৃত্যের অনুষ্ঠানে নৃত্যকারী স্বয়ং গীত পরিবেষণের পরিবর্তে তাহার পক্ষে পটভূমিকা কিংবা নেপথ্য হইতে অন্য গায়ক গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। কারণ, একক নৃত্যে নৃত্যকারীর দায়িত্ব অনেক বেশি। সমগ্র জনতার দৃষ্টি কেবল মাত্র তাহার দেহের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সারি-নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই নৃত্যকারী দলই নৃত্যকালীন নিজেরাই সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। সারি-নৃত্যের সঙ্গীতটি গৌণ হইয়া পড়ে, সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতের মধ্যে গানের পদ অস্পষ্ট হইয়া কেবল মাত্র একটি সুরই জাগিয়া থাকে ; কিন্তু একক নৃত্যের ক্ষেত্রে নৃত্যকারীর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গীতের প্রতিটি শব্দ দর্শক এবং শ্রোতা অনুসরণ করিবার সুযোগ পায়।

পূর্ব বাংলার ঘাটু-নৃত্য একক নৃত্য ; কিন্তু ইহার সঙ্গে যে সঙ্গীত যুক্ত হইয়া

থাকে, তাহার দুইটি সুস্পষ্ট বিভাগ। প্রথমতঃ সমবেত সঙ্গীত, দ্বিতীয়তঃ একক সঙ্গীত। কখনও ঘাটু বালকের মৌন নৃত্যের পটভূমিকায় সমবেত জনতা এক সঙ্গে গান গাহিয়া থাকে, তাহার ফলে গানের প্রকৃত যে কার্য-কারিতা, তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না; কিন্তু ইহার দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ঘাটু বালক নৃত্যকালীন স্বয়ং যে একক সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে, তাহার একটি বিশেষ আবেদন প্রকাশ পায়। ইহা কাছাড়ের বউ নাচের মত মৌন নৃত্যও নহে, ঘাটু বালক একক-নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাতে নিজ কণ্ঠেই সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া থাকে। একক নৃত্য এবং একক সঙ্গীত এক সঙ্গে পরিবেষণের দৃষ্টান্ত বাংলার লোক-নৃত্যে খুব সুলভ নহে। ইহা একটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠান; কিন্তু তথাপি কেবল মাত্র শিক্ষার গুণে ঘাটু নর্তক এই দুঃসাধ্য কার্যটিরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উপরে যে বলিয়াছি, একক নৃত্যের মধ্যে নৃত্যকারীর সঙ্গীতের সম্পর্ক প্রায় নাই, ঘাটু নৃত্য এবং নাচনীনাচ তাহার দুর্লভ ব্যতিক্রম। ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিলেও চলে।

কোন কোন আদিবাসী সমাজের মধ্যে একই সঙ্গীতের সহায়তায় একক নৃত্য এবং সারি-নৃত্য এক সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমায় প্রবাহিত মুচুকুন্দ নদের উপত্যকায় নৃত্যগীত-কুশল গদবা নামক যে অস্ট্রিক ভাষাভাষী জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে যখন যুবতী নারীরা অর্ধ-বৃত্তাকারে সঙ্গীত সহকারে সমবেত-নৃত্য করিয়া থাকে, তখন তাহাদের সম্মুখেই 'রসিক' একতারা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিয়া থাকে; 'রসিকে'র নৃত্য একক নৃত্য, সে যুবতীদের সঙ্গে মিলিতভাবে নৃত্য করে না সত্য, কিন্তু মিলিত কণ্ঠে তাহাদের সঙ্গীতের সঙ্গে যোগ দেয়। রসিকের একক নৃত্য, তাহার একতারা বাদ্য এবং যুবতীদিগের সমবেত নৃত্যগীত ইত্যাদি সকলে মিলিয়া একটি অখণ্ড আনন্দরস-মণ্ডল রচনা করে। বাংলার লোক-নৃত্যে ইহার অনুরূপ অনুষ্ঠান এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পশ্চিম বাংলার ভাদু-নৃত্যে কোন কোন অঞ্চলে এখনও ভাদু-গান গাহিয়া নিম্নশ্রেণীর কুমারী মেয়েরা ঢাকের তালে তালে নৃত্য করিয়া থাকে; কিন্তু ঢাকের বাদ্যকর সেই নৃত্য কিংবা সঙ্গীতে যোগ দেয় না। কোন সময় নৃত্যে যোগদান করিলেও সঙ্গীতে যোগদান করিতে কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঢাক যন্ত্রটির আয়তনও এই কার্যের অনুকুল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল পুরুলিয়া জিলায় যে ছো-নাচ প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে এখন আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গীত যুক্ত থাকিতে শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহা ছো-নাচের অধঃপতনেরই পরিচায়ক। এ কথা সত্য যে, ছো-নাচে নৃত্যকারীরা মুখোস ব্যবহার করিয়া থাকে; সেইজন্য তাহাদের পক্ষে সঙ্গীত কার্যত অসম্ভব। কিন্তু সেইজন্য পটভূমিকা হইতে তাহাদের পক্ষ হইয়া সঙ্গীত পরিবেষণে কোন বাধা থাকিবার কথা ছিল না। পুর্বে তাহার প্রচলনও ছিল। ছো-নাচের মধ্য দিয়া কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী ব্যক্ত হইয়া থাকে, কেবলমাত্র নৃত্য দ্বারা তাহা কিছুতেই প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে হয়ও না। সেইজন্য মনে হয়, ছো-নাচের প্রাচীনতর যুগে ইহার সঙ্গে সঙ্গীতও অনিবার্যরূপে পরিবেষিত হইত। কিন্তু বর্তমানে ঢাক নামক বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠসঙ্গীতের সেই স্থানটি গ্রহণ করিয়াছে। আট-দশখানি ঢাকের শব্দ যখন সেই নৃত্যকালীন চারি দিগন্ত উচ্চকিত করিতে থাকে, তখন কণ্ঠসঙ্গীতের কথা কাহারও মনে উদয় হইবার অবকাশই পায় না। ঢাকের বাদ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের অভাব পুর্ণ হইতে পারে না, অথচ মুখোস ব্যবহার করিবার ফলে এই শ্রেণীর নৃত্যেও কোন উৎকর্ষ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। একদিকে মুখোসের ব্যবহার, অপর দিকে ঢাকবাদ্যের অসঙ্গত অধিকার ছো-নৃত্যে কণ্ঠসঙ্গীত প্রয়োগের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফলে এই নৃত্য ক্রমেই বৈশিষ্ট্য বর্জিত হইয়া পড়িতেছে। বাংলার যে লোক-নৃত্যে ঢাক (drum) অসঙ্গতভাবে নিজের অধিকার স্থাপন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে ঢোল—বাংলার ঢোলই হোক, কিংবা বিহারী ঢোলকই হোক,—ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে কণ্ঠসঙ্গীতের প্রয়োগ সর্বত্রই প্রচলিত আছে। এমন কি, ঢোলের সঙ্গে কাঁসীর বাদ্য সংযুক্ত হইয়াও সঙ্গীতের সুরকে নীরব করিয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু ঢাকের শব্দের সমুখে কণ্ঠসঙ্গীত সম্পুর্ণ নীরব হইয়া গিয়াছে। কণ্ঠসঙ্গীতের উৎকর্ষ হ্রাস পাইবার ফলেই যে নৃত্যের সঙ্গে ঢাকের বাদ্য আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

সুরের দিক দিয়া বাংলা সঙ্গীতের দুইটি প্রধান বিভাগ—প্রথমতঃ সারি ও দ্বিতীয়তঃ ভাটিয়ালি। যে সুরে তাল আছে, তাহাই সারি; যাহাতে তাল নাই, তাহাই ভাটিয়ালি। তাহা ছাড়াও এমন অনেক সুর আছে, যাহাতে

তাল মুখ্য না হইয়া গৌণ স্থান অধিকার করে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে তালহীন ভাটিয়ালি বলিয়া মনে হইলেও, সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে তাহাতে তালের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। সারি এবং ভাটিয়ালির মিশ্র সুরও আছে। কিন্তু মূলতঃ এই দুই শ্রেণীর সুরের উপর নির্ভর করিয়াই বাংলার লোক-সঙ্গীত গীত হয়। বিষয়-বস্তুর দিক হইতে বিচার করিলে ইহার বিভাগের সংখ্যা স্বভাবতই আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকল বিষয়েই যে সুস্পষ্ট বিভাগ করা সম্ভব হয়, তাহাও নহে; যেমন, কতকগুলি সঙ্গীতের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইহারা বিশেষ নৈসর্গিক এবং সামাজিক কারণে দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য তাহা সত্ত্বেও এ কথা সত্য নহে যে, বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে তাহাদের আদৌ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়াই সঙ্গীতের দিক হইতে একটি অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া এক অঞ্চলের যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাহা অন্যান্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবেও গিয়া প্রচার লাভ করিয়াছে। তালপ্রধান সারিগানের সঙ্গেই নৃত্য প্রধানতঃ যুক্ত থাকিতে পারে, সুরপ্রধান ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে নৃত্যের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না।

নেটোগান

বীরভূম, বর্ধমান, এবং মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রচলিত এক শ্রেণীর বৈরাগ্য মূলক লোক-সঙ্গীত নেটো, নেটুয়া বা নটুয়া, লেটো গান (লেটো গান দেখ) বলিয়া পরিচিত। নৃত্য এবং নাটকের সঙ্গে ইহার মূলতঃ যোগ ছিল বলিয়া ইহার এই প্রকার নাম। নৃত্যের ও গানের ভিতর দিয়া অভিনয়কারীকে নেটো বা লেটো বলে। বর্তমানে ইহা লেটো গান বলিয়াই অধিক পরিচিত বলিয়া লেটো গান শিরোনামাতেই ইহার বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই খানে একটি মাত্র গান উদ্ধৃত হইল।

সেদিন কেমন ভাবলি নারে মন,
যেদিন তোর জীবন যাবেরে মন।
আইনের আসামী আসিবে জমাদার,
কোনদিন এসে তোমায় করিবে গেলেবদার।

সেদিন তোর নাই নিস্তার কেমনে হবি পার।
পারেরই ভাবনা ভাবলি নারে মন ॥
সে দশা দেখে তোমার এগানা বেগানা,
লেপ বালিশ কেড়ে লয়ে ধূলায় দেয় বিছানা।
কোথা আমিরানা কোথা বালাখানা,
খাট পালং বিছানা পড়ে রবে।
আপ্ত বন্ধু যারা কেঁদে হবে সারা,
দিবে গোবর ছড়া দিবে তেড়ে।
'রবে' কার 'রবি' কার বসিবে গলেতে,
শীঘ্রই বাহির করিবে তুলসী তলাতে। —মুর্শিদাবাদ

নৌকা খণ্ড

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটি অংশের নাম নৌকা খণ্ড। ইহার প্রসঙ্গ ভাগবতে নাই। রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর লৌকিক ধারা অনুসরণ করিয়া ইহা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার বিষয়-বস্তু শ্রীরাধিকা দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য মথুরায় যাইবার পথে যখন যমুনা নদী অতিক্রম করিতে আসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নৌকা লইয়া তাহাকে পার করিয়া দিবার জন্য আসিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ছিল, শ্রীরাধিকার সঙ্গে কৌশলে মিলিত হওয়া। শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে মধ্য নদীতে শ্রীরাধার সঙ্গে তাহার নৌকার উপর কি ভাবে মিলন হইল, তাহাই নৌকা খণ্ডের বর্ণনার বিষয়। পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যেও এই প্রসঙ্গ গৃহীত হইয়াছিল। (নৌকা বিলাস দ্রষ্টব্য)।

রাধাক না পাআঁ মোর বেয়াকুল মনে।
রাতিদিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে ॥
উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে।
তার দরশন বিনি প্রাণ না রহে ॥
আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী।
বোলেঁ চালেঁ তোর থান আনিতে না পারি ॥
আপনেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার ॥
সেই মতে করিবোঁ তুহ্মার উপকার ॥

আহ্মা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে।
দধি দুধ বিচি নিআঁ মথুরার হাটে॥
এ বার তোহ্মাক লআঁ যাইব আন পথে
তবে না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে।
তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।
উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ॥
আহ্মে রাধা লআঁ যাইব মথুরার হাটে।
নাঅ লয়া থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে॥ -বাঁকুড়া

নৌকা বাইচের গান

নৌকা বাইচের গান সাধারণত সারি গান বলিয়া পরিচিত (সারি গান দেখ)। সারি গান কর্মসঙ্গীতের (work song) অন্তর্গত। বর্ষা এবং শরৎকালে প্রধানতঃ নদীমাতৃক পুর্ববঙ্গে বাইচের নৌকার যে প্রতিযোগিতা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে বাইচের নৌকা (racing boat) বাহিবার সময় এক শ্রেণীর সমবেত সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাই নৌকা বাইচের গান। এই গান তাল-প্রধান এবং ভাবের দিক দিয়া অত্যন্ত তরল।

আমরা শুভ যাত্রা করে,
ঘাটে নৌকা ছাইড়ে এলাম, ভাই,
গঙ্গা দরশনে যাবি তোরা আয়॥
গঙ্গা ২ জল ডাকি, অন্তরেতে ভক্তি রাখি—
চরণ যেন পাই॥ —মুর্শিদাবাদ

২

আমার নতুন বাগানে ফুল ফুইটাছে চামেলী,
পাই না মনোমত মালী।
মনের মত মালা পেলে মালা দিতাম তার গলে,
ডেকে দিতাম রংমহলে, তোমারে বলি॥ —ঐ

৩

উঠ ২ ওগো প্রাণনাথ, ঘুমে অচেতন, হায়, ঘুমাইছ কত।
আমি অন্ন আর ব্যঞ্জন, করেছি রন্ধন, (নাথ)
করগো ভোজন, নিশি হইল গত॥ —ঐ

৪

বিদায় দে, মা, দে মা যশোদে,
শ্যাম সাজায়ে দে, মা, যাব গোষ্ঠেতে।
দে, মা, বিদায় গোষ্ঠেতে যাব, মোহন বাঁশি দে, মা, হাতে॥ —ঐ

৫

আমি মৃত পতি সঙ্গে লয়ে ভেসে যাব।
ভেসে যাব আশীর্বাদ কর যেন জীবিত হয়॥
আমি নারী অভাগিনী, জনম-দুঃখিনী,
হইলাম অনাথিনী, হায়, বিধি হায়॥ —ঐ

ময়ূরের নৃত্য দেখে মুরগীর হয় মনে—
এই নাচ হয় না কেনে?
ময়ূর যখন নৃত্য করে, মুরগী এসে উঁকি মারে,
ঘরের কোণে॥ —ঐ

৭

জটা বাকল পড়ে রাম যাবি রে বনে।
কেমনে সহিব, ওরে বাছা ধন॥
নির্বুদ্ধা রাজা বুদ্ধিতে, কেন যাবি বনেতে,
স্ত্রীবশ রাজা কেন করেছিল পণ॥ —ঐ

৮

ও সে ধূলায় পড়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী।
কাঁচা চুলে হলাম আমি রাঁড়ী॥
রাজা কেন যুদ্ধে গেল
যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ হারালো,
রাম-লক্ষ্মণ পাঠাইল যমপুরী॥ —ঐ

ও যে কালীদহে কৃষ্ণ ঝাঁপ দিল,
হায় রে, কি হ'ল।
কালিন্দী যমুনা জলে, ডুবেছিল সব রাখালে,
কালীর মন্ত্রগুণে প্রাণ বাঁচাল ॥ —ঐ

১০

কোলে আয় রে, বৃষকেতু, সোনার চাঁদ,
আজ, বাছা, যাবে তোর জীবন।
কোথাকার এক ব্রাহ্মণ এলো, তোর পিতা সত্য কৈল,
তোর মাংসে করাবে ভোজন ॥ —ঐ

১১

বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
কানাই এবার গৃহে ফিরে চল।
ওই দেখ গগনেতে নাহি আর বেলা,
গোঠের খেলা খেলা কত বল ?
ডেকে বলে বলাই, ও নীলমণি,
তোর লাগিয়া কাঁদিছে জননী,
চল রে সকাল সকাল গৃহেতে যাই,
গোঠের খেলা সাঙ্গ হল।

—ফরিদপুর (কোটালিপাড়া)

বাইচের নৌকা যখন নৌকার মালিকের ঘাট হইতে রঙ্গক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়, যখন গ্রাম-বধূরা বরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তখন কোন কোন অঞ্চলে এই গানটি কাঁসার তালে তালে গীত হয়—

১২

কয় নীলমণি, ও জননী !
সাজাইয়া দাও গোষ্ঠে যাব আমি।
যাব গোচারণে রাখাল সনে
বলাই দাদা শিঙের দিচ্ছে ধ্বনি।

৬৬১

দে মা! মোহন বাঁশী মোহন চূড়া,
কটিতে, মা, বাঁধ পীতধড়া—
দেও, মা, পায়ে নূপুর, হাতে বলয়,
রাখালবেশে সাজিয়ে দেও তুমি;
শোন, মা! গাভী বৎস রাখালগণে,
সবাই চেয়ে আছে আমার পানে,
আমি না গেলে, মা, গোচারণে—
ধেনুগণ খায় না তৃণপানি। —ঐ

নৌকার চলতি পথে পুরুষের কণ্ঠে এই মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়—

১৩

কোন্ কোন্ সখি তোরা যাবে গো জল ভরিতে,
(ওগো) জল ভরিতে (ওগো) জল ভরিতে।
সাজিয়া চল গো, সখি, জলের ঘাটে যাই,
(হাঁ হাঁ বেশ)
যে ঘাটে ভরিব জল সেই ঘাটে কানাই (গো)।
জল ভর সুন্দরী, কন্যা, জলে দিয়া ঢেউ,
(হাঁ হাঁ বেশ)
হাসি মুখে কও কথা ঘাটে নাই কেউ। (গো)
জল ভর সুন্দরী, কন্যা, জলে দিয়া মন,
(হাঁ হাঁ বেশ)
কাইল যে কইচ্‌লাম কথা আছে নি স্মরণ (গো)। —মৈমনসিংহ

১৪

বাজ্‌ল বাঁশী গইন কাননে, প্রিয়ে রাধে রাধে বইলে,
প্রিয়, রাধে রাধে বইলে (গো) প্রিয়, রাধে রাধে বইলে।
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা,
(হাঁ হাঁ বেশ)
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা (গো)
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশী না রে জলে ভাস্যা যায়,
(হাঁ হাঁ বেশ)

বালু চড়ে ঠেক্যা বাঁশী রাধাগুণ গায় (গো)
যদি শ্যামের বাঁশী তোর লাগাল পাই,
(হাঁ হাঁ বেশ)
জড়ে জড়ে উগ্‌ড়াইয়া সায়রে ভাসাই (গো)। —ঐ

১৫

আমার গৌর যায়রে, আরে, নবীন-সন্ন্যাসে,
নবীন সন্ন্যাসে, আরে নবীন সন্ন্যাসে।
সন্ন্যাসী না অইও, বাছা, বৈরাগী না অইও,
অভাগিনী মায়ের পরাণ বধিয়া না লইও।
আগে যদি জান্তাম, নিমাই, যাইবেরে ছাড়িয়া,
কুলবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া না করাইতাম বিয়া।
নিমতলে থাক, নিমাই, নিমের মালা গলে,
অইয়া পুত্র মইরা যাইতা না লইতাম কোলে। —ঐ

কোন কোন সময় নৌকা বাইচের গানের মধ্য দিয়া সকরুণ বাৎসল্যরস যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—

১৬

যাত্রা করাইয়া মোরে দে গো, মা নন্দরাণী,
মাগো, কালীদয়ে যাব আমি।
যাত্রা করাও, নন্দরাণী, বেইলের দিকে চাইয়া,
আইজের যাত্রা করাইয়া দাও তেল সিন্দুর দিয়া
যাত্রা করায় নন্দরাণী মুখে দিয়া পান,
ঘরত না বাইরি অইল পুন্নুমাসীর চান্।
ভাত যে রান্ধিবা, মাগো, না ফালাইও ফেনা,
কালীদয়ে যাইতে, মাগো, না করিও মানা।
সাজ সাজ, বলাইরে, নাগরে দিল সাড়া,
শ্রীকৃষ্ণের সাজন দেইখ্যা সাজে গোয়ালপাড়া। —ঐ

অনেক সময় বাইচ আরম্ভ করিবার সময় বন্দনা গান গাওয়া হয়—

১৭

প্রথমে বন্দনা করি নিত্যানন্দ গৌরহরি।
দ্বিতীয়ে বন্দনা করি পুবে ভানুশ্বর,
একদিকে উদয় ভানু চৌদিকে পশর।
তৃতীয়ে বন্দনা করি দেবী সরস্বতী,
এস, মাগো, মোর কণ্ঠে করহ বসতি।
তার পরে বন্দনা করি দেব ত্রিপুরারি,
মাথে শোভে গঙ্গাদেবী বামে শোভে গৌরী।
পশ্চিমে বন্দনা করি ঠাকুর জগন্নাথে,
পুনর্জন্ম নাহি তার যে দেখ্যাছে রথে।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী সাগর,
যাহাতে বাণিজ্য করে চান্দ সদাগর।
ভকতি করিয়া বন্দি জগৎগুরু হরি,
বৈষ্ণবের চরণ বন্দি নমস্কার করি।
সর্ব দেবদেবীর পদ বন্দি ভক্তি করি,
এই পর্যন্ত বল্যা আমি বন্দনা সাঙ্গ করি। —ঐ

কোন কোন সময় নৌকা চালানো বন্ধ করিয়া মাঝিরা নৌকার কিনারায় গোড়ালী ঠুকিয়া ঠুকিয়া তাল রক্ষা করিয়া গায়—

১৮

দিশা—শুন, ললিতে, কই তোমারে শ্যাম-পীরিতে লাঞ্ছনা,
হায়, পীরিত আমারে ছাইড়ো না॥
বয়াত—পীরিত যতন পীরিত রতন গো,
হায় গো—পীরিত গলার হার,
পীরিত কইর‍্যা যে জন মরে সফল জীবন তার।
হায়, পীরিত আমারে ছাইড়ো না॥
এক পীরিতি কইর‍্যাছিল, গো হায় গো, রাধের সনে কানু,
কোন যুগে করছিল পীরিত আইজো ঝুরে তনু, হায়।

এক পীরিতি কইরাছিল গো হায় গো, রাধে কইভো পারে,
নন্দের ছাইল্যা ভাইগ্না লইয়া ফিরছিল বনে বনে, হায় ॥
এক পীরিতি কইরাছিল গো হায় গো, ডাগুয়ার সনে পাত,
ফুরদা ফুরদা হইয়া গেলে তেও না ছাড়ে সাথ, হায় ॥
এক পীরিতি কইরাছিল গো হায় গো, চড়া আরও চড়ি,
কোন যুগে করছিল পীরিত আইজো টানে বেড়ি, হায়।
এক পীরিতি কইর‍্যাছিল গো হায় গো, লঙ্কারি রাবণ,
ঘুর ঘুইর‍্যা বানরে হায় মজাইছিল্ ভুবন, হায় ॥
পীরিত যতন পীরিত রতন গো হায় গো, পীরিত যে জন করে,
একশো একখান আক্কল তাহার বিন্ওস্তাদে বাড়ে হায় ॥
লোহার সনে কাঠের পীরিত গো হায় গো, জলে ভাসে দুই জনা,
জলের সনে মাছের পীরিত জল বিনে প্রাণ বাঁচে না।
হায়, পীরিত আমারে ছাইতো না। —ঐ

১৯

সুন্দরীলো বাইরইয়া দেখ,
শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে,
ও শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে,
শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে ॥
ভাল, তাইরিয়া নাইরিয়া নাইরে তাইরে নাইরে নার,
তাইরিয়া নাইরিয়া নাইরে তাইরে নাইরে নার ॥
শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে ॥
ভাল, আষ্ট আঙ্গুল বাঁশী নারে মধ্যে মধ্যে ছেদা।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা ॥
শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে ॥
ভাল, বাঁশীটি বাজাইয়া কৃষ্ণে থইল কদম ডালে,
লিলুয়া বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে।
শ্যামে বাঁশী বাজাইয়া যায় রে। —মৈমনসিংহ

মন ভজ তুমি রে গঙ্গা নারায়ণ।
আগে আগে যায় ভগীরথ শঙ্খের ধ্বনি দিয়ে
পাছে পাছে যায় গঙ্গা নদী বইয়ে। —ঐ

২১

পিরীত করিয়া কুল মজাইল রে,
আরে নাগর কানাইয়া রে ॥
আরে, ভাইরে,
পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত গলার হার।
পিরীত কর‍্যা যেজন মরছে সফল জীবন তার।
আরে, নাগর কানাইয়া রে ॥
আরে. ভাইরে,
পিরীতি বিষম রে জ্বালা টেংরা মাছের কাঁড়া।
ছাড়াইলে ছাড়ানি যায় না, পিরীত বড় লেডা ॥
আরে, নাগর কানাইয়া রে ॥
আরে, ভাইরে,
পিরীতি দারুণ রে শেল যার অন্তরায় লাগে।
এক চইক্ষে নিদ্রা গেলে আর এক চইক্ষে জাগে।
আরে, নাগর কানাইয়া রে ॥
আরে ভাইরে,
এক পিরীতি কর‍্যাছিল রাধে আর কানু।
রাধে বাজায় করতাল কানাই বাজায় বেণু।
আরে, নাগর কানাইয়া রে ॥
আরে, ভাইরে,
আর এক পিরীত কর‍্যাছিল ডাগ্‌গুয়ার সনে পাত
পুর্দা পুর্দা অইয়া গেলে তেওনা ছাড়ে সাথ।
আরে, নাগর কানাইয়া রে ॥
আরে, ভাইরে,
আর এক পিরীত করছে দেখ মাছে আর পানি।

তিলেক ছাড়িয়া থাকিলে উড়্যা যায় পরাণি।
আরে নাগর কানাইয়া রে ॥ —ঐ

অনেক সময় নৌকা বাইচের গানের বিষয় করুণ রসাশ্রিত হইতে পারে। কারণ, নদীর বিশাল বিস্তারের মধ্যে কেমন যেন একটু বিষাদের সুর আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে।

২২

শচী কেন্দে বেলে গো কোথায় রইল প্রাণধন।
আমার কোলের ধন, আমার জীবন ধন—
শচী কেন্দে বলে গো কোথায় রইল গৌর প্রাণধন।
বল বল নগরবাসী কও কথা শুনি
এই পথে নি যাইতে দেখছন গৌর গুণমণি ॥
ত্যজিলেক বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গেরি বরণ
অন্ধকার হইল নৈদে না দেখি নয়ন ॥ —ঐ

২৩

নন্দ আগ বাড়াইয়া দেখ,
রাজপথে দাঁড়াইয়া গোপাল বইলে ডাক—নন্দ হে
বিহানে গিয়াছে গোপাল কিছু না খাইয়ে,
কোন বনে রৈল গোপাল ধেনু বৎস নিয়ে—নন্দ হে।
ভাত হই কড়া কড়া, দুধে পৈল মাছি,
কোন বনে রৈল গোপাল দিনের উপাসী—নন্দ হে। —ঐ

২৪

উদ্ধবরে, আইজ বাঁশীর রব শুনি শ্রবণে রাধা রাধা
বইলেরে ডাকিব কেমনে।
মথুরাতে গেলায় কৃষ্ণ হৈল ছয় মাস
সে অবধি শ্রীরাধিকা নিত্তি উপবাস।
যেখানে দেখিলাম কৃষ্ণ সে সেখানে নাই
ফুলবন বৃন্দাবনে হারালাম কানাই ॥ —ঐ

২৫

জল ভরিয়ে ঘাটে রইও না, শুন রাধে গো,
কালার নয়ন পানে চাইও না।
জলে যাইও না যাইও না ঘাটে রইও না গো ॥
যাইও না সুন্দরী রাধে তরুতলে দিয়া
কালায় সেইখানে যান পীরিতের লাগিয়া।
যমুনার জলে যাইতে পড়িল বিষম বাধা
ভাল মন্দ না জানিয়ে জলে গ্যাল রাধা ॥
যমুনার জলেরে যাইতে আর পন্থা নাই,
যে ঘাটে ভরিবার জল সেই ঘাটে কানাই।
যমুনার জলে যাইতে দেও করিল আন্ধি
পান্থ খানি হারা হৈয়ে কৃষ্ণ বইলে কান্দি,
যমুনার জলে যাইতে চালে চালে ঘর,
সঙ্গে রাধার কেহ নাই কেবল একেশ্বর।
শাশুড়ীয়ে গালি পাড়ে বাপ ভাইও তু'ল,
কেমনে ভাঙ্গিলায় আমার স্বর্ণের কলসী।
বাড়ীর কাছে আছে যেন কুমারিয়া ভাই,
এক কলসী ভাঙ্গলে পরে আর এক কলসী পাই। —ঐ

নিমাই-সন্ন্যাসের বেদনাময় কাহিনী বাংলার লোক-সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষাদমূলক বিষয়কেই অবলম্বন করিয়াছে—

২৬

কোয়িলার সুরে মায় কান্দেরে,
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে ॥
আরে ভাল্
সন্ন্যাসী না অইও রে, নিমাই, বৈরাগী না অইও।
আগে তোমার মাও মরিলে পাছে সন্ন্যাস যাইও ॥
লেখিয়া পড়িয়া নিমাই পণ্ডিত অইছ দড়।
শয়াল বুঝাল বুঝাইতে পার, মাও কেন ছাড় ॥
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে ॥

সন্ন্যাসে যে যাইবারে, নিমাই, তার নাই দায়।
ঘরে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া কি অইব উপায় ॥
আগে যদি জানতাম রে, নিমাই, যাইবারে ছাড়িয়া ॥
ছুডু বেলা মার‍্যা ফাল্‌তাম গলায় টিপুন দিয়া।
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে ॥
আধ শরীল খাইছিল মায়ের গুয়ে আর মুতে।
আধ শরীল খাইছিল মায়ের মাঘ মাস্যা শীতে ॥
মায়ের অঙ্গের বস্ত্রখানি যাদুর অঙ্গে দিয়া।
সারা রাইত পোহাইছিল মারে আনল বুকে লইয়া ॥
নিমাই চান সন্ন্যাসে যায় রে ॥ —ঐ

নৌকাবিলাস

বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণলীলার যে বিভিন্ন পালা আছে, তাহাদের একটি পালার নাম নৌকাবিলাস। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র নৌকাখণ্ড প্রসঙ্গটিই গ্রাম্য স্থূলতা বর্জিত হইয়া পদাবলী সাহিত্যে নৌকাবিলাস রূপে মার্জিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অমার্জিত রূপটিই কি ভাবে যে ইহার নিজস্ব ধারায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, তাহা পশ্চিম বাংলার কৃষ্ণলীলা ঝুমুরের বহু পদ হইতেই জানিতে পারা যায়। তাহাদের একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই পদটিকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র নৌকাখণ্ডের পদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ঐতিহ্য যে লোক-মানসে সর্বদাই সক্রিয় ছিল, এই পদটি তাহার প্রমাণ।

১

দধি বিক্র ছলে যান শ্যাম-গরবিণী,
কৃষ্ণ-দরশনে যায় সঙ্গেতে গোপিনী।
কমলিনী চলিলেন মথুরার হাটে,
নাবিক হয়েছেন কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে।
সঙ্গেতে বড়াই ছিল কাজে বড় পাকা,
নাবিক ও'পার বুঝি ঐ যায় দেখা।

নাবিক বলিয়া ডাক দিল যত সখী,
ত্বরায় আনিল তরী শ্যাম কমল-আঁখি।
কে গো তোমরা কোথা যাবে কাহার রমণী,
পরিচয় দাও মোরে সবিশেষ শুনি।
পরিচয় পেয়ে ছল করেন কমল-আঁখি।
ঢাকা খুল বসন তুল পসরায় কি দেখি।
ললিতা বলেন, ইত বড় মজার কথা,
কড়ি দিয়ে পারে যাবে দেখাই কি কাজ।
ললিতা বলেন, ইত বড় মজার কথা,
দধি ছানা না বিচালে কড়ি পাব কোথা।
আসিবার কালে তুমি যত কড়ি চাও,
হাট বেলা বয়ি যায় পার করে দাও।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ক্ষতি নাইকো সুন্দরী,
কেমনে হব যে পার অতি জীর্ণ তরী।
একে একে পার যদি হইতে পার সবে,
ভাঙ্গা লাইয়ে পার আমি করে দিব তবে।
স্বীকার করিয়া গোপী চাপিলেন নায়,
পরথম খেয়াতে রাধা বিনোদিনী যায়।
মাঝেতে লাগাইয়া তরী রঙ্গ করেন হরি,
তরঙ্গ হইল বড সামলাইতে নারি।
গৌর অঙ্গে নীল শাড়ী পরেছে বড়াই,
সাজিল দারুণ মেঘ তাই তো ডরাই।
খুলহ আছে যত অঙ্গের অলঙ্কার,
কাল অঙ্গ ভারে তোমার তরী ডুবে যায়।
ধীরে ধীরে খুলে রাধা অঙ্গের ভুষণ,
হাসিছেন রসিক কৃষ্ণ মুরলীবদন।
নীল শাড়ী খুলে আমি তায় নাহি দায়,
কাল অঙ্গের ভারে তোমার তরী ডুবে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মেঘ ধরেছে উত্তরে,
ঐ মেঘের তরে জল হৈলেও হৈতে পারে।
এমন সময়ে জল ঝড় বৃষ্টি হৈল,
ছলকে ছলকে জল নৌকায় উঠিল।
অকূল মাঝারে কালা ডুবাইল তরী,
শ্যাম চাঁদ রাই চাঁদ যমুনার মাঝে,
নীলপদ্ম লাল পদ্ম আ মরি কি সাজে!
জললীলা সাঙ্গ কর ত্রিভঙ্গ কানাই,
মাথাতে ঢালিব দধি এস হে নাগর।
বড়াইয়ের করে রাণী করে সমর্পণ,
এই মতে লীলা করে ব্রজের নন্দন॥

—বাঁশপাহাড়ী (মেদিনীপুর)